১

বিশ্বনবীর সাহাবী

তালিবুল হাশেমী

বিশ্বনবীর সাহাবী

প্রথম খণ্ড

তালিবুল হাশেমী

অনুবাদ ঃ আবদুল কাদের

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.bjilibrary.com

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ১৩৫

সর্বস্বত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ ঃ এপ্রিল ১৯৮৯

৭ম প্রকাশ

শাবান	১৪৩২
আষাঢ়	১৪১৮
জুলাই	২০১১

বিনিময় ঃ ২০০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

BISHA NABIR SAHABI-1st Volume by Talibul Hashemy. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Price : Taka 200.00 Only.

www.bjilibrary.com

অনুবাদকের কথা

সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহুমদের সম্পর্কে জানার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা ছাত্র জীবন থেকেই ছিলো। সে আকাঙ্ক্ষাকে সামনে রেখেই বিভিন্ন সময় সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহুমদের ব্যাপারে জানার চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বাংলা ভাষায় সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহুমদের জীবনালেখ্য জানার সুযোগ খুবই সীমিত। এক সময় নির্ভরযোগ্য বই-পুস্তক পাওয়াই যেতনা বলা চলে। বর্তমানে কিছু পুস্তক-পুস্তিকা বাজারে পাওয়া যায়। এ সকল পুস্তকেও সকল সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহুমদের জীবনী পাওয়া যায় না। যা পাওয়া যায়, তাও মানুষ সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহুমদের জীবন খণ্ডিতভাবে বিবৃত। এতে পাঠকের তৃষ্ণা নিবারণ হয় না। প্রসঙ্গত প্রশ্ন হলো, সাহাবী কারা ? এ প্রশ্নের সহজ-সরল জবাব হলো, সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি নিবেদিত প্রাণ সঙ্গী-সাথীদেরকেই সাহাবী বলা হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়াত প্রাপ্তি থেকে ওফাত পর্যন্ত আল্লাহ প্রদত্ত একমাত্র পূর্ণ জীবন বিধান, ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য যে সকল মহান সন্তান জীবনের সবকিছু উৎসর্গ করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্ম হয়ে কাজ করে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাদেরকেই আমরা সাহাবীরূপে জানি। এসব সাহাবীর সংখ্যা কত ? এ প্রশ্নের জবাব খুবই কঠিন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়তি জিন্দেগীর প্রথম পর্বে এ সংখ্যা কম ছিলো। পরবর্তী পর্যায়ে, এ সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। সর্বশেষে এ সংখ্যা হাজার হাজার দাঁড়ায়। হাজার হাজার সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহুমদের সম্মিলিত প্রয়াসে ইসলামী বিপ্লব সাধিত হয়। ইসলাম প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহুমদের ভূমিকা অনন্য সাধারণ ছিলো। তাদের গুরুত্বও অপরিসীম। ইসলামের বাস্তব নমুনা ছিলেন সাহাবীবৃন্দ। এ হাজার হাজার সাহাবীদের কর্ম এবং জীবন সকল যুগেই অনুপ্রেরণার উৎস।

হাজার হাজার সাহাবীর জীবনী সংগ্রহ করা অত্যন্ত দুরূহ এবং কঠিন কাজ। কোনো একজন গবেষক অথবা লেখকের পক্ষে এ কর্ম সম্পাদন আরো দুরূহ এবং অসম্ভব। বিশেষ করে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বেকার মহান সন্তানদের জীবনী রচনা যে কত বড় কঠিন কাজ তা বলাই বাহুল্য। শ্রদ্ধেয় জনাব তালিবুল হাশেমী উর্দু ভাষায় এ অসাধ্য সাধনের আংশিক প্রয়াস চালিয়েছেন। গভীর সমুদ্রের তলদেশ হতে মণি-মুক্তা আহরণের যথাযথ প্রক্রিয়া অবলম্বন পূর্বক একাগ্রচিত্তে তিনি এ অসাধ্য সাধনের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত রয়েছেন। এ পর্যন্ত তিনি আটটি পুস্তকে প্রায় পাঁচ শ' সাহাবী এবং মহিলা সাহাবীর কর্ম ও জীবনী রচনা করে উর্দু ভাষী পাঠকদের উপহার দিয়েছেন।

www.bjilibrary.com

যতদূর জানা যায় তিনি এখনো এ কাজ অব্যাহত রেখেছেন। জনাব হাশেমীর রচনায় মানুষ সাহাবীর জীবনালেখ্য বিধৃত হয়েছে। এ কাজ করতে গিয়ে তিনি পবিত্র কুরআন শরীফ হাদীস সহ বহু আরবী এবং অন্য ভাষার গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছেন। এ কারণেই তাঁর গ্রন্থ যুক্তিসিদ্ধ এবং গ্রহণীয় হয়ে উঠেছে। তবুও তিনি বিনীতভাবে আরজ করে বলেছেন, তাঁর মন্তব্যে কোনো পাঠক একমত না হলে যেন ক্ষমা করেন এবং সে প্রশ্নে যা সঠিক তাই যেন গ্রহণ করেন। তিনি আরো স্পষ্ট করে বলেছেন, সাহাবী রাদিয়াল্লাহ আনহুমদের সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করতে হবে। নির্বিশেষে সকলকেই শ্রদ্ধা জানাতে হবে এবং কোনো অবস্থাতেই তাঁদের প্রতি অশোভন ভাষা প্রয়োগ ও অসুন্দর ধারণা পোষণ করা যাবে না। আল্লাহ পাক শ্রদ্ধেয় জনাব হাশেমীর এতবড় প্রচেষ্টা কবুল করে নিন এবং দীর্ঘ জীবন দান করুন যাতে তিনি গবেষণালব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে আরো সাহাবীর জীবনী পাঠকদের কাছে উপস্থাপনের সুযোগ পান। আর এ খিদমতের বিনিময়ে আল্লাহ তাঁকে জান্নাত নসীব করুন।

আলহামদুলিল্লাহ। জনাব তালিবুল হাশেমীর 'পঞ্চাশজন সাহাবী'র প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ায় দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে। তার বইটির নাম পরিবর্তন করা হয়েছে। বর্তমানে বইটির নামকরণ করা হয়েছে 'বিশ্বনবীর সাহাবী'। 'পঞ্চাশজন সাহাবী'র প্রথম খণ্ড 'বিশ্ব নবীর সাহাবী'র প্রথম খণ্ড হিসেবে প্রকাশিত হলো। পাঠক সমাজ সানন্দচিত্তে বইটি গ্রহণ করবেন বলে আশা রইলো। এতবড় কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্য আল্লাহ পাক আধুনিক প্রকাশনী কর্তৃপক্ষ এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে সুন্দর প্রতিদান দিন এ দোয়া করি।

বইটির দ্বিতীয় সংস্করণেও কিছু ভুল-ভ্রান্তি থেকে যেতে পারে। পাঠকবর্গ ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি দিয়ে বইটি গ্রহণ করবেন বলে আশা করি। অন্য দিকে ভুল-ত্রুটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলে কৃতজ্ঞ চিত্তে তা শুধরে নেয়ার চেষ্টা করবো। অনুবাদসহ অন্যান্য কাজে অনেকেই সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের প্রতি আমি চির কৃতজ্ঞ। আমার এ নগণ্য প্রচেষ্টায় বাংলা ভাষী পাঠক-পাঠিকা যদি সামান্যতম উপকৃত হন তাহলে সার্বিক প্রয়াস সার্থক হবে।

পরিশেষে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে মুনাজাত, হে আল্লাহ ! আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস কবুল করুন। আখিরাতের মুক্তিই আমার একান্ত কামনা।

বিনয়াবনত
আবদুল কাদের

ঢাকা, ৩০শে অগ্রহায়ণ, ১৪০০ সাল।
১৯শে জমাদিউস সানি, ১৪১৪ হিজরী।
১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৯৩ সন।

www.bjilibrary.com

সূচীপত্র

১. হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির রাদিয়াল্লাহ আনহু ৩৫
২. সাইয়েদেনা হযরত আবু ওয়াহাব শুজা রাদিয়াল্লাহ আনহু ৫৪
৩. হযরত আকিল রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন বাকির লাইসী ৫৮
৪. হযরত ওয়াকিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবদুল্লাহ ইয়ারবুয়ীত তামিমী ৬১
৫. হযরত আবু জানদাল রাদিয়াল্লাহ বিন সোহায়েল রাদিয়াল্লাহ আনহু ৬৫
৬. হযরত আবু বুরযাহ আসলামী রাদিয়াল্লাহ আনহু ৭৩
৭. হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ বিন সোহায়েল রাদিয়াল্লাহ আনহু ৭৭
৮. হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ৮০
৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু ১০২
১০. হযরত আবু হুরাইরাহ দাওসী রাদিয়াল্লাহ আনহু ১৩১
১১. হযরত শাকরান সালেহ রাদিয়াল্লাহ আনহু ১৬২
১২. হযরত ছাওবান রাদিয়াল্লাহ আনহু ১৬৫
১৩. হযরত ইয়াসার নওবী রাদিয়াল্লাহ আনহু ১৭১
১৪. হযরত মুয়াইকিব রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবি ফাতিমাতাদ দাওসী ১৭৪
১৫. হযরত জাকওয়ান রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন জুনদুব আসলামী ১৭৯
১৬. হযরত উতবাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন উসাইদ ছাকাফী ১৮৪
১৭. হযরত মুগিরাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন শু'বা ছাকাফী ১৮৯
১৮. হযরত হিশাম রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আস সাহমী ২১৪
১৯. হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদ—সাইফুল্লাহ ২১৮
২০. হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস ৩০৪

www.bjilibrary.com

بسم الله الرحمن الرحيم

কুরআনে হাকিম ও সাহাবীদের মর্যাদা

সারওয়ারে কায়েনাত, ফখরে মওজুদাত, রহমতে আলম মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন মানবকুলের শ্রেষ্ঠতম মানব। তিনি ছিলেন কামিল ইনসান। সার্বিক গুণাবলীর সমাহার ঘটেছিলো তাঁর মধ্যে। এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহ আনহুমদের মর্যাদা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে সমাসীন। নবীদের (আ) পর তাঁদের মত উন্নত মানব আজও বিশ্বে আবির্ভূত হয়নি। এসব মহান মানব যাঁরা সর্বশ্রেষ্ঠ মানব রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দর্শনে নিজেদের চক্ষুকে আলোকিত করেছিলেন। তাঁরা সর্বোত্তম চরিত্রবানের উপর নিষ্ঠার সাথে ঈমান এনেছিলেন। সরাসরি সুহবতের ফায়েজও তাঁরা হাসিল করেছিলেন এবং তাঁর উত্তম আদর্শকে জীবনের অনির্বাণ শিখা বানিয়ে নিয়েছিলেন। তাঁরা নভোমণ্ডলীয় হেদায়াতের প্রোজ্জ্বল তারকা সদৃশ। তাঁদের সত্যবাদিতা ও ইখলাস, দিয়ানত এবং আমানত, শুভকামনা ও ত্যাগ এবং খোদাভীতি অতুলনীয়। তাঁদের পূত-পবিত্র আত্মা থেকে আজ পর্যন্তও সৌভাগ্য এবং সফলতার দীপ্তি বিচ্ছুরিত হয়। তাহযিব-তামাদ্দুনের গুচ্ছ তাঁরা সজ্জিত করেছিলেন। তাঁরাই রাজনীতি এবং অর্থনীতির ঔজ্জ্বল্য প্রদান করেছিলেন। জাহেলিয়াতের তমসা এবং কুফর ও শিরকের অন্ধকার গহ্বরে তাঁরাই হেদায়াতের প্রদীপ জ্বেলেছিলেন। আল্লাহর নাম বুলন্দ করার জন্যে তাঁরা জান-মাল, সন্তান-সন্ততি তথা প্রয়োজনের মুহূর্তে সবকিছুই হাজির করেছিলেন।

•

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার লোকদের সম্বোধন করে বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউই মু'মিন হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি এবং অন্যান্য লোকদের চেয়ে আমার সাথে তাঁর ভালোবাসা বেশী না হয়।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ ইরশাদের সত্যতা সাহাবী রাদিয়াল্লাহ আনহুমদের নিজেদের আমল দিয়ে এমনভাবে প্রমাণ করেছেন, যা বিশ্বের ইতিহাসে নজিরবিহীন। রিসালাত প্রদীপের এসব পতঙ্গ ন্যায় বা সত্য পথে যে ধরনের দুঃখ-মুসিবত ও নির্যাতন সহ্য করেছেন তা পাঠ করলে শরীরের প্রতিটি লোমকূপ খাড়া হয়ে যায়। গা শিউরে উঠে। সত্য দীনের

www.bjilibrary.com

প্রসার ও প্রচার এবং হক ঝাণ্ডার শির উন্নত করার লক্ষ্যে তাঁরা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যে কুরবানী দিয়েছিলেন তা ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে কিয়ামত পর্যন্ত তাওহীদ পন্থীদের জন্যে মশাল স্বরূপ হয়ে থাকবে। এসব পবিত্র নফসের মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে মাতা-পিতাকে পরিত্যাগ করেছেন। পরিবার-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করেছেন। স্বদেশ ভূমি ও গোত্রের লোকজনকে বিদায় জানিয়েছেন। ঘর-বাড়ী পরিত্যাগ করেছেন। ক্ষুধা সয়েছেন। সব ধরনের শারীরিক নির্যাতন সহ্য করেছেন। এমনকি প্রয়োজনে হক পথে নিজের জীবনকেও নজরানা হিসেবে পেশ করতেও কুণ্ঠিত হননি। শুধু মাত্র প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশাতেই নয় বরং তাঁর ওফাতের পর সাহাবী রাদিয়াল্লাহ আনহুমদের আল্লাহর দীনের প্রতি যে ধরনের দরদ দেখিয়েছেন ও নিষ্ঠার সাথে খেদমত, হিফাযত ও প্রসারের কাজ করেছেন তার স্বীকৃতি প্রদান আমাদের ঈমানেরই দাবী। এ সকল পবিত্র আত্মা ইসলামী উম্মাহর কল্যাণকামী। এ উম্মাহ তাঁদের ইহসানের বোঝা থেকে কখনো অব্যাহতি পেতে পারে না। কোনো নবী এবং রাসূল শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবী রাদিয়াল্লাহ আনহুমদের মত জীবন উৎসর্গকারী সাথী পাননি। বাস্তব কথা হলো, প্রত্যেক সাহাবীই ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহর নিদর্শন ছিলেন। আল্লাহর কিতাব এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত এসব মহান ব্যক্তির মাধ্যমেই আমাদের কাছে পৌঁছেছে। তাঁদের চারিত্রিক দৃঢ়তার মাধ্যমে এ উম্মাত সাফল্য এবং কল্যাণের পথে ধাবিত হতে পারে। তাঁরা হলেন সুউচ্চ সত্যবাদিতার আলোকজ্জ্বল তারকা। তাদেরকে প্রত্যক্ষ করে মুসলিম উম্মাহ জীবন তরীর মনযিলে মাকসুদ নির্ধারণ করতে পারে। আল্লাহ পাকের এসব পবিত্র এবং নির্বাচিত ব্যক্তির ত্যাগের আবেগ মহান স্রষ্টার এত পসন্দনীয় ছিলো যে, কুরআনে পাকের স্থানে স্থানে তাঁদের গুণের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। তাদের প্রশংসা করা হয়েছে এবং সরাসরি তাদেরকে বেহেশতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। যখন আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের শান বর্ণনা করেন তখন সেইসব পবিত্র নফসের মর্যাদা প্রমাণে আর কোনো দলিলের প্রয়োজন হয় না। কুরআনে হাকিম সাহাবা কিরাম রাদিয়াল্লাহ আনহুমদের গুণাবলী, তাদের স্থান, মান ও মর্যাদা সম্পর্কে কি ধরনের বর্ণনা দিয়েছে তা দেখা যাক। সূরা ফাতাহ'তে ইশরাদ হয়েছে ঃ "মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল। আর যাঁরা তাঁর সাথে রয়েছেন তাঁরা কাফেরদের উপর কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পর রহমশীল। তোমরা যখনই দেখবে তখনই তাদেরকে রুকূ', সিজদা, আল্লাহর ফযিলত এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের প্রচেষ্টায় মশগুল পাবে। সিজদাহর চিহ্ন তাঁদের চেহারায় মওজুদ রয়েছে। যা থেকে

www.bjilibrary.com

তাঁদেরকে পৃথকভাবে চেনা যায়। ইঞ্জিল এবং তাওরাতেও তাঁদের গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। তাদের উদাহরণ এভাবে দেয়া হয়েছে যে, যেমন একটি ক্ষেত। ক্ষেতে বীজ অংকুরিত হলো। পরবর্তীতে তা শক্তিশালী হলো। এরপর আরো খানিকটা বর্ধিত হলো। অতপর নিজের কাণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে গেল। এ ক্ষেত কৃষককে খুশী করে। অন্যদিকে কাফেররা ফুলে ফলে সুশোভিত ক্ষেত দেখে জ্বলে যায়। তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে আল্লাহ তাদের মাগফিরাত এবং বড় সওয়াবের ওয়াদা করেছেন।"-(সূরা আল ফাতাহ ঃ ২৯)

এ আয়াতসমূহে সাহাবায়ে কিরামের তিনটি গুণের কথা বিশেষভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। গুণ তিনটি হলো ঃ কাফেরদের উপর কঠোর, পরস্পর রহমশীল এবং এ ধরনের ইবাদাত গুজার যে তাদের চেহারায় সিজদার নিদর্শন সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠতো। কাফেরদের উপর কঠোর অর্থ এই নয় যে, তাঁরা কাফেরদের সাথে তিক্ত ব্যবহার করতেন। বরং তার অর্থ হলো, কাফেরদের মুকাবিলায় তাঁরা ছিলেন পাথরের মতো কঠিন। কোনো ধমক, কঠোরতা, চাপ অথবা লোভ-লালসা তাদেরকে হক পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারতো না। তাঁরা ছিলেন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষে কাফেরদের বিরুদ্ধে মাথায় কাফন বাঁধা জীবন উৎসর্গকারী মানুষ।

পরস্পর রহমশীলের অর্থ হলো মু'মিনরা একে অপরের ভাইয়ের মূর্তিমান প্রতিচ্ছবি। একে অপরের প্রতি দরদ পোষণ এবং দুঃখে দুঃখীত হয়। একজন আরেকজনকে সালাম, সদালাপ এবং হাসি-খুশী ব্যবহার প্রদর্শন করে। একে অন্যের সাথে পরামর্শ করে। পরস্পর সাহায্য করে এবং অপরের ব্যথায় ব্যথিত হয়। একে অন্যের খুন নিজের উপর হারাম মনে করে। আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা, যুলুম, প্রতিশোধ গ্রহণ, অন্যায় প্রতিশ্রুতি, খারাপ ধারণা, অপবাদ দেয়া, বিদ্রূপ এবং ফেতনা-ফাসাদ থেকে তারা দূরে থাকে। তাদের পরস্পর রহমশীল হওয়া অথবা ভ্রাতৃত্বের জযবার চূড়ান্ত অবস্থা এই ছিলো যে, হযরত আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আওফ মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনা এলেন। মদীনা এসে তিনি হযরত সায়াদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন রবি আনসারীর বাড়ী উঠলেন। হযরত সায়াদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর দু'জন স্ত্রী ছিলো। তিনি হযরত আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহ আনহুকে বললেন, আমার সকল ধন-সম্পদ আপনি অর্ধেক ভাগ করে নিন। এমনকি আমি নিজের স্ত্রীর একজনকে তালাক দিচ্ছি। ইদ্দতের পর আপনি তাকে শাদী করবেন।

হযরত আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহ আনহুর অন্তরেও হযরত সায়াদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর মতই ভ্রাতৃত্বের আবেগ ছিলো। তিনি নিজের ভাইকে এ

www.bjilibrary.com

ধরনের পরীক্ষায় ফেলা পসন্দ করলেন না। তাঁর ভ্রাতৃত্ববোধের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে বললেন, আল্লাহ্ পাক তোমার সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে বরকত দিন এবং তোমার উপর রহমত নাযিল করুন। আমার আর কিছু প্রয়োজন নেই। বাজারের রাস্তা কোন্ দিকে শুধু এতটুকু বলে দাও। ব্যবসা করে আমি আমার রুজী কামাই করবো।

সিজদার নিদর্শন অর্থ কপালের সেই দাগ নয় যা সিজদা করার কারণে নামাযীদের কপালে পড়ে থাকে। বরং তার অর্থ খোদাভীতি, বিনয়, সত্যবাদিতা, শারাফত এবং সচ্চরিত্রের সেইসব চিহ্ন যা আল্লাহর সামনে অবনত হওয়ার কারণে মানুষের চেহারায় দীপ্যমান হয়ে উঠে। একজন অহংকারী, দুঃস্বভাব এবং বেশরম মানুষের চেহারা একজন শরীফ পবিত্র এবং বিনয়ী মানুষের চেহারা থেকে অবশ্যই পৃথক ধরনের হয়। কুরআনে কারীমে সাহাবাদের গুণ-বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, তাদের চেহারা আলোয় প্রদীপ্ত থাকে। ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এ গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, সাহাবায়ে কিরামের বাহিনী সিরিয়া প্রবেশ করলো। এ সময় সেখানকার খৃষ্টানরা বলতে লাগলো, ঈসা আলাইহিস সালামের অনুগামীদের যে গুণ আমরা কিতাবে পড়েছি অথবা নিজেদের আলেমদের কাছে শুনেছি, আরব থেকে আগত লোকদেরও একই গুণে গুণান্বিত মনে হয়।

সূরা আল আনফালে সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহ আনহুমদের এ গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে ঃ "ঈমানদার তারাই যাদের অন্তর আল্লাহর নাম নেয়ার সাথে সাথে কেঁপে ওঠে এবং যখন তাদের সামনে আল্লাহর কালাম পাঠ করা হয় তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং তারা নিজের রবের উপর ভরসা রাখে। সেই মানুষ যারা নামায কায়েম রাখে এবং আমরা তাদেরকে যে রুজী দিয়েছি তা থেকে খরচ করে। তারাই সত্যিকারের ঈমানদার। তাদের জন্যে নিজের রবের কাছে মর্যাদা রয়েছে। অধিকন্তু মাগফিরাত এবং ইজ্জতের রুজীও রয়েছে।"

সূরা আত তাওবাতে ইরশাদ হয়েছে ঃ এবং ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার মহিলা একে অপরের সাহায্যকারী। নেক কথা শিক্ষা দেয় এবং খারাপ কথা থেকে বিরত রাখে। নামায কায়েম রাখে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের নির্দেশ মুতাবেক চলে। আল্লাহ এসব লোকের উপর রহম করবেন। অবশ্যই আল্লাহ সবচেয়ে বড় বিজ্ঞ।

সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহ আনহুমদের গুণই হলো তাঁদের অন্তর আল্লাহ ভীতিতে পরিপূর্ণ। তাদের সামনে কুরআনে হাকিমের আয়াত পঠিত হলে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে কাফেরদের সামনে আল্লাহর কালাম পঠিত

www.bjilibrary.com

হলে তারা তাতে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। তাঁরা নিজের প্রকৃত স্রষ্টার উপর ভরসা রাখে। নামাযের পাবন্দী করে এবং নিজের হালাল আয় থেকে আল্লাহর পথে অকাতরে ব্যয় করে। একে অপরকে সাহায্য করে। ভালো কাজের নির্দেশ দেয় এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে, নামায পড়ে, রোযা রাখে, যাকাত প্রদান করে, আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের নির্দেশ মুতাবিক চলে।

সূরা আত তাওবার অন্য এক স্থানে আল্লাহ পাক মুহাজির এবং আনসার সাহাবা রাদিয়াল্লাহ আনহুমদের প্রতি নিজের সন্তুষ্টির সুসংবাদ এ ভাষায় দিয়েছেন ঃ

"যারা ঈমান এনেছে এবং হিজরত করেছে ও নিজেদের জান এবং মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে, আল্লাহর কাছে তাঁরা সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে সমাসীন এবং তাঁরা সফলতা লাভকারী। তাদের রব তাদেরকে তাঁর রহমাত, সন্তুষ্টি এবং এমন জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। যাতে তাঁদের জন্যে স্থায়ী নিয়ামতসমূহ থাকবে। চিরকালের জন্যে তাঁরা সেখানে অবস্থান করবে। অবশ্যই আল্লাহর কাছে তাদের জন্য বড় প্রতিদান রয়েছে।"

সূরা আল আনফালেও একই ধরনের কথা বলা হয়েছে ঃ "যারা ঈমান এনেছে ও যারা আল্লাহর রাস্তায় ঘর-বাড়ী পরিত্যাগ করেছে এবং জিহাদ করেছে, যারা আশ্রয় দিয়েছে এবং সাহায্য করেছে তারাই সত্যিকারের মু'মিন। তাদের জন্যে গুণাহ খাতার ক্ষমা এবং সুন্দর রিয্ক রয়েছে। এবং যারা পরে ঈমান এনেছে এবং হিজরত করেছে ও তোমাদের সাথে একত্রিত হয়ে জিহাদ করেছে তারাও তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত।"-(আয়াত ঃ ৭৪-৭৫)

এ পবিত্র আয়াতসমূহে আল্লাহ পাক বিশেষ করে সেসব মুহাজির এবং আনসারের কথা উল্লেখ করেছেন যাঁরা ইসলাম গ্রহণ প্রশ্নে অগ্রবর্তী ভূমিকা পালন করেছেন। আর এভাবেই তারা 'আস সাবিকুনাল আওয়ালুন'-এর মহান উপাধির যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছেন। আস সাবিকুনাল আওয়ালুন' অর্থাৎ ইসলামের প্রথম যুগের সাহাবীদেরকে এ মর্যাদা ও স্থান দেয়া হয়েছে। এতে তাদের সাথেই শুধু জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়নি, বরং তাদের পদাংক অনুসরণ করে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবা রাদিয়াল্লাহ আনহুমদেরও বেহেশতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। অগ্রগামীদের দলে সেসব মুহাজির সাহাবী রাদিয়াল্লাহ আনহুম রয়েছেন, যাঁরা নবুয়াত প্রাপ্তির প্রথম যুগে কঠিন অবস্থায় ঈমান আনার সৌভাগ্য লাভ এবং হক পথে চলার জন্যে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট বরদাশত করেছিলেন। এমনকি তাঁরা নিজের ঘর-বাড়ীও পরিত্যাগ করেন। তাদের এসব কুরবানী আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় হয় এবং তাঁরা তাঁর কাছে সাচ্চা মু'মিন এবং

www.bjilibrary.com

জান্নাতী হিসেবে অভিহিত হন। হক পথে তাঁরা যে নজীরবিহীন কুরবানী স্বীকার করেন তার কতিপয় দৃষ্টান্ত পরখ করুন ঃ

নবুয়াত প্রাপ্তির প্রথম তিন বছরে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে তাবলীগের দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে থাকেন। নবুয়াত প্রাপ্তির চতুর্থ বছরের শুরুতে 'ফাসদা বিমা তুমারু ওয়া আরিজ আনিল মুশরিকিনা' (অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশাবলী প্রকাশ্য শুনান এবং মুশরিকদের কোনো পরওয়া করবেন না) এ হুকুম নাযিল হলো। এ নির্দেশানুসারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রকাশ্যে হকের তাবলীগ শুরু করেন। ফলে মক্কার মুশরিকদের ক্রোধ ও গোস্বার আগুন পূর্ণ শক্তির সাথে ফেটে পড়লো। তাওহীদের দাওয়াত গ্রহণকারীদের উপর তারা এমন এমন লোমহর্ষক নির্যাতন চালালো যে তাতে মানবতা মুখ থুবড়ে পড়ে রইলো।

হযরত বেলাল হাবশী রাদিয়াল্লাহ আনহু মক্কার এক মুশরিক সরদার উমাইয়াহ বিন খালফের গোলাম ছিলেন। ইসলামের আহ্বান শুনতেই তিনি সাচ্চা অন্তরে ঈমান আনেন। তাঁর মুসলমান হওয়ার কথা শুনেই উমাইয়াহ অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলো। সত্য গ্রহণের অপরাধে হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহ আনহুর জন্যে সে বিভিন্ন ধরনের শাস্তি আবিষ্কার করলো। তাঁর গলায় রশি বেঁধে মাস্তান যুবকদের হাতে তা দিয়ে দিতো। আর তারা সে রশি ধরে তাঁকে মক্কার পাহাড়ী এলাকায় টেনে নিয়ে বেড়াতো। অতপর উত্তপ্ত বালিতে এনে উপুড় করে শুইয়ে দিতো এবং পাথর এনে শরীরের ওপর চাপা দিতো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবি হযরত হাসসান রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন সাবিত বলেন, আমি জাহেলী যুগে হজ্জ অথবা উমরার জন্য মদীনা থেকে মক্কা গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে দেখলাম যে, ছেলেরা বেলাল রাদিয়াল্লাহ আনহুকে রশি দিয়ে বেঁধে এদিক-ওদিক টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছে। এ সত্ত্বেও সে লাত, উজ্জা, হুবল, আসাফ, নায়েলাহ এবং বাওয়ানাহকে (মূর্তি ও দেব-দেবীর নাম) সরাসরি অস্বীকার করছে।

কখনো কখনো উমাইয়াহ স্বয়ং হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহ আনহুকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে যেতো এবং হিরার উত্তপ্ত বালুর উপর শুইয়ে দিয়ে ভারী পাথর তার বুকের উপর বেধে দিতো। যাতে নড়াচড়া করতে না পারে। অতপর বলতো, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য প্রত্যাহার কর এবং লাত ও উজ্জাই প্রকৃত স্রষ্টা তার প্রতিশ্রুতি দাও। নচেৎ এভাবেই পড়ে থাকবে। এর জবাবে হক পুরস্ত হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহ আনহুর মুখ দিয়ে আহাদ আহাদ শব্দ বেরুতো। প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহ আনহুকে

www.bjilibrary.com

এ অবস্থায় দেখলেন যে, উমাইয়া তাঁকে উত্তপ্ত শক্ত মাটিতে শুইয়ে রেখেছে। মাটিও এমন উত্তপ্ত যে, তার উপর যদি গোশত রাখা হতো তাহলে তা গলে যেত। কিন্তু তিনি সে অবস্থাতেও লাত এবং উজ্জাকে অস্বীকার করে চলেছেন।

কোনো কোনো দিন বনু জুমাহর ছোকড়ারা হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহ আনহুকে মারাত্মকভাবে প্রহার করতো। দিনের বেলায় কাপড় খুলে লোহার জিরাহ পরাতো এবং রোদে রেখে দিতো। সন্ধ্যায় হাত-পা বেঁধে এক প্রকোষ্ঠে নিক্ষেপ এবং রাতে চাবুক দিয়ে কষাঘাত করতো। এ সত্ত্বেও তাঁর কদম হক পথ থেকে বিচ্যুত হয়নি। মুখ দিয়ে আহাদ আহাদ শব্দ ছাড়া আর কিছুই বের হতো না।

আবু ফাকিহাহ ইয়াসার ইযদী রাদিয়াল্লাহ আনহু ও উমাইয়াহ বিন খালফের গোলাম ছিলেন। তিনিও ইসলাম গ্রহণ করলেন। এতে উমাইয়া তাঁকেও যুলুম-নির্যাতনের নিশানা বানালো। উত্তপ্ত বালুর উপর মুখ উবু করে তাঁকে শুইয়ে দিতো এবং পিঠের উপর রেখে দিত ভারী পাথর। ভয়াবহ গরম ও বোঝার কারণে তিনি বেহুঁশ হয়ে যেতেন। একদিন পাষাণ হৃদয় উমাইয়াহ হযরত আবু ফাকিহা রাদিয়াল্লাহ আনহুর দু' পায়েই রশি বাঁধলো এবং তাঁকে নির্দয়ভাবে টেনে বাইরে নিয়ে গেল। সেখানে উত্তপ্ত বালুর উপর শুইয়ে দিলো এবং এতো জোরে তার গলার উপর চাপ দিলো যে জিহ্বা বেরিয়ে এলো। তিনি নিঃসাড় হয়ে পড়ে রইলেন। উমাইয়াহ ভাবলো কারবার খতম। কিন্তু তখনো তিনি জীবিত ছিলেন। ঘটনাক্রমে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি হযরত আবু ফাকিহা রাদিয়াল্লাহ আনহুর ওপর এ নির্যাতনের মর্মন্তুদ চিত্র দেখলেন। তাঁর অন্তর কেঁদে উঠলো এবং সে সময়ই আবু ফাকিহা রাদিয়াল্লাহ আনহুকে উমাইয়ার কাছ থেকে ক্রয় করে আযাদ করে দিলেন। কিন্তু সে যুগে কাফেরদের যুলুম-নির্যাতন থেকে কোনো স্বাধীন মুসলমান অথবা গোলাম কেউই মুক্ত ছিলো না। হযরত আবু ফাকিহা রাদিয়াল্লাহ আনহু মুক্ত হওয়া সত্ত্বেও কাফেরদের নির্যাতনের শিকার হয়ে রইলেন। ফলে নবুয়াতের ৬ষ্ঠ বছরে তিনি হিজরত করে হাবশা চলে গেলেন। হক পথে নির্যাতন সইতে সইতে স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছিলো। বদরের যুদ্ধের কিছু দিন পূর্বে তিনি ইনতিকাল করেন।

কুরাইশ সরদার সুহাইল বিন আমরের নেক প্রকৃতির সন্তান হযরত আবু জান্দাল রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু নবুয়াতের প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাতে পিতা এতো ক্রোধান্বিত হলেন যে, দুই পুত্রের পায়ে বেড়ি লাগিয়ে কারাগারে নিক্ষেপ করলো। তাঁরা সেখানে বছরের পর বছর ধরে বন্দীত্বের নির্যাতন সইতে থাকেন।

www.bjilibrary.com

হযরত ইয়াসির রাদিয়াল্লাহ বিন আমের, তাঁর পত্নী হযরত সুমাইয়াহ রাদিয়াল্লাহ বিনতে খাবাত এবং দুই পুত্র আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ এবং আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহু ইসলাম গ্রহণ করেন। আবু জেহেল তাদের উপর প্রচণ্ড নির্যাতন চালায়। তাদের অবস্থা পড়ে শরীরের লোমকূপ খাড়া হয়ে যায়। সে তাদেরকে পানিতে ডুবিয়ে রাখতো। উত্তপ্ত বালু এবং প্রজ্জ্বলিত আগুনের উপর শুইয়ে দিতো। মক্কার প্রখর রোদে দুপুরে দাঁড় করিয়ে রাখতো। বেত দিয়ে পিটাতো। মোটকথা সে নির্যাতন চরম সীমায় গিয়ে পৌছলো। একদিন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে কঠিন নির্যাতন সহ্য এবং মার খেতে দেখলেন। তিনি বললেন, "হে ইয়াসিরের খান্দান ! ধৈর্য ধর। নিসন্দেহে তোমাদের স্থান জান্নাত।"

যালেম আবু জেহেল একদিন হযরত সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহ আনহুর গোপন নাজুক স্থানে এতো জোরে নিযাহ মারলো যে, তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। অতপর আর একদিন সে হতভাগা হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে তীর মেরে শহীদ করে ফেললো। হযরত ইয়াসির রাদিয়াল্লাহ আনহুও বৃদ্ধ অবস্থায় নির্যাতন সইতে সইতে ওফাত পেলেন। হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহুর হায়াত ছিলো, এজন্যে তিনি বেঁচে গেলেন। নচেৎ আবু জেহেল তাঁকেও মেরে ফেলতে দ্বিধা করতো না।

হযরত যুবাইর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আওয়াম ঈমান আনলেন। এতে তাঁর অভিভাবক চাচা নওফিল বিন খুয়ায়েলদ ক্রোধে ফেটে পড়লো। হাফিজ ইবনে কাসির রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া গ্রন্থে লিখেছেন, নওফিল হযরত যুবাইর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে চাটাইতে শুইয়ে দিতো। এরপর আগুন জ্বালিয়ে তাতে ধুনি দিতো এবং যুবাইর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে বলতো, নিজের বাপ-দাদার ধর্মে ফিরে আয়। কিন্তু যুবাইর রাদিয়াল্লাহ আনহু বার বারই বলতেন, "কখনই নয় কখনই নয়। এখন আর আমি কুফরী গ্রহণ করবো না।"

হযরত মাসআব রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন উমাইর বনু আবদিদ্দার গোত্রের এক সচ্ছল পরিবারের সন্তান ছিলেন। মক্কায় তাঁর মতো সুদর্শন যুবক দ্বিতীয় আর কেউ ছিলো না। সে সর্বোত্তম মানের পোশাক পরতো এবং উন্নত ধরনের সুগন্ধি ব্যবহার করতো। যে রাস্তা দিয়ে হাঁটতো তা সুবাসিত হয়ে যেতো। পায়ে জরিদার হাজরামী জুতা পরিধান করতো। পিতা-মাতার এ আদুরে সন্তান বেশীর ভাগ সময় সাজ-গোজ, আরাম-আয়েশ এবং সুন্দর চুলের যত্ন করেই কাটাতো। এ সত্ত্বেও আল্লাহ পাক তাঁকে সুন্দর স্বভাব দান করেছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়াত প্রাপ্তির প্রথম যুগে যেই তাওহীদের

www.bjilibrary.com

অমীয় বাণী তাঁর কর্ণ কুহরে প্রবেশ করলো তখনই নির্দ্বিধায় তাকে স্বাগত জানালো। বাড়ীর লোকেরা এ খবর পেয়ে ইসলাম গ্রহণের অভিযোগে হাত-পা বেঁধে তাঁকে নির্জন স্থানে আটক করে রাখলো। কিন্তু তিনি কোনো অবস্থাতেই হক পথ থেকে বিচ্যুত হলেন না। অবশেষে তাঁকে বাড়ী থেকে বহিষ্কার করা হলো। নবুয়াত প্রাপ্তির পাঁচ বছর পর তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইঙ্গিতে হিজরত করে হাবশা চলে গেলেন। সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর যুলুম-নির্যাতন সইতে সইতে তাঁর সুশ্রী নিঃশেষ হয়ে গেল। রেশমের পোশাকের পরিবর্তে একটি কম্বলের অর্ধেক পরিধান করতেন এবং বাকী অংশ গায়ে জড়াতেন। পরিধেয় অংশটুকু বাবলার কাঁটা দিয়ে আটকে রাখতেন। নবুয়াত প্রাপ্তির ১২ বছর পর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে ইসলামের প্রথম শিক্ষক বানিয়ে মদীনা প্রেরণ করেন। সেখানে তিনি অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে ইসলামের তাবলীগ করতে থাকেন। তৃতীয় হিজরীতে ওহোদের যুদ্ধে বীরত্বের সাথে লড়াই করতে করতে শাহাদাত প্রাপ্ত হন। এতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুবই দুঃখিত হলেন। তিনি তাঁর লাশের কাছে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন ঃ

> "মু'মিনদের মধ্যে বহু এমন লোক রয়েছে যে, তারা আল্লাহর সাথে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো তা সত্যভাবে পালন করে দেখিয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকে নিজের সময় পুরো করেছে এবং অনেকে ইন্তেজার বা অপেক্ষা করছে এবং নিজের ইচ্ছার কোনো পরিবর্তন সাধন করেনি।"–(সূরা আল আহযাব ঃ ২৩)

এরপর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিহ্বল চিত্তে বললেন ঃ "মক্কায় আমি তোমার মতো সুদর্শন এবং সুন্দর পোশাক পরিধানকারী আর কাউকে দেখিনি। কিন্তু আজ দেখছি যে, তোমার চুল অবিন্যস্ত ও মাটিতে লেপ্টে রয়েছে এবং তোমার শরীরের উপর একটি চাদর। আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, কিয়ামাতের দিন তোমরা আল্লাহর সান্নিধ্যে উপস্থিত হবে।"

হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল ইরত ইসলাম গ্রহণ করলেন। কাফেররা তাঁর উপর মারাত্মক নির্যাতন শুরু করলো। তাঁরা তাঁর কাপড় খুলে আগুনের উপর শুইয়ে দিতো এবং বুকের ওপর রাখতো ভারী পাথর। কখনো দগদগে আগুনের ওপর শুইয়ে ভারী দেহের মানুষ তাঁর বুকের উপর বসতো। যাতে তিনি পাশ ফিরতে না পারেন। খাব্বাব রাদিয়াল্লাহ আনহু অটল ধৈর্যের সাথে সে আগুনে কাবাব হতেন। এমনকি জখমের রক্ত এবং পুঁজ গলে গলে সেই আগুন নিভে যেত। ইবনে সায়াদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বর্ণনা করেছেন, খাব্বাব রাদিয়াল্লাহ আনহু পাষণ্ড এক মহিলা উম্মে আনমারের গোলাম ছিলেন।

www.bjilibrary.com

মহিলাটি ইসলাম গ্রহণের অভিযোগে তাঁকে কখনো লোহার যিরাহ্ পরিয়ে রোদে শুইয়ে দিতো এবং কখনো গরম লোহা দিয়ে তাঁর মাথায় দাগ দিতো। এ ধরনের ভয়ংকর নির্যাতন সহ্য করতে করতে হযরত খাব্বাব কিছুদিন অতিবাহিত করলেন। এরপর একদিন ফরিয়াদ নিয়ে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাজির হলেন।

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, সে সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কা'বার দেয়ালের ছায়ায় শুয়েছিলেন। হযরত খাব্বাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আরয করলেন ঃ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আপনি আল্লাহ পাকের কাছে আমাদের জন্য কেন দোয়া করেন না ?' একথা শুনে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উঠে বসলেন। তাঁর পবিত্র চেহারা লাল হয়ে গেল এবং বললেন ঃ

"তোমাদের আগে অতীতকালে এমন লোকও ছিলো, লোহার চিরুনী দিয়ে যাদের গোশত চেঁছে ফেলা হয়েছিলো। হাড্ডি ছাড়া তাদের শরীরের আর কিছুই ছিলো না। এ কঠোর অবস্থায়ও তাঁরা নিজের দীনের উপর থেকে আস্থা হারাননি। তাদের মাথার উপর করাত চালান হয়েছে। করাত দিয়ে চিরে তাদেরকে দু' ভাগ করা হয়েছে। এ সত্ত্বেও তাঁরা দীন পরিত্যাগ করেননি। আল্লাহ এ দীনকে অবশ্যই বিজয়ী করবেন এবং তোমরা দেখতে পাবে যে, সওয়ার একাকী ইয়েমেন থেকে হাজরা মাওত পর্যন্ত যাবে ও আল্লাহ ছাড়া কাউকেই ভয় করবে না।"

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইরশাদ শুনে হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহ আনহু আল্লাহর অভিপ্রায় বুঝে ফেললেন এবং নীরবে ফিরে গেলেন। আল্লামা ইবনে আসির রাহমাতুল্লাহ আলাই বলেছেন, হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু নিজের খেলাফতকালে একবার হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহ আনহুকে তাঁর নির্যাতনের কাহিনী শুনানোর নির্দেশ দিলেন। তিনি কাপড় উঠিয়ে আমীরুল মু'মিনিনকে নিজের পিঠ দেখালেন। পিঠ দেখে তিনি থ' মেরে গেলেন। কোনো শ্বেত রোগীর চামড়া যেমন সাদা হয়ে যায় তেমনি তাঁর সারা পিঠ সাদা হয়ে গিয়েছিলো। হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন ঃ

"আমীরুল মু'মিনিন, আগুন জ্বালিয়ে তার উপর আমাকে শুইয়ে দেয়া হতো। এমনকি আমার পিঠের চর্বি সে আগুন নিভিয়ে দিতো।"

হযরত আবু যর গিফারী রাদিয়াল্লাহ আনহু নিজের দেশ থেকে মক্কা এসে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিলেন। এ সময় মুশরিকরা চার দিক থেকে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং মার মার ধর ধর করে রক্তাক্ত করে ফেললো।

www.bjilibrary.com

হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু এসে যদি তাদের হাত থেকে ছাড়িয়ে না নিতেন তাহলে সেদিনই তাঁর ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যেতো।

হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন মাজউন ইসলাম গ্রহণ করলেন। মুশরিকরা তাঁকে বিভিন্ন ধরনের যুলুম-নির্যাতন, হাসি-ঠাট্টা, বিদ্রূপ এবং অর্থনৈতিক চাপে নিক্ষেপ করলো। অবশেষে বাধ্য হয়ে তিনি ঘর-বাড়ী ত্যাগ করে হাবশায় হিজরত করলেন।

হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন মাসউদ ইসলাম গ্রহণের পর মুশরিকদের সামনে কুরআন তেলাওয়াত করলেন। এতে সেই যালেমরা এমন নিষ্ঠুরভাবে মারলো যে, তাঁর চেহারা ফুলে গেলো এবং শরীরের কয়েক স্থান থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে লাগলো। কিন্তু তাতে তিনি ভ্রূক্ষেপও করলেন না। একদিকে যালেমরা তাঁকে প্রহার করছিলো অন্যদিকে তিনি কুরআন তেলাওয়াত অব্যাহত রেখেছিলেন। যখন তাঁর উপর কাফেরদের যুলুম-নির্যাতন সীমাহীন অবস্থায় গিয়ে পৌঁছলো তখন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইশারায় তিনি হাবশায় হিজরত করলেন।

হযরত ওসমান গনি রাদিয়াল্লাহ আনহু ইসলাম গ্রহণ করলেন। এ অপরাধে তাঁর চাচা তাঁকে বেঁধে মারলো। তাঁর ওপর এত নির্যাতন চালানো হলো যে, অবশেষে তিনি স্ত্রী হযরত রোকাইয়া রাদিয়াল্লাহ আনহু বিনতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সহ স্বদেশ ভূমি ত্যাগ করে হাবশা গিয়ে উপস্থিত হলেন।

হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহ আনহু ঈমান আনলেন। এ কারণে মক্কার কাফেররা তাঁর উপর সীমাহীন অত্যাচার চালালো। সে সময় তাঁর মাতা ইসলাম গ্রহণ করেননি। তিনিও পুত্রের ইসলাম গ্রহণে অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তারিখুস সগীর গ্রন্থে মাসউদ বিন খারাশের একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। এ বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, তাঁরা সাফা এবং মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে চক্কর মারছিলেন। তাঁরা দেখলেন অনেক মানুষ একজন যুবককে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কি ঘটনা ? মানুষেরা বললো, তালহা বিন উবায়দুল্লাহ বেদীন হয়ে গেছে। একজন মহিলা সে যুবকের পেছনে পেছনে গড় গড় করতে করতে এবং গালি দিতে দিতে যাচ্ছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, মহিলাটি কে ? লোকজন জবাবে বললো সে তার মা সায়বাহ বিনতে হাজরামী। হাফেজ ইবনে কাসির রাহমাতুল্লাহ আলাইহি 'আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া' গ্রন্থে লিখেছেন, নওফিল বিন খুয়াইলদ আদবিয়া কুরাইশের বাঘ খিতাবে মশহুর ছিলো। হযরত তালহা

২—

www.bjilibrary.com

রাদিয়াল্লাহ আনহুর ইসলাম গ্রহণে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হলো। সে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং হযরত তালহাকে (উভয়ই বনু তামিম গোত্রের এবং পরস্পর আত্মীয় ছিলেন) এক রশিতে বাঁধলো এবং নির্যাতন চালালো।

ইবনে আসির রাহ্মাতুল্লাহ আলাইহি এবং ইমাম হাকিম রাহ্মাতুল্লাহ আলাইহি বলেছেন, হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহ আনহুর ইসলাম গ্রহণের খবর যখন তাঁর চাচা এবং বড় ভাই ওসমান বিন ওবায়দুল্লাহ পেলেন তখন তারা হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহ আনহু ও হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহুকে দড়ি দিয়ে বেঁধে খুব পিটালো। এর উদ্দেশ্য ছিলো যাতে তাঁরা ইসলাম পরিত্যাগ করেন। কিন্তু নির্যাতন যতই করা হোক না কেন ইসলাম থেকে তাঁদের সমান্যতম বিচ্যুতিও ঘটলো না।

হযরত আমের রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ফাহিরাহ হযরত আয়েশাহ সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহ আনহার এক ধরনের ভাই তোফায়েল বিন আবদুল্লাহর গোলাম ছিলেন। তিনি ঈমান আনলেন। এতে মক্কার মুশরিকদের রাগ ও ক্রোধের তুফান তাঁর উপরে গিয়ে আপতিত হলো। এ হতভাগারা যাবতীয় নির্যাতনই তাঁর উপর চালালো। কখনো তাঁকে নৃশংসভাবে মারা হতো। কখনো উত্তপ্ত বালিতে এবং কাটার উপর টেনে হিঁচড়ে নিয়ে বেড়ানো হতো। একদিন হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু দেখলেন যে, কাফেররা তাঁর শরীরে কাঁটা বিধিয়ে দিচ্ছে এবং দাড়ি ধরে থাপ্পর মারছে। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁকে ক্রয় করে আযাদ করে দিলেন। এ সত্ত্বেও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে হিজরত করে মদীনা না যাওয়া পর্যন্ত কাফেররা তাঁর উপর নির্যাতন চালাতে কসুর করেনি।

হযরত আয়াশ বিন আবু রবিয়াহ, হযরত সালমাহ রাদিয়াল্লাহ আনহা বিন হিশাম এবং হযরত ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদ ইসলাম গ্রহণ করলেন। কাফেররা তাদেরকে কারাগারে নিক্ষেপ করলো। সেখানে তাঁরা বছরের পর বছর ধরে নিঃসঙ্গ জীবন অতিবাহিত করেন।

হযরত যিন্নিরাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু কুরাইশের মখজুম বংশের দাসী ছিলেন। দাওয়াতে হকের প্রথম যুগে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। সত্য গ্রহণের অপরাধে আবু জেহেল তাঁর ওপর নিত্য নতুন নির্যাতন চালাতো। তিনি জীবন দিতে রাজী ছিলেন, কিন্তু আল্লাহর একত্ববাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে কোনো -ক্রমেই প্রস্তুত ছিলেন না। আল্লামা বালাজুরী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বর্ণনা করেছেন, হক পথে চরম নির্যাতন সইতে সইতে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে

www.bjilibrary.com

আসছিলো। এতে আবু জেহেল ভর্ৎসনা করে বললো লাত এবং উজ্জা তোমাকে অন্ধ করে দিয়েছে। তিনি নির্দিধায় জবাব দিলেন, লাত এবং উজ্জা পাথরের মূর্তি। তাদেরকে পূজা করছে সে কথা তারা কি করে জানবে। আমার দৃষ্টিশক্তি চলে গিয়ে থাকলে তা আমার আল্লাহর তরফ থেকে মুসিবত হিসেবে এসেছে তিনি চাইলে আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়েও দিতে পারেন। আল্লাহ তাঁর এ দৃঢ়তাকে অত্যন্ত পসন্দ করলেন। পরের দিন তিনি যখন ঘুম থেকে জাগলেন তখন তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছেন। ইবনে হিশাম লিখেছেন, হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ্ আনহু তাঁকেও ক্রয় করে মুক্ত করে দিয়েছিলেন।

হযরত লুবাইনাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু কুরাইশের বনু আদি গোত্রের একটি শাখা বনি মুয়াক্কালের দাসী ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়াত প্রাপ্তির প্রথম বছরগুলোতেই ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেন। এতে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন খাত্তাব (নিজের জাহেলী যুগে) এত উত্তেজিত হয়ে পড়েন যে, তাঁর উপর প্রতিদিন নির্যাতন চালাতেন। মারতে মারতে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়তেন তখন বললেন, আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এজন্যে তোমাকে ছেড়ে দিয়েছি। এখনো সময় আছে, নতুন ধর্ম ত্যাগ করো। তিনি জবাবে বলতেন, "অবশ্যই নয়। তুমি যত ইচ্ছা যুলুম করে নাও।" অবশেষে তাঁকেও হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু খরিদ করে স্বাধীন করে দেন।

হযরত নাহদিয়াহ রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং তার কন্যা বনু আবদিন দার গোত্রের এক মহিলার ক্রীতদাসী ছিলেন। নবুয়াত প্রাপ্তির প্রথম যুগেই ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর প্রভু তাঁর ওপর কঠিন নির্যাতন চালান। কিন্তু তিনি এ নির্যাতন উপেক্ষা করে হক পথে অটল ছিলেন।

হযরত উম্মে উবাইস রাদিয়াল্লাহ আনহু বনু যোহরাহ গোত্রের বাঁদী ছিলেন। হক দাওয়াতের প্রতি সাড়াদানকারী প্রথম মুসলমানদের অন্যতম ছিলেন। হক পথে চলার অপরাধে মক্কার মশহুর মুশরিক সরদার আসওয়াদ বিন আবদে ইয়াগুছ তার ওপর চরম নির্যাতন চালাতো। কিন্তু তিনি কোনো অবস্থাতেই ইসলাম থেকে মুখ ফিরাননি। শেষে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁকে এ নির্যাতনের পাঞ্জা থেকে মুক্তি দেন।

হযরত হুমামাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত বিলাল হাবশী রাদিয়াল্লাহ আনহুর মা ছিলেন। হাফিজ ইবনে আবদুল বার রাহমাতুল্লাহ আলাইহি আল ইসতিয়াব গ্রন্থে লিখেছেন, তিনিও পুত্রের মতো দাওয়াতে হকের প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। মুশরিকরা তাঁর পুত্রের ওপর

www.bjilibrary.com

যেমন নির্যাতন চালাতো তেমনি তাঁকেও শাস্তি দিতো। কিন্তু তিনি ইসলামের ওপর অটল ছিলেন।

এ হলো মক্কায় ইসলাম গ্রহণকারী সাবিকুনাল আওয়ালুনদের ওপর যুলুম-নির্যাতনের মাত্র কতিপয় উদাহরণ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়াত প্রাপ্তির প্রথম যুগে তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহীদের কোনো শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণকারীই কাফেরদের যুলুম-নির্যাতন ও অত্যাচারের হাত থেকে নিস্তার পাননি। যখন তাদের নির্যাতন সীমা ছাড়িয়ে গেলো তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মযলুম মুসলমানদেরকে হাবশার দিকে হিজরত করার পরামর্শ দিলেন। বস্তুত নবুয়াত প্রাপ্তি ৫ এবং ৬ বছর পর অনেক মুসলমান পুরুষ এবং মহিলা মক্কা থেকে হিজরত করে হাবশা চলে গেলেন। প্রতিটি মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই স্বদেশ এবং নিজের ঘর-বাড়ীকে ভালোবেসে থাকে। এসব পরিত্যাগ করে যাওয়া তাদের জন্য এক বিরাট পরীক্ষা। কিন্তু আল্লাহর এ পবিত্র বান্দারা সে পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হন। তাদের মধ্যে একদল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরতের পূর্বেই মক্কা ফিরে আসেন এবং অন্য দলটি খায়বারের যুদ্ধ ৭ হিজরী পর্যন্ত হাবশার মুহাজিরের জীবনের মুসিবত সহ্য করতে থাকেন। নবুয়াত প্রাপ্তির ১৩ বছর পর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমদেরকে মদীনায় হিজরতের নির্দেশ দেন। নির্দেশ প্রাপ্তির সাথে সাথে হকপন্থীরা তাতে সাড়া দিলেন এবং প্রিয় স্বদেশ ভূমি, ধন-সম্পদ এবং ঘর-বাড়ীকে বিদায় জানিয়ে মদীনা গিয়ে পৌঁছলেন। আল্লাহ্ পাক তাঁদের এ কুরবানী অত্যন্ত পসন্দ করলেন। শুধু এ কুরবানীই নয় বরং পরবর্তীতে তাদের পদাংক অনুসরণ করে যাঁরা এসেছেন তাঁদেরকেও আল্লাহ্ তায়ালা নিজের সন্তুষ্টির সুসংবাদ দিয়েছেন। যদিও পরবর্তীতে আগমনকারীরা অগ্রগামীদের মত যুলুম-নির্যাতন সহ্য করেননি, তবুও তাঁরা নিজের ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও জীবন হক পথে বিলিয়ে দিয়েছেন এবং হকের ঝাণ্ডা উড্ডীন রাখার জন্যে যে কোনো ধরনের কুরবানী দিতে পিছপা হননি। আল্লাহ্ পাক নিজের বিশেষ ফযিলতে তাদেরকেও সাবিকুনাল আওয়ালুনের পবিত্র দলের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। হাঁ, কিছু পার্থক্যও সূচীত করেছেন। মক্কা বিজয়ের পূর্বে ঈমান আনয়নকারীদেরকে মক্কা বিজয়ের পরে ঈমান গ্রহণকারীদের চেয়ে আফজাল বা উত্তম বলা হয়েছে। যেমন সূরা আল হাদীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ

"তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিজয়ের (মক্কা) পূর্বে ব্যয় করেছে এবং লড়াই করেছে (আর যে এ কাজ পরে করেছে) তা বরাবর হতে পারে না। যারা পরে ব্যয় (ধন-সম্পদ) এবং জিহাদ ও কিতাল (কাফেরদের) করেছে তাদের মর্যাদা

www.bjilibrary.com

পূর্বে ব্যয়কারীদের চেয়ে কম। আল্লাহ পাক সবার সাথেই নেক ওয়াদা করেছেন এবং যে কাজ তোমরা সম্পাদন করো সে সম্পর্কে আল্লাহ ওয়াকিবহাল।"

–(সূরা আল হাদীদ ঃ ১০)

কুরআনে কারীমে মুহাজিরদের সাথে সাথে আনসারদের উঁচু মর্যাদার কথাও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁরাও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং আখিরাতে সমান সমান সওয়াবের অংশীদার হবেন। সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমদের পবিত্র কাতারে আনসারদের এক বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। এ সকল পবিত্র আত্মার লোক মক্কা থেকে তিনশ' মাইল দূরে এক পুরোনো শহর ইয়াসরাবে বসবাস করতেন। তাঁরা সেখানে অত্যন্ত নির্ঝণঝাট এবং শান্তিপূর্ণ ভাবে জীবন অতিবাহিত করছিলেন। এসব মানুষের ইসলাম গ্রহণেরও প্রয়োজন ছিলো না এবং মক্কার হকপন্থীদের আশ্রয় প্রদানেও বাধ্য ছিলেন না। শুধুমাত্র সৎ প্রকৃতির কারণে তাঁরা হক দাওয়াতের প্রতি সাড়া দিয়েছিলেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়াত প্রাপ্তির ১১ বছর পর হজ্জ মওসুমে ৬জন ভদ্র স্বভাবের খাজরাজী মক্কা এলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সামনে ইসলাম পেশ করলেন। তাঁরা নির্দিধায় তা কবুল করলেন। ইয়াছরাব ফিরে গিয়ে অন্যান্যদের কাছেও তাঁরা তাওহীদের দাওয়াত দিলেন। নবুয়াত প্রাপ্তির ১২ বছর পর দ্বিতীয়বার তাঁরা মক্কা এলেন। এ সময় তাঁদের সাথে আরো ৬জন হকপন্থী এসেছিলেন। তাঁরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাইয়াত হলেন। তাঁদের আবেদন অনুযায়ী প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত মুসআব রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন উমায়েরকে ইসলামের প্রথম দায়ী বানিয়ে ইয়াসরাব প্রেরণ করলেন। তাঁদের তাবলিগী প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে ইয়াসরাবের ঘরে ঘরে ইসলামের চর্চা হতে লাগলো। নবুয়াত প্রাপ্তির ১৩ বছর পর ইয়াসরাবের ৭৫জন হকপন্থী (৭৩জন পুরুষ এবং ২জন মহিলা) মক্কা এলেন এবং কাফেরদের অগোচরে রাতের বেলা আকাবার ঘাঁটিতে বিশ্ব নেতা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাত করলেন। তাঁর হাতে বাইয়াত হলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইয়াসরাব তাশরীফ নেয়ার দাওয়াত দিলেন। এ সময় এ ওয়াদাও করলেন যে, তাঁরা নিজের জীবন, সন্তান এবং সম্পদ দিয়ে তাঁকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হেফাজত ও সাহায্য করবেন। এ বাইয়াত ইতিহাসে বাইয়াতে উকবায়ে সানিয়াহ, বাইয়াতে লাইলাতুল উকবাহ অথবা বাইয়াতে উকবায়ে কাবিরাহ নামে স্মরণ করা হয়। এ বাইয়াত ইসলামের ইতিহাসে মাইল ফলকের মর্যাদা রাখে। প্রকৃতপক্ষে এ বাইয়াত আরব ও আযম এবং জ্বিন ও ইনসানের কাছ থেকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করার বাইয়াত

www.bjilibrary.com

ছিলো। সে সময় আরবের প্রতিটি অণু-পরামাণু হকের নিশানবাহীদের খুন পিপাসু ছিলো। ইয়াসরাব ভূখণ্ডের এ সকল পূত-পবিত্র মানুষ উঠে দাঁড়ালেন এবং নিজের জীবন, সম্পদ এবং সন্তানদেরকে মক্কায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পদতলে এনে রাখলেন। এসব পবিত্র ব্যক্তিত্ব নিজেদের সবকিছু হক পথে নিয়োজিত করলেন এবং ভয়-ভীতি ও গালমন্দের পরওয়া করলেন না। এ বাইয়াতের কারণে আনসাররা এমন এক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হলেন, যার ওপর তাঁরা চিরকাল ফখর করতেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবী রাদিয়াল্লাহ আনহুমদেরকে মদীনায় হিজরতের অনুমতি দিলেন। অনুমতি পেয়ে প্রায় সকল পুরুষ ও মহিলা সাহাবীই রাদিয়াল্লাহ আনহাই মক্কাকে বিদায় জানিয়ে মদীনা গিয়ে পৌঁছলেন। আনসাররা তাঁদেরকে আহলান-সাহলান ওয়া মারহাবা বলে স্বাগত জানালেন এবং অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে তাঁদের মেহমানদারী করলেন। কিছুদিন পর স্বয়ং হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু ও হযরত আমের রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ফাহিরাহসহ ইয়াসরাবে তাশরীফ আনলেন। এ সময় আনসাররা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এমন উষ্ণ সম্বর্ধনা জানালো যার নজীর বিশ্বের ইতিহাসে পাওয়া ভার। সেদিন "ইয়াসরাব" "মদীনাতুন নবীতে" রূপান্তরিত এবং তার ভূমি নভোমণ্ডলীর ঈর্ষায় পরিণত হলো।

মুহাজিরীনে কিরাম রাদিয়াল্লাহ আনহুম বছরের পর বছর ধরে বিষবৎ অকথ্য যুলুম-নির্যাতন সহ্যের পর নিজের পরিবার-পরিজন, ঘর-বাড়ী এবং ধন-সম্পদ ত্যাগ করে যখন মদীনা পৌঁছলেন, তখন তাঁদের কাছে আল্লাহর নাম ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। কিন্তু মদীনার আনসাররা যে ভালোবাসা এবং নিষ্ঠা ও সততার সাথে সে দেশ ত্যাগীদের মেহমানদারী করলেন, তা এক ঈমান প্রজ্জ্বলিত কাহিনী। ইসলামের ইতিহাসে এ কাহিনী চিরকালের জন্যে আলোর বিচ্ছুরণ ঘটাবে।

প্রকৃতিগতভাবে আনসাররা ছিলেন অত্যন্ত শরীফ, সাদাসিধে এবং রুচিশীল ও দরাজ দিলসম্পন্ন মানুষ। কিন্তু শত শত বছরের পুরনো পারস্পরিক মুনাফিকী ও শত্রুতা তাদের শরীফ চরিত্রকে প্রায় ধ্বংস করে দিয়েছিলো। ইসলাম আনসারদের পারস্পরিক মুনাফিকীকে খতম এবং যারা একে অপরের রক্ত পিপাসু ছিলো তাদেরকে দীনের মযবুত ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে। আল্লাহ পাক এভাবে আনসারদেরকে ভয়াবহ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন। সূরা আলে ইমরানে ইরশাদ হয়েছে ঃ "আল্লাহর রজ্জু ঐক্যবদ্ধভাবে দৃঢ়তার সাথে ধারণ করো এবং বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করো না। আর আল্লাহর সে নিয়ামত

www.bjilibrary.com

স্মরণ করো যখন তোমরা পরস্পর শত্রু রূপে পরিগণিত ছিলে। অতপর তিনি তোমাদের অন্তরে (পারস্পরিক) ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিলেন। ফলে পরস্পর তোমরা ভাই হয়ে গেলে। প্রকৃতপক্ষে তোমরা অগ্নি গহ্বরের কিনারায় দণ্ডায়মান ছিলে। আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে তা থেকে বাঁচিয়ে নিলেন। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের কাছে নিজের নিদর্শনাবলী প্রকাশ্যভাবে বর্ণনা করেন। যাতে করে তোমরা পথ পাও।"(-আয়াত ১০৩)

আনসাররা আল্লাহ্ তায়ালার এ মহান ইহসানের পুরোপুরি শোকর আদায় করলেন। তাঁরা নিজের জীবন, সম্পদ এবং সন্তানদেরকে হক পথে ওয়াকফ করে দিলেন এবং নিজেদের ত্যাগ-তিতিক্ষা ও নিষ্ঠার এক উজ্জ্বল নিদর্শন ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ করে দিলেন। হিজরতের কয়েক মাস পর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুহাজির এবং আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন কায়েম করলেন। এ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা শুধুমাত্র এক জরুরী পরিস্থিতির ফলশ্রুতি ছিলো না বরং এর মধ্যে বিশেষ হিকমত এবং মুসলিহাত ছিলো। এর ফলে একদিকে মুহাজিরদের অন্তর থেকে স্বদেশ ত্যাগের অনুভূতি বিদূরিত হচ্ছিলো। দ্বিতীয়তঃ মুহাজিররা পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং যুলুম-নির্যাতনের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়ে খাঁটি সোনায় রূপান্তরিত হয়েছিলেন। তাঁদের প্রশিক্ষণ এবং সংশোধন স্বয়ং বিশ্ব নবী মুস্তফা সাল্লাল্লা হুআলাইহি ওয়া সাল্লাম করেছিলেন। এ খাঁটি সোনা সদৃশ মুহাজিররা যাতে নওমুসলিম আনসার ভাইদের প্রশিক্ষণ দিতে পারেন, সে ব্যবস্থাই এ ভ্রাতৃত্ব বন্ধন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছিলো। ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সৃষ্টির পূর্বেই আনসাররা মুহাজিরদের প্রতি ছিলেন দয়ার্দ্র বা সেবাগত প্রাণ। কিন্তু এ সম্পর্ক সৃষ্টির পর তাঁরা পাতানো ভাইদের সাথে আপন ভাইয়ের চেয়েও সুন্দর ব্যবহার করলেন। তাঁরা তাদেরকে নিজেদের ঘরে নিয়ে গেলেন এবং সকল ধন-সম্পদ ও আসবাব পত্রসহ ঘরের প্রতিটি জিনিস গুণে গুণে তার অর্ধেক দিয়ে দিলেন। আনসারদের মালিকানা দানের আবেগ ছিলো চূড়ান্ত পর্যায়ের। হযরত সায়াদ রাদিয়াল্লাহ্ আনহু বিন রাবি' আনসারী নিজের দু' স্ত্রীর একজনকে নিজের মুহাজির ভাইয়ের জন্যে পৃথক করার প্রস্তুতি নিয়েই ফেলেছিলেন। এর বিশদ বিবরণ পূর্বেই দেয়া হয়েছে।

আনসাররা নিজের খেজুর বাগান এবং জমি মুহাজির ভাইদেরকে পেশ করলেন। বাগান পরিচর্যা এবং কৃষি বিষয়ে ওয়াকিবহাল না থাকার কারণে তাঁরা তা গ্রহণ করতে আপত্তি জানালেন। তখন আনসারদের ঈমানী জোশ উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। তাঁরা বললেন, এ খেজুরের বাগান ও জমি আমরা অবশ্যই আপনাদেরকে দিবো। তাতে কৃষি ও সেচ কাজ আমরাই করবো এবং উৎপাদিত শস্যের অর্ধেক আপনাদেরকে নিতে হবে। মুহাজিররা আন্তরিকতার

www.bjilibrary.com

সাথে নিজের আনসার ভাইদের এ প্রস্তাব কবুল করলেন। খায়বার যুদ্ধ পর্যন্ত মুহাজিররা এ সকল খেজুর বাগান থেকে উপকৃত হতে থাকলেন। খায়বার যুদ্ধের পর তাঁরা এসব বাগান কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আনসারদেরকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

সহীহ্ আল বুখারীতে বর্ণিত আছে, বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ভ্রাতৃত্ব সহোদরের মতই আত্মীয় হয়ে গিয়েছিলো। এমনকি কোনো আনসার ইন্তিকাল করলে মুহাজির ভাই তার সম্পদের উত্তরাধিকারী হতেন এবং মরহুমের নিকটাত্মীয় তা থেকে বঞ্চিত হতেন। বদরের যুদ্ধের পর মুহাজিরদের আর্থিক অবস্থা ভালো হয়ে গেলে সূরা আল আনফালের এ আয়াত নাযিল হলো ঃ "নিকটাত্মীয় পরস্পরের বেশী হকদার।"−(আয়াত ঃ ৭৫)

বস্তুত আল্লাহ্ এ ফরমান বাস্তবায়নে আনসার এবং মুহাজিরদের পারস্পরিক উত্তরাধিকারের বিধান বাতিল করা হয় এবং শুধুমাত্র নিকটাত্মীয়ের মধ্যেই উত্তরাধিকারের নীতি চালু হয়।

আনসারদের ত্যাগ ও সততা নিজেদের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া ভাইদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং যখনই প্রয়োজন হয়েছে তখনই তাঁরা হক পথে নিজের সাধ্যের বাইরেও কুরবানী পেশ করেছেন। হযরত হারিসাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন নু'মান আনসারী নিজের কয়েকটি বাড়ী প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাওয়ালা করে দিয়েছিলেন। এমনিভাবে আসহাবে সুফফার ভরণ-পোষণের বিষয়টিও নিজেদের দায়িত্বে নিয়েছিলেন। জিহাদের ডাক এলেই তাঁরা নিজেদের জান এবং মাল সমেত ইসলামের জন্যে দণ্ডায়মান হয়ে যেতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদরের যুদ্ধের পূর্বে আনসারদের ইচ্ছা বিশেষ করে অবহিত হলেন। কেননা তাঁরা মদীনার বাইরে গিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলো না। মুহাজিরদের সাথে পরামর্শের পর যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এখন অন্যরাও পরামর্শ দিন। আওস গোত্রের সরদার হযরত সায়াদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন মায়াজ তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালেন এবং আবেগময় ভাষায় আরজ করলেন ঃ

"ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমরা আপনার উপর ঈমান এনেছি। আপনার রিসালাতের সত্যতা স্বীকার করেছি। আপনার আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। সুতরাং যা মর্জি হয় তাই করুন। সেই মহান আল্লাহর শপথ, যিনি আপনাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বানিয়ে প্রেরণ করেছেন। আপনি সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দিলে আমরা তাই করবো। আমাদের একজন শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণকারীও পেছনে থাকবে না। ইনশাআল্লাহ্ আপনি আমাদেরকে

www.bjilibrary.com

যুদ্ধের ময়দানে অটল এবং বাহাদুর হিসেবেই পাবেন। আল্লাহ্ আমাদের তরফ থেকে আপনার চক্ষু শীতল করবেন।"

অন্য এক রাওয়ায়েতে আছে, সেই সময় খাজরাজ গোত্রের সরদার হযরত সায়াদ রাদিয়াল্লাহ্ আনহু বিন উবাদাহ্ এ বক্তৃতা করেছিলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল ! সম্ভবতঃ আপনি আনসারদের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। আপনি যদি সমুদ্রের নির্দেশ দেন, তাহলে আমরা তা পদদলিত করবো। আর যদি শুকনো স্থানের নির্দেশ দেন, তাহলে বারকে গামমাদ পর্যন্ত (হাবশাহ অথবা ইয়েমেনের একটি স্থানের নাম) উটের কলিজা গলিয়ে ফেলবো।"

আনসারদের জিহাদের আবেগ এবং ত্যাগের জযবাহ দেখে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারা মুবারক আনন্দে ঝলমল করে উঠলো।

শুধু বদরের যুদ্ধেই নয় বরং আনসাররা প্রত্যেক যুদ্ধেই এবং সবসময়ই মুহাজিরদের পাশে থেকে হক পথে জীবন কুরবানীর চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। সত্য পথে তাদের জীবন দান এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রেমের কতিপয় উদাহরণ এখানে পেশ করা হলো ঃ

হযরত হিন্দ রাদিয়াল্লাহ্ আনহা বিনতে আমর বিন হারাম আনসারীয়াহর স্বামী হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ্ আনহু বিন জামুহর সন্তান হযরত খাল্লাদ রাদিয়াল্লাহ্ আনহু বিন আমর রাদিয়াল্লাহ্ আনহু এবং ভাই হযরত আবদুল্লাহ্ রাদিয়াল্লাহ্ আনহু বিন আমর বিন হারাম ওহোদের যুদ্ধে বাহাদুরীর সাথে লড়াই করতে করতে শাহাদাত প্রাপ্ত হন। হযরত হিন্দ রাদিয়াল্লাহ্ আনহা স্বামী, সন্তান এবং ভাইয়ের শাহাদাতের খবর শুনে কোনো দুঃখ প্রকাশ না করে লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কি অবস্থা আমাকে তা বলো। তাঁর তো কোনো ক্ষতি হয়নি ?"

লোকেরা যখন বললো, আল্লাহর ফযলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভালো আছেন, তখন তাঁর চেহারা আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠলো। ধীরে ধীরে তিনি যুদ্ধের ময়দানের দিকে রওয়ানা হলেন। যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখলেন, তখন অযাচিতভাবে মুখ দিয়ে একথা বেরিয়ে গেলো ঃ "আপনি ভালো থাকলে সব মুসিবতই তুচ্ছ ব্যাপার।"

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহ্ আনহু বিন নজর আনসারী ওহোদের যুদ্ধে কতিপয় বাহাদুর মুসলমানদেরকে অস্ত্র ফেলে দিয়ে বিষন্ন অবস্থায় বসে থাকতে দেখলেন। জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা যুদ্ধ ছেড়ে এখানে বসে আছো কেন ? তাঁরা বললেন, আফসোস ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শহীদ

www.bjilibrary.com

হয়ে গেছেন। হযরত আনাস বললেন, তাহলে তোমরা জীবিত থেকে কি করবে! ওঠো এবং হক বা সত্যের জন্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেমন জীবনদান করেছেন তেমনি তোমরাও কাফেরদের সাথে লড়াই করে জীবন বিলিয়ে দাও। একথা বলেই অত্যন্ত জোশের সাথে তরবারি চালাতে চালাতে কাফেরদের মধ্যে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং ৭০টি আঘাত খেয়ে শহীদ হয়ে গেলেন। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন মালেক খাদেমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে যে, সূরা আল আহ্যাবের এ আয়াত হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন নজরের প্রসঙ্গেই অবতীর্ণ হয় ঃ "ঈমানদারদের মধ্যে এমনও আছেন যাঁরা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা সত্য করে দেখিয়েছেন। তাদের মধ্যে কেউ নিজের সময় পূর্ণ করেছে এবং কেউ সময় আসার অপেক্ষায় আছেন।"–(আয়াত ঃ ২৩)

হযরত খুবাইব রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আদী আনসারী এবং হযরত যায়েদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন দাছনা আনসারীকে যাদল ওকারাহর লোকেরা বিশ্বাসঘাতকতা করে রাজি নামক স্থানে গ্রেফতার করলো। অতপর মক্কার কুরাইশদের হাওয়ালা করে দিলো। এ যালেমরা তাঁদের দু'জনকেই শূলে চড়ানোর সিদ্ধান্ত নিলো। উরওয়াহ রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং মূসা রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন উকবাহ থেকে বর্ণিত আছে যে, মুশরিকরা যখন হযরত খুবাইব রাদিয়াল্লাহ আনহুকে শূলে চড়াচ্ছিলো তখন তাঁকে উচ্চস্বরে ডেকে এবং কসম খেয়ে জিজ্ঞেস করলো, তোমার পরিবর্তে যদি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শূলে চড়ে এ সময় তুমি নিজের গৃহে আরামে অবস্থান কি পসন্দ করবে? হযরত খুবাইব রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন ঃ "আল্লাহর কসম ! মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র পায়ে যদি কাঁটাও ফোঁটে, আর আমি নিজের গৃহে আরামে বসে থাকবো—এটা আমার সহ্যের বাইরে।"

এমনিভাবে হযরত যায়েদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন দাছনাকে শূলে চড়ানোর আগে আবু সুফিয়ান (তখনও ঈমান আনেননি) জিজ্ঞেস করলো, "হে যায়েদ ! আল্লাহর কসম ! তুমি সত্যি সত্যি বলো, যদি তোমার পরিবর্তে মুহাম্মাদের গর্দান উড়িয়ে দেয়া হয়, তাহলে কি তুমি নিজের পরিবার-পরিজনসহ খুশীতে থাকবে ?"

এ হকপন্থী বীরপুরুষ আবু সুফিয়ানকে ঠিক একই জবাব দিয়েছিলেন যা খুবাইব রাদিয়াল্লাহ আনহু মুশরিকদের দিয়েছিলেন। অর্থাৎ আমিতো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পায়ে কাঁটা ফোঁটাও সহ্য করতে পারি না। তাঁর জবাব শুনে আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহ আনহুর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো ঃ

www.bjilibrary.com

"মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথী তাঁকে যেভাবে ভালোবাসে, দুনিয়ার আর কোনো ব্যক্তিরই এমন প্রেমিক নেই।"

ওহোদের যুদ্ধে হযরত সায়াদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন রবী' আনসারী মুশরিকদের বিরুদ্ধে বাহাদুরী প্রদর্শন করে মারাত্মকভাবে আহত হলেন। এক রাওয়ায়েত মতে তিনি ১২টি আঘাত পেয়েছিলেন এবং অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গিয়েছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরও তাঁর সাথে গভীর সম্পর্ক ছিলো। যুদ্ধের পর তিনি সায়াদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে দেখলেন না। সাহাবী রাদিয়াল্লাহ আনহুমদেরকে সম্বোধন করে বললেন, "এমন কি কেউ আছে যে, সায়াদ বিন রবী'র খবর আনবে?"

হযরত উবাই রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন কাআব আনসারী আরজ করলেন ঃ "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি যাচ্ছি। একথা বলে তিনি যুদ্ধের ময়দানে গেলেন এবং লাশের মধ্যে ঘুরে ঘুরে হযরত সায়াদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন রবীকে খোঁজ করতে লাগলেন। বার বার তাঁর নাম ধরে ডাকছিলেন, কিন্তু কোনো জবাব পাচ্ছিলেন না। অবশেষে তিনি উচ্চস্বরে একথা বললেন, "সায়াদ যদি জীবিত থাকো, তাহলে জবাব দাও—রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন।"

সে সময় হযরত সায়াদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন রবী'র মুমূর্ষু অবস্থা। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম শুনে শরীর ও রূহের সকল শক্তি একত্র করে তিনি ক্ষীণ কণ্ঠে জবাব দিলেন ঃ

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র খিদমতে আমার সালাম পেশ করবে এবং আমার আনসার ভাইদেরকে বলবে, আল্লাহ না করুন আজ যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শহীদ হয়ে থাকেন, আর তোমাদের মধ্যে যদি কেউ জীবিত থাকে, তাহলে আল্লাহর কাছে অবশ্যই মুখ দেখাতে পারবে না এবং তাঁর কাছে তোমাদের কোনো ওযরই গ্রহণীয় হবে না। আমরা লাইলাতুল আকাবাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর আত্মোৎসর্গের ওয়াদা করেছিলাম।" একথা বলেই আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলেন।

আনসারদের এ কুরবানীর কারণেই আল্লাহর কাছে মুহাজিরদের মত তারাও মর্যাদার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছিলেন। তাদেরকে সাচ্চা মু'মিন উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন এবং জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন।

www.bjilibrary.com

কুরআনে কারীমে সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহ আনহুমদের মর্যাদা বিভিন্ন ভাবে বর্ণিত হয়েছে। কোথাও সকল সাহাবী রাদিয়াল্লাহ আনহুমদের উচ্চমর্যাদার কথা সামষ্টিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং কাউকে বাদ না দিয়ে সবার জন্যে মাগফিরাত এবং বেহেশতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। কোথায়ও কোনো বিশেষ ঘটনা অথবা স্থান ও কাল হিসেবে সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহ আনহুমের কোনো বিশেষ দলকে আল্লাহর সন্তুষ্টির সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। কোনো কোনো স্থানে এমন আয়াতও আছে, যা কোনো বিশেষ সাহাবী রাদিয়াল্লাহ আনহুর শানে নাযিল হয়েছে। এমন অনেক আয়াতও আছে যা পূর্বে নাযিল হয়েছিলো। এ সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোনো সাহাবী রাদিয়াল্লাহ আনহুর কোনো বিশেষ নেক কাজ দেখেছেন তখন এসব আয়াত তিলাওয়াত করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি এটাই বলতে চেয়েছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অমুক সাহাবী রাদিয়াল্লাহ আনহুর এ কাজ আল্লাহর কাছে এত পসন্দনীয় যে, তাঁর উপর এ আয়াত প্রযোজ্য।

যেসব আয়াতে সকল সাহাবীকে জান্নাতী বলা হয়েছে, তার মধ্যে কতিপয় উপরে বর্ণনা করা হয়েছে। এখন অন্য ধরনের কিছু উদাহরণ এখানে পেশ করা হলো ঃ

৬ষ্ঠ হিজরীর ১লা যিলকদ সারওয়ারে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওমরাহর ইরাদা করলেন এবং ১৪শ সাহাবী রাদিয়াল্লাহ আনহু সহ মদীনা মুনাওয়ারাহ থেকে মক্কা যাত্রা করলেন। তিনি সাহাবী রাদিয়াল্লাহ আনহুমদেরকে তরবারি ছাড়া অন্য কোনো অস্ত্র সাথে নিতে নিষেধ করলেন এবং তরবারিও খাপে ভরে নিতে বললেন। জুল হুলাইফা পৌঁছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবী রাদিয়াল্লাহ আনহুম ইহরাম বাঁধলেন। এদিকে মক্কার কুরাইশরা মুসলমানদের আগমনের খবর পেয়ে মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হয়ে গেলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন খবর পেলেন যে, কুরাইশরা বাধা দিতে প্রস্তুত তখন তিনি হুদাইবিয়া পৌঁছে তাঁবু খাটালেন এবং সেখান থেকে কুরাইশদের কাছে এক পয়গাম প্রেরণ করলেন। পয়গামে তিনি জানালেন যে, আমরা শুধু ওমরাহ করতে এসেছি। লড়াই করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কুরাইশরা দু'দিন পর উরওয়াহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন মাসউদ সাকাফীকে (তিনি তখনো ঈমান আনেননি) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আলোচনার জন্যে পাঠালো। তিনি আলাপ-আলোচনার পর ফিরে গিয়ে কুরাইশদেরকে আলোচনার বিস্তারিত জানালেন এবং সাথে সাথে আরো বললেন ঃ

"হে কুরাইশ ভাইয়েরা ! দুনিয়ার বড় বড় রাজা-বাদশাহদের দরবারে যাওয়ার সুযোগ আমার হয়েছে। আমি কাইসার ও কিসরা এবং নাজ্জাশীর

www.bjilibrary.com

দরবারের শান-শাওকাত দেখেছি। কিন্তু আল্লাহর কসম, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথীরা তাঁকে যে ইজ্জত এবং সম্মান করে তা কোনো ক্রয়কৃত গোলামও সেসব রাজা-বাদশাহদের সাথে করে না। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের থু থু ফেললেও এসব মানুষ অগ্রসর হয়ে সে থু থু নিজের হাতে নেয় এবং উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে তা মুখে এবং হাতে লাগায়। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওযু করলে এসব মানুষ ব্যবহৃত পানির প্রতিটি ফোটার উপর এমনভাবে ঝাপিয়ে পড়ে, যেন তাঁরা পরস্পর এজন্যে লড়াই করে জীবন দেবে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো নির্দেশ দিলে তা পালনের জন্যে সবাই এগিয়ে আসে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো কথা বললে সকলেই চুপ মেরে যায়। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এমন মর্যাদা যে, কোনো সাথী তাঁর প্রতি তাকাতেও সাহস পায় না। আমার কথা যদি তোমরা শোন, তাহলে তোমরা তাঁর সাথে সন্ধি করে নাও।"

কুরাইশরা যদিও উরওয়াহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন মাসউদকে বুযর্গ ব্যক্তি হিসেবে মানতো কিন্তু তাঁর পরামর্শের প্রতি কর্ণপাত করলো না। ওদিকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উরওয়াহ রাদিয়াল্লাহ আনহুর ফিরে যাওয়ার পর হযরত ওসমান যুন্নুরাইন রাদিয়াল্লাহ আনহুকে নিজের দূত হিসেবে কুরাইশদের কাছে প্রেরণ করলেন। কুরাইশরা হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহুকে মক্কায় আটকে ফেললো। যখন তিনি ফিরে এলেন না তখন মুসলমানদের মধ্যে প্রচারিত হলো যে, হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহুকে মুশরিকরা শহীদ করে ফেলেছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "যদি এ খবর সঠিক হয়, তাহলে আমরা ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহুর বদলা নেয়া ছাড়া এখান থেকে ফিরে যাবো না।" সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহ আনহুম যদিও সরঞ্জামহীন ছিলেন তবুও সবাই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথায় সাড়া দিলেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি বাবলা বৃক্ষের নীচে বসে পড়লেন এবং মুসলমানদের কাছ থেকে দেহে জীবন থাকা অবস্থায় কাফেরদের সাথে লড়াই করার ও পেছনে না হটার বাইআত নিলেন।

সকল সাহাবী রাদিয়াল্লাহ আনহুম অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে জীবন কুরবানী করার বাইআত করলেন। ইসলামের ইতিহাসে এ বাইআত "বাইআতে রিদওয়ান" নামে প্রসিদ্ধ। এ সময় সূরায়ে আল ফাতাহর এ আয়াত নাযিল হয় ঃ "আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন। যখন তারা বৃক্ষের নীচে তোমার কাছে বাইআত করছিলেন। তাদের অন্তরের অবস্থা তিনি জানতেন।"–(আয়াত ঃ ১৮)

হিজরতের সময় হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু গারে ছুর এবং মদীনা সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে থাকার মহান মর্যাদা লাভ করেছিলেন। এ কাজটি ছিলো জীবন বাজী রাখার কাজ। কেননা, সে সময় মক্কার কাফেররা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাথীদের জীবন হননের অপচেষ্টায় লিপ্ত ছিলো। আল্লাহ পাক হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহুর জীবন কুরবানী করার আবেগ এত পসন্দ করলেন যে, এ আয়াত নাযিল করলেন ঃ তোমরা যদি রাসূলকে সাহায্য না করো, তাহলে আল্লাহ তাঁকে সাহায্য করেছে। যে সময় কাফেররা তাঁকে বহিষ্কার করেছিলো তখন সে দু'জনের দ্বিতীয় ছিলো। যখন তাঁরা গার এ ছিলেন তখন তিনি নিজের সাথীকে বলছিলেন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ো না। অবশ্যই আল্লাহ আমাদের সাথে রয়েছেন।"–(সূরা আত তাওবা ঃ ৪০)

যেন স্বয়ং আল্লাহ পাক হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহুকে দু'জনের একজনের মর্যাদাপূর্ণ খিতাবে ভূষিত করলেন।

যখন সূরা আল হাদীদের এ আয়াত নাযিল হলো ঃ "কে আছো যে, আল্লাহকে কর্জ দেবে ? ভালো কর্জ। যাতে আল্লাহ তাকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে ফেরত দেবে এবং তার জন্যে উত্তম বদলা রয়েছে।"–(আয়াত ঃ ১১)

এ আয়াত শুনে হযরত আবুদ দাহদাহ আনসারী রাদিয়াল্লাহ আনহু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ! আল্লাহ কি আমাদের কাছে কর্জ চান ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে আবুদ দাহদাহ ! হ্যাঁ। তিনি আরজ করলেন, "আপনার হাতটা আমাকে একটু দেখান।" হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের পবিত্র হাত তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিলেন। তিনি তা নিজের হাতে নিয়ে বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমি আল্লাহকে আমার বাগান কর্জ দিয়ে দিয়েছি।" হযরত আবুদ দাহদাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু যে বাগানটি আল্লাহর রাহে দিলেন তাতে ৬শ খেজুরের গাছ ছিলো এবং সেখানে তাঁর বাড়ী ছিলো। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কথা বলে তিনি সোজা বাড়ী গেলেন এবং স্ত্রীকে ডেকে বললেন, "দাহদাহর মা ! বেরিয়ে এসো। আমি এ বাগান আল্লাহকে কর্জ দিয়ে দিয়েছি।"

স্ত্রীও নেকবখত ছিলেন। বললেন, হে আবুদ দাহদাহ, তুমি লাভের বাণিজ্য করেছো।" এবং তৎক্ষণাৎ সামান নিয়ে বাগান থেকে বের হয়ে এলেন।

একদিন সারওয়ারে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহ আনহুমদের এক দলের মধ্যে মধ্যমণি হিসেবে বসেছিলেন।

www.bjilibrary.com

এ সময় এক ব্যক্তি পেরেশান অবস্থায় তাঁর খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল ! আমি একজন মুসাফির। মদীনায় আমার থাকা ও খাওয়ার কোনো বন্দোবস্ত নেই। আপনার সাহায্যের মুখাপেক্ষী।"

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তৎক্ষণাৎ আজওয়াজে মুতাহিরাতের (স্ত্রীদের) কাছে ঘরে কিছু খাবার আছে কিনা তা জিজ্ঞেস করে পাঠালেন। সবদিক থেকেই উত্তর এলো যে, আজ সবাই ভুখা। তখন তিনি সাহাবী রাদিয়াল্লাহ আনহুমদের দিকে তাকালেন এবং বললেন ঃ "এমনকি কেউ আছে, যে আল্লাহর বান্দাহকে মেহমান বানাবে ?"

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইরশাদ শুনে হযরত আবু তালহা আনসারী রাদিয়াল্লাহ আনহু উঠে দাঁড়ালেন এবং আরজ করলেন ঃ

"ইয়া রাসূলাল্লাহ ! তাকে আমার সাথে নিয়ে যাবো।" একথা বলেই তিনি বাড়ী গেলেন এবং স্ত্রীকে মেহমান আগমনের খবর দিলেন। তিনি জানালেন, "বাচ্চাদের জন্য কিছু পাকানো হয়েছে। এছাড়া আল্লাহর কসম ঘরে কিছুই নেই।"

হযরত আবু তালহা রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন, "এতে ক্ষতির কিছু নেই। বাচ্চাদেরকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে শুইয়ে দাও। যখন তারা শুয়ে পড়বে তখন আমরা তাদের খাবার মেহমানের সামনে দেব। তুমি চেরাগ ঠিক করার বাহানায় উঠে তা নিভিয়ে দেবে। অন্ধকারে মেহমান খাবার খেয়ে নেবে এবং আমরাও এমনি এমনি মুখ চালাতে থাকবো।"

মোটকথা, এভাবে মেহমানকে খাবার খাইয়ে স্বামী-স্ত্রী দু'জন এবং বাচ্চারা রাতে অভুক্ত অবস্থায় কাটালেন। সকালে যখন এ অপরিচিত মেহমান হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হলেন তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে সূরা আল হাশরের এ আয়াত উচ্চারিত হচ্ছিলো ঃ "এবং সে ব্যক্তি নিজের ওপর অন্যদের অগ্রাধিকার প্রদান করে। যদিও তাঁরা ক্ষুধাতুর থাকে।"-(আয়াত ঃ ৯)

আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছিলেন, "রাতে মেহমানের সাথে তোমাদের ব্যবহার আল্লাহ খুব পসন্দ করেছেন।"

এভাবে আরো একদিন এই হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহ আনহুই রাসূলের কাছে উপস্থিত ছিলেন। ঠিক এমনি সময় সূরা আলে ইমরানের এ আয়াত নাযিল হলো ঃ "যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় খরচ না করবে ততক্ষণ তোমরা কখনই সওয়াব পাবে না।"-(আয়াত ঃ ৯২)

www.bjilibrary.com

মসজিদে নববীর সামনে এক প্রশস্ত ও সুন্দর বাগানের মালিক ছিলেন হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহ্ আনহু এ বাগানের কূপ "বিরহার" পানি অত্যন্ত পরিষ্কার, সুমিষ্ট ও খোশবুদার ছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত উৎসাহের সাথে কূপের পানি পান করতেন। মদীনায় এ ধরনের সম্পদ অত্যন্ত মূল্যবান বলে পরিগণিত হতো। কিন্তু হযরত আবু তালহা উঠে দাঁড়ালেন এবং আরয করলেন ঃ "ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমার সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ হলো 'বিরহা'। আমি তা আল্লাহর রাস্তায় ওয়াকফ করছি। আল্লাহর কসম ! যদি একথা গোপন রাখা যেতো তাহলে তা কখনো প্রকাশ করতাম না।"

আল্লাহর পথে তাঁর খরচের জযবাহ্ দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারা মুবারক আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তাঁর জন্যে দোয়া করলেন এবং বললেন, নিজের নিকটাত্মীয়দের মধ্যে এ বাগান বণ্টন করে দাও। তিনি তৎক্ষণাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ পালন করলেন এবং সমগ্র বাগান আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন।

কুরআনে হাকীমে সাহাবা কিরাম রাদিয়াল্লাহ আনহুমদের ভালো কাজের আকাঙ্ক্ষা, ত্যাগ ও আল্লাহর পথে ব্যয়ের প্রশংসা প্রায়ই করা হয়েছে ; আল্লাহর পথে ব্যয়ের একটি চূড়ান্ত নজীর হলো ঃ তাবুকের যুদ্ধের সময় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহ আনহুমদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয়ের আহ্বান জানালেন। এ সময় অন্যান্য সাহাবী রাদিয়াল্লাহ আনহুম নিজেদের সামর্থের চেয়ে বেশী সম্পদের কুরবানী দিলেন। কিন্তু হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু এক ইতিহাস সৃষ্টি করলেন।

তিনি ঘরের সেলাইয়ের সুতা পর্যন্ত এনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে পেশ করলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, আবু বকর, ঘরে কিছু রেখে এসেছো তো ? জবাবে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম ছাড়া আর কিছুই রেখে আসিনি। আর তাই আমার জন্যে যথেষ্ট।"

সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহ আনহুম এমনি ধরনের উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। আল্লাহ পাক তাদের পথকে অনুকরণীয় পথ হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁদের বিরোধিতাকে রাসূলের বিরোধিতা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। সূরায়ে আন নিসাতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

"তাদের সামনে হিদায়াতের রাস্তা খুলে যাওয়ার পরও যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতা করে এবং মু'মিনদের রাস্তা

www.bjilibrary.com

পরিত্যাগ করে চলে ; আমরা তাদেরকে সে দিকে ফিরিয়ে দেব যেদিকে তারা ফেরে এবং কিয়ামাতের দিন জাহান্নামে প্রবেশ করাবো। আর জাহান্নাম অত্যন্ত খারাপ স্থান।"-(আয়াত ঃ ১১৫)

মুফাসসিরদের কাছে এখানে 'মু'মিনদের রাস্তা'র অর্থ হলো সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহ আনহুমের রাস্তা বা পথ, আর সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহ আনহুম সেই পবিত্র নফস সম্পর্কে কুরআনে হাকীমে বার বার তারিফ এবং প্রশংসা করা হয়েছে। সাহাবীগণের উন্নত চরিত্র ও সুন্দর সুষ্ঠু কাজের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরতে হলে ভারি ভারি কিতাব রচনা করতে হয়। এখানে তাদের কতিপয় গুণাবলীর কথা উল্লেখ করা হলো।

সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহ আনহুম ছিলেন আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের অনুগত, সত্য ঈমানের অধিকারী, নেক নিয়তধারী, নেকীর প্রতি অগ্রগামী, প্রতিটি ভালো কাজে আগুয়ান, হকের জন্য জীবন বাজী রাখা, হকের জন্যে আত্মীয়-স্বজন, স্বদেশ, ঘর-বাড়ী, ধন-সম্পদ সবকিছুই কুরবানী করা, হালাল কামাই এবং হালাল খাওয়া, হারাম থেকে বিরত থাকা, ন্যায়পরায়ণ, আমানতদার, প্রতিশ্রুতি পূরণকারী, হক পথে সব ধরনের মুসীবতে ধৈর্য এবং স্থৈর্যের সাথে মুকাবিলাকারী, মুখলিস, হক পথে বেশী বেশী সম্পদের কুরবানী করা, নিজের প্রয়োজনের উপর অন্যের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার প্রদান, নিজের জবানকে আয়ত্বে রাখা, পরস্পর রহমশীল, কাফেরদের ওপর কঠিন, কবীরাহ গোনাহ এবং বে-শরমী থেকে বেঁচে থাকা, নিজেদের গুপ্তস্থান হেফাযত করা, রাগের সময় ক্ষমা করা, নামায কায়েম করা, হজ্জ করা, রোযা রাখা, যাকাত প্রদান করা, জ্ঞান আহরণ করা, নেক কাজের নির্দেশ দেয়া এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা, সত্য সাক্ষ্য প্রদান করা, আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করা, মুসীবতে ধৈর্যধারণ, ফখর এবং আত্মম্ভরিতা থেকে দূরে থাকা, গরীব, মিসীকন ও সওয়ালকারীকে সাহায্য করা, প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার করা, পিতা-মাতার খিদমত করা রাতের নির্জনত্বে বেশী বেশী সেজদা করা সহ এ ধরনের বহু গুণের আধার ছিলেন তাঁরা।

সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহ আনহুম এ গুণের বদৌলতেই আল্লাহর প্রিয় ও পসন্দীয় হতে পেরেছিলেন। তাঁদের মর্যাদার সবচেয়ে বড় প্রমাণ এর থেকে আর কি হতে পারে যে, কুরআনে পাকে তাঁদেরকে ইহ ও পরকালে সফলতায় অভিষিক্ত মানুষ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং প্রকাশ্য ভাষায় বলা হয়েছে ঃ "আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে।"

www.bjilibrary.com

একজন মুসলমানের জীবনের লক্ষ্যই হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং পরকালীন মুক্তি। কিন্তু যেসব মহান নফসকে স্বয়ং আল্লাহ নিজের সন্তুষ্টির সুসংবাদ দেন ; তাদের মরতবা ও মর্যাদার আন্দাজ কে করতে পারে ? নিসন্দেহে নবী আলাইহিস সালামদের পর তাঁরাই হলেন সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। আর যে ব্যক্তি তাদের পদাংক অনুসরণ করে চলে তার ভাগ্যবান হওয়া সম্পর্কে কোনো কথাই উঠতে পারে না। আল্লাহ পাক সকল মুসলমানকে সাহাবী রাদিয়াল্লাহ আনহুমদের পদাংক অনুসরণ করার তাওফীক দিন।—আমীন।

----

www.bjilibrary.com

হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহু

বিশ্ব নেতা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন স্বগৃহে অবস্থান করছিলেন। সে সময় হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় সুঠাম ও লম্বাদেহী, প্রশস্ত বুক এবং নার্গিস ফুল সদৃশ চক্ষু সম্বলিত এক সুদর্শন ব্যক্তি তাঁর কাছে ভেতরে আসার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আইহিহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র চেহারা প্রফুল্লতায় ছেয়ে গেলো এবং বললেন ঃ

"মারহাবা বিত তাইয়্যিবুল মুতাইয়্যিব"—খোশ আমদেদ ! পবিত্র ও পূত-পবিত্র মানুষ। সৃষ্টির সেরা, বিশ্বের গর্ব ও সাইয়্যেদুল আম্বিয়া যাঁকে তাইয়্যিবুল মুতাইয়্যিব উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন তিনি ছিলেন হযরত আম্মার বিন ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহু।"

হযরত আবুল ইয়াকজান আম্মার বিন ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত উঁচু মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবীদের মধ্যে গণ্য হতেন। তাঁর পিতা ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন আমের এবং মাতা সুমাইয়া বিনতে খিয়াতও সাহাবীয়া হওয়ার গৌরব পেয়েছিলেন। তাঁর বংশধারা নিম্নরূপ ঃ

আম্মার বিন ইয়াসির বিন আমের বিন মালিক কিনানা বিন কায়েস বিন আল হাসিন বিন লাওজিম বিন আওফ বিন আমের আল-আকবার বিন ইয়াম বিন উনুস।

হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহুর পিতা হযরত ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন আমের কাহতানী বংশোদ্ভূত এবং ইয়েমেনের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি তাঁর নিখোঁজ ভাইয়ের খোঁজে মক্কায় আসেন। তাঁর সাথে দু' ভাই মালিক এবং হারিসও ছিলেন। মক্কায় নিখোঁজ ভাইয়ের কোনো সন্ধান না পেয়ে মালিক এবং হারিস ফিরে যান। কিন্তু ইয়াসির বিন আমের আবু হুজাইফা বিন আল মুগিরা মাখজুমীর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কস্থাপন করে মক্কাতেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। এটা ছিলো প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়াত প্রাপ্তির প্রায় ৪৫ বছর পূর্বেকার ঘটনা। আবু হুজাইফা বিন আল মুগিরা নিজের দাসী সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা বিনতে খাবাতের সাথে হযরত ইয়াসির বিন আমেরের বিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর ঔরষে হযরত সুমাইয়ার দুই পুত্র হযরত আম্মার এবং আবদুল্লাহ জন্মগ্রহণ করেন। আবু হুজাইফা এ সমগ্র পরিবারটিকে

www.bjilibrary.com

অত্যন্ত স্নেহের সাথে দেখতেন। তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুয়াত পেলেন এবং সত্যের দাওয়াত প্রদান শুরু করলেন। নবুয়াত প্রাপ্তির প্রথম যুগেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতে সাড়া দিয়েছিলেন সজ্জন চরিত্রের এ পরিবারটি। তাঁদের ইসলাম গ্রহণের সঠিক কাল কোন্‌টি ছিলো ? মশহুর বর্ণনা মতে হযরত আম্মার নবুয়াতের প্রথম তিন বছরের কোনো এক সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।

সহীহ আল বুখারীর এক বর্ণনা মতে হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহু ঈমান আনার পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু ছাড়া শুধু পাঁচজন গোলাম এবং দু'জন মহিলাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে দেখেছিলেন। অন্য এক বর্ণনা মতে হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহুর ইসলাম গ্রহণের পূর্বে শুধু সাতজনই ইসলাম কবুল করেছিলেন। কিন্তু হাফেজ ইবনে হাজর রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ফাতহুল বারি এবং আল্লামা ইবনে আসির "উসুদুল গাব্বা" গ্রন্থে লিখেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে সে সময় ৩০জনেরও বেশী লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। মুশরিকদের ভয়ে ভীত হয়ে অবশ্য তাঁরা ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করেননি। এটা ছিলো সেই যুগ যখন বিশ্বনেতা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে তাবলীগের দায়িত্ব আঞ্জাম দিচ্ছিলেন। তখনো তিনি সাধারণ্যে দাওয়াতের কাজ শুরু করেননি।

ইবনে সায়াদ রাহমাতুল্লাহ আলাইহির বর্ণনা মতে, হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহুর ইসলাম গ্রহণের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আরকাম রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবি আরকামের গৃহে আশ্রয় নিয়েছিলেন। হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং হযরত সোহায়েব বিন সানান রুমী এক সাথে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। স্বয়ং হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকেই বর্ণিত আছে যে, "আমি সোহায়েব রাদিয়াল্লাহ আনহুকে আরকাম বিন আবি আরকামের দরযায় দেখে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি উদ্দেশ্যে এসেছো ? সোহায়েব রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন, আগে তুমি তোমার উদ্দেশ্য বর্ণনা করো। আমি বললাম, আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে দেখা করে তাঁর কথা শুনতে চাই। (অর্থাৎ তাঁর দাওয়াতের অবস্থা জানতে চাই)। সোহায়েব রাদিয়াল্লাহ আনহু বললো, আমারও একই উদ্দেশ্য। সুতরাং আমরা দু'জন এক সাথে ভেতরে প্রবেশ করলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাত করে ইসলাম গ্রহণ করলাম।" হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে অথবা কিছু আগে পরে তাঁর পিতা-মাতা এবং ভাই ঈমান এনেছিলেন।

www.bjilibrary.com

ইবনে সায়াদ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বললেন, আবু হুজাইফা হযরত আম্মারকে শৈশবকালেই স্বাধীন করে দিয়েছিলেন। কিন্তু হযরত সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহ আনহাকে নিজের দাসীত্বে রেখেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তিনি তাঁর উত্তরাধিকারদের (আবু জেহেল প্রমুখ) দাসত্বে এসেছিলেন। হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহুর ভাই আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহুর প্রশ্ন কেউই স্পষ্ট করে বলেননি যে, তাঁকে এতদিনে আযাদ করে দেয়া হয়েছিলো অথবা তিনি গোলামই ছিলেন। মোটকথা এ পরিবার বনু মাখজুমের সাথেই সম্পৃক্ত ছিলেন। হক বা ন্যায়পন্থীদের জন্যে এটা ছিলো এক ভয়ংকর যুগ। মক্কার যে ব্যক্তিই ইসলাম গ্রহণ করতো সে কুরাইশ মুশরিকদের ক্রোধ এবং যুলুম-নির্যাতনের শিকার হতো। মুশরিকরা এ ব্যাপারে নিজের নিকটতম বন্ধুরও কোনো তারতম্য করতো না। এ প্রবাসী বন্ধুহীন পিতা-পুত্র এবং হযরত সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহ আনহার উপর মুশরিকরা ইসলাম গ্রহণের অপরাধে লোমহর্ষক নির্যাতন চালিয়েছিলো। এ নির্যাতনের কাহিনী শুনে মানবতার মস্তক অবনত না হয়ে পারেনি। হযরত ইয়াসির রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং হযরত সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহ আনহা উভয়ই অত্যন্ত দুর্বল এবং বয়স্ক মানুষ ছিলেন। কিন্তু কাফেরদের সব ধরনের যুলুম-নির্যাতন সত্ত্বেও তাঁদের কদম মুহূর্তের জন্যেও হক থেকে এদিক ওদিক হয়নি। তাঁদের পুত্রদের বেলায়ও একই অবস্থা ছিলো। তাঁদেরকে লৌহ বর্ম পরিয়ে জলন্ত উত্তপ্ত বালিতে শুইয়ে দেয়া এবং তাঁদের পেছনে আগুন দিয়ে দাগ দেয়া কাফেরদের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। কিন্তু তাওহীদের নেশা তাদেরকে এমনভাবে পেয়ে বসেছিলো যে, সত্য পথ থেকে বিচ্যুতির কথা তারা মুখেও আনতো না।

বালাজুরী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি হযরত উম্মে হানী রাদিয়াল্লাহ আনহা থেকে এ বর্ণনা নকল করেছেন যে, একদিন এ চার পবিত্র আত্মার ব্যক্তি কাফেরদের হাতে ভয়ানক নির্যাতন ভোগ করছিলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁদের উপর কঠিন নির্যাতন প্রত্যক্ষ করে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হলেন এবং বললেন ঃ "ধৈর্য ধর হে ইয়াসিরের বংশধর। তোমাদের জন্যে বেহেশতের ওয়াদা রয়েছে।"

ইবনে সায়াদ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহমাতুল্লাহ আলাইহি হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহুর বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেছেন যে, একবার আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সে স্থান অতিক্রম করছিলাম যেখানে এ পরিবারটিকে শাস্তি দেয়া হচ্ছিলো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমালেন ঃ "ধৈর্য ধর-হে আল্লাহ! ইয়াসিরের বংশধরদেরকে ক্ষমা করে দাও এবং তুমি তো তাদেরকে ক্ষমা করেই দিয়েছো।"

বৃদ্ধ ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহু এ নির্যাতন সইতে সইতে একদিন আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেলেন। অতপর একদিন আবু জেহেল হযরত সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহার নাজুক স্থানে বর্শা নিক্ষেপ করলো। বর্শার আঘাতের ব্যথায় কাতর হয়ে তিনি শহীদ হয়ে গেলেন। ন্যায় ও সত্যের পথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে এটাই হলো প্রথম শাহাদাতের ঘটনা। যালেম আবু জেহেল হযরত আবদুল্লাহ বিন ইয়াসিরকেও তীর মেরে শহীদ করলো। এখন শুধুমাত্র আম্মার বাকী রইলেন। মায়ের যন্ত্রণা দেখে তাঁর কলিজা ছিঁড়ে যেতে লাগলো। কাঁদতে কাঁদতে হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাজির হয়ে তাঁর মায়ের কাহিনী শুনিয়ে আরজ করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল ! যুলুম তো এখন চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।" হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে ধৈর্য অবলম্বনের নির্দেশ দিলেন এবং বললেন ঃ "হে আল্লাহ ! ইয়াসিরের পরিবারকে দোযখের আগুন থেকে নিষ্কৃতি দাও।"

পিতা-মাতা এবং ভাইয়ের শাহাদাতের পরও হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহু যথারীতি কাফেরদের যুলুম-নির্যাতনের লক্ষ্যবস্তু হয়ে রইলেন।

ইবনে সায়াদ বর্ণনা করেছেন ঃ একবার এক ব্যক্তি হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহুর গায়ের জামা খুলে ফেললেন। তিনি তাঁর পিঠে শুধু দাগ আর দাগ দেখতে পেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, একি ? তিনি বললেন, মক্কার উত্তপ্ত বালির উপর আমাকে যে শাস্তি দেয়া হতো এটা তারই নিদর্শন।

এরপর মুশরিকরা হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আগুনের উপর শুইয়ে দিলো। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তাঁর মাথার উপর হাত রাখলেন এবং বললেন ঃ হে আগুন ! আম্মারের উপর তুমি এমনভাবে শীতল হয়ে যাও যেমন তুমি ইবরাহীম আলাইহিস সালামের উপর হয়েছিলে।"

একবার মুশরিকরা হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে পানির মধ্যে এমনভাবে ডুবিয়ে দিলো যে, তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। এ অবস্থায় সেসব যালেমরা তাঁর মুখ দিয়ে এমন সব অশোভনীয় কথা বলিয়ে নিলো যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অস্বীকৃতি এবং মূর্তিদের (মুশরিকদের মাবুদ) প্রশংসাসূচক ছিলো। যখন তিনি এসব হতভাগার কাছ থেকে মুক্তি পেলেন তখন কাঁদতে কাঁদতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাজির হলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ কি ব্যাপার ! তোমার কি হয়েছে যে কাদছো ? তিনি আরজ করলেন ঃ হে

www.bjilibrary.com

আল্লাহর রাসূল ! অত্যন্ত খারাপ কথা। আপনার ব্যাপারে অশোভনীয় কথা এবং মুশরিকদের মাবুদদের প্রশ্নে প্রশস্তি না গাওয়া পর্যন্ত আমাকে তারা ছেড়ে দেয়নি।”

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার অন্তরের অবস্থা কি ? তিনি আরজ করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল ! আল্লাহর ফযলে আমার অন্তর আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমানে অবিচল রয়েছে।”

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত স্নেহের সাথে তাঁর চোখের পানি মুছে দিলেন এবং বললেন ঃ কোনো ভয় নেই। ভবিষ্যতেও যদি তারা তোমার ওপর নির্যাতন চালায় এবং একই ধরনের দাবী করে, তাহলে জীবন রক্ষার জন্যে তুমি এ ধরনের করো।”

অসংখ্য মুফাসসির লিখেছেন যে, যে ব্যক্তি ঈমান গ্রহণের পর কুফরী করে, সে যদি বাধ্য হয়ে গিয়ে থাকে, অথচ তার অন্তর ঈমানের প্রতি পূর্ণ আস্থাবান ও অবিচল থাকে” (তবে কোনো দোষ নেই)। সূরা আন নাহালের ১০৬)। এ আয়াত সে প্রসঙ্গেই নাযিল হয়েছে।

হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহু মদীনায় হিজরত পর্যন্ত অব্যাহতভাবে মক্কায় অবস্থান করে কাফেরদের নির্যাতন সহ্য করতে থাকেন। অথবা তিনি কিছু দিনের জন্যে হাবশাহ গিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে মতভেদ রয়েছে। কতিপয় ইতিহাসবিদ লিখেছেন যে, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইঙ্গিতে দ্বিতীয় হিজরতে হাবশায় (নবুয়াত প্রাপ্তির ৬ বছর পর) চলে গিয়েছিলেন এবং সেখানে কিছুদিন অবস্থানের পর মক্কায় ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু বেশীর ভাগ ইতিহাসবিদ হাবশায় দ্বিতীয় হিজরতে অংশগ্রহণকারী যেসব মুহাজিরের তালিকা দিয়েছেন তাতে হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহুর নাম নেই। যা হোক, এ ব্যাপারে সকলেই ঐকমত্য পোষণ করে থাকেন যে, হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহু সেসব সাহাবার অন্তর্ভুক্ত যাঁরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরতের কিছু আগে (এক-দুই মাস) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেছিলেন। সহীহ আল বুখারীর মতে যেসব পূত-পবিত্র ব্যক্তি সর্বপ্রথম মক্কা থেকে মদীনার দিকে রওয়ানা হয়েছিলেন তাঁরা হলেন ঃ হযরত আবু সালমাহ আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবদুল আসাদ মাখজুমী, হযরত আমের রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন রবিয়াহ আনজী, [হযরত আমের রাদিয়াল্লাহ আনহুর পত্নী] হযরত লায়লা রাদিয়াল্লাহ আনহা বিনতে আবি হাসমা, হযরত সাদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবি ওক্কাস, হযরত আম্মার বিন ইয়াসির রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন রাবাহ।

www.bjilibrary.com

হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহু প্রথমে কুবা গমন করলেন। এখানে বনি আমর বিন আওফ গোত্রের হযরত মুবাশশির রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবদুল মানযার তাঁকে নিজের মেহমান বানিয়ে নিলেন। এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও মক্কা থেকে হিজরত করে কুবাতে শুভ পদার্পণ করলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে কুবার ভিত্তিস্থাপন করলেন। এ সময় হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহুও অন্যান্য সাহাবাদের সাথে মসজিদের নির্মাণ কাজে অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অংশ নিলেন। ইমাম হাকিম রাহমাতুল্লাহ আলাইহি নিজের পুস্তক 'মুসতাদরাক' এ এও লিখেছেন যে, কুবা মসজিদের জন্যে হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহুই পাথর একত্রিত করেছিলেন এবং তার নির্মাণ কাজও তিনিই আঞ্জাম দিয়েছিলেন। কিছুদিন পর হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহু বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমভিব্যাহারে কুবা থেকে মদীনা চলে আসেন। ইবনে সায়াদ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বর্ণনা করেছেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্যে হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহুকে এক টুকরো জমি দিয়েছিলেন। ধারণা করা হয় যে, হিজরতের অব্যবহতি পরেই তাঁকে এ জমি দেয়া হয়নি। বরং কিছুদিন পর তাঁকে জমি দেয়া হয়েছিলো। কেননা হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহু কিছুদিনের জন্যে আসহাবে সুফ্ফারও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

মদীনা মুনাওয়ারাতে আগমনের কিছুদিন পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুহাজির এবং আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত হুজাইফা রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আইমানের ইসলামী ভাই হলেন।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে নববীর নির্মাণ কাজ শুরু করলেন। সব সাহাবা এ কাজে অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অংশ নিলেন। দোজাহানের নেতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যান্যদের মত স্বয়ং ইট ও অন্যান্য বস্তু বহন করে আনতেন। সাহাবারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ কষ্ট না করার মিনতি জানালেন এবং বললেন, আমরাই এ কাজ করবো। কিন্তু তিনি এ প্রস্তাব নাকচ করে দিলেন।

এ সময় হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহু ইট এনে এনে দিতেন এবং এ কবিতা আবৃত্তি করতেন ঃ "আমরা মুসলমান, আমরা মসজিদ বানাই।"

সহীহ বুখারীতে হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, আমরা একটি করে ইট আনছিলাম আর আম্মার আনছিলো দু'টি

www.bjilibrary.com

করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে দেখে তাঁর শরীর থেকে মাটি পরিষ্কার করতে লাগলেন এবং বললেন, হায় আম্মার তাকে বিদ্রোহী দল হত্যা করবে।

তবকাতে ইবনে সায়াদে (র) একটি বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এ বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, একদিন জনৈক ব্যক্তি হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহুর মাথার ওপর এমন এক বোঝা এনে চাপিয়ে দিলেন যে, তা দেখে লোকজন চেঁচিয়ে উঠে বললো, "এ বোঝা আম্মারকে মেরে ফেলবে।" আগেও তিনি এ ধরনের অভিযোগ করেছিলেন (সামর্থের বেশী বড় বোঝা তাঁর ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথা শুনলেন এবং কিছু ইট নামিয়ে ফেলে দিলেন। এরপর বললেন ঃ "আফসোস হে ইবনে সুমাইয়াহ! এক বিদ্রোহী গ্রুপ তোমাকে হত্যা করবে।"

হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহু সত্য পথের এক নির্ভীক সেনানী ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলো তাঁর নিখাদ সম্পর্ক। তিনি বদর থেকে শুরু করে তাবুক পর্যন্ত সকল যুদ্ধেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহগামী ছিলেন এবং প্রত্যেক যুদ্ধেই জীবন বাজী রেখে লড়াই করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে সম্ভবতঃ এমন কোনো মর্যাদা নেই যা তিনি লাভ করেননি। নামকরা যুদ্ধসমূহ ছাড়াও তিনি ছোট ছোট যুদ্ধেও অংশ নিয়েছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দীনের প্রতি তাঁর আন্তরিকতা এবং ত্যাগের আবেগের স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং তাঁকে অত্যন্ত সম্মান দিতেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে এক অভিযানের আমীর বানিয়ে প্রেরণ করলেন। তাঁর অধীনের সৈন্যদের মধ্যে হযরত আম্মার বিন ইয়াসির রাদিয়াল্লাহ আনহুও ছিলেন। এ বাহিনী রওয়ানা হলো। যাদের বিরুদ্ধে সকালে যুদ্ধ করার কথা সে গোত্রের কাছে পৌঁছলো এবং রাতের শেষের দিকে সেখানে তাঁবু ফেললো। সে গোত্রের কোনো ব্যক্তিই মুসলমানদের আগমনের কথা জানলো এবং তারা পালিয়ে গেলো।

অবশ্য এক ব্যক্তি সেখানেই রয়ে গেলো। কেননা সে এবং তার স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করেছিলো। তবুও তার স্ত্রী পালিয়ে যাওয়ার জন্যে সওয়ারীর ওপর আসবাবপত্র বোঝাই করলো। এ অবস্থায় সে ব্যক্তি তাকে বললো, আমার ফিরে আসা পর্যন্ত একটু অপেক্ষা করো। এরপর সে মুসলমানদের তাঁবুতে এসে হযরত আম্মারের সাথে সাক্ষাত করলো এবং বললো, হে আবুল ইয়াকজানা। আমি এবং আমার পত্নী ইসলাম গ্রহণ করেছি। একথা কি

www.bjilibrary.com

কোনো উপকারে আসবে ? আমার গোত্রের লোকেরাতো তোমাদের আগমনের কথা শুনে পালিয়ে গেছে ? হযরত আম্মার বললেন, তুমি থাক। তোমার নিরাপত্তা দিচ্ছি। বস্তুতঃ সে ব্যক্তি এবং তার পত্নী নিজের বস্তিতেই রয়ে গেলো। সকালে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ্ আনহু সে বস্তিতে অভিযান চালালেন। কিন্তু দেখলেন, সবাই পালিয়ে গেছে। তাঁরা সেই ব্যক্তি এবং তার পত্নীকে আটক করলেন। হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ্ আনহু হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ্ আনহুকে বললেন, তুমি এ ব্যক্তির সাথে কঠোর আচরণ করো না। কেননা সে ইসলাম গ্রহণ করেছে। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ্ আনহু বললেন, এ ব্যক্তির সাথে তোমার সম্পর্ক কি ? তুমি কি তাকে আশ্রয় দেবে। প্রকৃতপক্ষে আমি বাহিনীর নেতা।

হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন, হ্যাঁ, যদিও তুমি নেতা তবুও আমি তাকে আশ্রয় দেবো। এ ব্যক্তি ঈমান এনেছে। যদি চাইতো তাহলে তার গোত্রের অন্যান্য লোকের মতো সে-ও পালিয়ে যেত। ইসলাম গ্রহণ করার কারণে আমি তাকে এখানে থেকে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছি। এভাবে কথা কাটা-কাটির উপক্রম হলো। যখন এ বাহিনী মদীনা ফিরে এলো তখন হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহু দু'জনেই হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে উপস্থিত হলেন। হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহু পুরো ঘটনা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে পেশ করলেন। তিনি হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহুর নিরাপত্তা ও আশ্রয়দান সম্পর্কিত ব্যাপারটি বহাল রাখলেন। অবশ্য হেদায়াত দিলেন যে, ভবিষ্যতে কেউ আমীরের (পরামর্শ অথবা অনুমতি ব্যতিরেকে) বিরুদ্ধে কাউকে যেন আশ্রয় না দেয়। এরপরও তাদের মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনেই তর্ক-বিতর্ক হলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ্ আনহু ক্রুদ্ধাবস্থায় বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ! আপনার সামনেই এ গোলাম আমাকে কঠিন এবং তেড়া কথা বলছে। খোদার কসম ! যদি আপনি না থাকতেন, তাহলে তার এ সাহস হতো না।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, খালিদ ! আম্মারের ব্যাপারে থেমে যাও। যে আম্মারকে মন্দ বলে, আল্লাহ্ তাকে মন্দ বলেন। যে আম্মারকে ঘৃণা করে, সে আল্লাহর কাছে ঘৃণার পাত্র হয় এবং যে আম্মারকে অবজ্ঞা করে আল্লাহর কাছে সে ঘৃণিত হয়।"

এরপর হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহু উঠে দাঁড়ালেন এবং সেখান থেকে রওয়ানা দিলেন। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহ্ আনহু তাঁর পিছু পিছু গেলেন এবং কাপড় ধরে ফেললেন। অতপর তাঁর কাছে মিনতি

www.bjilibrary.com

জানাতে লাগলেন। অবশেষে হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন।-(ইবনে আসাকির)

মুসতাদরাকে হাকিম গ্রন্থে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, এ দিনটি ছিলো আমার জন্যে অত্যন্ত কঠিন দিন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আবেদন করলাম যে, আমার জন্যে ইসতিগফার করুন এবং হযরত আম্মারের কাছেও ক্ষমা চাইলাম।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু খলিফা নির্বাচিত হলেন। এ সময় প্রায় সমগ্র আরবেই স্বধর্ম ত্যাগের ফেতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু নজীরবিহীন সাহস এবং ধৈর্যের সাথে এ ফেতনার মুকাবিলা করেন। এজন্যে কয়েকটি রক্তাক্ত সংঘর্ষও সংঘটিত হলো। হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহু অধিকাংশ অভিযানে মুরতাদদের বিরুদ্ধে বাহাদুরী প্রদর্শন করলেন। মুসায়লামা কাজ্জাবের বিরুদ্ধে পরিচালিত ইয়ামামার যুদ্ধেও তিনি শরীক ছিলেন। তাবারীর বর্ণনা মতে স্বধর্ম ত্যাগী বা মুরতাদদের বিরুদ্ধে পরিচালিত সকল যুদ্ধের মধ্যে এটি ছিলো সবচেয়ে কঠিন যুদ্ধ। হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহু এ যুদ্ধে চরম বাহাদুরীর পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে ছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, ইয়ামামার যুদ্ধে হযরত আম্মারের একটি কান শহীদ হয়ে গিয়েছিলো। পাশেই কান ছিঁড়ে পড়েছিলো। কিন্তু তিনি বেপরোয়া হয়ে হামলার পর হামলা চালিয়ে গেলেন। যেদিকেই অগ্রসর হচ্ছিলেন শত্রুর ব্যূহ নাস্তানাবুদ হচ্ছিলো। এক সময় মুসলমানদের অবস্থা অত্যন্ত নাজুক হয়ে দাঁড়ালো। তিনি মরুময় প্রান্তরের এক উঁচুস্থানে দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে আহ্বান জানালেন ঃ হে মুসলমানরা ! তোমরা কি জান্নাত থেকে পালিয়ে যাচ্ছো ? দেখ, আমি আম্মার বিন ইয়াসির। এসো, আমার দিকে এসো।"

তার আহ্বানে মুসলমানরা মযবুত হয়ে দাঁড়ালো এবং হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহু সহ ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে হামলা চালালো। অবশেষে মুসলমানদের বিজয় ঘটলো। ১১ হিজরীতে সংঘটিত ইয়ামামার যুদ্ধের সময় হযরত আম্মারের বয়স প্রায় ৬৫ বছর ছিলো। কিন্তু শৌর্যবির্যে তিনি যুবকদেরকেও হার মানিয়েছিলেন।

আমিরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা এবং সম্মান করতেন। একবার কুরাইশ সরদার হযরত আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন হারব, হযরত হারিস

রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন হিশাম এবং হযরত সোহায়েল রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আমর খলিফা হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে সাক্ষাতের জন্যে এলেন। ঠিক একই সময় হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহু, হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহ আনহু ও হযরত সোহায়েব রাদিয়াল্লাহ আনহু একই উদ্দেশ্যে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে পৌঁছলেন। আমীরুল মু'মিনীন এ খবর পেলেন এবং তিনি প্রথমে হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহু, হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহ আনহু ও হযরত সোহায়েব রাদিয়াল্লাহ আনহুকে সাক্ষাতের জন্যে ভেতরে ডাকলেন। তাঁদের সাথে আলোচনার পর তিনি কুরাইশ সরদারদের সাক্ষাতদান করলেন। হযরত আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহ আনহু ব্যাপারটি অনুভব করলেন এবং আমীরুল মু'মিনীনের কাছে অভিযোগ করে বললেন যে, গোলামদেরকে তো তাৎক্ষণিকভাবে সাক্ষাতদান করা হয়। আর আমাদের মত কুরাইশদের নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে বসে বসে অপেক্ষা করতে হয়।

আমীরুল মু'মিনীন বললেন, এর জবাব আপনাদের অন্তরের কাছেই জিজ্ঞেস করা উচিত। ইসলাম সবার সাথে আপনাদেরকেও ডেকেছে। কিন্তু এসব মানুষ আপনাদের আগে ইসলামের আহ্বানে সাড়া দিয়েছে।

২০ হিরজীতে হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত আম্মার বিন ইয়াসির রাদিয়াল্লাহ আনহুকে কুফার গভর্নর করেন। এ সময় তিনি কুফাবাসীদের নামে এ ফরমান প্রেরণ করেন ঃ

"আমি তোমাদের কাছে আম্মার বিন ইয়াসির রাদিয়াল্লাহ আনহুকে আমীর এবং ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে শিক্ষক ও উপদেষ্টা (মন্ত্রী) হিসেবে প্রেরণ করছি। এ দু'জন হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাছাইকৃত সাথী এবং বদরের মুজাহিদ। তাদের আনুগত্য করো এবং নির্দেশ মেনে চলো। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে আমার চেয়েও শ্রেষ্ঠ হিসেবে তোমাদের কাছে প্রেরণ করলাম এবং তাঁকে তোমাদের খাজাঞ্চীখানার রক্ষক বা কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেছি। ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন হুনাইফকে পশ্চিম ইরাকের পরিমাপক ও জমির খাজনা নিরুপণের পরিচালক নিয়োগ করেছি। এ তিনজনের রসদ হিসেবে প্রতিদিন একটি বকরী ঠিক করে দিয়েছি। বকরীর পেটসহ অর্ধেক আম্মারের জন্য এবং অবশিষ্টাংশ ইবনে মাসউদ ও ওসমানের জন্য।"

কুফায় হযরত আম্মারের শাসনকালে নাহাওন্দ নামক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর নির্দেশ মুতাবিক হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহু কুফা থেকে সাহায্যসহ নাহাওন্দ পৌঁছলেন। ইত্যবসরে যুদ্ধ শেষ হয়ে

www.bjilibrary.com

গিয়েছিলো এবং মুসলমানরা বিজয়ী হয়েছিলো। ইমাম বাইহাকী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ও শামসুল আইম্মা সারাখসী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজের সৈন্যদের জন্যে গনিমাতের মালের অংশ দাবী করলেন। বিজয়ী সৈনিকদের অনেকেই এ দাবীতে উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। তাঁরা বললেন, আপনি যুদ্ধে অংশ নেননি। এজন্যে গনিমাতের মালের মুসতাহিক বা যোগ্য নন। একজন গ্রাম্য সৈনিক ক্রোধান্বিত হয়ে গালাগালি করে বললো," কান কাটা গোলাম। (ইয়ামামার যুদ্ধে হযরত আম্মারের রাদিয়াল্লাহু আনহুর একটি কান কেটে গিয়েছিলো) তুমি আমাদের গনিমাতের মালে অংশীদার হতে চাও (এ মাল আমরা যুদ্ধের আগুনে জ্বলে হাসিল করেছি)। হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহু অত্যন্ত ধৈর্যশীল মানুষ ছিলেন। তিনি কারোর সাথে বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়া সঠিক মনে করলেন না। অবশ্য আমিরুল মু'মিনীন রাদিয়াল্লাহ আনহুকে অভিযোগ পত্র লিখলেন। সেখান থেকে জবাব এলো ঃ "নিসন্দেহে গনিমাতের মাল তাদের যারা প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে অংশ নিয়েছে।"

মুসলমানরা সে যুগে মাদায়েনে একটি কবরে মূল্যবান কাপড়ে জড়ানো একটি লাশ পেলো। এ লাশের পাশে অনেক অর্থও ছিলো। কাফনের কাপড় এবং অর্থ হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে কুফায় আনা হলো। তিনি আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুকে চিঠি লিখে জানতে চাইলেন যে, এ কাপড় এবং অর্থ কোষাগারে জমা করে নেব না তাকে (প্রাপকদেরকে) দিয়ে দিবো। আমীরুল মু'মিনীন জবাব দিলো, এসব বস্তু প্রাপকদেরকে দিয়ে দাও এবং তাদের কাছ থেকে আর ফেরত নেবে না।"

হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহু এক বছর নয় মাস পর্যন্ত অত্যন্ত সুচারুরূপে কুফার ইমামাতের দায়িত্ব পালন করলেন। কিন্তু সে যুগেই কুফা এবং বসরাবাসীদের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ তুঙ্গে উঠলো। অন্যদিকে হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহুর পক্ষপাতহীন আচরণে কুফাবাসীকে ক্ষুব্ধ করে তুললো। ইবনে জারির তাবারি বলেছেন, খুজিস্তান বিজয়ের পর বসরাবাসী মাহ অথবা মাস পন্দান পরগণা এবং আরো কিছু দখলকৃত এলাকা বসরার সাথে সংযুক্ত করে দেয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলো। কেননা বসরা প্রদেশের আয়তন জনসংখ্যার তুলনায় অত্যন্ত ছোট ছিলো। কিন্তু কুফাবাসী সেসব এলাকা বসরার সাথে সংযুক্ত করার বিরোধী ছিলো। বসরার গভর্নর হযরত আবু মূসা আশআরী রাদিয়াল্লাহ আনহু এলাকাসমূহ বসরার সাথে সংযুক্ত করার জন্যে খলিফার কাছে দাবী জানালেন। পক্ষান্তরে কুফাবাসী নিজেদের গভর্নর হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহুর উপর চাপ সৃষ্টি করলো যে, তিনি যেন এ

www.bjilibrary.com

দাবীর বিরোধিতা করেন। কিন্তু হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহু এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করলেন এবং বললেন, "আমার এ বিসম্বাদে জড়িয়ে পড়ার কি প্রয়োজন রয়েছে।" তাঁর জবাব শুনে কুফার এক সরদার আতারদ অগ্নিশর্মা হয়ে বললো ঃ হে কানকাটা ! এরপর তুমি আমাদের কাছ থেকে রাজস্ব কিভাবে চাও।"

কুফার সবচেয়ে বড় শাসক ছিলেন হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহু। তিনি ইচ্ছা করলে আতারদের এ ঔদ্ধত্যের শাস্তি দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি অত্যন্ত ধৈর্যের পরিচয় দিলেন এবং শুধু এটুকু বললেন ঃ "আফসোস ! তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় কানকে গালি দিলে।"

হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহুর নিরপেক্ষতার ফলশ্রুতিতে উল্লেখিত এলাকা বসরা প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া হলো। এতে কুফাবাসী খলিফার দরবারে হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহুর বিরুদ্ধে অভিযোগের ফিরিস্তি তুলে ধরলো এবং বার বার লিখে পাঠালো যে, আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহু একজন দুর্বল আমীর। তিনি রাজনীতি বুঝেন না। এর পূর্বে কুফাবাসী হযরত সাদ বিন আবি ওক্কাস রাদিয়াল্লাহ আনহুর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রেরণ করে তাঁকে বরখাস্ত করিয়েছিলো। আল্লামা বালাজুরী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ফতহুল বুলদান নামক গ্রন্থে লিখেছেন, কুফাবাসীর এ কার্যকলাপে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু দুঃখিত হলেন এবং বললেন, "কুফাবাসীর মধ্যে কে আছে যে, আমাকে অক্ষম করে রাখে। আমি যদি কোনো শক্তিশালী ব্যক্তিকে তাদের শাসক বানাই তাহলে তারা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। পক্ষান্তরে যদি কোনো দুর্বল ব্যক্তিকে তাদের আমীর নিযুক্ত করি তাহলে তাহলে তারা তাকে অপমানিত করে।"

এ সত্বেও তিনি হযরত আম্মার বিন ইয়াসির রাদিয়াল্লাহ আনহুকে বরখাস্ত করে তাঁর স্থলে হযরত মুগিরাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন শোবাকে কুফার গভর্নর নিয়োগ করলেন।

ইবনে আসির (র) বলেছেন, বরখাস্তের পর হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহুকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "বরখাস্তের নির্দেশে তুমি অসন্তুষ্ট হওনি তো ?" হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহু জবাবে বললেন, "আপনি যখন জিজ্ঞেস করেছেন তখন প্রকৃত কথা হলো যে, এ পদে নিয়োগে আমি যেমন খুশী হইনি, তেমনি তা থেকে বরখাস্তেও অসন্তুষ্ট নই।"

হযরত ওসমান জুন্নুরাইন রাদিয়াল্লাহ আনহুর শাসনকালের দ্বিতীয়ার্ধে দেশে ফেতনা ও বিশৃংখলা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। ৩৫ হিজরীতে আমীরুল মু'মিনীন রাদিয়াল্লাহ আনহু এ বিশৃংখলার কারণ জানার জন্যে একটি তদন্ত

কমিটি নিয়োগ করেন। হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহু এ কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন। এ কমিটিকে বিশৃংখলা ও ফেতনার মূল কেন্দ্র মিসরে পাঠানো হলো। তদন্ত কমিটির অন্যান্য সদস্য শীঘ্রই ফিরে এসে স্ব স্ব এলাকার অবস্থা সম্পর্কে আমীরুল মু'মিনীনকে অবহিত করলেন। কিন্তু হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফিরতে অস্বাভাবিক দেরী হলো। কিছুদিন পর তিনি সেখান থেকে মদীনায় ফিরে বিপ্লবপন্থীদের কিছু দাবী এবং অভিযোগের প্রকাশ্য সমর্থন জানালেন। এজন্যে তাঁকে একবার অত্যন্ত কষ্ট সহ্য করতে হয়। মাওলানা হাজী মুঈনুদ্দীন নদভী মরহুম "সিয়ারুস সাহাবা" গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

"একবার হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর গোলামরা হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এমনভাবে প্রহার করলো যে, তাতে সারা শরীর ফুলে গেলো। পেটে নখের আচর বসে গেলো এবং পাঁজরের হাড়ে ব্যথা অনুভূত হতে লাগলো। জাহেলী যুগে বনি মাখজুম গোত্রের সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিলো। একথা শুনে গোত্রের লোকেরা খিলাফত ভবন ঘিরে নিলো এবং হযরত আম্মার বিন ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহু যদি সুস্থ না হয়ে ওঠেন তাহলে তারা অবশ্যই প্রতিশোধ নেবে বলে হুমকি দিলো।"-(সিয়ারুস সাহাবা দ্বিতীয় খণ্ড)

যদি এ বর্ণনা সঠিক হয় তাহলে বিশ্বাস করতে হবে যে, যা কিছু ঘটেছে তা আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওসমান জুন্নুরাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর অজ্ঞাতে এবং বিনা ইঙ্গিতেই ঘটেছে। কারণ, তিনি ছিলেন সৎ স্বভাব, ধৈর্যের আঁধার এবং উম্মাহর কল্যাণকামী। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র প্রয়োগের অনুমতি দেননি। সলফে সালেহীনরা সাহাবাদের রাদিয়াল্লাহু আনহুমদের ঝগড়া-বিবাদ প্রশ্নে কোনো উক্তি না করাকেই উত্তম বলে মনে করেছেন। খুব বেশী হলেও এতটুকু বলা যায় যে, কিছু কিছু ব্যাপারে হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে আমীরুল মু'মিনীন হযরত জুন্নুরাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতবিরোধ ছিলো।

খলিফায়ে রাশেদ সাইয়েদেনা হযরত ওসমান জুন্নুরাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর মর্মান্তিক শাহাদাতের পর সাইয়েদেনা হযরত আলী কাররামুল্লাহু ওয়াজহাহু খলিফা নির্বাচিত হলেন। হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে পুরোপুরি সমর্থন এবং তার দক্ষিণ বাহু হিসেবে প্রমাণিত করলেন। উষ্ট্রের যুদ্ধের পূর্বে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু কুফাবাসীর সমর্থন লাভের জন্যে তাঁকে সাইয়েদেনা হযরত হাসানের রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে কুফা প্রেরণ করলেন। কুফার গভর্নর হযরত আবু মূসা আশআরীর রাদিয়াল্লাহু আনহু ভূমিকা ছিলো নিরপেক্ষ। হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহু এটা পসন্দ করতেন না। তিনি এক সভায় কুফার জনগণকে নিরপেক্ষ

www.bjilibrary.com

থাকার উপদেশ দিচ্ছিলেন। এমন সময় হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহ আনহু ও হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহু সেখানে উপস্থিত হলেন। হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত আবু মূসা রাদিয়াল্লাহ আনহুকে পেছনে সরিয়ে দিয়ে মিম্বরে উঠে দাঁড়ালেন এবং জনগণকে তাঁর প্রতি সমর্থনের জন্য উদ্বুদ্ধ করণের লক্ষ্যে এক উদ্দীপনাময় বক্তৃতা দিলেন। হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহুও তাঁর সাথে মিম্বরে উঠে দাঁড়ালেন এবং বক্তৃতা করতে গিয়ে বললেন ঃ হে মানুষেরা ! উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহ আনহাকে ইহ ও পরকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন সঙ্গিনী হিসেবে আমি জানি। কিন্তু এখন তোমরা আল্লাহর না হযরত আয়েশার আনুগত্য করবে তার পরীক্ষা তিনি নিচ্ছেন।"

কুফার একজন প্রভাবশালী সদস্য হযরত হুজর রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আদী হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহুকে পুরোপুরি সমর্থন জানালেন। এভাবে কুফার প্রায় ১০ হাজার মানুষ হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর বাহিনীতে যোগদানের জন্যে হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহুর সহযোগী হয়ে গেলো।

উষ্ট্রের যুদ্ধ শুরু হলো। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহুকে মাইসারার অফিসার নিয়োগ করলেন। কেননা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর হকপন্থী হওয়ার ব্যাপারে তাঁর পুরো বিশ্বাস ছিলো। এজন্যে তিনি অসাধারণ উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং অবিচলভাবে যুদ্ধ করলেন। অবশেষে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর বিজয় হলো। ৩৬ হিজরীর জমাদিউস সানীতে এ ঘটনা ঘটেছিলো।

উষ্ট্রের যুদ্ধের পর হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহুর মধ্যকার মতবিরোধ প্রচণ্ড আকার ধারণ করছিলো। এরই ফলশ্রুতিতে সিফফীনের যুদ্ধ সংঘটিত হলো। এ যুদ্ধেও হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর পক্ষ নিলেন। ইবনে সায়াদের বর্ণনা মতে, যখন তিনি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর বাহিনীতে যোগ দিয়ে যুদ্ধের ময়দানের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন বারংবার বলছিলেন, হে আল্লাহ ! পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়ে, পানিতে ডুবে অথবা আগুনে জ্বলে জীবন দান যদি তোমার সন্তুষ্টির মাধ্যমে হবে বলে আমি জানতাম তাহলে যে কোনোভাবে আমি তোমাকে সন্তুষ্ট করতাম। এখন আমি যুদ্ধ করতে যাচ্ছি। তোমার সন্তুষ্টি অর্জনই একমাত্র কাম্য। আশা করি তুমি আমার এ কামনা ব্যর্থ করে দেবে না। এ সময় তাঁর বয়স ছিলো ৯০ বছরেরও বেশী। (বিভিন্ন মত অনুযায়ী ৯১, ৯৩ অথাব ৯৪ বছর)। কিন্তু আবেগ ও উদ্দীপনা কানায় কানায় পূর্ণ ছিলো। দেহ ছিলো বলিষ্ঠ এবং মযবুত। এজন্যে

www.bjilibrary.com

যুদ্ধে অচিন্তনীয় বাহাদুরী প্রদর্শন করলেন। যেদিকে অগ্রসর হতেন, বিপক্ষের ব্যূহ বিশৃংখল ও এলোমেলো হয়ে যেতো। যুদ্ধকালীন সময়ে একবার আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহুর সেনাপতি হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসের প্রতি দৃষ্টি পড়লো। আবেগ ও ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে পড়লেন এবং তাঁর মুখ দিয়ে একথাগুলো বের হয়ে পড়লো ঃ

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহযোদ্ধা হয়ে এ সেনাপতির সাথে আমি তিনবার যুদ্ধ করেছি। এখন চতুর্থবার তাঁর মুখোমুখি হচ্ছি। আল্লাহর কসম ! সে যদি আমাদেরকে পরাজিত করে মকামে হিজর পর্যন্তও পেছনে হটিয়ে দেয় তাহলেও আমি মনে করবো যে, আমরা হকের উপর রয়েছি এবং সে ভুল পথে চলছে।"

একদিন সন্ধ্যায় সূর্য ডুবে যাচ্ছিলো এবং প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছিলো। হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহু কয়েক চুমুক দুধ পান করলেন এবং বললেন ঃ

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমায়েছিলেন, সর্বশেষ চুমুক তুমি যা পান করবে তা হবে দুধ।" একথা বলে বাঘ যেমন শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তেমনি যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়লেন। এ সময় তাঁর মুখ দিয়ে উচ্চারিত হচ্ছিলো, "আজ আমি বন্ধুদের সাথে মিলিত হবো। আজ আমি আমার বন্ধু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর জামায়াতের সাথে মিলিত হবো।"

হযরত হাশিম রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন উতবা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর ঝাণ্ডা উঁচু করে ধরে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর দিকে দৃষ্টি পড়তেই বলে উঠলেন ঃ হে হাশিম ! সামনে অগ্রসর হও। বেহেশত তলোয়ারের ছায়ার নীচে এবং মৃত্যু নেজার কিনারায় অবস্থান করে। বেহেশতের দরযা খোলা হয়েছে এবং সেখানকার হুররা সজ্জিত হয়ে অপেক্ষা করছে।" অতপর এতো বেপরোয়া হয়ে লড়াই করলেন যে, কাতারের পর কাতার সিরীয় সৈন্য সাফ হয়ে গেলো। অবশেষে একজন সিরীয় সিপাহী নিজের বল্লম দিয়ে তাঁকে আহত করে মাটিতে ফেলে দিলো এবং একজন সিরীয় সৈন্য তাঁর শরীর থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে ফেললো।-(ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাইহি রাজিউন)

আল্লামা ইবনে আসির (র) এবং হাফেজ ইবনে কাসিরের (র) বর্ণনা মতে, হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহুর শাহাদাতের খবর আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহুকে পৌছানো হলো। এ সময় তাঁর পাশে হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস এবং তাঁর পুত্র হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আমরও উপস্থিত ছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত মুয়াবিয়া এবং নিজের পিতাকে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.bjilibrary.com

ওয়া সাল্লামের ইরশাদ স্মরণ করালেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহুকে এক বিদ্রোহী গ্রুপ হত্যা করবে। একথা শুনে হযরত আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন ঃ আমরা কি আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহুকে হত্যা করেছি ? তাঁকে তো সে-ই হত্যা করেছে, যে তাঁকে যুদ্ধের ময়দানে এনেছে।" তাঁর ইঙ্গিত ছিলো হযরত আলী কাররামুল্লাহ ওয়াজহাহু রাদিয়াল্লাহ আনহুর দিকে। তাঁর সমর্থনে যুদ্ধ করতে করতে হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহু শাহাদাত প্রাপ্ত হন।

ইবনে আসির রাহমাতুল্লাহ আলাইহি উসুদুল গাব্বাহ নামক গ্রন্থে লিখেছেন, দু'জন ঝগড়া করতে করতে হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসের কাছে এলো। উভয়েই দাবী করলো যে, সে-ই আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহুকে হত্যা করেছে। এজন্যে তাদেরকে পুরস্কার দিতে হবে। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস বললেন, "আল্লাহর কসম ! এ দু' ব্যক্তি ।াযখের জন্যে বিবাদ করছে। আল্লাহর কসম ! আজ থেকে ২০ বছর আগে মরে যাওয়াই আমি পসন্দ করতাম।

ইবনে সায়াদ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন, এ ঘটনা হযরত আমীর মুয়াবিয়ার সামনে পেশ করা হলো। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস যখন বললেন, এ দু' ব্যক্তি হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ্ আনহুর হত্যার দাবীদার জাহান্নামের জন্যে ঝগড়া করছে, তখন আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহু অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন ঃ আমর তুমি কি বলছো। যারা আমাদের জন্যে জীবন উৎসর্গ করছে তাদেরকে তুমি এ ধরনের কথা বলছো।"

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস বললেন ঃ "আল্লাহর কসম ! এটাই ঠিক। আহা ! আজ থেকে ২০ বছর আগে যদি আমার মৃত্যু হতো।"

অন্যান্য বর্ণনা থেকে জানা যায়, হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ্ আনহুর শাহাদাতের পর নিরপেক্ষ সাহাবা রাদিয়াল্লাহ আনহুমও হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর সমর্থক হয়ে গিয়েছিলেন।

হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ্ আনহুর শাহাতাদের খবর শুনে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো। যখন তাঁর রক্তাক্ত লাশ যুদ্ধের ময়দান থেকে উঠিয়ে আনা হলো তখন শেরে খোদা রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ "আম্মার যেদিন ঈমান এনেছিলো সেদিন আল্লাহ তাঁর উপর রহম করেছিলেন। যেদিন তিনি শহীদ হলেন সেদিনও তিনি তাঁর উপর রহম করেছেন। যেদিন তাঁর পুনরুত্থান ঘটবে সেদিনও তিনি তাঁর উপর রহম করবেন। যখন চার অথবা পাঁচজন সাহাবা ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা

www.bjilibrary.com

করেছিলেন তখন আমি তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে দেখেছিলাম। পুরাতন সাহাবাদের মধ্যে কেউই তাঁর মাগফিরাত প্রশ্নে সন্দেহ করতে পারবে না। আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং হক পরস্পর অবিচ্ছেদ্য। এজন্যে তাঁর হত্যাকারী অবশ্যই জাহান্নামী হবে।"

এরপর নিজে তাঁর জানাযার নামায পড়ালেন এবং প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ উঁচু মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবীকে কুফায় দাফন করলেন।

হযরত আম্মার বিন ইয়াসির রাদিয়াল্লাহ আনহু দীর্ঘদিন যাবত নবুয়াতের প্রস্রবণে সরাসরি অবগাহন করেছিলেন। এজন্যে তিনি জ্ঞানের ক্ষেত্রে খুব উঁচু মর্যাদা রাখতেন। কিন্তু তিনি অত্যন্ত কম কথা বলতেন এবং হাদীস বর্ণনায় সীমাহীন সতর্ক ছিলেন। এ কারণেই তাঁর থেকে মাত্র ৬২টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবাদের মধ্যে তাঁকে চতুর্থ পর্যায়ের বর্ণনাকারী হিসেবে গণ্য করা হয়।

হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহুর জীবনী পুস্তকে তাঁকে ইসলামের প্রতি অগ্রগমন, উদ্যমশীল, ধৈর্য, স্থৈর্য, রাসূলের প্রতি ভালোবাসা, জিহাদের প্রতি উদ্দীপনা, ইবাদাতে নিবেদিত প্রাণ, আল্লাহ ভীতি, ভদ্রতা ও নম্রতা, সরলতা ও অনাড়ম্বরতা এবং বিনয়ের আধার হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

তিনি সত্যের দাওয়াতের প্রতি সে সময় লাব্বাইক বলেছিলেন বা সাড়া দিয়েছিলেন যখন এ সাড়াদানের অর্থই ছিলো তলোয়ার গর্দানের ওপর আপতিত করে নেয়া। সত্যের পথে চলার জন্যে তাঁর ওপর যে ধরনের নির্যাতন চালানো হয়েছিলো তা পড়লে শরীরের লোম খাড়া হয়ে যায়। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ছিলো তাঁর গভীর ভালোবাসা। তাঁর জন্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করার প্রশ্নে সবসময় প্রস্তুত থাকতেন। জীবন উৎসর্গের আবেগের কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন। বদরের যুদ্ধে আবু জেহেল নিহত হলে তিনি হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহুকে ডেকে বললেন ঃ "আল্লাহ্ তোমার মায়ের হত্যাকারীকে হত্যা করেছেন।"

জিহাদের প্রতি এত অনুরাগ ছিলো যে, তিনি সবসময় প্রস্তুত থাকতেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগের সব যুদ্ধেই তিনি শরীক হয়েছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহুর খেলাফতকালে মুরতাদ বা ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধে জীবন বাজী রাখার চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন। কতিপয় বর্ণনায় আছে যে, হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ

www.bjilibrary.com

আনহুর খেলাফতকালে তিনি সিরিয়া ও ইরানের কয়েকটি যুদ্ধেও অত্যন্ত বাহাদুরী দেখিয়েছিলেন।

তিনি আল্লাহভীতি এবং ইবাদাত প্রীতির এক নমুনা ছিলেন। শুধু হারামই নয়, সন্দেহজনক বস্তু থেকেও তিনি নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও এক সময় তাঁকে "তাইয়িবুল মুতাইয়িব" উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত আছে, "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একথা বলতে শুনেছি যে, আম্মারের শরীরের হাড্ডি পর্যন্ত ঈমানে ভরপুর।" হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন যে, আম্মারের আপাদমস্তক ঈমানে ভরপুর। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন মালিক বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে. বেহশত অবশ্যই চার ব্যক্তির জন্যে আগ্রহী। তারা হলেন ঃ "আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহু, আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু, সালমান রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং মিকদাদ রাদিয়াল্লাহ আনহু।"

পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা ছাড়াও হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহু সারারাত নামায এবং ওজিফা পাঠে মশগুল থাকতেন। কুরআনের ভাষ্যকার হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু বলেছেন, কুরআন শরীফের সূরা আয যুমারের ৯ নম্বর আয়াত–"যে ব্যক্তি রাতে মাটিতে কপাল লাগিয়ে এবং দাঁড়িয়ে ইবাদাত করে এবং পরকালের ভয় করে ও নিজের রবের রহমতের প্রত্যাশা করে।" হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহুর শানেই নাযিল হয়েছিলো।

অনন্যোপায় বা মাজুর অবস্থাতেও তিনি নামায কাযা করতেন না। একবার সফরে গোসল ওয়াজিব হয়ে গেলো। পানি পাওয়া গেলো না। এজন্যে সর্বাঙ্গে মাটি লাগিয়ে নামায পড়ে নিলেন। মদীনা ফিরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে এ ঘটনা পেশ করলেন। তিনি বললেন ঃ "এ অবস্থাতেও শুধু তাইয়াম্মুমই যথেষ্ট ছিলো।" সহীহ আল বুখারী ও মুসলিমে স্বয়ং হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহুর ভাষায় এ ঘটনাকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ "এক ব্যক্তি হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহ আনহুর খিদমতে উপস্থিত হয়ে মাসায়ালা জিজ্ঞেস করলেন যে, আমার গোসল ওয়াজিব হয়ে গেলো এবং পানি পেলাম না, তাহলে কি করবো।"

হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহু সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে বললেন, আপনার কি স্বরণ নেই যে, একবার আমি এবং আপনি সফরে ছিলাম। আমাদের দু'জনরেই গোসল ওয়াজিব হয়ে গেলো। এ অবস্থায় আপনি নামায পড়লেন না। আর আমি "মাটির ওপর লুটোপুটি

www.bjilibrary.com

খেলাম। কেননা আমার ধারণা ছিলো যে, জানাবাতের তাইয়াম্মুমও গোসলের মত সারা শরীরেই প্রযোজ্য। অতপর আমরা যখন সফর থেকে ফিরে এলাম তখন আমি একথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বললাম। তিনি বললেন, "মাটির ওপর লুটোপুটি খাওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিলো না। তোমাদের জন্যে এতটুকুনই যথেষ্ট ছিলো। এ বলে তিনি মাটির ওপর দু' হাত মারলেন এবং তাতে ফুঁ দিলেন। (যাতে ধুলো মাটি যা লেগেছিলো তা উড়ে যায়) অতপর তিনি দু' হাত নিজের চেহারা ও হাতে লাগিয়ে নিলেন।"

জুমআর দিন খুতবার আগে মিম্বরে বসে সাধারণত সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াত করতেন। খুতবা সংক্ষিপ্ত হলেও তা হতো সুন্দর ও স্বচ্ছ। একবার এক ব্যক্তি সংক্ষিপ্ত খুতবা প্রশ্নে অভিযোগ করলো। তিনি বললেন ঃ "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নামায দীর্ঘ করা এবং খুতবা সংক্ষিপ্ত করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।"

তিনি অত্যন্ত সাদাসিধে এবং অল্পে তুষ্ট মানুষ ছিলেন। জীবনভর কোনো বাড়ী বানাননি। হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন মাসউদ নিজের বাড়ী বানানোর পর তাঁকে দেখানোর জন্য একবার নিয়ে এলেন। বাড়ী দেখে তিনি বললেন—"কঠিন জিনিস বানিয়েছ এবং বিরাট আশা করেছ।"

হযরত ওমর ফারুকের শাসনামলে তিনি কুফার আমীর ছিলেন। কিন্তু প্রয়োজনীয় সব জিনিস নিজে বাজারে গিয়ে কিনতেন, বোঝা বাঁধতেন এবং নিজের পিঠে অথবা কাঁধে উঠিয়ে নিয়ে আসতেন। ঘরের অন্যান্য কাজও নিজের হাতে করতেন। কতিপয় বর্ণনায় আছে যে, তিনি অক্ষম ব্যক্তিদের বাজারও করতেন এবং নিজে তাদের বাড়ী পৌছে দিতেন। পোশাকও অত্যন্ত সাদাসিধে ছিলো। ছিঁড়ে গেলে তাতে পট্টি লাগাতেন। এতে লজ্জা অনুভব করতেন না।

তিনি অত্যন্ত ধৈর্য ও সহনশীল ছিলেন। একবার একজন কানকাটা বলে তাঁকে রাগান্বিত করতে চাইলো। তিনি অত্যন্ত নরমভাবে বললেন ঃ "হে ভালো কানওয়ালা ! আমাকে কেন লজ্জা দিচ্ছো। আমার এ কানতো আল্লাহর পথে কাটা গেছে।"

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তিনি অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তাঁর প্রসঙ্গে কারো মুখ দিয়ে কটু কথা শুনতে পারতেন না। যা সত্য এবং হক মনে করতেন তা তিনি নির্দ্বিধায় বলে দিতেন। এ ব্যাপারে তিনি কোনো ভয়-ভীতির পরোয়া করতেন না। প্রত্যেক কাজেই আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়ত করতেন। বস্তুগত লাভের জন্যে তিনি কোনো কাজ করতেন না।

---

www.bjilibrary.com

সাইয়েদেনা হযরত আবু ওয়াহাব শুজা রাদিয়াল্লাহ আনহু

সাইয়েদেনা হযরত আবু ওয়াহাব শুজা রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়াহাব ছিলেন প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি জীবন উৎসর্গকারী সাহাবীদের অন্যতম। তিনি এমন বিপদ সংকুল যুগে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন যখন আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি সাড়াদান মুশরিকদের কাছে ছিলো ঘোরতর অপরাধ। বুন আসাদ বিন খুজাইমাহ গোত্রের সাথে তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন। জাহেলী যুগে তাঁর বংশ বনু আবদি শামসের মিত্র ছিলো। তাঁর বংশ তালিকা নিম্নরূপ ঃ

শুজা রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়াহাব বিন রবিয়াহ বিন আসাদ বিন সুহাইব বিন মালিক বিন কাসির (কবির) বিন গানাম বিন দাওদান আসাদ বিন খুযাইমাহ।

তাঁর বংশ এবং রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশ খুযাইমাহর সাথে এসে মিশে গেছে। নবুয়াত প্রাপ্তির তিন বছর পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কাবাসীদেরকে প্রকাশ্যে তাওহীদের দাওয়াত প্রদান শুরু করেন। এ সময় হযরত শুজা রাদিয়াল্লাহ আনহুর সবেমাত্র গোঁফ গজাতে শুরু হয়েছে। খেলাধুলা ও আনন্দ ফূর্তি করে বেড়ানোর সময় ছিলো এটা। কিন্তু আল্লাহ তাঁকে সৌভাগ্যবান করেছিলেন। যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে সে মুশরিকদের যুলুম-নির্যাতনের শিকার হয়। একথা জেনেও তাওহীদের বাণী কানে আসতেই নিঃসংকোচ ও নির্দ্বিধায় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। মক্কার কাফেররা একথা পরিজ্ঞাত হতেই তাঁর ওপর সীমাহীন নির্যাতন শুরু করলো। যখন এ নির্যাতন চরম পর্যায়ে পৌছলো তখন তিনি নবুয়াত প্রাপ্তির ৬ বছর পর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইঙ্গিতে হাবশার মুহাজিরদের দ্বিতীয় কাফেলায় শরীক হয়ে হাবশা গমন করেন।

হাফিজ ইবনে আবদুল বার রাদিয়াল্লাহ আনহু "আল ইসতিয়াব" গ্রন্থে লিখেছেন ঃ "কিছুদিন পর এক গুযব রটে গেলো। মক্কাবাসীরা মুসলমান হয়ে গেছে এ ছিলো গুযবের সারমর্ম। একথা শুনে হযরত শুজা রাদিয়াল্লাহ আনহু হাবশা থেকে মক্কা ফিরে এলেন। মক্কা পৌছে জানতে পারলেন যে, গুজবটি মিথ্যা। মক্কার কুরাইশদের কোনো পরিবর্তন হয়নি। চরম ধৈর্য ধরে তিনি চুপ মেরে গেলেন এবং মুশরিকদের নির্যাতন সইতে লাগলেন। কিছুদিন পর নবী

www.bjilibrary.com

করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবা রাদিয়াল্লাহ আনহুমদেরকে মদীনায় হিজরতের অনুমতি দিলেন। এ সময় তিনি তাঁর আপন ভাই উকবাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়াহাবের সাথে মক্কাকে বিদায় জানিয়ে মদীনা চলে গেলেন।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা থেকে হিযরত করে মদীনা তাশরীফ আনলেন। এ সময় খাজরাজ গোত্রের এক সম্মানিত ব্যক্তি আওস রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন খাওলী তাঁর খিদমতে উপস্থিত হয়ে ইসলামের পেয়ালা পান করে মুসলমান হলেন। এ ব্যক্তি অশ্বারোহন, লিখন এবং সাঁতারে পূর্ণ নিপুণতা রাখতেন। এ ভিত্তিতে তাঁকে "কামেল" বলা হতো। হিজরতের পাঁচ মাস পর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক কায়েম করলেন। এ সম্পর্কের ফলে হযরত আওস রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন খাওলী হযরত শুজা রাদিয়াল্লাহ আনহুর দীনি ভাই হলেন। কেননা উভয়ের প্রকৃতিতে বড় ধরনের মিল ছিলো। হযরত আওস রাদিয়াল্লাহ আনহু যেমন উঁচু শ্রেণীর অশ্বারোহী এবং তীরন্দাজ ছিলেন তেমনি হযরত শুজা রাদিয়াল্লাহ আনহুও উঁচুমানের অশ্বারোহী ও শত্রুর ব্যূহ ভেদকারী ছিলেন।

যুদ্ধসমূহ শুরু হলো। হযরত শুজা রাদিয়াল্লাহ আনহুর তলোয়ার সর্বপ্রথম বদরের যুদ্ধে চমকে উঠলো। এভাবেই তিনি ইসলামে অগ্রগামী দু' হিযরতকারী এবং বদরী সাহাবী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছিলেন। বদরের যুদ্ধের পর তিনি ওহোদ, খন্দক এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে সংঘটিত অন্যান্য বিশেষ বিশেষ যুদ্ধে বাহাদুরীর চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন।

অষ্টম হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খবর পেলেন যে, বনু হাওয়াজেন গোত্রের শাখা বনু আমেরের লোকজন মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। মদীনার পাঁচ মনযিল দূরে বনু আমেরের লোকজন মক্কা এবং বসরার সড়কে নজদের সাইয়ি নামক স্থানে বসবাস করতো। এখানকার এ নামের একটি পুকুর অথবা কূপ তাদের দখলে ছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত শুজা রাদিয়াল্লাহ আনহুকে বনু আমেরকে উৎখাতের জন্য প্রেরণ করলেন। তাঁর সাথে ছিলেন আরো ২৪জন মুজাহিদ। হযরত শুজা রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং তাঁর সঙ্গীরা মদীনা থেকে সাইয়ি পর্যন্ত অত্যন্ত সংগোপনে এগুলেন। তাঁরা দিনে পাহাড়, বালির টিলা অথবা বৃক্ষের আড়ালে লুকিয়ে থাকতেন এবং রাতে বিদ্যুৎ বেগে সফর করতেন। এভাবে তারা হঠাৎ করে বনু আমেরের মাথার ওপর গিয়ে উপস্থিত হলো। তারা নিজেদের মাথার ওপর এভাবে মুসলমানদেরকে দেখে

হকচকিয়ে গেলো এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় সবকিছু ছেড়ে ছুড়ে পালিয়ে বাঁচলো। গনিমাতের মালের মধ্যে মুসলমানরা অন্যান্য মাল ছাড়া অসংখ্য উট এবং ভেড়া বকরী পেলেন। এসব মাল নিয়ে তাঁরা মদীনা ফিরে গেলেন। ইবনে সায়াদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বর্ণনা করেছেন, গনিমাতের মাল বন্টন করা হলো। প্রত্যেক মুজাহিদ ১৫টি করে উট নিজের অংশে পেলেন। কোনো কোনো মুজাহিদ নিজের উটের পরিবর্তে ভেড়া বকরী নিলেন। বিনিময় হার হিসেবে এক উটের পরিবর্তে বিশটি ভেড়া এবং বকরী ধার্য করা হয়েছিলো।

হুদায়বিয়ার সন্ধির (৬ষ্ঠ হিজরী) পর বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চারদিকের শাসক ও নেতৃবৃন্দের নামে ইসলামের দাওয়াতের পত্রাবলী প্রেরণ করলেন। এ সময় তিনি হযরত শুজাকে হারেস বিন আবি সামার গাসসানী এবং জাবালা বিন আইহামের কাছে দূত হিসেবে পাঠালেন।

হাফিজ ইবনে কাইয়েম 'যাদুল মায়াদ" গ্রন্থে লিখেছেন, হারেস বিন আবি সামার গাসসানী দামেশকের নিকটবর্তী গুতার রইস ছিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে যে পত্র হযরত শুজা রাদিয়াল্লাহ আনহুর মাধ্যমে প্রেরণ করেছিলেন তার প্রথম স্তবকে লিখা ছিলো ঃ আল্লাহর নামে যিনি অত্যন্ত দয়ালু এবং মেহেরবান, মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তরফ থেকে হারেস বিন আবিসামারের নামে—তার ওপর 'সালাম'। যে হেদায়াতের আনুগত্য করে—ঈমান আনে এবং তার সত্যতা স্বীকার করে। অবশ্যই আমি তোমাকে সে আল্লাহর ওপর ঈমান আনার দাওয়াত দিচ্ছি যিনি এক এবং তাঁর কোনো অংশীদার নেই। এ অবস্থায় তোমার সালতানাত কায়েম থাকবে (যদি তুমি এক খোদার ওপর ঈমান আনো)।

আল্লামা ইবনে সায়াদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বর্ণনা করেছেন, হারেস বিন আবি সামারের ওপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ পত্রের কোনো প্রভাব পড়লো না এবং নিজের ধর্মের ওপর সে বলবৎ রইলো। কিন্তু তার মন্ত্রী এ পত্রে অত্যন্ত প্রভাবান্বিত হলো। মাররী নামক সজ্জন প্রকৃতির এ মন্ত্রী মনে মনে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ঈমান আনলেন। তবে এ হকের ঘোষণা দানের মতো পরিবেশ অনুকূলে ছিলো না। তিনি তাখলিয়ায় হযরত শুজার রাদিয়াল্লাহ আনহু সাথে সাক্ষাত করলেন। তাঁর সামনে ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করলেন এবং আবেদন জানালেন যে, তিনি যেন তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে পৌঁছে দেন। তিনি এ আবেদনও জানালেন যে, তিনি নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার সাথে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং ইনশাআল্লাহ মৃত্যু পর্যন্ত ইসলামের ওপর কায়েম থাকবেন।

www.bjilibrary.com

জাবালা বিন আইহাম আরবের উত্তরে তাবুকের উপকণ্ঠ এলাকার শাসক ছিলেন। সে সময় সে ইসলাম কবুল করেননি। কিন্তু কয়েক বছর পর হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে হন্তদন্ত হয়ে মদীনা গমন করেন এবং হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। কিছুদিন পর আমীরুল মু'মিনীন রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে হজ্জের জন্য মক্কা যান। তাওয়াফের সময় তার পরিধেয় কাপড়ের নীচের এক কোণার ওপর মাটিতে ঘসা অবস্থায় বনু ফাজারাহর এক গরীব মুসলমানের পা পড়ে যায়। জাবালা তার মুখের ওপরে এত জোরে এক থাপ্পড় মারলো যে, তার নাক ফেটে রক্ত পড়তে লাগলো। গরীব মুসলমানটি খলিফা সমীপে অভিযোগ উত্থাপন করলো। খলিফা জাবালার কাছে এর জবাব চাইলেন। সে অত্যন্ত অহংকারের সাথে বললো এটাতো শুধুমাত্র থাপ্পড় ছিলো। এ ঘটনা যদি কাবার পাশে না ঘটতো, তাহলে সে অধমের গর্দান উড়িয়ে দিতাম। বাদশাহর কাপড়ের ওপর পা রাখার সাহস তার কোত্থেকে হলো। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ইসলাম তোমাকে এবং ঐ গরীব মুসলমানকে সমান করে দিয়েছে। এখন শুধু তাকওয়া বা খোদাভীতিই মর্যাদার মাপকাঠি। তুমি হয় সেই গরীব মুসলমানকে রাজী করিয়ে নিবে অথবা কিসাস দিবে। জাবালা বললো, আগামীকাল পর্যন্ত আমাকে সময় দিন। আমীরুল মু'মিনীন তার এ আবেদন মেনে নিলেন। সে রাতের মধ্যে নিজের সঙ্গী-সাথীসহ মক্কা থেকে পালিয়ে গেলো এবং রোমে গিয়ে হিরাক্লিয়াসের আশ্রয় নিলো। এভাবে মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী অবস্থাতেই তার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটেছিলো।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তিরোধানের পর হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু খলিফা নির্বাচিত হলেন। এ সময় সমগ্র আরবে স্বধর্ম ত্যাগের এক হিড়িক পড়ে গেলো। সিদ্দিকে আকবার রাদিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত ধৈর্য, স্থৈর্য এবং দৃঢ়তার সাথে এ ফেতনার মুকাবিলা করলেন। তিনি বিভিন্ন দিকে ১১টি বাহিনী প্রেরণ করে কয়েক মাসের মধ্যে সব মুরতাদকে উৎখাত করলেন। এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে ঘোরতর এবং কঠিন যুদ্ধ হয়েছিলো মুসাইলামা কাজ্জাবের বিরুদ্ধে ইয়ামামার ময়দানে। মুসাইলামাকে উৎখাতের জন্য হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নিযুক্ত করা হয়েছিলো। হযরত শুজা রাদিয়াল্লাহু আনহুও তাঁর বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন এবং ইয়ামামার ময়দানে অত্যন্ত বাহাদুরীর সাথে লড়াই করে শহীদ হয়ে যান। সে সময় তার বয়স ছিলো ৪০ বছরের কিছু বেশী।

www.bjilibrary.com

হযরত আকিল রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন বাকির লাইসী

নবুয়াত প্রাপ্তির আড়াই বছর পর বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরকামের গৃহকে তাবলিগ ও হেদায়াতের কেন্দ্র বানালেন। এ কেন্দ্র বানানোর পর সর্বপ্রথম বনু লাইস গোত্রের ৪জন যুবক তাঁর খেদমতে সমুপস্থিত হয়ে বিনীতভাবে আরজ করলো ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার দাওয়াতের ওপর ঈমান এনেছি। আমাদেরকে আপনার দলে অন্তর্ভুক্ত করে নিন। এ চারজন সহোদর ছিলো এবং কুরাইশের বনু আদী বিন কা'ব বিন লুব্বী গোত্রের মিত্র ছিলো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলাম গ্রহণে তাদের এ অগ্রগামী ভূমিকাকে অত্যন্ত সুনজরে দেখলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন তোমাদের নাম কি। জবাবে একজন বললো তার নাম খালেদ। দ্বিতীয়জন বললো তার নাম আমের। তৃতীয়জন নিজেকে আয়াস হিসেবে পরিচয় দিলো। চতুর্থজন বললো, তার নাম গাফিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চতুর্থজনকে সম্বোধন করে বললেন, 'গাফিল' নয়, আজ থেকে তোমার নাম আকিল।"

তিনি বললেন, "ঠিক আছে তাই।"

সেদিন থেকেই মানুষ গাফিলকে আকিল বলতে লাগলো। আর এ নামেই তিনি ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। হযরত আকিল রাদিয়াল্লাহু আনহুর বংশ তালিকা নিম্নরূপ ঃ আকিল রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন বাকির (অন্যমতে আবি বকির) বিন আবদি ইয়া লাইল বিন নাশিব বিন গাইরাহ বিন সায়াদ বিন লাইস বিন বকির বিন আবদি মানাত বিন কিনানাহ।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদেরকে মদীনায় হিজরত করার অনুমতি দিলেন। বছরের পর বছর ধরে মক্কার মুশরিকদের যুলুম-নির্যাতনের শিকার হকপন্থীরা আস্তে আস্তে কাফেরদের নজর এড়িয়ে মদীনা পৌঁছতে লাগলেন। কেননা হকপন্থীরা কাফেরদের যুলুম-নির্যাতনের পাঞ্জা থেকে বের হয়ে বাইরে চলে যাক এটা তারা চাইতো না। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু বলেছেন, মক্কা হতে হিজরত করা অত্যন্ত কঠিন কাজ ছিলো। এজন্যে সকলেই চুপিসারে হিজরত করেছিলেন। কিন্তু হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু যেদিন হিজরতের ইচ্ছা করলেন সেদিন তিনি প্রথমে সকলের সামনে বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করলেন। অতপর দু' রাকাআত নামায পড়লেন এবং এরপর কুরাইশদের সামনে গিয়ে ঘোষণা করলেন ঃ

www.bjilibrary.com

"হতভাগারা ! যদি কারোর মাকে নিঃসন্তান করার এবং নিজের সন্তানকে ইয়াতীম করার এবং নিজের স্ত্রীকে বিধবা করার ইচ্ছা থাকে তাহলে সে যেন আমার পিছু নেয়। আমি এখান থেকে মদীনা যাচ্ছি।"

মুশরিকরা হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুর ঘোষণা শুনলো। কিন্তু কারোরই তার পিছু ধাওয়া করার সাহস হলো না। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে অন্য বিশজন তাওহীদ পন্থীও মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনা গেলেন। তাদের মধ্যে হযরত আকিল রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং তার তিন ভাইও ছিলেন। কতিপয় ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, এ চার সহোদর পরিবার-পরিজনসহ এক সাথে হিজরত করেন এবং মক্কায় তাদের ঘরের (অথবা ঘরসমূহ) দরযা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেলো।

মদীনা পৌঁছে চার ভাই হযরত রিফায়া রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবদুল মানযার আনসারীর মেহমান হলেন। হযরত আকিল হযরত মুজাফ্ফর বিন যিয়াদের দীনি ভাই হলেন।

হিজরতের পর হক এবং বাতিলের প্রথম যুদ্ধ (১৭ই রমযান, ২ হিজরী) বদরের ময়দানে সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে হযরত আকিল রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং তাঁর তিন ভাই অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অংশ নেন। হযরত আকিল রাদিয়াল্লাহ আনহু তাদের মধ্যে সৌভাগ্যবান ছিলেন। তিনি দুনিয়ার সবকিছু ভুলে যুদ্ধে প্রচণ্ড বাহাদুরী প্রদর্শন করতে থাকেন। এ সময় মালিক বিন যহীর নামক এক মুশরিক তাক করে তার ওপর বর্শা নিক্ষেপ করলে অথবা তলোয়ার দিয়ে পূর্ণ শক্তিসহ আঘাত করলে তিনি শহীদ হয়ে যান। সাবিকুনাল আওয়ালুনের অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম অগ্রগামী দলের এবং প্রথম মুহাজিরদের পবিত্র দলের তিনিই প্রথম সদস্য ছিলেন। তিনি বদরের যুদ্ধের শহীদদের দলভুক্ত হয়ে এত উঁচু মর্যাদার অধিকারী হয়ে গেলেন যে, অন্যান্য সাহাবা তার প্রতি ঈর্ষা করতেন।

হযরত আকিল রাদিয়াল্লাহ আনহুর ভাই হযরত খালেদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন বকির বদরের পর ওহোদের যুদ্ধেও বাহাদুরী প্রদর্শন করেন এবং রাজির অভিযানে শাহাদাত বরণ করেন। হযরত আমের রাদিয়াল্লাহ আনহু বদরের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে অন্যান্য সকল যুদ্ধে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথী ছিলেন এবং হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহুর খেলাফতকালে ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদাতের পিয়ালা পান করেন।

www.bjilibrary.com

হযরত আয়াস রাদিয়াল্লাহ আনহুও রাসূলের যুগে সকল যুদ্ধে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথী হওয়ার গৌরব লাভ করেছিলেন।

ইবনে আসির "উসুদুল গাব্বা" গ্রন্থে লিখেছেন, তিনি ৩৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

---

www.bjilibrary.com

হযরত ওয়াকিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন আবদুল্লাহ ইয়ারবুয়ীত তামিমী

হযরত ওয়াকিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন আবদুল্লাহ অত্যন্ত উঁচু মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহুমদের দলভুক্ত ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়াত প্রাপ্তির প্রাথমিক যুগে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ইবনে সায়াদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনা মতে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দারে আরকাম অর্থাৎ আরকামের গৃহে তখনো আশ্রয় নেননি। এ সময়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। এ বর্ণনা থেকে জানা গেলো যে, নবুয়াত প্রাপ্তির তিরিশ মাসের মধ্যেই হযরত ওয়াকিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ঈমান এনেছিলেন। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুয়াত প্রাপ্তির আড়াই বছর পর আরকামের গৃহে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

আরবের মশহুর কবিলা বা গোত্র বনু তামিমের সাথে হযরত ওয়াকিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর সম্পর্ক ছিলো। ইতিহাস বেত্তারা পরিষ্কার করে বলেননি যে, হযরত ওয়াকিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু কখন থেকে মক্কায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। কেননা মক্কা বনু তামিম গোত্রের দেশ ছিলো না। হতে পারে হযরত ওয়াকিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর পিতৃ পুরুষদের কোনো ব্যক্তি মক্কায় এসে বসবাস শুরু করেন এবং তিনি সেখানে লালিত পালিত হন। কিছু বর্ণনায় জানা যায় যে, হযরত ওয়াকিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুর পিতা খাত্তাব নিজের মিত্র এবং পালক পুত্র বানিয়ে রেখেছিলেন। সম্ভবত সে কুরাইশের শাখা বনু আদির মিত্র ছিলো।

তাঁর বংশ তালিকা নিম্নরূপ ঃ

ওয়াকিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন আবদুল্লাহ বিন আবদি মান্নাফ বিন উরিন বিন ছায়ালাবা বিন ইয়ারবু বিন হানজালাহ বিন মালিক বিন যায়েদ মানাত বিন তামিম। নিজের গোত্রের যে শাখার সাথে হযরত ওয়াকিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর সম্পর্ক ছিলো তাকে ইয়ারবুয়ী এবং হানজালীও বলা হয়ে থাকে।

অন্যান্য মুসলমানদের মত হযরত ওয়াকিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুও কয়েক বছর পর্যন্ত কুরাইশ মুশরিকদের যুলুম-নির্যাতনের শিকার হন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে মদীনায় হিজরতের অনুমতি দিলেন। এ সময় অধিকাংশ সাহাবী সংগোপনে মদীনায় হিজরত করে চলে গেলেন। কিন্তু হযরত ওয়াকিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন আবদুল্লাহ হযরত ওমর

www.bjilibrary.com

ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে প্রকাশ্যে হিজরত করেন। মদীনা পৌছে তিনি হযরত রাফায়া রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবদুল মানযার আনসারীর গৃহে উঠলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদীনায় শুভাগমন ঘটলো। কয়েক মাস পর মুহাজির এবং আনসারদের মধ্যে তিনি ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করলেন। হযরত ওয়াকিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবদুল্লাহকে হযরত বাশার বিন বারায়া রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন মারুর আনসারীর দীনি ভাই বানিয়ে দিলেন।

দ্বিতীয় হিজরীর জমাদিউস সানীতে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন জাহাশকে আট অথবা ১২জন সাহাবী সহ কুরাইশদের তৎপরতা পর্যবেক্ষণের জন্য নিয়োগ করলেন। হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন জাহাশের অধীন হযরত সায়াদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবি ওয়াককাস, হযরত উতবাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন গাজওয়ান, হযরত উক্কাছা রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন মুহসিন এবং হযরত ওয়াকিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবদুল্লাহর মতো অত্যন্ত মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবী ছিলেন। তাঁদের রওয়ানার সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি পত্র লিখিয়ে হযরত আবদুল্লাহ বিন জাহাশকে দিলেন এবং নির্দেশ দিলেন যে, দু'দিন সফরের পর পত্রটি খুলে পড়তে হবে ও পত্রের নির্দেশ মত কাজ করতে হবে। হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ মুতাবিক দু'দিন সফরের পর পত্র খুলে পড়লেন। তাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ ফরমান লিপিবদ্ধ ছিলো ঃ

"এ চিঠি পাঠের পর তোমরা সোজা মক্কা এবং তায়েফের মধ্যবর্তী নাখলা নামক স্থানে গিয়ে অবস্থান নেবে। সেখান থেকে কুরাইশদের বাণিজ্যিক কাফেলার ওপর কড়া নজর রাখবে এবং কাউকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সাথে নেবে না। কেউ চাইলে তোমাদের সাথে যাবে এবং না চাইলে ফিরে আসবে।"

হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন জাহাশ নিজের সাথীদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পত্রের বিষয়বস্তু অবহিত করলেন এবং বললেন, আমার সাথে যাওয়া না যাওয়া তোমাদের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। কারো ওপর কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। সবাই ঐকমত্য হয়ে বললেন, হে আমীর ! আমরা আপনাকে ছেড়ে যাচ্ছিনে। এরপর তাঁরা বাতনে নাখলার দিকে রওয়ানা দিলেন। পথিমধ্যে হযরত সায়াদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবি ওক্কাস এবং হযরত উতবাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন গাজওয়ানের উট হারিয়ে গেলো। এ দু'জন হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন জাহাশের কাছ

www.bjilibrary.com

থেকে অনুমতি নিয়ে নিখোঁজ উটের সন্ধানে গেলেন এবং তাঁদের সাথীদের থেকে দূরে রয়ে গেলেন। হযরত আবদুল্লাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন জাহাশ নাখলাহ পৌঁছে কুরাইশদের বাণিজ্যিক কাফেলা পর্যবেক্ষণে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। হঠাৎ করে কুরাইশদের একটি কাফেলা মুসলমানদের অবস্থান স্থলের কাছে এসেই তাঁবু ফেললো। এ কাফেলা তায়েফ থেকে কাঁচা চামড়া, মুনাক্কা এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক পণ্য নিয়ে আসছিলো। কাফেলাটির সাথে ওসমান বিন আবদুল্লাহ্ মাখজুমী, নওফেল বিন আবদুল্লাহ্ মাখজুমী, হাকাম বিন কাইসান এবং আমর বিন হাজরামীর মত কুরাইশদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিও ছিলেন।

মুসলমানরা এ কাফেলার ব্যাপারে শলা-পরামর্শ করলেন। দিনটি ছিলো রযবের প্রথম তারিখ। কিন্তু মুসলমানদের ধারণা ছিলো যে দিনটি জমাদিউস সানীর শেষ দিন। তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন যে, আজই কাফেলার ওপর এক হাত নেয়া হবে। নচেৎ আগামীকাল রযবের মাস শুরু হয়ে যাবে। আর যুদ্ধ-বিগ্রহ হারাম ঘোষিত মাসের অন্যতম মাস হলো রযব। সুতরাং মুসলমানরা কাফেলার দিকে অগ্রসর হলেন। হযরত ওয়াকিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন আবদুল্লাহ্ বাহাদুরীর আবেগে আমর বিন হাজরামীকে তীরে নিশানা বানিয়ে শেষ করে দিলেন। আমর বিন হাজরামীই প্রথম মুশরিক যে একজন মুসলমানের [হযরত ওয়াকিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু] হাতে নিহত হয়েছিলো। হাকাম বিন কাইসান এবং ওসমান বিন আবদুল্লাহকে মুসলমানরা গ্রেফতার করলো। কাফেলার অন্যান্য সদস্য পালিয়ে গেলো। হযরত আবদুল্লাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন জাহাশ এবং তাঁর সাথীরা গনিমাতের মাল ও দু'জন কয়েদীসহ মদীনা পৌঁছলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমগ্র ঘটনা অবহিত হলেন। তিনি হযরত আবদুল্লাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন জাহাশকে নিষিদ্ধ মাসে রক্তারক্তির অনুমতি দেননি বলে বললেন। হযরত আবদুল্লাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন জাহাশ তারিখের ভুল ধারণার ওজর পেশ করলেন। পক্ষান্তরে কুরাইশরা এ ঘটনাকে রং চং দিয়ে প্রচার করলো। তারা বলতে লাগলো, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাথীরা নিষিদ্ধ মাসের মর্যাদা ক্ষুণ্ন, রক্তারক্তি, মাল লুট এবং আমাদের মানুষ আটক করেছে। মদীনার ইহুদী এবং অমুসলিমরাও বিদ্রূপ করে বলতে লাগলো যে, তোমরা হারাম মাসকে হালাল করে নিয়েছো। স্বয়ং মুসলমানরা পর্যন্ত এ অভিযানে অংশগ্রহণকারীদের কাজে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলো এবং বললো তোমরা ঠিক কাজ করোনি। এতে হযরত আবদুল্লাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন জাহাশ এবং অভিযানে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য সাহাবী অত্যন্ত মনোক্ষুণ্ন হলেন। আল্লাহর শাস্তির ভয়ে তাঁরা ভীত হয়ে পড়লেন। ইত্যবসরে আল্লাহ্ মেহেরবান এ আয়াত নাযিল করলেন ঃ

www.bjilibrary.com

"হে নবী ! নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ প্রশ্নে মানুষ আপনাকে প্রশ্ন করে। আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, এ মাসে যুদ্ধ করা বড় পাপ। কিন্তু আল্লাহর রাস্তা থেকে বিরত রাখা এবং মানুষদেরকে হারামে যেতে না দেয়া ও যারা এর যোগ্য (মুসলমান) তাদেরকে তা থেকে বের করে দেয়া আল্লাহর কাছে আরো বড় গোনাহ। এবং বিপর্যয় সৃষ্টি করা কতল থেকেও বেশী গোনাহের কাজ।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২১৭)

এ আয়াত মুসলমানদের জন্য এক ধরনের ক্ষমা ছিলো। যদিও তারা ভুল করেছিলেন। (দ্বিধা ও সন্দেহের ভিত্তিতে।) কিন্তু মুসলমানদেরকে মসজিদে হারামে প্রবেশে বাধাদান অথবা মসজিদে হারাম থেকে তাদেরকে বের করে দেয়া এমন ধরনের ফেতনা যা নিষিদ্ধ মাসে রক্তারক্তির চেয়েও বড় ধরনের পাপ। বস্তুত কাফেররা কোন্ মুখে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঠাট্টা-বিদ্রূপের ভাষা ব্যবহার করে থাকে।

আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার কারণে অভিযানে অংশগ্রহণকারী মুসলমানরা সান্ত্বনা পেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে গনিমাতের মাল খরচ করার অনুমতি দিলেন। ইবনে জারির তাবারির মতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও এ গনিমাতের মালের পঞ্চমাংশ গ্রহণ করেছিলেন। কয়েদীদের মধ্য থেকে হাকাম বিন কাইসান ইসলাম গ্রহণ করলেন। মক্কাবাসীরা ফিদিয়া প্রেরণ করে ওসমান বিন আবদুল্লাহকে মুক্ত করে নিলো। এক বর্ণনা মতে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমর বিন হাজরামীর উত্তরাধিকারদেরকে দিয়ত আদায় করে দিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় হিজরীর রমযান মাসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে হক ও বাতিলের মধ্যে প্রথম সংঘর্ষ ঘটে বদরের ময়দানে। এ যুদ্ধে হযরত ওয়াকিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুও অংশগ্রহণ করেন। তিনি সবসময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলেন। এভাবে তিনি অন্যতম মর্যাদাবান সাহাবী হওয়ার গৌরব লাভ করেন।

বদরের যুদ্ধের পর হযরত ওয়াকিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু ওহোদ, খন্দক, হুনাইন, তাবুক, মক্কা বিজয় প্রভৃতি যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তিরোধানের পর তাঁর তৎপরতা সম্পর্কে আর কিছু জানা যায়নি। আল্লামা ইবনে সায়াদের (র) বর্ণনা মতে তিনি হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুর শাসনামলে ইন্তেকাল করেন। তাঁর পারিবারিক জীবন সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা নীরব।

www.bjilibrary.com

আবু জানদাল রাদিয়াল্লাহ আনহু
বিন সোহায়েল রাদিয়াল্লাহ আনহু

হযরত জানদাল রাদিয়াল্লাহ আনহুর প্রকৃত নাম ছিলো আস। কিন্তু ইতিহাসে তিনি আবু জানদাল উপাধিতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তাঁর বংশ তালিকা হলো ঃ আবু জানদাল আস রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন সোহায়েল রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আমর বিন আবদি শামস বিন আবদি ওয়াদ বিন নাসার বিন মালিক বিন হাসাল বিন আমের বিন লুব্বী।

হযরত আবু জানদালের পিতা সোহায়েল রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আমর কুরাইশের অন্যতম সরদার ছিলেন এবং নিজের বাগ্মীতার জন্যে "খতিবে কুরাইশ" উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। তিনি সুন্দর স্বচ্ছ ও সাবলীল বক্তৃতা দিয়ে জনগণের মধ্যে আবেগ সৃষ্টিতে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁর এ শক্তিশালী বক্তৃতা মক্কা বিজয় পর্যন্ত ইসলামের বিরুদ্ধেই ব্যয়িত হয়েছিলো। মহান আল্লাহর এক অসাধারণ কুদরত যে সোহায়েল রাদিয়াল্লাহ আনহু যেমন ইসলাম বিরোধী ছিলেন, তেমনি তাঁর পুত্ররা ইসলামের প্রতি ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। তাঁর দু' কন্যা সাহলাহ রাদিয়াল্লাহ আনহা ও উম্মে কুলসুম রাদিয়াল্লাহ আনহা এবং দু' পুত্র আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু ও আবু জানদাল আস রাদিয়াল্লাহ আনহু অত্যন্ত সৌভাগ্যবান ছিলেন। তাঁরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়াত প্রাপ্তির প্রথম যুগেই হক দাওয়াত কবুল করেছিলেন। হযরত আবু জানদালের পিতা তাঁকে ইসলাম গ্রহণের অপরাধে প্রচণ্ড শাস্তি দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর পায়ে বেড়ি দিয়ে অন্তরীণ করে রেখেছিলেন। বছরের পর বছর তিনি কারারুদ্ধ অবস্থায় নির্যাতিত হন এমনকি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনা তাশরীফ নেন এবং বদর, ওহোদ ও পরিখার যুদ্ধেরও সমাপ্তি ঘটে। তবুও তাঁর ওপর নির্যাতন শেষ হয়নি।

৬ষ্ঠ হিজরীর জিলকাদ মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ১৪শ সাহাবী রাদিয়াল্লাহ আনহুম সমভিব্যাহারে ওমরাহ করার জন্যে মদীনা থেকে মক্কা রওয়ানা হলেন। একথা জানতে পেরে কুরাইশরা মুসলমানদেরকে মক্কা প্রবেশে বাধাদানের সিদ্ধান্ত নিলো। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা থেকে এক মনজিল আগে হুদাইবিয়া নামক স্থানে তাঁবু ফেললেন এবং কুরাইশদেরকে পয়গাম প্রেরণ করে বললেন যে, আমরা শুধু ওমরাহ আদায় করার জন্যে এসেছি। যুদ্ধ-বিগ্রহ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং

www.bjilibrary.com

কিছু দিনের জন্যে আমাদের সাথে সন্ধি করে নেয়াই কুরাইশদের উত্তম কাজ হবে। এর জবাবে কুরাইশরা ওরয়াহ বিন মাসউদ সাকাফীকে দূত হিসেবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আলোচনার জন্যে প্রেরণ করলেন। তিনি ফিরে গিয়ে বললেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথীরা তাঁর প্রতি এত গভীর অনুরক্ত যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্যে তাঁরা নির্দ্বিধায় নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিতে পারেন। এজন্যে মুসলমানদের সাথে সন্ধি করে নেয়াই উত্তম কাজ হবে। কিন্তু কুরাইশরা ওরওয়াহর কথা মানলো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুনরায় আরেকজন দূত প্রেরণ করলেন। কুরাইশরা তাঁর সাথেও দুর্ব্যবহার করলো এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে একটি বাহিনী পাঠালো। মুসলমানরা তাদেরকে আটক করলো। কিন্তু রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন এবং শেষ সুযোগদানের জন্যে নিজের দূত হিসেবে হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহুকে কুরাইশদের কাছে প্রেরণ করলেন। কুরাইশরা তাঁকে মক্কায় আটক করলো।

এদিকে মুসলমানদের মধ্যে রটে গেলো যে, হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহুকে শহীদ করে ফেলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহুর খুনের বদলা নেয়ার জন্যে নিজের সাথে আগত সকল সাহাবী রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছ থেকে জীবন উৎসর্গের বাইয়াত নিলেন। এ বাইয়াত ইতিহাসে 'বাইয়াতে রেদওয়ান' নামে পরিচিত। কেননা আল্লাহ তায়ালা বাইয়াতকারীদেরকে নিজের সন্তুষ্টির সুসংবাদ দিয়েছিলেন। পরে জানা গেলো যে, হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহুর শাহাদাতের খবর সঠিক ছিলো না। তবুও মুসলমানদের আবেগ উদ্দীপনার সংবাদ পেয়ে মক্কার মুশরিকদের সাহসে ভাটা পড়লো এবং মুসলমানদের সাথে সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে গেলো। তাদের তরফ থেকে হযরত আবু জানদাল রাদিয়াল্লাহ আনহুর পিতা সোহায়েল বিন আমর সন্ধির শর্তাবলী নির্ধারণের জন্যে হুদাইবিয়া এলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী কাররামুল্লাহ ওয়াজহাহুকে সোলেহ বা চুক্তিনামা লেখার নির্দেশ দিলেন। প্রথমে 'রাহমান' ও 'রাসূলুল্লাহ' শব্দাবলী নিয়ে কথা কাটাকাটি হলো। এ ব্যাপারে ফায়সালা হওয়ার পর প্রথম শর্ত হিসেবে লেখা হলো যে, মুসলমানরা এ বছর ওমরাহ করা ছাড়াই ফিরে যাবে। অবশ্য আগামী বছর তারা এ উদ্দেশ্যে আসতে পারবে।

এরপর সুহাইল রাদিয়াল্লাহ আনহু দ্বিতীয় শর্ত পেশ করলেন। এ শর্তে বলা হলো যে, মক্কার কোনো ব্যক্তি যদি পালিয়ে মুসলমানদের কাছে চলে যায়, আর

www.bjilibrary.com

সে যদি মুসলমানও হয়, তবুও তাকে কুরাইশদের কাছে ফেরত পাঠাতে হবে। পক্ষান্তরে কোনো মুসলমান যদি মক্কাবাসীদের কব্জায় আসে তাহলে কুরাইশরা তাকে ফেরত পাঠাবে না। মুসলমানদের কাছে এ শর্ত অত্যন্ত আশ্চর্যের মনে হলো। তাঁরা এক বাক্যে এ শর্তকে 'ইনসাফ বিরোধী' এবং 'অগ্রহণীয়' বলে ঘোষণা করলেন। কিন্তু সুহাইল পীড়াপীড়ি করছিলেন যে, এ শর্ত অবশ্যই লিখতে হবে। এ শর্ত নিয়ে বাদানুবাদ চলছিলো। ইত্যবসরে এক প্রাণ স্পর্শী ঘটনা ঘটে গেলো। হযরত আবু জানদাল রাদিয়াল্লাহ আনহু কোনো উপায়ে কারাগার থেকে বেরিয়ে পড়ি কি মরি অবস্থায় হুদাইবিয়া এসে পৌঁছলেন। তাঁর হাটু থেকে রক্ত নির্গত হচ্ছিলো। পায়ে বেড়ি লাগানোই ছিলো এবং তিনি ডেকে ডেকে মুসলমানদের কাছে এ ভাষায় ফরিয়াদ জানাচ্ছিলেন।

"হে মুসলমানরা ! দেখ, ইসলাম গ্রহণের অপরাধে আমার পিতা আমার এ অবস্থা করে ছেড়েছে। তোমরা কি আমাকে এ মুসিবত থেকে পরিত্রাণের ব্যবস্থা করবে না।" তাঁর এ অবস্থা দেখে মুসলমানদের মধ্যে ক্রন্দনের রোল পড়ে গেলো। কিন্তু সুহাইল এসব দেখে বলতে লাগলেন ঃ "হে মুহাম্মাদ ! আবু জানদালের প্রত্যার্পণের মাধ্যমেই এ সন্ধির বাস্তবায়ন শুরু হবে। শর্ত পূরণের এ প্রথম সুযোগ।"

হুজুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "ভাই, এ শর্ত তো এখনো লিখাই হয়নি। এজন্যে আবু জানদালের ওপর তা কি করে কার্যকর হতে পারে? সুহাইল চমকে উঠলো। তিনি বললেন, "যাই হোক, আবু জানদালকে আমাদের কাছে প্রত্যার্পণ না করা পর্যন্ত আমরা কোনো শর্তেই সন্ধিতে উপনীত হবো না।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবা রাদিয়াল্লাহ আনহুম তাঁকে বোঝানোর অনেক চেষ্টা করলেন। কিন্তু তিনি কোনোক্রমেই মানলেন না। অবশেষে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুহাইলের শর্ত কবুল করে নিলেন এবং বললেন ঃ "ঠিক আছে, আবু জানদালকে তুমি তোমার সাথে ফিরিয়ে নিয়ে যাও।"

তখন আবু জানদাল চীৎকার করে করে কাঁদতে লাগলেন এবং উচ্চস্বরে বললেন ঃ

"হে মুসলমানদের দল ! মুশরিকরা একজন মুসলমানদের ওপর যুলুম-নির্যাতনের পাহাড় আপতিত করতে পারে। একথা জেনেও তোমরা তাকে তাদের কাছে হস্তান্তর করছো ? আমার শরীরের দিকে একটু তাকিয়ে দেখ। তাদের অত্যাচারের কারণে আমার শরীরের বিভিন্ন স্থান থেকে রক্তের ধারা প্রবাহিত হচ্ছে।"

www.bjilibrary.com

তাঁর এ ফরিয়াদ শুনে হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু অত্যন্ত প্রভাবান্বিত হলেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ! আপনি কি সত্য পয়গম্বর নন ?" রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন ঃ "নিসন্দেহে আমি সত্য পয়গম্বর।"

হযরত ওমর জিজ্ঞেস করলেন ঃ "আমরা কি সত্যের ওপর এবং আমাদের শত্রুরা কি মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত নয় ?"

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন ঃ "নিসন্দেহে।" হযরত ওমর আরজ করলেন ঃ "তাহলে আমরা নতি স্বীকার করে সন্ধি করবো কেন।"

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ "আমি আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর নির্দেশ অমান্য করতে পারি না। তিনিই আমার সমর্থক এবং সাহায্যকারী।"

হযরত ওমর ফারুক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্তব্য শুনে চুপ মেরে গেলেন। অতপর হযরত আবু জানদাল রাদিয়াল্লাহ আনহু আবারো ফরিয়াদ করলেন ঃ "হে মুসলমানেরা ! তোমরা কি আমাকে এজন্যে কুরাইশদের কাছে ন্যস্ত করছো যাতে তারা আমাকে সত্য দ্বীন থেকে পেছনে ঠেলে দিতে পারে।"

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু জানদালকে সম্বোধন করে বললেন ঃ "আবু জানদাল। ধৈর্যধারণ করো। আমাদের কর্মপদ্ধতির ফল খুব শীঘ্রই প্রকাশিত হবে (তিনি এটা ইঙ্গিত বা ইশারা দিয়ে বললেন)। আল্লাহ তোমার এবং অন্যান্য মযলুম মুসলমানের জন্যে কোনো রাস্তা তৈরি করে দেবেন। মোটকথা, জিঞ্জিরাবদ্ধ অবস্থায় হযরত আবু জানদাল রাদিয়াল্লাহ আনহুকে সুহাইল রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে হস্তান্তর এবং সন্ধিনামায় দস্তখত হলো।

রহমতে আলম হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওমরাহ করা ছাড়াই সাহাবা রাদিয়াল্লাহ আনহুম সহ মদীনার দিকে রওয়ানা দিলেন। তখন আল্লাহর তরফ থেকে ইরশাদ হলো ঃ হে আল্লাহর রাসূল ! আমরা তোমাকে প্রকাশ্য বিজয় দিয়েছি)।

আল্লাহ পাকের এ ইরশাদে প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের ভবিষ্যত বিজয়-সমূহের ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। আল্লাহ যদি সেই মুহূর্তে এ আয়াত নাযিল না

www.bjilibrary.com

করতেন তাহলে অধিকাংশ সাহাবীই ধারণা করে নিয়েছিলেন যে, তাঁরা নতি স্বীকার করে সন্ধিতে সম্মত হয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুদাইবিয়া থেকে মদীনা ফিরে এলেন। এ সময় বনি সাকিফ গোত্রের একজন মযলুম মুসলমান হযরত আবু বাসির রাদিয়াল্লাহ আনহু কোনোক্রমে মক্কার কাফেরদের নির্যাতনের পাঞ্জা থেকে বের হয়ে মদীনা এসে উপস্থিত হলেন। মক্কার মুশরিকরা তাঁকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য দু'জনকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে প্রেরণ করলো। তিনি হুদাইবিয়ার সন্ধি অনুসারে হযরত আবু বাসির রাদিয়াল্লাহ আনহুকে তাদের কাছে প্রত্যার্পণ করলেন। পথিমধ্যে হযরত আবু বাসির রাদিয়াল্লাহ আনহু দু'জনের একজনকে হত্যা করলেন এবং অপরজন পালিয়ে মদীনা উপস্থিত হলো। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাজির হয়ে ঘটনা বর্ণনা করলো। ইত্যবসরে হযরত আবু বাসির রাদিয়াল্লাহ আনহুও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌঁছলেন এবং আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ! আল্লাহ আপনাকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। কেননা আপনি চুক্তির শর্ত পূরণ করেছেন। আল্লাহ পাক আমাকে মুশরিকদের নির্যাতনের থাবা থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন এটা ভিন্ন কথা।"

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবা রাদিয়াল্লাহ আনহুমদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ "এ ব্যক্তি যদি আরো কয়েকজন সাথী পায় তাহলে যুদ্ধের দাবানল প্রজ্জ্বলিত করতে পারে।"

হযরত আবু বাসির রাদিয়াল্লাহ আনহু বুঝে নিলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবশ্যই তাঁকে মক্কা ফেরত পাঠিয়ে দিবেন। তিনি চুপিসারে মদীনার উপকণ্ঠের দিকে চলে গেলেন এবং মক্কা থেকে সিরিয়া গমনকারী বাণিজ্যিক সড়কের কাছে একটি স্থানে অবস্থান শুরু করলেন।

কিছুদিন পর হযরত আবু জানদাল রাদিয়াল্লাহ আনহুও কোনোভাবে সুযোগ পেয়ে কারাগার থেকে পালিয়ে হযরত আবু বাসির রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে গিয়ে পৌঁছলেন। এভাবে আরো কতিপয় মযলুম মুসলমানও মক্কার কুরাইশদের নির্যাতনের থাবা থেকে বের হয়ে সেখানে এলেন। ধীরে ধীরে আবু বাসির রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে বেশ কিছু লোক একত্রিত হলেন। তাঁরা এখন কুরাইশদের বাণিজ্যিক কাফেলার ওপর অতর্কিতে হামলা শুরু করলো। এ হামলা ক্রমে বেড়েই যেতে লাগলো। পরিস্থিতি এমন দাঁড়ালো যে, কুরাইশদের পক্ষে কোনো বাণিজ্যিক কাফেলা প্রেরণই কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। এমনিভাবে

www.bjilibrary.com

তাদের জীবন জীবিকাই মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়লো। অবস্থা বেগতিক দেখে তারা সবাই একত্রে বসলো এবং এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে, মুসলমানদের প্রত্যার্পণ না করার শর্তের কারণে এসব ঘটছে। যতক্ষণ পর্যন্ত এ শর্ত বলবৎ থাকবে ততক্ষণ তাদের পাঞ্জা থেকে বেরিয়ে যাওয়া মুসলমান কুরাইশদের বাণিজ্য প্রশ্নে হুমকি হয়ে থাকবেন। অতএব, এ শর্ত বাতিল করাই উত্তম হবে। সুতরাং তারা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে একজন দূত প্রেরণ করে আবেদন জানালো যে, খোদার কসম ! উক্ত শর্ত বাতিল করে দিন এবং আবু বাসির রাদিয়াল্লাহ আনহু, আবু জানদাল রাদিয়াল্লাহ আনহু ও তাদের সাথীদেরকে আপনার কাছে ডেকে পাঠান। ভবিষ্যতে কোনো মুসলমান পালিয়ে গেলে সে স্বাধীন হয়ে যাবে। তাঁকে ফেরত পাঠানোর প্রশ্নে আপনার কোনো দায়-দায়িত্ব থাকবে না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশদের এ আবেদন মঞ্জুর করলেন এবং হযরত আবু বাসির রাদিয়াল্লাহ আনহুর দলকে একটি পত্র পাঠালেন। পত্রে তিনি আবু বাসির এবং আবু জানদালকে মদীনায় তাঁর কাছে চলে আসতে বললেন। অন্যান্যদেরকে স্ব স্ব গৃহে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। এ পবিত্র পত্র যখন হযরত আবু বাসির রাদিয়াল্লাহ আনহু পেলেন তখন তিনি মৃত্যু শয্যায় শায়িত ছিলেন। পত্র পড়তে পড়তে তিনি ইন্তেকাল করলেন। হযরত আবু জানদাল রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁর নামাযে জানাযা পড়ে সেখানেই দাফন করলেন এবং নিজে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ পালনার্থে মদীনা চলে এলেন। মদীনা আসার পর তিনি মক্কা বিজয়, হুনাইন, তায়েফ ও তাবুক প্রভৃতি সকল যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহযোদ্ধা হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।

হযরত আবু জানদাল রাদিয়াল্লাহ আনহু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তিরোধান পর্যন্ত মদীনাতেই অবস্থান করেছিলেন এবং হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহুর শাসনামল পর্যন্ত এখানেই কাটান। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুর শাসনামলে সিরিয়া গমনকারী মুজাহিদদের দলে যোগ দেন এবং রোমীয়দের বিরুদ্ধে বিভিন্ন যুদ্ধে বাহাদুরী প্রদর্শন করেন। ঐতিহাসিকরা বর্ণনা করেছেন যে, তিনি অব্যাহতভাবে ছ' বছর সিরিয়ার ময়দানে জিহাদে তৎপর ছিলেন। ১৮ হিজরীতে মহামারী আকারে প্লেগ দেখা দিলে অন্যান্য হাজার হাজার মুজাহিদদের মত হযরত আবু জানদাল রাদিয়াল্লাহু আনহুও তাতে আক্রান্ত হন এবং আপন গৃহ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে জিহাদের ময়দানে ওফাত পান।

www.bjilibrary.com

ইবনে জারির তাবারী হযরত আবু জানদাল রাদিয়াল্লাহ আনহুর সিরিয়া অবস্থানকালীন যুগের এক আশ্চর্য ধরনের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, একবার কতিপয় মুজাহিদদের তরফ থেকে শরাব পানের মত বিচ্যুতি ঘটে গেলো। হযরত আবু জানদাল রাদিয়াল্লাহ আনহুও তাঁদের মধ্যে ছিলেন। সিরিয়ার আমীর হযরত আবু ওবায়দাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল জাররাহ আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুর নির্দেশ মতো তাদের ওপর প্রকাশ্যে হদ বা দণ্ড কার্যকর করলেন (প্রত্যেককে ৮০ করে বেত্র দণ্ড প্রদান করা হলো)।

এসব মুজাহিদ নিজের বিচ্যুতি এবং তার জন্য প্রাপ্ত শাস্তিতে এত লজ্জিত হলেন যে, মুখ ঢেকে বসে পড়লেন এবং বাইরে বেরুনো ছেড়ে দিলেন। হযরত আবু জানদাল রাদিয়াল্লাহ আনহু অত্যন্ত অনুভূতিপ্রবণ ছিলেন। তাঁর চিন্তায় বেশী প্রভাব পড়লো। হযরত আবু ওবায়দাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুকে তার অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত করালেন এবং আবু জানদাল রাদিয়াল্লাহ আনহুর নামে একটি সান্ত্বনামূলক পত্র প্রেরণের আবেদন জানালেন। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত আবু জানদাল রাদিয়াল্লাহ আনহুর নামে এ চিঠি প্রেরণ করলেন ঃ

"ওমরের কাছ থেকে হযরত আবু জানদালের নামে—আল্লাহর সাথে যারা অন্যকে শরীক করে তাদের ভুল-ভ্রান্তি আল্লাহ কখনো মাফ করবেন না। এর চেয়ে কম ভুল-ভ্রান্তিকারীদেরকে আল্লাহ চাইলে মাফ করে দেবেন। অতএব, তুমি তাওবাহ করো। মাথা উঠাও। বাইরে বের হও এবং নিরাশ হয়ো না। মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাআলা বলেন, হে আমার বান্দাহ ! যারা নিজের নফসের সাথে বাড়াবাড়ি করেছে তারা যেন আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ না হয়। তিনি সকল পাপ মার্জনা করেন এবং অত্যন্ত দয়ালু ও মেহেরবান।"

এ বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, মানবীয় ভিত্তিতে যদি কোনো সাহাবীর ত্রুটি-বিচ্যুতিও হয়ে থাকে, তাহলেও তিনি স্বয়ং নিজের ওপর দণ্ডও কার্যকর করিয়ে নিতেন এবং প্রচণ্ড লজ্জা অনুভব করতেন। এজন্যে আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত আবু জানদাল রাদিয়াল্লাহ আনহুকে বিশেষভাবে চিঠি লিখে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন যে, আল্লাহ তাআলা শির্ক ছাড়া সকল গুণাহই মার্জনা করবেন। এজন্য তুমি পশ্চাৎগামিতা থেকে বিরত হও। এ পত্রে এও প্রমাণিত হয় যে, হযরত আবু জানদাল রাদিয়াল্লাহ আনহু মুসলমানদের মধ্যে অত্যন্ত মর্যাদার অধিকারী ছিলেন এবং হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে তাঁর অত্যন্ত মর্যাদা ছিলো।

www.bjilibrary.com

হাফেয ইবনে আবদুল বার (র) লিখেছেন, হযরত আবু জানদাল রাদিয়াল্লাহ আনহু কবিতা এবং কাব্যেও দখল রাখতেন এবং সুন্দর কবিতা লিখতেন। তিনি "আল ইসতিয়াব" গ্রন্থে হযরত আবু জানদালের রাদিয়াল্লাহ আনহু কিছু কবিতাও সংকলিত করেছেন।

------------।

www.bjilibrary.com

হযরত আবু বুরযাহ্ আসলামী রাদিয়াল্লাহ আনহু

হিজরী প্রথম শতাব্দীর ৬ষ্ঠ দশকের কথা। বসরার গভর্নর ওবায়েদুল্লাহ বিন যিয়াদের একবার হাওজ কাওসারের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোনো ব্যক্তি কি হাওজ কাওসার সম্পর্কে তাঁর মনে সৃষ্ট সন্দেহ দূর করতে পারে? জিজ্ঞাসিত ব্যক্তিরা তাঁকে বসরায় বসবাসরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অত্যন্ত বয়োঃবৃদ্ধ একজন সাহাবীর ঠিকানা দিলেন। ইবনে যিয়াদ তাঁকে ডেকে পাঠালেন। তিনি তাশরীফ আনলেন। তাঁকে দেখে তিনি ঠাট্টা করে বললেন ঃ

"এ কি তোমাদের সেই–মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।"

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবী ইবনে যিয়াদের কথা শুনলেন। তিনি মনে অত্যন্ত দুঃখ পেলেন। তিনি ক্রোধ মিশ্রিত কণ্ঠে বললেন ঃ

"এ ধরনের চিন্তাও করতে পারি না। আমি কখনো এ ধরনের লোকও দেখবো যে আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবী হওয়া সম্পর্কে লজ্জা দেবে।"

অতপর তিনি অগ্রসর হয়ে যিয়াদের সিংহাসনের সামনা সামনি বসে গেলেন। ইবনে যিয়াদ কথা পাল্টে বললেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সান্নিধ্য তো আপনার জন্যে কোনো দোষের নয়, বরং সৌভাগ্যের। এরপর তিনি তাঁকে হাওজ কাওসার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হাওজ কাওসার সম্পর্কে কিছু বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, একবার নয় দু'বার নয়, তিনবার নয়, চারবার নয়, বরং বারবার। যে ব্যক্তি হাওজ কাওসারকে অস্বীকার করবে আল্লাহ তাকে তার কাছেও ঘেঁষতে দেবেন না এবং তার পানিও পান করতে দেবেন না।" একথা বলে তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন।

এ সাহাবী যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সান্নিধ্যকে নিজের জীবনের প্রাপ্তি হিসেবে মনে করতেন এবং হক কথা বলতে শাসকেরও পরোয়া করতেন না।

সাইয়েদেনা হযরত আবু বুরযাহ'র নাম ছিলো নাজলা। আসলাম বিন আফসা গোত্রের সাথে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁর বংশ তালিকা নিম্নরূপ ঃ

www.bjilibrary.com

নাজলা রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবদুল্লাহ বিন হারেস বিন হাবাল বিন রবিয়া বিন ওয়ায়িল বিন আনাস বিন খোজায়মাহ বিন মালিক বিন সালামান বিন আসলাম বিন আফসা।

বনু আসলাম গোত্র মাররে জাহরান এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাস করতো। হযরত আবু বুরযাহ রাদিয়াল্লাহ আনহুর প্রাথমিক জীবনের ঘটনাবলী সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। তিনি কবে নাগাদ মক্কা এসেছিলেন তাও নির্দিষ্ট করা যায়নি। তবে আল্লামা ইবনে সায়াদ (র) সুস্পষ্টভাবে লিখেছেন যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়াত প্রাপ্তির প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং হিজরতের পর প্রায় সকল যুদ্ধেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে অংশ নিয়েছিলেন।

অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের সময় প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ক'জন ব্যক্তিকে হত্যা করা ওয়াজিব বলে নির্ধারণ করেছিলেন তাদের মধ্যে একজন ছিলো আবদুল্লাহ বিন খাতাল। এ লোকটি ইসলামের ঘোরতর শত্রু ছিলো। ইসলাম এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে তার শত্রুতা এত প্রকট ছিলো যে, সে নিজের দু'জন বাঁদীকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার সাহাবীদের গালাগাল সম্বলিত কবিতা মুখস্ত করিয়ে রেখেছিলো। তারা এ কবিতা গান আকারে বাদ্যযন্ত্র সমেত গাইত। মুসনাদে আবু দাউদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মক্কায় প্রবেশ করলেন, তখন আবদুল্লাহ বিন খাতাল কা'বা শরীফের গেলাফ ধরে রইলো। মনে করলো যে, এভাবেই সে নিরাপত্তা পাবে। কিন্তু তার অপরাধ ছিলো অত্যন্ত ভয়ংকর। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সে কোনোক্রমেই নিরাপত্তা পাওয়ার জন্য যোগ্য ছিলো না। সুতরাং তিনি হযরত আবু বুরযাহ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে খাতালের ভবলীলা সাঙ্গ করার নির্দেশ দিলেন। হযরত আবু বুরযাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু অগ্রসর হয়ে তাকে যমের ঘরে পাঠিয়ে দিলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে হযরত আবু বুরযাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু মদীনাতেই কাটিয়ে ছিলেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর শাসনামলেও তিনি সেখানেই অবস্থান করেন। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুর খিলাফতকালে বসরায় বসতিস্থাপন শুরু হয়। এ সময় তিনি সেখানে গিয়ে বসবাস শুরু করেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহুর মধ্যে বিরোধ শুরু হলে তিনি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুকে পুরোপুরি সমর্থন করেন এবং সিফফীনের যুদ্ধে সিরীয় সৈন্যদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে যুদ্ধ করেন। এরপর নাহারওয়ানের

www.bjilibrary.com

যুদ্ধে খারেজীদের বিরুদ্ধে বাহাদুরীর পরিচয় দেন। হাফিজ ইবনে হাজর (র) ইসাবাহ নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে, হযরত আবু বুরযাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু খুরাসানের বিজয়সমূহে অংশ নিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি পরিষ্কার করে বলেননি যে, হযরত আবু বুরযাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু কোনো সময়ে এবং খোরাসানের কোনো যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। ধারণা করা হয় যে, তিনি খোরাসানের সেসব অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন যা আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহুর যুগে প্রেরণ করা হয়েছিলো।

হযরত আবু বুরযাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু ৬৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তিনি মুগিরাহ নামক এক পুত্র রেখে যান।

নবুয়াতের প্রস্রবনে অবগাহন করার যথেষ্ট সুযোগ হয়েছিলো হযরত আবু বুরযাহ রাদিয়াল্লাহ আনহুর এজন্যে জ্ঞান ও ফযিলাতের দিক দিয়ে তিনি উঁচু মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তিনি ৬৪টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে ২৭টি ঐকমত্যের হাদীস। দু'টিতে ইমাম বুখারী এবং ৪টিতে ইমাম মুসলিম ভিন্নমত পোষণ করেন।

তাঁর অসংখ্য শিষ্যের মধ্যে আবু ওসমান নাহদী (র), আবু মিনহাল রিয়াহী (র), আরযাক বিন কায়েস (র), আবু তালুত (র), মুগিরাহ (র), আবুল আলিয়া রিয়াহী (র), কিনানাহ বিন নয়ীম (র), রাবেসী (র) এবং আবুস সাওয়ারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হযরত আবু বুরযাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু অত্যন্ত পবিত্র চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। ইসলামের প্রতি অগ্রগামিতা, জ্ঞান পিপাসা, জিহাদের প্রতি অনুরাগ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ভালোবাসা, বদান্যতা ও দানশীলতা এবং সাদাসিধে জীবনযাপন তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিলো। ইবনে সায়াদের (র) মতে সকাল-সন্ধ্যায় গরীব-মিসকীনদের আহার করানো তাঁর অভ্যাস ছিলো। হাসান বিন হাকিম (র) নিজের আম্মার জবানীতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবু বুরযাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু সারিদের (আরববাসীদের প্রিয় খাবার) এক পুরো বড় পাত্র প্রত্যেক দিন সকাল ও সন্ধ্যায় বিধবা, এতীম এবং মিসকীনদের খাওয়াতেন।

আল্লাহ পাক হযরত আবু বুরযাহ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে অনেক কিছু দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি নিরাসক্ত জীবনযাপন করতেন। জীবনে কোনো দিন তিনি আড়ম্বর পূর্ণ পোশাক পরিধান করেননি। শুধু মাত্র গেরুয়া রংয়ের দু'টি কাপড় পরতেন। ঘোড়ায় সওয়ার হওয়াও তিনি এড়িয়ে চলতেন। তাঁর সমকালীন এক সাহাবী হযরত আয়েজ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওমর ভালো

www.bjilibrary.com

কাপড়ও পরতেন এবং ঘোড়াতেও সওয়ার হতেন। একজন এ দু' বুযর্গ ব্যক্তির মধ্যে কলহ সৃষ্টির লক্ষ্যে হযরত আয়েজ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে বললো, আবু বুরযাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু তো আপনার বিরোধিতায় এক পায়ে খাড়া হয়ে রয়েছে। আপনি খাজ (এক ধরনের অত্যন্ত মূল্যবান কাপড়) ব্যবহার করেন এবং ঘোড়াতেও সওয়ার হন। কিন্তু আবু বুরযাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু এ দু' বস্তুই এড়িয়ে চলেন। হযরত আয়েজ রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন, আল্লাহ তাআলা আবু বুরযাহ রাদিয়াল্লাহ আনহুর ওপর স্বীয় রহমত নাযিল করুন। আজ আমাদের মধ্যে কে শত্রুতা সৃষ্টি করতে পারে ? সে ব্যক্তি হযরত আয়েজ রাদিয়াল্লাহ আনহুর জবাবে নিরাশ হয়ে হযরত আবু বুরযাহ রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে গেলো এবং তাকে বললো, দেখুন আয়েজ কেমন ধরনের ঠাটের সাথে জীবনযাপন করে। খাজের পোশাক পরিধান করে এবং ঘোড়াতেও সওয়ার হয়। হযরত আবু বুরযাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু জবাবে বললেন, আল্লাহ তাআলা আয়েজের ওপর রহম করুন। আমাদের মধ্যে তার মত মর্যাদার কে আছেন।"

হযরত আবু বুরযাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু নিসন্দেহে সিফফিনের যুদ্ধে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর পক্ষ নিয়েছিলেন। কিন্তু প্রকৃতিগতভাবে তিনি মুসলমানদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতে অংশগ্রহণ পসন্দ করতেন না। সুতরাং পরে তিনি মুসলমানদের পারস্পরিক বিরোধে কখনই অংশ নেননি।

www.bjilibrary.com

হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন সোহায়েল রাদিয়াল্লাহু আনহু

হযরত আবু সোহায়েল আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর পিতা ছিলেন কুরাইশদের মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। তিনি ছিলেন অসাধারণ বাগ্মী। তাঁকে কুরাইশদের খতিব উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিলো। তিনি এত শক্তিশালী বক্তা ছিলেন যে, বড় বড় সমাবেশে বক্তৃতাকালে মুহূর্তের মধ্যে পরিস্থিতির মোড় ঘুরিয়ে দিতেন। শুধু বক্তৃতাই নয়, তাঁর বিচক্ষণতা ও পরিস্থিতির উপলব্ধি কুরাইশদের কাছে স্বীকৃত ছিলো। এ খতিবে কুরাইশের নাম ছিলো সোহায়েল রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন আমর। প্রকৃতির বিস্ময়কর ব্যাপার হলো যে, সোহায়েল রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিচক্ষণতা, জ্ঞানবুদ্ধি ও বিশ্ব দ্রষ্টা হওয়া সত্ত্বেও মক্কা বিজয় পর্যন্ত কুফর ও শির্কের অন্ধ গলিতে হোচট খেয়েছেন। কিন্তু তাঁর সন্তানরা (ছেলে মেয়ে) এমন সৌভাগ্যবান ছিলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়াত প্রাপ্তির প্রথম যুগেই ঈমান এনে অগ্রগামী দলের সুমহান মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু সোহায়েল রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন আমরেরই সন্তান ছিলেন। তাঁর সম্পর্ক ছিলো আমের বিন লুব্বী গোত্রের সাথে। তাঁর বংশ তালিকা নিম্নরূপ ঃ

আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন সোহায়েল রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন আমর বিন আবদে শামস বিন আবদে ওয়াদ বিন নাজার বিন মালিক বিন হাসাল বিন আমের বিন লুব্বী। মাতার নাম ছিলো ফাখনাহ বিনতে আমের (বিন নওফেল বিন আবদে মান্নাফ বিন কুসাই)। এভাবে পিতা ও মাতা উভয়ের দিক থেকে তাঁর বংশ ধারা ওপরের দিকে গিয়ে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশের সাথে মিশে গেছে।

সত্যের দাওয়াতের প্রথম যুগেই হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণ করেন। এতে তাঁর পিতা ভয়ানক ক্রোধান্বিত হন। তাঁকে মারধোর করেন। একাকীত্বের অন্তরীণে রাখা হয়। কিন্তু তিনি হক থেকে বিন্দুমাত্রও টলেননি। এজন্যে তাঁর পিতা তাঁর অভিভাবকত্ব পরিত্যাগ করেন। এর ফলশ্রুতিতে মক্কার মুশরিকরাও ইসলাম গ্রহণের অভিযোগে তাঁর ওপর নির্যাতন চালাতে থাকে। অবশেষে নবুয়াত প্রাপ্তির ৬ষ্ঠ বছরে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইঙ্গিতে হাবশায় হিজরতকারী দ্বিতীয় দলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে হাবশায় গিয়ে উপস্থিত হন। ইবনে আসির রাদিয়াল্লাহু আনহুর

www.bjilibrary.com

বর্ণনা মতে কিছুদিন পর তিনি হাবশা থেকে মক্কা ফিরে আসেন। পিতা তখন তাঁর ওপর আরো বেশী নির্যাতন চালাতে থাকেন। তাঁর হাত পা বেঁধে এক প্রকোষ্ঠে অন্তরীণ করে রাখলেন এবং পরিষ্কার বলে দিলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীন পরিত্যাগ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত অন্তরীণ এবং ক্ষুৎ পিপাসার মুসিবত বরদাশত করতে থাকবে। হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বাধ্য হয়ে প্রকাশ্যত পিতার নির্দেশ মেনে নিলেন এবং মুক্তি পেলেন। কিন্তু অন্তরের দিক থেকে তিনি সাচ্চা ও পাক্কা মুসলমানই রয়ে গেলেন।

দ্বিতীয় হিজরীতে কুরাইশের মুশরিকরা বদরের যুদ্ধের জন্যে মক্কা থেকে রওয়ানা হলো। এ সময় তারা হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন সোহায়েল রাদিয়াল্লাহু আনহুকেও নিজেদের সৈন্য দলে অন্তর্ভুক্ত করে নিলো। যখন বদরের প্রান্তরে হক ও বাতিল পন্থীরা পরস্পরের মুকাবিলায় দণ্ডায়মান হলো তখন হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রকাশ্যে শির্কের পোশাক ছিন্ন করে তাওহীদবাদীদের পতাকা তলে গিয়ে দণ্ডায়মান হলেন। তা দেখে তাঁর পিতা অগ্নিশর্মা হয়ে দাঁত কাটতে লাগলেন। কিন্তু ততক্ষণে তীর ধনু থেকে বের হয়ে গেছে।

হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত বাহাদুরীর সাথে মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করলেন। এমনিভাবে তিনি নিজেকে বদরের যুদ্ধে সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত করার সৌভাগ্য অর্জন করলেন।

বদরের যুদ্ধের পর হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু ওহোদ, খন্দক, হুদাইবিয়া, মক্কা, বিজয় এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগের মশহুর যুদ্ধসমূহে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহগামী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। বাইয়াতে রেদওয়ানেও (৬ষ্ঠ হিজরী) তিনি শরীক ছিলেন এবং হুদাইবিয়ার সন্ধিপত্রেও সাক্ষী হিসেবে নিজের নাম দস্তখত করেন।

মক্কা বিজয়ের (৮ম হিজরী) সময় হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর পিতা সোহায়েল রাদিয়াল্লাহু আনহু ঘরের দরযা বন্ধ করে বসে গেলেন এবং হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলে পাঠালেন যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে তাঁর জীবন বাঁচিয়ে দাও। নচেত তাঁর জীবনের আশংকা রয়েছে। পিতার অসহায়ত্বে হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর অন্তরে দয়ার উদ্রেক হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ! আমার পিতাকে নিরাপত্তা দিন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রহমতের

www.bjilibrary.com

দরিয়া তখন তুঙ্গে। তিনি বললেন, তাঁকে নিরাপত্তা দেয়া হলো। নির্ভয়ে ঘর থেকে বের হয়ে তিনি ঘুরাফেরা করতে পারেন।"

"মুসতাদরাকে হাকিম" গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, সে সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদেরকে সোহায়েল রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে কঠোরতা অবলম্বন থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিলেন। আল্লাহর কসম ! তিনি একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি। এ ধরনের প্রজ্ঞা সম্পন্ন মানুষ ইসলাম থেকে দূরে থাকতে পারেন না। এভাবে নিজের ভাগ্যবান সন্তানের বদৌলতে সোহায়েল রাদিয়াল্লাহ আনহু নিরাপত্তা পেলেন এবং সাথে সাথেই তিনি ঈমান আনলেন। এরপর তাঁর সমগ্র জীবন অতীত কার্যাবলী সংশোধনেই কেটেছিলো।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তিরোধানের পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহুর শাসনামলে ইসলাম ত্যাগের ফেতনা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এ সময় হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত খালেদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে মুসায়লামা কাজ্জাবকে উৎখাতের জন্যে একটি বাহিনী প্রেরণ করলেন। এ বাহিনীতে হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন সোহায়েল রাদিয়াল্লাহ আনহুও ছিলেন। মুসলমান এবং মুসায়লামার মধ্যে ইয়ামামাহ নামক স্থানে ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হলো। হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু অত্যন্ত বাহাদুরীর সাথে যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাতের পেয়ালা পান করলেন। এ সময় তাঁর বয়স ছিলো ৩৮ বছর।

ইবনে সায়াদের (র) বর্ণনা মতে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁর পিতা হযরত সোহায়েল রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে শোক জ্ঞাপন করলেন। এ সময় তিনি বললেন, "আমি শুনেছি যে, শহীদ নিজের পরিবারের ৭০ ব্যক্তির জন্যে সুপারিশ করতে পারে। আমি আশা করি যে, আমার শহীদ সন্তান সর্বপ্রথম আল্লাহ পাকের দরবারে আমার জন্যে সুপারিশ করবে।"

---

www.bjilibrary.com

হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু

হযরত সুফিয়ান সাওরী (র) ইমাম শা'বী থেকে বর্ণনা করেছেন, একবার কুরাইশের চার যুবক হেরেম শরীফে একত্রিত হলো। তারা স্থির করলো তারা প্রত্যেকেই কা'বার দক্ষিণ স্তম্ভ ধরে আল্লাহর কাছে দোয়া করবে। দোয়ায় তারা নিজের জীবনের সবচেয়ে বড় সাধ পূরণের আকাংখা প্রকাশ করবে। সুতরাং একজন যুবক উঠে দাঁড়ালো এবং দোয়া করলো ঃ

"হে খোদা ! তুমিতো বিরাট। তোমার কাছে বড় জিনিসই চাওয়া হয়। এজন্য আমি তোমার আরশ, তোমার হেরেম, তোমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তোমার মর্যাদার মাধ্যম দিয়ে দোয়া করছি। তুমি আমাকে সেই সময় পর্যন্ত জীবিত রেখো, যতক্ষণ না সমগ্র হেজাজে আমার শাসন কায়েম হয়।"

এরপর দ্বিতীয় যুবক দক্ষিণ স্তম্ভ ধরে দোয়া করলো ঃ

"হে খোদা ! তুমি সৃষ্টিজগতের সকল কিছুর স্রষ্টা। সবশেষে প্রত্যেক বস্তুকে তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তোমার যে শক্তির অধীন সমস্ত বিশ্ব সেই শক্তির মাধ্যম দিয়ে আমি দোয়া করছি। আমাকে সেই সময় পর্যন্ত জীবিত রেখো, যতক্ষণ না আমি ইরাকের গভর্নর হই।"

অতপর তৃতীয় যুবক দোয়া করলো ঃ

"হে যমিন ও আসমানের মালিক ! আমি তোমার কাছে এমন জিনিস চাই, যা তোমার অনুগত বান্দাহরা তোমার নির্দেশে চেয়েছে। আমি তোমার বিরাট সত্তা, তোমার সৃষ্টি এবং হেরেমবাসীর হকের মাধ্যম দিয়ে দোয়া করছি, তুমি আমাকে দুনিয়া থেকে সে সময় পর্যন্ত উঠিয়ে নিও না, যতক্ষণ না পূর্ব ও পশ্চিমে আমার শাসন কায়েম হয় এবং যে ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে তার মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেই।"

এরপর চতুর্থ যুবক উঠে দাঁড়ালো এবং অত্যন্ত বিনয়ের সাথে এ দোয়া করলো ঃ

"হে আল্লাহ ! তুমি রাহমান এবং রাহীম। আমি তোমার সেই রহমতের মাধ্যম দিয়ে দোয়া করছি যা তোমার ক্রোধের ওপর বিজয়ী। আখিরাতে তুমি আমাকে লজ্জিত করো না এবং সেই জগতে তুমি আমাকে বেহেশত নসীব করো।"

www.bjilibrary.com

প্রথম যুবক ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু দ্বিতীয়জন ছিলেন, তার ভাই মুসয়াব বিন যোবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু তৃতীয় যুবক ছিলেন আবদুল মালিক বিন মারওয়ান। চতুর্থ যুবক যার জীবনের সবচেয়ে বেশী কাম্য ছিলো শুধুমাত্র পরকালীন কল্যাণ। তাঁর নাম হলো ফাকিহুল উম্মাহ হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু।

সাইয়েদেনা হযরত আবু আবদুর রহমান আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু উম্মাহর অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে পরিগণিত। তিনি সাধারণভাবে ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু নামে প্রসিদ্ধ। অর্থাৎ সেই ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুর পুত্র যার সম্পর্কে নবীকুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিরোমনি বলেছিলেন ঃ "আমার পরে যদি কেউ নবী হতো, তাহলে ওমর হতো। কিন্তু আমার পর আর কোনো নবী নেই।"

হযরত ইবনে ওমরের বংশ তালিকা হলো ঃ

আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন খাত্তাব বিন নুফায়েল বিন আবদুল উজ্জা বিন রাবাহ বিন কুরত বিন জারাহ বিন আদি বিন কাব বিন লুব্বী।

কা'ব বিন লুব্বীতে এসে তাঁর বংশ ধারা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশের সাথে মিলে যায়।

মাতার নাম ছিলো হযরত জয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহু বিনতে মাজউন। তিনি বনু জুমাহ গোত্রের ছিলেন এবং সাহাবিয়াহ হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা রাদিয়াল্লাহ আনহা বিনতে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সহোদরা ছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলামের ইতিহাসের চার প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্বের অন্যতম ছিলেন। অন্য তিনজন ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনুল আস এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন যোবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু। এ চারজন ছিলেন অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

বিশ্বস্ত বর্ণনা মতে, হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়াত প্রাপ্তির দু' বছর পর জন্মগ্রহণ করেন। নবুয়াত প্রাপ্তির ছ' বছর পর হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণ করেন। এ সময় হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বয়স ছিলো প্রায়

www.bjilibrary.com

পাঁচ বছর। পিতার ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে এমনি এমনি তিনি নিজেও ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে চলে এলেন এবং নির্ভেজাল ইসলামী পরিবেশেই লালিত-পালিত হলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়াত প্রাপ্তির ১৩ বছর পর হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু নিজের পরিবার-পরিজনসহ মদীনা হিজরত করলেন। হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু পিতার সাথে মদীনা পৌঁছলেন। এ সময় তার বয়স ছিলো ১১ বছর। যুদ্ধসমূহ শুরু হলো। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদরের যুদ্ধে রওয়ানা হলেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু জিহাদের আবেগে অস্থির হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী তিনি ১৫ বছর বয়সের কম বয়স্ক বালকদেরকে যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি দিতেন না। বস্তুত সে সময় হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর বয়স মাত্র ১৩ বছর ছিলো। এজন্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ফিরিয়ে দিলেন। ওহোদের যুদ্ধের সময় তাঁর বয়স ছিলো ১৪ বছর। এজন্য এ যুদ্ধেও তিনি শরীক হতে পারলেন না।

হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু সর্বপ্রথম পরিখার যুদ্ধে (৫ হিজরী) বাহাদুরীর চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। এ সময় তাঁর বয়স যুদ্ধের উপযোগী হয়ে গিয়েছিলো।

৬ষ্ঠ হিজরীতে হুদাইবিয়ার সন্ধির পূর্বে বাইয়াতে রেদওয়ানে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিলো। এভাবে তিনি আসহাবিস সাজারাহ (বৃক্ষের সাথীসমূহ) মধ্যে পরিগণিত হন। আল্লাহ তাআলা প্রকাশ্য ভাষায় এসব সাহাবীকে নিজের সন্তুষ্টি প্রাপ্ত সাহাবী হিসেবে সুসংবাদ দিয়েছেন। সহীহ আল বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, ঘটনাক্রমে বাইয়াতে রেদওয়ানের সৌভাগ্য তাঁর মর্যাদাবান পিতার পূর্বেই ঘটেছিলো। ঘটনাটি এভাবে ঘটেছিলো যে, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে এক আনসারীর কাছে ঘোড়া আনার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। তিনি অগ্রসর হয়ে প্রথমে নিজে বাইয়াত হন। অতপর পিতাকে গিয়ে খবর দেন। তিনিও তৎক্ষণাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌঁছেন এবং বাইয়াতের সৌভাগ্য অর্জন করেন।

বাইয়াতে রেদওয়ানের পর হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু খাইবার, মক্কা বিজয়, হুনাইন, তায়েফ এবং তাবুকের যুদ্ধসমূহে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহগামী ছিলেন।

www.bjilibrary.com

ইমাম বুখারী (র) মক্কা বিজয় প্রসঙ্গে প্রাণস্পর্শী ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন যে, মক্কা বিজয়ের সময় হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর বয়স ছিলো মাত্র ২০ বছর এবং তিনি একরোখা দ্রুতগামী অশ্বে চড়ে আসছিলেন। তাঁর গায়ে ছিলো ছোট্ট একটি চাদর এবং হাতে একটি বল্লম। এক স্থানে ঘোড়া থেকে নেমে তিনি ঘাস কাটতে লাগলেন। ঘটনাক্রমে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃষ্টি তার ওপর পড়লো এবং অত্যন্ত প্রশংসার সুরে তিনি বললেন, এতো আবদুল্লাহ। এরপর তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছু পিছু মক্কায় প্রবেশ করলেন। হযরত উসামা বিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহ আনহু হুজুরের সাথে ছিলেন। হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন তালহাও একই সাথে আসছিলেন। কা'বা শরীফের উঠানে উট বসিয়ে চাবি চেয়ে আনা হলো এবং কা'বার দরযা খুলে তিনজন একই সাথে প্রবেশ করলেন। তাদের পর কা'বা শরীফে সর্বপ্রথম প্রবেশের সৌভাগ্য হয়েছিলো হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর।

১০ম হিজরীতে হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর বিদায় হজ্জে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহগামী হওয়ারও সৌভাগ্য লাভ করেন।

১১ হিজরীতে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওফাত পান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতে হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু এত শোকাভিভূত হয়েছিলেন যে, আজীবন তিনি বাড়ীও বানাননি এবং কোনো বাগানও আবাদ করেননি। যখনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা স্মরণ হতো তখনই তিনি অস্থির চিত্তে ক্রন্দন করতেন।

হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর অন্তরে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর অপরিসীম আবেগ ছিলো। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহুর শাসনামালে বিভিন্ন কারণে তিনি মদীনার বাইরে যেতে পারেননি। কিন্তু হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুর শাসনকালে ইরান, সিরিয়া এবং মিসরের বিজয়সমূহে জীবন বাযী রেখে অংশ নিয়েছিলেন। পিতা ছিলেন বিশাল ইসলামী রাষ্ট্রের খলীফা। তবুও তিনি একজন সাধারণ মুজাহিদ হিসেবে ইসলামী বাহিনীতে যোগ দেন এবং কখনো কোনো পদের খাহেশ করেননি। ওয়াকেদী কয়েকটি যুদ্ধে তাঁর প্রদর্শিত বাহাদুরী এবং অকুতোভয় কাহিনী বর্ণনা করেছেন।

www.bjilibrary.com

২৩ হিজরীর শেষ দিকে হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুর ওপর হত্যামূলক হামলা চালানো হলো এবং তার জীবিত থাকার আর কোনো আশাই রইলো না। এ অবস্থায় তিনি তার নিজের উত্তরাধিকার নির্বাচন প্রশ্নটি মুসলমানদের কাছে একটি জামায়াতের ওপর ন্যস্ত করলেন। এ দল বা জামায়াতে বড় বড় সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহুম ছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যদিও নিজের জ্ঞান, মর্যাদা ও অন্যান্য যোগ্যতার দিক থেকে খলিফা হওয়ার যোগ্য ছিলেন। কিন্তু হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকওয়ার এত উচ্চাসনে আসীন ছিলেন যে, স্বীয় পুত্রকে খলীফা হিসেবে মনোনীত করা কোনোক্রমেই পসন্দ করতেন না। তিনি অসিয়াত করলেন যে, সে খলীফা নির্বাচনে পরামর্শদাতা বা উপদেষ্টা হিসেবে অংশ নিতে পারে। কিন্তু খলীফা হিসেবে তাঁর নাম কিছুতেই চিন্তা করা যাবে না। হযরত ওসমান জুন্নুরাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজের শাসনামলে হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বিচারপতির পদ দেয়ার প্রস্তাব পেশ করলেন। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ না করে ক্ষমা চাইলেন। আল্লামা বালাজুরী (র) ফতহুল বুলদান নামক গ্রন্থে লিখেছেন, ২৭ হিজরীতে হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু আফ্রিকায় (তিউনিসিয়া, আলজিরিয়া এবং মরক্কো) সৈন্য প্রেরণ করলেন। হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলামী বাহিনীতে অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অংশ নিয়েছিলেন। ইবনে আসীরের (র) বর্ণনা মতে, ৩০ হিজরীতে তিনি খোরাসান এবং তাবারিস্তান যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেন।

হযরত ওসমান জুন্নুরাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে ফেতনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। এ সময় হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু নির্জনবাসী হয়ে গেলেন। কেননা তিনি মুসলমানদের একে অপরের বিরুদ্ধে হানাহানি করা কিছুতেই পসন্দ করতেন না। ইবনে সায়াদের (র) বর্ণনা মতে, আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওসমান গনি রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের পর জনগণ তাঁকে খেলাফতের আসনে আসীন করতে চাইলেন। কিন্তু তিনি এ দায়িত্ব গ্রহণ প্রশ্নে সরাসরি অস্বীকৃতি জানালেন।

ইমাম হাকিম (র) নিজের পুস্তক মুসতাদরাকে গাসসান বিন আবদুল হামিদের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আলী কাররামুল্লাহু ওয়াজহাহু খেলাফতের আসনে আসীন হলেন। তখন হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ শর্তে তাঁর হাতে বাইয়াত বা আনুগত্য প্রকাশ করলেন যে, হযরত আলী গৃহযুদ্ধে অংশ নেবেন না। বস্তুত তিনি উষ্ট্র ও সিফফিনের যুদ্ধে কোনো পক্ষই সমর্থন করেননি। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে কার্যতঃ সহযোগিতা না করার ব্যাপারে সবসময় আফসোস এবং দুঃখ

www.bjilibrary.com

প্রকাশ করেছেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাত ও হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফত থেকে সরে দাঁড়ানোর পর তিনি হযরত আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর আনুগত্য প্রকাশ করেন। তিনি কাসতানতুনিয়ার যুদ্ধে অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অংশ নিয়েছিলেন। হযরত আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর পর ইয়াযিদ সিংহাসনে বসলো। ইবনে সায়াদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর বক্তব্য অনুসারে তিনি এ সময় উম্মাহর মতবিরোধ থেকে বাঁচার জন্য ইয়াজিদের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছিলেন। কিন্তু আনুগত্য প্রকাশের সময় বলেছিলেন যে, যদি এটা মঙ্গলের হয়, তাহলে আমি সন্তুষ্ট। আর যদি তা মুসবিতের হয় তাহলে আমি ধৈর্যধারণ করবো। অতপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন ঃ "অতপর যদি তুমি মুখ ফিরাও, তাহলে যে বোঝা তার ওপর রাখা হয়েছে তার দায়িত্ব তার–যে বোঝা তোমার ওপর রাখা হয়েছে সে দায়িত্ব তোমার।"

ইয়াযিদের পর দ্বিতীয় মুয়াবিয়া এবং মারওয়ান ইবনুল হাকাম ক্ষমতার আসনে বসলেন। ৬৫ হিজরীতে মারওয়ানের মৃত্যুর পর তার পুত্র আবদুল মালিক খলিফা হলো। হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে লিখিত আনুগত্যনামা পাঠিয়ে দিলেন। এ আনুগত্য নামায় লেখা ছিলো যে, আমি এবং আমার পুত্র আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের সুন্নাতের ওপর সামর্থানুযায়ী আমীরুল মু'মিনীন আবদুল মালিকের কথা শ্রবণ ও আনুগত্যের অঙ্গীকার করছি।

হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আবদুল মালিকের শাসনামলে ৭৪ হিজরীতে ৮৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। চরিতকাররা তাঁর ইন্তেকাল প্রসঙ্গে বিভিন্ন ধরনের বর্ণনা পেশ করেছেন। ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন যে, একবার হাজ্জাজ বিন ইউসুফ খুতবা দিচ্ছিলেন। খুতবায় সে প্রতিপক্ষ হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে তোহমত আরোপ করলো। সে বললো, হযরত যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু কুরআনে হাকিমের আয়াতের অক্ষর পরিবর্তন করেছে। হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একথা শুনে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং জনাকীর্ণ সমাবেশে প্রতিবাদ করে বললেন, তুমি মিথ্যা বলছো। ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তোমার মধ্যে এমন শক্তি নেই যে, তোমরা আল্লাহর কালামে পরিবর্তন সাধন করতে পারো। হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ ধমক হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কাছে অত্যন্ত কঠিন এবং অসহনীয় মনে হলো। কিন্তু প্রকাশ্যে তাঁর ওপর হাত তোলার সাহস হলো না। অবশ্য প্রতিশোধ নেয়ার জন্য একজন সিরিয়াবাসীকে নিয়োগ করলো। নিয়োগকালে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তাকে বললো, হজ্জের সময় বর্শার মাথায় বিষ লাগিয়ে হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পায়ে ঢুকিয়ে দিতে হবে।

www.bjilibrary.com

সে যথাযথভাবেই কাজ করলো। তাঁর সারা শরীরে বিষের ক্রিয়া শুরু হলো এবং তিনি তা সহ্য করতে না পেরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন।

ইমাম হাকিম (র) স্বলিখিত গ্রন্থ "মুসতাদরাকে" বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য হাজ্জাজ মক্কা এলো এবং কামান ফিট করে কা'বা শরীফের ওপর গোলা বর্ষণের জন্য প্রস্তুতি নিলো। তখন ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত ভীত বিহ্বল হয়ে পড়লেন। তিনি হাজ্জাজকে গালমন্দ করলেন। এতে সে ক্রোধান্বিত হলো এবং তাঁর ইঙ্গিতে একজন সিরিয়বাসী তার বিষ মিশ্রিত বর্শা দিয়ে তাঁকে আহত করলো। যখন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন তখন হাজ্জাজ তাঁকে দেখতে এসে বললো, আহা ! অপরাধীর ঠিকানা যদি সে জানতো তাহলে তার মাথা উড়িয়ে দিতো। হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, এসব তোমারই কীর্তি। তুমি যদি হেরেম শরীফে অস্ত্র আনার অনুমতি না দিতে তাহলে এ ঘটনা ঘটতো না।

ইবনে আসির (র) বর্ণনা করেছেন যে, একদিন হাজ্জাজ খুতবা দিচ্ছিলো। খুতবা এত লম্বা হচ্ছিলো যে, আসরের নামাযের ওয়াক্ত প্রায় যায় যায়। হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, সূর্যতো তোমার জন্য অপেক্ষা করতে পারে না। এতে হাজ্জাজ অত্যন্ত রাগান্বিত হলো এবং তাঁর শত্রু হয়ে গেলো।

ইবনে খালকান লিখেছেন ঃ

আবদুল মালিক ফরমান জারি করলো। এ ফরমানে হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে হজ্জের আহকাম পালনের নির্দেশ ছিলো। এ নির্দেশ হাজ্জাজ বিন ইউসুফের মনঃপুত হলো না। কিন্তু খলিফার নির্দেশ পালনে বাধ্য ছিলো। তাই হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বিষ মিশ্রিত বর্শা দিয়ে আহত করে সে মনের ঝাল মিটালো।

ইবনে সায়াদ (র) এ ঘটনাও বর্ণনা করেছেন যে, একবার হাজ্জাজ বক্তৃতা দিচ্ছিলো। বক্তৃতা দিতে দিতে সন্ধা হয়ে গেলো। নামাযের ওয়াক্ত এসে পড়লো। হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে ব্যক্তি ! নামাযের সময় হয়েছে। এখন বসে যা।" এ কথাটি তিনবার বললেন। কিন্তু সে বক্তৃতা অব্যাহতই রাখলো। চতুর্থবার তিনি উপস্থিত লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমি যদি উঠে যাই তাহলে তোমরা কি উঠে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত আছো ? তারা বললো, হ্যাঁ, আমরা প্রস্তুত আছি। একথা বলেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং হাজ্জাজকে বললেন যে, তোমার নামাযের প্রয়োজন নেই বলেই আমার মনে হয়। এতক্ষণে হাজ্জাজ মিম্বর থেকে নেমে এলো এবং নামায পড়লো। নামাযের পর হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ডেকে জিজ্ঞেস

www.bjilibrary.com

করলো, আপনি এ রকম কেন করলেন ? তিনি বললেন, আমরা সময় হলে যথাযথ সময়ে নামায আদায়ের জন্য এসে থাকি, এর পর যা ইচ্ছে তা বলতে পার।

হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ স্পষ্টবাদিতার কারণে হাজ্জাজ শত্রুতে পরিণত হলো এবং বিষ মিশ্রিত বর্শা দিয়ে হজ্জের ভীড়ে তাঁকে আহত করলো।

হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর অন্তরের আকাংখা ছিলো যে, তিনি মদীনা মুনাওয়ারাতে ইন্তেকাল করবেন। কিন্তু মক্কা মুয়াজ্জামাতে ইন্তেকাল করাই তার ভাগ্যে লিপিবদ্ধ ছিলো। মৃত্যুর পূর্বে তিনি পুত্র সালেম রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ওয়াসিয়াত করলেন যে, এখন আমি এখানেই ইন্তেকাল করছি। আমাকে হেরেম শরীফের সীমানার বাইরে দাফন করো। তিনি পিতার ওসিয়াত অনুযায়ী কাজ করতে চাইলেন। কিন্তু হাজ্জাজ তাতে বাধা দিলো এবং জানাযার নামায পড়িয়ে "ফাখখে মুহাজিরিনের করবস্থানে দাফন করলো।"

জ্ঞান ও মর্যাদার দিক দিয়ে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সেসব মহান সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহুমদের দলভুক্ত ছিলেন যাঁরা দীনি জ্ঞানের ক্ষেত্রে গভীর সমুদ্র হিসেবে বিবেচিত হতেন। তিনি শুধুমাত্র বছরের পর বছর ধরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সরাসরি সান্নিধ্য লাভের সুযোগই পাননি বরং সাইয়েদেনা ফারুকে আজম রাদিয়াল্লাহু আনহুর মত অভিজ্ঞ পিতার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভ করার সৌভাগ্যও তাঁর হয়েছিলো। এভাবে তিনি মর্যাদা ও পূর্ণতার ক্ষেত্রে অত্যন্ত উঁচুস্থানে সমাসীন হয়েছিলেন। তাঁর এমর্যাদায় অনেক বড় বড় সাহাবীও ঈর্ষা করতেন। কুরআনে হাকিম এবং তাফসীরের সাথে তার গভীর সম্পর্ক ছিলো। তিনি বেশীর ভাগ সময়ই কুরআনের বিভিন্ন সূরা ও আয়াত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে কাটাতেন। ইমাম মালিকের (র) মুয়াত্তায় বর্ণিত আছে যে, তিনি শুধুমাত্র সূরা আল বাকারার ওপরই ১৪ বছর চিন্তা-গবেষণা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অধিকাংশ জ্ঞানের মজলিশে অংশগ্রহণের সুযোগ পেতেন। এভাবে তিনি কুরআনে হাকিমের তাফসীরের ওপর অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন হয়ে উঠেছিলেন।

সহীহ আল বুখারীতে উল্লেখ আছে যে, একবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের সমাবেশে সমুপস্থিত ছিলেন। এ সমাবেশে হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুও ছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনে হাকিমের এ আয়াত পড়লেন ঃ

www.bjilibrary.com

"তোমরা কি দেখনি যে, আল্লাহ পবিত্র কথার কেমন উদাহরণ পেশ করেছেন। যেমন পবিত্র বৃক্ষ। যার শিকড় মযবুত এবং শাখাসমূহ আকাশে। নিজের স্রষ্টার নির্দেশে সবসময় ফল দান করে।"-(সূরা ইবরাহীম ঃ

অতপর তিনি সাহাবাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন যে, এ আয়াতে কোন্ বৃক্ষের উদাহরণ দেয়া হয়েছে ? সকল সাহাবী রাদিয়াল্লাহ আনহু চুপ রইলেন। তখন তিনি নিজে বললেন যে, এটা খেজুর বৃক্ষ। পরে হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু পিতা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে বললেন, এটা খেজুর গাছের উদাহরণ তা আমি বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু বুযর্গ সাহাবা রাদিয়াল্লাহ আনহুমদের নিশ্চুপ থাকার কারণে আমি চুপ মেরে ছিলাম। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন, বেটা ! তুমি যদি এ মজলিশে বলে দিতে।

কুরআন হাকীমে অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন হওয়া ছাড়াও হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর হাদীসের সাথেও গভীর সম্পর্ক ছিলো। তার থেকে ১ হাজার ৩৬টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে ১৭০টি ঐকমত্যের হাদীস। বুখারী ৮১টিতে এবং মুসলিম ৩১টিতে ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে সরাসরি যেসব কথা শুনেছেন তা অন্তরের সাথে গেঁথে রাখতেন। এছাড়া অন্যদের মাধ্যমে যা তাঁর কাছে পৌঁছতো তাও স্মরণ রাখতেন। এভাবে হাদীসে হাফেজদের মধ্যেও তাঁর এক বিশেষ স্থান ছিলো। অধিকন্তু তিনি হাদীস বর্ণনাতে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন এবং কমবেশী না হওয়ার পূর্ণ আস্থার পরই তিনি হাদীস বর্ণনা করতেন। এ কঠিন ভিত্তিতে বর্ণিত তাঁর হাদীসগুলো অত্যন্ত বিশুদ্ধ বলে মানা হয়।

তাঁর শিক্ষক মণ্ডলীর মধ্যে রয়েছেন হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু, হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু, হযরত ওসমান জুন্নুরাইন রাদিয়াল্লাহ আনহু, হযরত আলী কাররামাল্লাহ ওয়াজহাহু রাদিয়াল্লাহ আনহু, উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহ আনহা, উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসাহ রাদিয়াল্লাহ আনহা, হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন মাসউদ, হযরত বেলাল হাবশী রাদিয়াল্লাহ আনহু, হযরত সোহায়েব রুমী রাদিয়াল্লাহ আনহু, হযরত যায়েদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন সাবিত এবং হযরত রাফে রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন খুদায়েজের মতো মহান মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবাহ ও সাহাবিয়াহ। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে রয়েছেন সালেম রাদিয়াল্লাহ আনহু, ওবায়দুল্লাহ (র), মুহাম্মদ (র), নাফে (র), হাফস (র), ওরওয়াহ (র) বিন যুবায়ের রাদিয়াল্লাহ আনহু, মুসা বিন তালহা (র), আবু সালমাহ (র), বিন আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহ আনহু, সাঈদ (র), বিন মুসাইয়্যিব রাদিয়াল্লাহ আনহু, কাসেম (র), আবু বুরদাহ (র) বিন আবু মূসা আশয়ারী রাদিয়াল্লাহ

www.bjilibrary.com

আনহু, সাঈদ বিন ইয়াসার (র), আক্রামাহ (র), মুজাহিদ (র), সাঈদ বিন জুবাইর (র), তাউস (র), আতা (র), আবু জুবায়ের (র) এবং আবি মালিকাহার (র) মত উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গ।

ফিকাহ ইসলামী শরীয়াতের স্থিতিস্থাপক। হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু এ শাস্ত্রেও সমুদ্রের মত গভীরতা রাখতেন। তিনি জীবনের বেশীর ভাগ সময়ই শিক্ষাগ্রহণ, শিক্ষা প্রদান এবং ফতোয়াদানের মধ্য দিয়ে কাটিয়েছেন। হাফেজ ইবনে কাইয়েম (র) বলেছেন ঃ "হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর প্রদত্ত ফতোয়া যদি একত্রিত করা হয়, তাহলে এক বিপুলাকৃতির পুস্তক তৈরি হতে পারে।" হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর ফতওয়াবলীর ওপরই মালেকী ফিকাহ নির্ভরশীল। ইমাম মালেক (র) বলেছেন, হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু অন্যতম দীনি ইমাম ছিলেন। তাফাককুহ ফিদ্দীন বা দীনের ওপর গভীর জ্ঞানের ভিত্তিতে হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ফকীহ উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। এ সত্ত্বেও তিনি ফতওয়াদানের ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকতেন। যদি কোনো প্রশ্নে সামান্যতম সন্দেহও দেখা দিতো, তাহলে তিনি কোনোক্রমেই ফতোয়া দিতেন না। এবং যিনি ফতোয়া চাইতেন তাকে এই বলে ফিরিয়ে দিতেন যে, তিনি সে মাসয়ালা সম্পর্কে জানেন না। কিয়াস এবং ইজতিহাদেও আল্লাহ প্রদত্ত প্রভূত যোগ্যতা ছিলো। কিন্তু কিয়াস ও ইজতিহাদ তখনই প্রয়োগ করতেন যখন কোনো মাসয়ালার ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহতে স্পষ্ট কোনো নির্দেশ না পেতেন। এ ধরনের ফতওয়া প্রদানের সময় তিনি ফতওয়া তলবকারীকে পরিষ্কার বলে দিতেন যে, এটা তার কিয়াস। এ সত্ত্বেও তাঁর মত প্রদানের পর বড় বড় ইমাম দ্বিতীয় মতের প্রয়োজন অনুভব করতেন না।

দীনি জ্ঞান ছাড়াও হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু আরবের কাব্য, ভাষণ এবং বংশ তালিকা শাস্ত্রে প্রভূত দখল রাখতেন। কিন্তু এসব শাস্ত্রে সময় ব্যয় পসন্দ করতেন না। সামগ্রিকভাবে তিনি জ্ঞান ও মর্যাদার দিক দিয়ে দু' সমুদ্রের এক গভীর সমুদ্র ছিলেন। ইবনে সায়াদের (র) বর্ণনা মতে এক যুগে মানুষ এ বলে দোয়া করতো যে, হে আল্লাহ ! আমাদের জীবদ্দশায় ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে জীবিত রেখো যাতে আমরা তাঁর জ্ঞান সমুদ্র থেকে পিপাসা মেটাতে পারি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগ সম্পর্কে বর্তমানে তাঁর চেয়ে বেশী ওয়াকিবহাল আর কেউ নেই।

হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ছিলেন অত্যন্ত আকর্ষণীয় চরিত্রের ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ। বহুবিধ গুণাবলীর সমাহার তাঁর মধ্যে ঘটেছিলো। এ সকল গুণের জন্য তিনি সুশোভিত ও সুবাসিত ফুলের বাগানের

www.bjilibrary.com

সাথে তুলনীয়। রাসূল প্রেম, সুন্নাহর অনুসরণ, খোদাভীতি, জিহাদ ও ইবাদাতের প্রতি উৎসাহ, আল্লাহর প্রতি ভক্তি, বদান্যতা ও আত্মত্যাগ, বিনয়, মুখাপেক্ষহীনতা, অল্পে তুষ্টি, সহজ-সরলতা, হক কথন ও স্পষ্টবাদিতার গুণে তিনি গুনান্বিত ছিলেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে তিনি বেশীর ভাগ সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সান্নিধ্যে কাটানোর চেষ্টা করতেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালে তিনি গভীরভাবে শোকার্ত এবং ভগ্ন হৃদয় হয়ে পড়েছিলেন। এ কারণে তিনি আজীবন বাড়ী তৈরি করেননি। যখনই মুখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম উচ্চারিত হতো তখনই চোখ দিয়ে অশ্রু অঝোর ধারায় ঝরে পড়তো। যখনই রাসূলের যুগে সংঘটিত যুদ্ধসমূহের স্থান অতিক্রম করতেন তখনই রিসালাতকালের চিত্র সামনে সমুপস্থিত হতো। তিনি কাঁদতেন। কেউ তাঁর কাছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা উল্লেখ করলেই তিনি অস্থির চিত্তে ক্রন্দন শুরু করতেন। ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (র) নিজের ওস্তাদের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, অনেকে হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর রাসূল প্রেমের অবস্থা দেখে তাঁকে পাগল বলেও আখ্যায়িত করতেন। প্রকৃত কথা হলো, তিনি রাসূল প্রেমের অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন ছিলেন। ছোটখাটো বিষয়েও তিনি রাসূলের সুন্নাত অনুসরণে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতেন। এমনকি মানবীয় ব্যাপারেও তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পদাংক অনুসরণ করার চেষ্টা চালাতেন। সফর ও মুকিম অবস্থায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেখানেই নামায আদায় করেছেন সেখানেই তিনি নামায পড়তেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেখানে বিশ্রাম নিয়েছেন সেখানে তিনিও বিশ্রাম নিতেন। যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বল্প সময়ের জন্যও অবস্থান করেছেন সেখানে তিনি অবশ্যই অবস্থান করেছেন। যেসব বৃক্ষের ছায়াতলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো বিশ্রাম নিয়েছেন সেসব বৃক্ষ যাতে শুকিয়ে না যায় সে জন্যে তিনি তাতে পানি সিঞ্চন করতেন এবং তিনি তার ছায়াতলে বিশ্রাম নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের আনুগত্য প্রকাশ করতেন। যে কোনো সফর থেকে ফিরেই সর্বপ্রথম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওযায় উপস্থিত হয়ে সালাম বলতেন। মদীনা মুনাওয়ারার প্রতি গভীর ভালোবাসা ছিলো। কোনো অবস্থাতেই সেখান থেকে বাইরে যেতে চাইতেন না। একবার তাঁর ভৃত্য অভাবের কারণে মদীনা পরিত্যাগের অনুমতি চাইলো। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মদীনায় মুসবিতে ধৈর্যধারণ করবে কিয়ামতের দিন আমি তাঁর জন্যে সুপারিশ করবো।

www.bjilibrary.com

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবার-পরিজনের প্রতিও তাঁর প্রগাঢ় ভালোবাসা ছিলো। তিনি প্রায়ই মানুষের কাছে তাদের মর্যাদা সম্পর্কে বর্ণনা দিতেন। হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু হজ্জের নিয়মাবলী সম্পর্কিত সবচেয়ে বড় আলেম ছিলেন। এর কারণ হলো তিনি হজ্জে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সব সুন্নাতের যথাযথ ও সার্বিকভাবে পালন করতেন। এমনকি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেখানে যেখানে তাহারাত বা পবিত্র হয়েছিলেন সেখানে তিনিও তা অবশ্যই হতেন। হজ্জের সফরে সেই সড়ক ধরেই আসতেন সে সড়কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমন ঘটতো। হুজুর জুল হালিফায় অবতরণ করে নামায পড়তেন। হজরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু জুলহালিফাতে অবশ্যই নামায পড়তেন। যেসব স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মনযিল বানিয়েছিলেন সেসব স্থানে তিনিও তাই করেছিলেন। সহীহ আল বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো পদব্রজে আবার কখনো সওয়ারীতে মসজিদে কুবাতে তাশরীফ আনতেন। হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুও একই কাজ করতেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা প্রবেশের আগে বাতহা নামক স্থানে শুইতেন। হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুরও একই নিয়ম ছিলো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের জীবন উৎসর্গকারী সাহাবীদের দাওয়াত সবসময়ই কবুল করতেন। হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুও কারো দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করতেন না। এমনকি রোযা অবস্থাতে দাওয়াতে যেতেন। যদিও খানা-পিনায় অংশ নিতেন না। মোটকথা তিনি সকল কাজেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ সামনে রাখতেন।

হযরত ইবনে ওমর ছিলেন কোমল অন্তরের মানুষ। আল্লাহভীতি এবং শেষ বিচারের দিনের ভয়ে তিনি সদাভীত সন্ত্রস্ত থাকতেন। আখিরাতের হিসাব-নিকাশ সম্পর্কিত কোনো আয়াত শুনতেই তিনি ভীত হয়ে পড়তেন এবং কাঁদতেন। একদিন ওবায়েদ বিন ওমর থেকে এ আয়াত শুনলেন ঃ

فَكَيْفَ اِذَ جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَابِكَ عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ شَهِيْدًا ـ

"হে রাসূল ! আখিরাতের সে দিনে কি অবস্থা হবে, যখন আমরা প্রত্যেক উম্মতের তরফ থেকে এক সাক্ষী এনে দাঁড় করবো এবং আপনাকে তাদের ওপর সাক্ষী হিসেবে দাঁড় করাবো।"-(সূরা আন নিসা ঃ ৪১)

এ আয়াত শুনতেই তিনি কাঁদতে লাগলেন। কাঁদতে কাঁদতে তাঁর দাড়ি এবং বুকের কাপড় ভিজে গেলো।

www.bjilibrary.com

খোদাভীতি তাঁর অন্তরে জিহাদ এবং ইবাদাতের প্রতি প্রচণ্ড অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করেছিলো। তিনি জিহাদ এবং ইবাদাত ছাড়া থাকতেই পারতেন না। পনের বছর বয়স থেকে বৃদ্ধকাল পর্যন্ত অব্যাহতভাবে জিহাদে অংশ নিয়েছেন। ইবাদাতের অবস্থা এমন ছিলো যে, তিনি সারারাত নামায পড়তেন এবং লাগাতার রোযা রাখতেন। কোনো কোনো সময় এক রাতে পুরো কুরআন শরীফ পড়ে নিতেন। প্রত্যেক নামাযের জন্যে নতুন করে অযু করতেন। তিনি জীবনে ৬০ বার হজ্জ এবং এক হাজার বার ওমরাহ করেছিলেন।

তাকওয়ার প্রশ্নে তিনি ছিলেন উদাহরণ স্বরূপ। হাফেজ ইবনে হাজর (র) তাহজিবুত তাহজিব গ্রন্থে লিখেছেন, যুবক কুরাইশদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের চেয়ে নিজের ওপর আধিপত্য বিস্তারকারী আর কেউ ছিলো না।

সহীহ আল বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু যৌবনের প্রারম্ভকালেই মসজিদে গিয়ে শুয়ে থাকতেন। একবার তিনি স্বপ্নে দোযখের ফেরেশতাদের দেখলেন। পরদিন সহোদরা উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসার কাছে স্বপ্নের কথা বর্ণনা করলেন। হযরত হাফসা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ঘটনা উল্লেখ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ "আবদুল্লাহ একজন সত্যবাদী নওজোয়ান।"

হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবদুল্লাহ আনসারী রাদিয়াল্লাহ আনহু বলতেন যে, আমাদের মধ্যে শুধুমাত্র ইবনে ওমরই রাদিয়াল্লাহ আনহু একমাত্র ব্যক্তি ছিলেন, যাকে পার্থিব কোনো কিছুই আকর্ষণ করতে পারেনি। নবীজির ইন্তেকালের পর যদি কোনো ব্যক্তি পরিবর্তন ছাড়া এমন কোনো সাহাবীকে দেখতে চায়, তাহলে সে যেন ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে দেখে।

একবার এক ব্যক্তি ওষুধসহ তাঁর খেদমতে হাজির হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ একি ? সে বললো, খাদ্য হজমকারী ওষুধ। তিনি বললেন, তার এ ওষুধ প্রয়োজন নেই। কারণ, তিনি মাসের পর মাস পেট ভরে খাবার খাননি।

একবার জনৈক ব্যক্তির কাছে পানি চাইলেন। সে কাঁচের পাত্রে পানি এনে দিলেন। তিনি এ পাত্রে পানি পান করতে অস্বীকৃতি জানালেন। অতপর কাঠের পাত্রে পানি এনে তাঁর সামনে পেশ করা হলো। তিনি তা পান করলেন। পানি পান করে অযু করার জন্য পাত্র চাইলেন। তার সামনে বদনা এনে রাখা হলো। তিনি এ বদনার পানি দিয়ে অযু করতে কিছুতেই রাজী হলেন না এবং লোটার পানি দিয়ে অযু করলেন।

www.bjilibrary.com

মাইমুন বিন মাহরান (র) বর্ণনা করেছেন, একবার তাঁর খিদমতে হাজির হলাম। তার গৃহের সব জিনিসের মূল্য নির্ধারণ করলাম। একশ' দিরহামের বেশী মূল্যের আসবাবপত্র ছিলো না। এ আসবাবের মধ্যে বিছানাও ছিলো।

অঢেল পার্থিব বিত্ত-বৈভব লাভের সুযোগ হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর সামনে কয়েকবারই এসেছিলো। কিন্তু তিনি সেদিকে চোখ তুলেও তাকাননি। অনেকবারই তিনি বড় বড় সুযোগ পেয়েছেন। বড় পদ থেকে নিয়ে খিলাফত পর্যন্ত তিনি লাভ করতে পারতেন। স্বর্ণ এবং রৌপ্য যদি কামাই করতে চাইতেন তাহলে সমকালীন সবচেয়ে বড় ধনী হওয়ারও সুযোগ ছিলো। কিন্তু তিনি পার্থিব জগত থেকে পরকালকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং তাকওয়ার গণ্ডী থেকে নিজের পা বাইরে বের করেননি। তাঁর সময়ে যে রাজনৈতিক সংঘাত হয়েছিলো তাতে তিনি কোনোক্রমেই অংশ নেননি। গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার আশংকায় প্রত্যেক আমীরের হাতেই বাইয়াত করে নিতেন এবং এর পরিণাম আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিতেন।

তিনি অত্যন্ত সাদাসিধে জীবনযাপন করতেন। প্রায় সব কাজ নিজের হাতে করতেন। এমনকি উট বসানোর কাজেও অন্যের সাহায্য নিতেন না। একদম সাধারণ পোশাক পরতেন। এ ব্যাপারেও বিশেষ উদ্দেশ্য ছিলো। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তিনি দু'বার ভালো পোশাক পরিধান করতে দেখেছিলেন। পোশাকের মধ্যে ছিলো কামিজ, ইজার এবং কালো পাগড়ী। নিসফ সাক পর্যন্ত ইজার পরিধান করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলুদ রং পসন্দ করতেন। এজন্যে তাঁরও এ রং অত্যন্ত প্রিয় ছিলো।

দস্তরখান লৌকিকতা মুক্ত ছিলো। কোনো কোনো সময় বড় পাত্রে খাবার রেখে দেয়া হতো। পরিবার-পরিজনসহ তার চারপাশে বসে খেয়ে নিতেন। প্রদর্শনী এবং লৌকিকতামূলক সকল জিনিসই তাঁর অপসন্দনীয় ছিলো। এমনকি জুমায়ার দিন ছাড়া কখনো মাথা, দাড়ি এবং কাপড়ে খোশবু লাগাননি।

পার্থিব দিক থেকে ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু অত্যন্ত সচ্ছল ছিলেন। দীনি খিদমতের ভিত্তিতে মাসিক আড়াই হাজার করে বৃত্তি পেতেন। এছাড়া সহীহ আল বুখারীর মতে তিনি অনেক আবাদী জমির মালিক ছিলেন। তিনি নিজের সম্পদকে নির্দ্বিধায় খোদার রাস্তায় লুটিয়ে দিতেন। বদান্যতা এবং উদারতা তাঁর চরিত্রের অন্যতম বস্তু ছিলো। কোনো ফকির বা সওয়ালকারীকে নিজের দরযা থেকে খালি হাতে ফিরে যেতে দিতেন না। বিশজনের মত ফকির তাঁর দস্তরখানে লালিত-পালিত হতো। সাধারণত কোনো ফকিরকে নিজের দস্তরখানে না বসিয়ে খাবার খেতেন না। বরং অনেক সময় নিজের অংশের

www.bjilibrary.com

খাবারও মিসকীনদের খাইয়ে দিতেন এবং নিজে অভুক্ত থাকতেন। একবার তাঁর মাছ খাওয়ার ইচ্ছে হলো। যখন মাছ ভেজে তাঁর সামনে রাখা হলো, তখন এক ফকির এসে উপস্থিত। তিনি মাছ ফকিরকে দিয়ে দিলেন।

একবার তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এক দিরহামের আঙ্গুর তাঁর জন্যে কিনে আনা হলো। ঘটনাক্রমে এ সময় এক ফকির এসে উপস্থিত। তিনি ফকিরকে এ আঙ্গুর দিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। পরিবারের লোকজন আঙ্গুরগুলো খেয়ে নিতে এবং ফকিরের জন্যে অন্য আঙ্গুর দেবেন বলে আরজ করলো, কিন্তু কোনোক্রমেই তিনি তা শুনলেন না। বাধ্য হয়ে ফকিরকে তা দিয়ে দিতে হলো এবং পুনরায় কিনে এনে তাঁর সামনে পেশ করা হলো।

একবার রাস্তায় একটি খেজুর পেলেন। মুখে তা না পুরতেই একজন ফকির এসে হাজির। তিনি এ খেজুর তাকে দিয়ে দিলেন।

তাবকাতে ইবনে সায়াদে হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর গোলাম এবং শিষ্য নাফে (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার তাঁর কাছে এক হাজার দিরহাম অথবা দিনার (তা স্পষ্ট করা হয়নি) এলো। তিনি দু' হাতে লোকদেরকে তা দেয়া শুরু করলেন এবং শেষ হয়ে গেলো। বণ্টনের পর যারা এলো তাদেরকে অন্যান্যদের (যাদের আগে দিয়েছিলেন) কাছ থেকে ধার করে প্রদান করলেন।

কোনো স্থানে অবস্থান করলে বেশীর ভাগ রোযা রাখতেন। কিন্তু কোনো মেহমান এসে গেলে রোযা ভেঙ্গে ফেলতেন এবং বলতেন মেহমানের উপস্থিতিতে নফল রোযা রাখা বদান্যতা বিরোধী কাজ।

হাফেজ ইবনে হাজার (র) "ইসাবাহ" গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু দু' দু' তিন তিন হাজার প্রতিদিনই দান করতেন। আবার অনেক সময় বিশ বিশ ত্রিশ ত্রিশ হাজারের মতো পরিমাণ মুহূর্তের মধ্যে আল্লাহর পথে বিলিয়ে দিতেন।

যদি কোনো দাস অথবা দাসী পসন্দ হতো অথবা নিজের কোনো দাসকে বেশী বেশী ইবাদাতে মশগুল দেখতেন, তাহলে তাকে আযাদ বা স্বাধীন করে দিতেন। এভাবে তিনি নিজের জীবনে এক হাজারেরও বেশী গোলাম আযাদ করেছেন।

একবার হজ্জের সফরের জন্য এক উটনী কিনলেন। তাতে সওয়ার হলেন। উটনির চলন অত্যন্ত পসন্দ হলো। তৎক্ষণাৎ তিনি নেমে পড়লেন এবং উটনীর ওপর থেকে সকল জিনিসপত্র নামানোর নির্দেশ দিলেন। এ উটনীকে তিনি কুরবানীর পশুর অন্তর্ভুক্ত করারও আদেশ দিলেন।

www.bjilibrary.com

একবার কতিপয় বন্ধুর সাথে মদীনার উপকণ্ঠে গেলেন। এক স্থানে দস্তরখান বিছানো হলো। তখন এক রাখাল সেখানে এসে উপস্থিত। সে সালাম করলো। হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে খাবার দাওয়াত দিলেন। সে রোযা রাখার ওজর পেশ করলো। তিনি বললেন, এত গরমে রোযাও রাখো, আবার বকরীও চরাও ? অতপর তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এ বকরীগুলো কি আমাদের কাছে বিক্রি করতে পারো ? আমরা নগদ মূল্য ও ইফতারের জন্য গোশতও দিবো।

রাখাল আরজ করলো, এ বকরী আমার নয়। বকরীগুলোর মালিকতো আমার প্রভু। হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার তাকওয়ার পরীক্ষা স্বরূপ বললেন, তাহলে তোমার প্রভু কি করবে ?

রাখাল আকাশের দিকে আঙ্গুল উঠালো এবং আল্লাহ কোথায় আল্লাহ কোথায় এ বলে রওয়ানা দিলো। (এর অর্থ আল্লাহ তো এ খেয়ানতের কথা জেনে ফেলবে)। হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর রাখালের একথা অত্যন্ত পসন্দ হলো এবং একথা বার বার বলতে লাগলেন। বস্তুত তিনি তার আমানতদারী ও খোদাভীতির জন্যে অত্যন্ত খুশী হয়েছিলেন। এজন্যে যখন মদীনা এলেন তখন তার মালিকের কাছ থেকে তাকে বকরী সমেত কিনে আযাদ করে দিলেন এবং সব বকরী তাকে দান করলেন।

একবার কোথাও যাচ্ছিলেন। রাস্তায় এক গ্রামবাসীর সাথে দেখা। হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে সালাম দিলেন এবং সওয়ারীর গাধা ও মাথার পাগড়ী খুলে তাকে দিয়ে দিলেন। ইবনে দিনার (র) সাথে ছিলেন। তিনি আরজ করলেন, আল্লাহ আপনার যোগ্যতা দিক। এ গ্রামবাসী তো সাধারণ জিনিসেই খুশী হয়ে যায়। গাধা এবং পাগড়ী দানের কি প্রয়োজন ছিলো। তিনি বললেন, তার পিতা আমার পিতার বন্ধু ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, নিজের পিতার বন্ধুদের সাথে ভালো আচরণ করাই সবচেয়ে বড় নেকীর কাজ।

হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কয়েকজন গোলাম আযাদ হওয়ার জন্য অত্যন্ত ইবাদাতগুজার হয়ে যেতো। তাঁর কতিপয় বন্ধু বললেন, এসব গোলাম ইবাদাতে নিষ্ঠ নয় এবং তারা আপনাকে ধোঁকা দিতে চায়। তিনি বললেন, যারা আমাকে আল্লাহর মাধ্যমে ধোঁকা দেয় আমি তাদের কাছে ধোঁকা খেয়ে যাই।

তাঁর হাত থেকে যে সম্পদ বেরিয়ে যেত তা তিনি কখনই ফিরিয়ে নিতেন না। আতা (র) বর্ণনা করেছেন, একবার আমি তাঁকে দু' হাজার দিরহাম ঋণ

www.bjilibrary.com

দিয়েছিলাম। তিনি যখন ঋণ পরিশোধ করলেন, তখন আমি তাঁর দিরহামগুলো ওজন করলাম। ওজনে দু'শ' দিরহাম বেশী পাওয়া গেলো। আমি এ দু'শ' দিরহাম ফিরিয়ে দিতে চাইলাম। তিনি বললেন, এখন তা তোমার।

বেশীর ভাগ খাদ্য মিসকীনদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। এজন্যে তাঁর শরীর অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিলো। লোকজন তাঁর স্ত্রীকে ভর্ৎসনা করলো। তারা বললো আপনি ভালোভাবে তাঁর খেদমত করেন না। তিনি বললেন, আমি কি করবো। যখন তাঁর জন্যে কোনো খাবার রান্না করা হয়, তখন তিনি তা মিসকীনদের মধ্যে বিলিয়ে দেন। এ অভ্যাসের কারণে তিনি যখন মসজিদ থেকে বের হন তখন ফকির-মিসকীনরা ঘিরে ধরে। তিনি তাদেরকে নিজের সাথে নিয়ে আসেন এবং খাবার খাইয়ে ফেরত পাঠান। এজন্যে একদিন তার স্ত্রী সেই ফকিরদের ঘরে খাবার পাঠিয়ে দিলেন এবং বলে পাঠালেন যে, তাঁর রাস্তায় যেন বসে থাকা না হয়। তিনি যদি ডাকেনও তাহলে যেন আসা না হয়।

হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সেদিন মসজিদ থেকে বের হলেন। কিন্তু রাস্তায় কোনো ফকির বসা পেলেন না। ঘরে ফিরে ঘটনা জানতে পারলেন। ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন, ফকিররা আমার দস্তরখানে না বসুক এবং আমি অভুক্ত থাকি এটাই কি তুমি চাও? বস্তুত তিনি অভুক্ত থাকলেন।

নিজের মহত্ব ও মর্যাদা থাকা সত্বেও হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বিনয়, নম্রতা এবং উত্তম চরিত্রের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতেন। তিনি সবসময় মানুষকে আগে সালাম করতেন। এ ব্যাপারে আমীর গরীবের মধ্যে কোনো পার্থক্য করতেন না। লোকজনদেরকে সালাম দেয়ার জন্যেই তিনি বাইরে বেরুতেন। যদি কাউকে সালাম দেয়া ভুলে যেতেন তাহলে ফিরে গিয়ে সালাম দিতেন।

মুজাহিদ (র) বলেন, আমি তাঁর সাথে সফরে থাকতাম। যতদূর সম্ভব তিনি নিজের কাজ স্বহস্তে করতেন। এমনকি নিজে উটের পা ধরে বসাতেন এবং আমি তখন তাতে উঠতাম।

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে যে, নিজের প্রশংসা তিনি কখনই পসন্দ করতেন না। একবার এক ব্যক্তি তাঁর প্রশংসা করছিলেন। এ সময় তিনি তাঁর মুখের ওপর মাটি নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মুখের ওপর প্রশংসাকারীদের (তোষামোদকারীদের) মুখের ওপর মাটি নিক্ষেপ করো।

হাফিজ ইবনে হাজার (র) লিখেছেন, একবার এক ব্যক্তি তাঁকে গালাগাল করতে লাগলো। তিনি জবাবে শুধু এতটুকুন বললেন যে, ভাই আমরাতো উঁচু বংশের মানুষ। অতপর চুপ মেরে গেলেন।-(আল ইসাবাহ)

www.bjilibrary.com

একবার এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কে ? জবাবে তিনি বললেন, তুমি যা বলো আমি তাই। সে বললো, আপনি দৌহিত্র। আপনি কেন্দ্র। একথা শুনে তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ দৌহিত্র তো বনি ইসরাঈলরা ছিলেন। আর সকল উম্মতে মুহাম্মদীয়াই সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেন্দ্র। অবশ্য আমরা মুদীর গোত্রের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। এর থেকে বেশী মর্যাদা কেউ আমাদেরকে দিলে তাহলে সে মিথ্যা।

একবার কেউ তাঁকে উপঢৌকন হিসাবে অত্যন্ত মূল্যবান কাপড় দিলো। তিনি তা এ বলে ফিরিয়ে দিলেন যে, তিনি তা পরিধানে অন্যায় কিছু মনে করেন না। কিন্তু তাকাব্বরীর ভয়ে তিনি এ কাপড় পরতে পারেন না।

একবার ইহরাম অবস্থায় সর্দি অনুভূত হলো। নিজের শিষ্য কারয়া আকিলীকে বললেন, আমার ওপর চাদর দিয়ে দাও। তিনি চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। ঘুম থেকে জেগে চাদরের বুটিদার রেশমের কারুকাজ দেখতে লাগলেন এবং বললেন, এ বুটি যদি না হতো তাহলে তা ব্যবহারে অন্যায়ের কিছু ছিলো না।

এমন স্থানে তিনি যেতেন না, যেখানে লোকজন তাকে দেখলেই সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যেত।–(ইবনে সায়াদ)

গোলামদের সাথে তাঁর ব্যবহার ছিলো অত্যন্ত বন্ধুভাবাপন্ন। তাঁদেরকে নিজের সাথে দস্তরখানে বসিয়ে খাবার খাওয়াতেন এবং নিজের পরিবার-পরিজনের মত তাদের খাওয়া পরার খেয়াল রাখতেন। একবার তাদের খাবার দিতে দেরী হয়ে গেলো। হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু একথা জানতে পেরে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁদেরকে খাবার দেয়ার নির্দেশ দিলেন। এরপর বললেন, গোলামের খানাপিনার খেয়াল না রাখা মানুষের জন্য বড় গোনাহ।–(মুসলিম)

দস্তরখানে বসা অবস্থায় অন্য কারো গোলাম সেখানে উপস্থিত হলে তাকেও খাবারে শরীক করাতেন। তিনি নিজের গোলামদের একটি নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন। নির্দেশে তিনি বলেছিলেন যখনই তারা তাঁকে চিঠি লিখবে তখনই তারা তাঁর নামের আগে নিজের নাম লিখবে। প্রকৃতপক্ষে তৎকালীন রেওয়াজ মুতাবিক প্রভুর নাম আগে লিখা হতো।–(ইবনে সায়াদ)

গোলামদের কখনই কঠিন কথা বলতেন না এবং তাদের ওপর কোনোদিন হাতও তুলতেন না। ক্রোধান্বিত অবস্থায় এক আধবার কখনো কঠিন ব্যবহার করে বসলে কাফফারা হিসেবে তাকে আযাদ করে দিতেন।–(সহীহ মুসলিম)

৭—

www.bjilibrary.com

নিজের উত্তম চরিত্র, নম্রতা ও বিনয়ের কারণে সাধারণ মানুষ তাঁকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। ঘর থেকে বাইরে বেরুলেই পদে পদে মানুষ তাকে সালাম করতো। একবার হযরত মুজাহিদ সাথে ছিলেন। তিনি তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন, মানুষ আমাকে এত ভালোবাসে যে স্বর্ণ ও রৌপ্য দিয়েও এ ভালোবাসা তুমি যদি কিনতে চাও তাহলে তুমি তা থেকে বেশী পাবে না।—(তাবকাতে ইবনে সায়াদ)

মুখাপেক্ষীহীনতা এবং অল্পে তুষ্টি হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রকৃতিতে পুরোপুরিই ছিলো। যদিও তিনি নবীর সুন্নাত মুতাবিক উপঢৌকন গ্রহণ করতেন, কিন্তু কারো কাছে হাত পাতেননি। আল্লামা ইবনে সায়াদ (র) তাঁর এ বক্তব্য উদৃত করেছেন ঃ "আমি কারো কাছে চাই না, তবে আল্লাহ যা দেন তা ফেরতও দেই না। একবার তাঁর ফুফু রামলাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু দু'শ' দিনার প্রেরণ করলেন। তিনি শুকরিয়ার সাথে তা গ্রহণ এবং দোয়া করলেন।

একবার আবদুল আজীজ বিন হারুন তাঁকে লিখলেন যে, তাঁর যা প্রয়োজন তা যেন তার কাছে চায়। তিনি এর জবাব লিখে পাঠালেন। তিনি লিখলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, নিজের পরিবার-পরিজন থেকে (লেনদেন) শুরু করো এবং উপর হাত নীচের হাত হতে উত্তম। আমার ধারণা দানকারী হাত উপরের এবং গ্রহণকারী হাত নীচের। আমি আপনার কাছে সাওয়াল করবো না এবং সেই মাল প্রত্যার্পণও করবো না যা আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন।

আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার এক বিশেষ উদ্দেশ্যে এক লাখ পরিমাণ তাঁর কাছে প্রেরণ করলেন। তিনি এ অর্থ গ্রহণে স্পষ্টভাবে অস্বীকার করলেন।

ধন-সম্পদ তাঁর কাছে সম্পূর্ণ তাৎপর্যহীন বস্তু ছিলো। সামান্যতম সন্দেহ হলেই তিনি আর্থিক উপঢৌকন প্রত্যাখ্যান করতেন। কেউ কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থে অথবা কপটতার সাথে যদি উপঢৌকন পাঠাতেন তাহলে তা তিনি গ্রহণ করতেন না। এভাবে কোনো বস্তুতে সাদকার সন্দেহ হলেই তা ব্যবহার করতেন না। একবার তিনি নিজের মায়ের নামে এক গোলাম সাদকাহ করলেন। ঘটনাক্রমে সে গোলামের সাথে তিনি বাজারে গেলেন। সেখানে এক দুধালো বকরী বিক্রি হচ্ছিলো। তিনি গোলামকে বললেন, নিজের অর্থ দিয়ে এটা কিনে নাও। সে কিনে নিলো এবং ইফতারের সময় সেই বকরীর দুধ তাঁর সামনে পেশ করলো। তিনি বললেন, এ দুধ বকরীর। বকরী গোলামের অর্থে কেনা এবং গোলাম হলো সাদকার। দুধ সরিয়ে নাও। আমি পান করবো না।

www.bjilibrary.com

সন্দেহযুক্ত দ্রব্যাদি সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে চলতেন। একবার একজন খেজুরের সিরকা উপঢৌকন হিসেবে প্রেরণ করলো। জিজ্ঞেস করলেন, কি জিনিস। জানতে পারলেন যে, খেজুরের সিরকা। তিনি তৎক্ষণাৎ তা ফেলে দেয়ালেন। কেননা তা ব্যবহারে মাতলামির আশংকা থাকে।

ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন, তিনি শসা এবং খরবুজাহ (এক ধরনের জলজ ফল) খেতেন না। কেননা এতে দুর্গন্ধযুক্ত বস্তুর ভেজাল মিশ্রণ করা হয় (এটা তাঁর কঠিন সাবধানতার ফলশ্রুতি ছিলো)। বস্তুত এসব জিনিস ব্যবহার দোষের কিছু নয়।

মারওয়ান ইবনুল হাকাম নিজের যুগে সড়কে মাইল ফলক স্থাপন করান। হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু এসব পাথরের দিকে দাঁড়িয়ে নামায পড়া মাকরূহ মনে করতেন। এবং তা থেকে সরে নামায পড়তেন। কেননা সেদিকে মুখ করে নামায পড়ায় পাথর পূজার সন্দেহ বিদ্যমান ছিলো।

হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর জীবন পারস্পরিক আপোষ কামনায় পূর্ণ ছিলো। তিনি মুসলমানদের পারস্পরিক বিরোধের আপোষ কাজে অংশ নিয়েছেন। কিন্তু সমকালীন শাসকের বিরুদ্ধে কোনো তৎপরতায় অংশ নেননি। তবে যা হক হিসেবে মনে করতেন তা খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করতেন। এতে সমকালীন শাসকের কপাল কুঁচকে গেলেও তিনি কোনো পরওয়া করতেন না। তার সত্য কথন এবং স্পষ্টবাদিতার কিছু ঘটনা ওপরে বর্ণনা করা হয়েছে। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে তাঁর এ হক কথনই তাঁর শাহাদাতের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, একবার এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, মশার খুনের কাফফারা কি ? তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে ? সে বললো, ইরাকী। তিনি বললেন, তোমরা এ ব্যক্তিকে দেখ। সে আমার কাছে মশার রক্তের কাফফারা কি তা জিজ্ঞেস করছে। প্রকৃতপক্ষে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কলিজার টুকরাকে শহীদ করেছে। যাদের ব্যাপারে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, এ দু'জন (হাসান ও হোসাইন) দুনিয়ার বাগানে দু'টি ফুল।

কারবালার ঘটনার ব্যাপারে এ ধরনের আবেগ প্রকাশ ক্ষমতাসীন মহলকে উত্তেজিত করতে পারতো। কিন্তু হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু এ ব্যাপারে কোনো পরওয়া করেননি। অন্তরে যা থাকতো নির্দ্বিধায় তা প্রকাশ করতেন।

হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত সঠিক রায় সম্পন্ন এবং বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। চরিত্রকাররা তাঁর বেশ কিছু অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন ঃ

০ সবচেয়ে সহজ নেকী হলো প্রফুল্লমুখ এবং মিষ্টি কথা।

০ শত্রুর কাছ থেকে হলেও জ্ঞান অর্জন করো।

০ অন্যের দোষ খোঁজার আগে নিজের দোষের প্রতি নজর দাও।

০ যেভাবে মিষ্টি শরবত পান করে থাকো, তেমনি ক্রোধ হজম করো।

০ আল্লাহর কাছে কোনো বান্দাহ যতই প্রিয় হোক না কেন, কিন্তু সে যখন পার্থিব কিছু পায় তখন আল্লাহর কাছে তার মর্যাদা নিসন্দেহে কমে যায়।

০ মানুষ সেই সময় জ্ঞানীদের দলভুক্ত হতে পারে, যখন সে নিজের চেয়ে উঁচু লোককে শত্রু ঠাওরাবে না এবং নিজের চেয়ে কম জ্ঞানসম্পন্নকে অবজ্ঞা করবে না। আর নিজের জ্ঞানের মূল্য নেবে না।

০ চরিত্র খারাপ হলে ঈমানও খারাপ হবে।

০ পাপ করতে চাইলে সেই স্থান তালাশ করো যেখানে আল্লাহ নেই।

০ ইবাদাতের স্বাদ হাসিল করতে চাইলে একাকীত্ব তালাশ করো। বন্ধু এবং ওয়াকিবহাল লোকদের থেকে পৃথক হয়ে যাও। কিন্তু এটা রুজী তালাশের পর এবং পরিবার-পরিজনকে মিষ্টি ঘুমের ব্যবস্থা করে দেয়ার পর।

০ আমি প্রথম হাদীসের ওপর আমল করি। তারপর তা মানুষকে শুনাই।

সাইয়েদেনা ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আকার ও আকৃতিতে নিজের মর্যাদাবান পিতা হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো ছিলেন। লম্বা দেহ, গমের মতো রং এবং হৃষ্টপুষ্ট শরীর ছিলো। কাঁধ পর্যন্ত চুল ছিলো। কখনো কখনো সিঁথি কাটতেন। এক মুঠো দাড়ি এবং পাতলা করে মুচ রাখতেন। ইবনে সায়াদের বর্ণনা মতে হলুদ খেজাব মাখতেন।

যেসব সাহাবী এবং তাবেয়ী হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দেখেছেন তারা এক বাক্যে তাঁর সচ্চরিত্রাবলী, জ্ঞানের গভীরতা এবং মর্যাদার প্রশংসা করেছেন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন, নবী যুগের অনুসরণ প্রশ্নে তাঁর মতো আর কেউ ছিলো না। হযরত হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর প্রত্যেক ব্যক্তিই কিছু না কিছু বদলে গিয়েছিলো। কিন্তু ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তাঁর পুত্রের কোনো পরিবর্তন হয়নি। হযরত

www.bjilibrary.com

সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, আমি একমাত্র ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর জান্নাতী হওয়ার সাক্ষী দিতে পারি। মাইমুন বিন মিহরান (র) বলতেন, আমি ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বড় কোনো মুত্তাকী ও পরহেযগার মানুষ দেখিনি। হযরত সালমা (র) বিন আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যুর পর আমি তার মতো আর কাউকে দেখিনি। মর্যাদার দিক থেকে তিনি নিজের পিতার কাছাকাছি ছিলেন।

www.bjilibrary.com

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু

উম্মুল মু'মিনীন হযরত মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু আনহার একজন ভাগিনেয় ছিলো। এ কিশোর ভাগিনেয়কে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন। ভাগিনেয়ও শুধু খালাকেই ভালোবাসতেন না বরং উচ্চতম মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত খালু হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও অত্যন্ত ভালোবাসতো এবং সীমাহীন মর্যাদা দিতো। এজন্যে সে শ্রদ্ধেয় খালার বাড়ীতে যেতো। অত্যন্ত ব্যস্ততার সাথে সেখানে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ছোটখাটো কাজও করে দিতো এবং তাঁর কাছ থেকে দোয়া নিতো। কোনো কোনো সময় খালার বাড়ীতেই কাটাতো। এভাবে সে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহচর্য লাভের সুবর্ণ সুযোগ পেতো। একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতের শেষাংশে নামাযের জন্য দাঁড়ালেন। সে সময় এ সৌভাগ্যবান যবুকও তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে গেলো। তিনি তার হাত ধরে নিজের বরাবর দাঁড় করিয়ে দিলেন। যুবকটি তাঁর বরাবরই দাঁড়িয়ে গেলো। কিন্তু যেই প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায শুরু করলেন, তখনই সে পিছনে হটে গেলো। সালাম ফেরানোর পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "আমি তোমাকে আমার সাথে দাঁড় করালাম, তুমি পেছনে হটে গেলে কেন ? সে অত্যন্ত আদবের সাথে আরজ করলো ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল ! কে এত বড় সাহসী যে, সে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বরাবর দাঁড়িয়ে নামায পড়ে। আমি কি করে হুজুরের বরাবর দাঁড়িয়ে নামায পড়ি ? আমার এ ধরনের সাহস ও শক্তি নেই। তার জবাব শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত খুশী হলেন এবং আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন ঃ হে আল্লাহ! তুমি এ ছেলেকে প্রভুত জ্ঞানে বিভূষিত করো এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও বিচক্ষণতা দান করো।"

উম্মুল মু'মিনীন হযরত মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু আনহার এ ভাগিনেয়—যার ব্যাপারে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর কাছে জ্ঞান, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা প্রদানের দোয়া করছিলেন তিনি ছিলেন হাশেমী বংশের উজ্জ্বল প্রদীপ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু।

যেসব সাহাবী জ্ঞান ও মর্যাদার দিক থেকে উম্মাহর স্তম্ভ হিসেবে বিবেচিত হতেন সাইয়েদেনা হযরত আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু সেসব সাহাবীর মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। তাঁর বংশীয় মর্যাদা সম্পর্কে

www.bjilibrary.com

এতটুকু লেখাই যথেষ্ট যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয় চাচা হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবদুল মুত্তালিবের সন্তান ছিলেন। তাঁর মাতা হযরত উম্মুল ফজল লুবাবাহ রাদিয়াল্লাহ আনহাও অত্যন্ত মর্যাদাবান মহিলা সাহাবী ছিলেন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহ আনহা মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহ আনহার পরেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত মাইমুনা রাদিয়াল্লাহ আনহা হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহুর আপন খালা ছিলেন। এ সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের চাচাতো ভাই ছাড়াও খালুও হতেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহুর মশহুর উপাধিগুলো হলো ঃ আল হিবর (একজন বিরাট জ্ঞানী), আল বাহর (জ্ঞানের সমুদ্র), তরজুমানুল কুরআন (কুরআনের ভাষ্যকার) এবং মুফাসসিরদের ইমাম।

হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহুর আরও কয়েকজন সন্তান ছিলেন। কিন্তু যখনই ইবনে আব্বাস বলা হয় তখনই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকেই বুঝানো হয়।

হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু নবীর হিজরাতের তিন বছর পূর্বে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। সে যুগে কুরাইশের মুশরিকরা বনু হাশেম এবং বনু মুত্তালিব গোত্রকে শেয়েবে আবি তালিবে আটক করে রেখেছিলো। হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু এ আটক অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেন। ইবনে আসির (র) উসুদুল গাব্বাহ গ্রন্থে লিখেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু ভুমিষ্ঠ হওয়ার পর হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু তাকে কোলে করে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবজাতকের জন্য দোয়া করলেন। বহু ঐতিহাসিক এবং চরিতকার লিখেছেন, হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরাতের পূর্বে মুসলমান হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রেখেছিলেন। মক্কা বিজয়ের (৮ম হিজরী) কিছুদিন পূর্বে তিনি ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করেন এবং সাথে সাথে নিজের পরিবার-পরিজনসহ হিজরত করে মদীনা গমন করেন। অবশ্য তাঁর পত্নী হযরত উম্মুল ফজল রাদিয়াল্লাহ আনহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়াত প্রাপ্তির প্রথম যুগেই প্রকাশ্যভাবেই মুসলমান হয়েছিলেন। বস্তুত হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু নিজের জন্মের প্রথম দিন থেকেই তাওহীদের ছায়াতলে

www.bjilibrary.com

লালিত-পালিত হন। পিতা-মাতার সাথে হিজরতের সময় তাঁর বয়স ছিলো প্রায় ১১ বছর। মদীনায় পৌঁছে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমত এবং সাহচর্য লাভের সুযোগ পান। তাছাড়া তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। পিতার নির্দেশ অনুযায়ী অধিকাংশ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কাটাতেন এবং তাঁর বাণীসমূহ শোনার সুযোগ পেতেন। একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে ফিরে এসে হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহুকে বললেন, আজ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশে এমন এক ব্যক্তিকে দেখলাম যাকে আমি চিনি না। তার সম্পর্কে জানতে পারলে কতই না ভালো হতো।

হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহুর কথা উল্লেখ করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ডেকে পাঠালেন এবং স্নেহের সাথে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তিনি তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন এবং দোয়া করলেন ঃ

"হে আল্লাহ, তার ওপর বরকত অবতীর্ণ করুন এবং তাকে জ্ঞানের আলো বিতরণের মাধ্যম বানিয়ে দিন।"-(আল ইসাবাহ)

হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির ছিলেন। কিন্তু তবুও শৈশবকাল। এজন্যে মাঝে মধ্যে সম বয়সী বালকদের সাথে খেলাধুলা করার জন্যে মদীনার অলিগলিতে চলে যেতেন। এ যুগের একটি ঘটনা তার সারা জীবন স্মরণ ছিলো। নিজেই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন ঃ

ছেলেদের সাথে গলিতে খেলাধুলা করতাম। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাশরীফ আনতে দেখলাম। এ অবস্থায় দৌড়ে এক বাড়ীর দরজার পেছনে পালালাম। কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে দেখে ফেলেছিলেন। তিনি অগ্রসর হয়ে আমাকে ধরে ফেললেন এবং মাথার ওপর হাত বুলিয়ে বললেন, যাও, মাবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহুকে ডেকে আনো। মাবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহু কাতিবে (লেখক) অহী ছিলেন। আমি দৌড়ে দৌড়ে হযরত মাবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে গেলাম এবং তাঁকে ডেকে আনলাম।"-(মুসনাদে আহমাদ)

হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু অধিকাংশ সময় খালা উম্মুল মু'মিনীন হযরত মাইমুনা রাদিয়াল্লাহ আনহার কাছে কাটাতেন। এবং কখনো কখনো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাড়ীতেই শুয়ে থাকতেন।

www.bjilibrary.com

একবার খালার কাছে শুয়েছিলেন। এ সময় প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাশরীফ আনলেন এবং চার রাকাআত নামায পড়ে আরাম করলেন। তখনো কিছু রাত বাকী ছিলো। তিনি ঘুম থেকে জাগলেন এবং মশকের পানি থেকে অযু করে নামায শুরু করলেন। তিনিও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাঁ দিকে দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি মাথা ধরে তাকে ডান দিকে দাঁড় করিয়ে দিলেন।-(সহীহ আল বুখারী)

একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযের জন্যে ঘুম থেকে জাগলেন। এ সময় তিনি পাত্র ভরা পানি পেলেন। অযু করার পর তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত মাইমুনা রাদিয়াল্লাহ আনহাকে জিজ্ঞেস করলেন, অযুর পানি কে এনেছিলো ? তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের দিকে ইঙ্গিত করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত খুশী হলেন এবং দোয়া করলেন ঃ "হে আল্লাহ ! তাকে দীনের সমঝ দান করো এবং তার ব্যাখ্যার পদ্ধতিও শিখিয়ে দাও।"

মোটকথা শৈশবকালেই তিনি কয়েকবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতের মাধ্যমে দোয়া নেয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের বয়স সবেমাত্র ১৩ বছর হয়েছিলো। ঠিক এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাত হয়ে গেলো। বস্তুত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে তার বয়স ছিলো কম। এজন্যে তিনি কোনো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। এ প্রসঙ্গে একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য বয়স কমপক্ষে ১৫ বছর নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহুর খেলাফাতকালেও তিনি এ ব্যাপারে কোনো কৃতিত্ব দেখানোর সুযোগ পাননি। এ সত্ত্বেও তিনি বড় বড় সাহাবার কাছ থেকে জ্ঞানের জগতে উপকৃত হতে থাকলেন এবং তাঁর খ্যাতি একজন তীক্ষ্ণ ধী ও মেধাসম্পন্ন যুবক হিসেবে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু খেলাফাতের দায়িত্ব পেলেন। এ সময় তিনি হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহুর যোগ্যতার প্রকাশ্য স্বীকৃতি দিলেন এবং তার সাহস, বুদ্ধি ও প্রশিক্ষণের ওপর বিশেষ নজর দিলেন। তিনি নিজের জ্ঞানের সাহচর্যের জন্য যেখানে বড় বড় সাহাবা রাদিয়াল্লাহ আনহুমদেরকে ডাকতেন সেখানে হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহুকে ডেকে পাঠাতেন। এ কারণে তাঁকে অনেকেই ঈর্ষা করতেন। সহীহ আল বুখারীতে স্বয়ং হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু আমাকে বদরী সাহাবীদের সাথে বসাতেন। একবার কতিপয় বুযর্গ

www.bjilibrary.com

আশ্চর্য হয়ে বললেন যে, আপনি এ যুবককে আমাদের সাথে বসান। তার সমান তো আমাদের ছেলেরা (অথবা তার সমবয়সী আমাদের ছেলেদেরকে তো এখানে বসার সুযোগ দেন না)। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন, এ সেই ব্যক্তি যার যোগ্যতা সম্পর্কে তোমরা অবহিত আছো।

হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ্ আনহুর মজলিসে কোনো কোনো সময় এমন মাসয়ালা উত্থাপিত হতো যার জবাব হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু দিতে চাইতেন। কিন্তু নিজের কম বয়সের কারণে বড় সাহাবাদের সামনে কথা বলতে সংকোচবোধ করতেন। এ অবস্থায় আমীরুল মু'মিনীন স্পষ্ট ভাষায় তাঁকে সাহস যোগাতেন। তিনি বলতেন, ইবনে আব্বাস, জ্ঞান বয়স কমবেশী হওয়ার ওপর নির্ভর করে না। তুমি নিজেকে অবজ্ঞার পাত্র মনে করো না। যা সঠিক মনে করো অথবা অন্তরে যে ধারণার উদ্ভব হয় তা নির্দ্বিধায় বলে দেবে।"–(সহীহ আল বুখারী)

হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) "আল ইসতিয়াব" গ্রন্থে লিখেছেন, আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহুকে অত্যন্ত মর্যাদা দিতেন এবং খুব ভালোবাসতনে।

বিভিন্ন নেতৃস্থানীয় চরিতকারের উদ্ধৃতি দিয়ে "দায়েরায়ে মায়ারেফে ইসলামিয়া" গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সুন্দর আচার-আচরণ, চেহারার ঔজ্জ্বল্য এবং আল্লাহর কিতাবের সমঝের কারণে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহুকে অত্যন্ত মর্যাদা দিতেন এবং কঠিন সমস্যায় তাঁর সাথে পরামর্শ করতেন ও তাঁর মতের ভিত্তিতেই কাজ করতেন। তিনি বলতেন যে, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় জ্ঞানী ও আলেম। সে প্রৌঢ়দের যুবক অথবা নওজোয়ান বুযর্গ ব্যক্তি। তিনি বেশীর ভাগ প্রশ্ন করেন এবং অন্তর বুদ্ধিদীপ্ত।

কতিপয় বর্ণনায় আছে যে, হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু মিসর করায়ত্ব করার জন্যে হযরত আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহ্ আনহুকে নিয়োগ করেন। এ সময় হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহুও জিহাদের জন্যে মিসর গমন করেন। (১৮-২১ হিজরীর মধ্যবর্তী কোনো এক সময়ে)।
–(দায়েরায়ে মায়ারেফে ইসলামিয়া)

হযরত ওসমান জুন্নুরাইন রাদিয়াল্লাহ আনহুর খেলাফতকালে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবি সারায়াহর নেতৃত্বে আফ্রিকায় সেনাবাহিনী প্রেরণ করা (২৭ হিজরী) হয়। হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহুও

www.bjilibrary.com

একটি দলের সাথে এ অভিযানে অংশ নেন। একবার তাঁকে দূত বানিয়ে আফ্রিকার শাসক গ্রেগরীর কাছে প্রেরণ করা হয়। হাফেজ ইবনে হাজার "ইসাবাহ" গ্রন্থে লিখেছেন, তিনি গ্রেগরীর সাথে অত্যন্ত সুন্দরভাবে কথা বলেন। গ্রেগরী তাঁর অসাধারণ মেধা ও যোগ্যতায় অভিভূত হয়ে পড়েন এবং তিনি অকপটভাবে বলে ফেলেন ঃ "আপনি হাবারে আরব অর্থাৎ আপনি আরবের একজন বড় আলেম বা জ্ঞানী।"

২৯-৩০ হিজরীতে হযরত ওসমান জুন্নুরাইন রাদিয়াল্লাহ আনহুর নির্দেশে কুফার গভর্নর হযরত সাঈদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আস জারজান এবং তাবারিস্তানের ওপর চড়াও হন। ইবনে আসির (র) বর্ণনা করেছেন, হযরত সাঈদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আসের বাহিনীতে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু, হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবাইর রাদিয়াল্লাহ আনহু, হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহ আনহু ও হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহ আনহুর মত কুরাইশদের সব যুবক অন্তর্ভুক্ত ছিলো।-(উসুদুল গাব্বাহ)

২৫ হিজরীতে বিবাদকারীরা মদীনা ঘিরে নিলো এবং অবরোধ করলো। এ সময় হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু যথাসাধ্য আমীরুল মু'মিনীনকে সমর্থন দিলেন। এক বর্ণনা মতে তিনি কুরাইশের অন্যান্য যুবকসহ খলিফার দরজাতে গিয়ে পাহারাও দিয়েছিলেন। এ সময় হজ্জের মওসুম এসে পড়লো। বস্তুত আমীরুল মু'মিনীন অবরুদ্ধ ছিলেন এবং মক্কা যেতে পারছিলেন না। এজন্যে তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে আমীরে হজ্জ হিসেবে নিয়োগ করলেন এবং যথাযথ নির্দেশসহ হজ্জের কাফেলার সাথে মক্কা মোয়াজ্জামা প্রেরণ করলেন। এভাবে আমীরুল মু'মিনীন যেন হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহুকে নিজের স্থলাভিষিক্ত বানিয়ে দিলেন। তিনি মক্কাতেই ছিলেন এমন সময় আমীরুল মু'মিনীনের শাহাদাতের মত হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটে গেলো। হজ্জে নেতৃত্বের দায়িত্ব পালনের পর মদীনায় ফিরে এলেন। তখন সেখানে কিয়ামাতের মত অবস্থা বিরাজ করছিলো। হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহুর শাহাদাতের পর জনগণ হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুকে খেলাফাতের দায়িত্ব প্রদানের জন্যে বাধ্য করছিলো। তিনি এ প্রশ্নে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহুর পরামর্শ চাইলেন। তিনি বললেন, এখন যাকেই খেলাফাতের দায়িত্ব দেয়া হবে, তাকেই হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহুর হত্যার অপবাদ সইতে হবে। কিন্তু এখন আপনার প্রয়োজন। এজন্যে আল্লাহর ওপর ভরসা করে আপনি এ দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিন।

অন্য এক রাওয়ায়েতে হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে এ বাক্যাবলী সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে। "আপনি ঘরের দরজা বন্ধ করে থাকুন অথবা

www.bjilibrary.com

আপনি জায়গীরে (সরকার প্রদত্ত জমিদারী) চলে যান এবং নীরবতার ভূমিকা পালন করুন। এসব মানুষ সারা দুনিয়া তন্ন তন্ন করে ফিরবে।

কিন্তু আপনি ছাড়া কাউকেই তারা খেলাফাতের দায়িত্ব বহনের যোগ্য পাবে না। আল্লাহর কসম, আপনি যদি মিসরীয়দেরকে নিজের সাথে নেন, তাহলে মানুষ অবশ্যই আপনাকে ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যার অপবাদ দেবে।"

হযরত আলী কাররামুল্লাহু ওয়াজহাহু নির্জনত্ব অবলম্বন ঠিক মনে করলেন না এবং মদীনাবাসীদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে খেলাফাতের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। নতুনভাবে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু হলো। এ সময় হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু সিরিয়ার গভর্নর আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরিবর্তে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নিয়োগ করতে চাইলেন। তিনি এ পদ গ্রহণে ওজর পেশ করলেন এবং আমীরুল মু'মিনীনকে পরামর্শ দিয়ে বললেন ঃ "আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বর্তমান পদে বহাল রাখুন ও তাঁকে আপনার সমর্থক বানিয়ে নিন। তিনি হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাল থেকেই সিরিয়ার গভর্নর হিসেবে কাজ করে আসছেন।"

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এ পরামর্শ গ্রহণ করলেন। তবে হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকেও সিরিয়া যেতে বাধ্য করলেন না। যাহোক হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে বাইয়াত করলেন এবং তাঁকে সহযোগিতা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন।

৩৬ হিজরীতে দুঃখজনক উষ্ট্রের যুদ্ধ সংঘটিত হলো। হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষ থেকে অত্যন্ত বাহাদুরীর সাথে লড়াই করলেন। কতিপয় নেতৃস্থানীয় চরিতকার লিখেছেন, তিনি হযরত আলী মুরতাজা রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাহিনীর হেজাজবাসীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সমর্থকরা বসরা দখল করে নিয়েছিলেন। উষ্ট্রের যুদ্ধে হযরত আলী বিজয়ী হলেন। এ সময় তিনি বসরা পুনর্দখল করলেন এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সেখানকার গভর্নর বানিয়ে দিলেন।

উষ্টের যুদ্ধের পর হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যে মতপার্থক্য ব্যাপক আকার ধারণ করলো। এমনকি সিফফিনের যুদ্ধ সংঘটিত হলো। হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বসরাবাসীদের সৈন্যসহ হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাহায্যের জন্য উপস্থিত হলেন। তিনি হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নিজের

www.bjilibrary.com

বাহিনীর অফিসার বানালেন। তিনি অত্যন্ত বাহাদুরীর সাথে যুদ্ধ করলেন। যুদ্ধকালে উভয় পক্ষ সালিসীতে ঐকমত্য হলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহুও সালিসনামায় অন্যতম দস্তখতকারী ছিলেন। আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহুর পক্ষ থেকে হযরত আমর ইবনুল আস এবং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর পক্ষ থেকে হযরত আবু মুসা আশয়ারী রাদিয়াল্লাহ আনহু সালিস হিসেবে নিয়োজিত হয়েছিলেন।

এক বর্ণনায় আছে যে, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু সালিস হিসেবে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে নিয়োগ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর বিরোধী পক্ষ আপত্তি তুলে বলেছিলেন যে, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং আপনি মূলতঃ এক। প্রকৃতপক্ষে সালিস বা তৃতীয় পক্ষ একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তি হওয়া উচিত।

সালিসীতে তেমন কোনো সন্তোষজনক ফল হলো না। তবুও যুদ্ধ বন্ধ হয়ে গেলো। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু কুফা প্রত্যাবর্তন করলেন এবং হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহু দামেস্ক ফিরে গেলেন। ইত্যবসরে খারেজীরা নাহরোয়ানে একত্রিত হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করলো। কথিত আছে যে, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর সালিসী কবুল করার কারণেই তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলো। তাদের কাছে দীনের ব্যাপারে সালিস নিয়োগ ছিলো কুফুরী।

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে যে, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু খারেজীদেরকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে এবং আলাপ-আলোচনা করে তাদেরকে সঠিক পথে আনার জন্য হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহুকে প্রেরণ করলেন। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু খারেজী বাহিনীতে পৌঁছলেন। এ সময় ইবনুল কাওয়াহ নামক তাদের এক সরদার বক্তৃতা দেয়ার জন্য দাঁড়ালেন এবং বললেন ঃ

"হে কুরআন বহনকারীরা ! ইনি আবদুল্লাহ বিন আব্বাস। আমি তাঁকে খুব ভালোভাবে চিনি। তাঁকে তাঁর দোস্তের [আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু] দিকে ফিরিয়ে দাও। আমাদের আলোচনার প্রয়োজন নেই।" একথার পর খারেজীদের আরও কতিপয় খতিব দাঁড়িয়ে গেলো এবং বললো, আমরা অবশ্যই তাঁর সাথে আলোচনা করবো। যদি তিনি হক কথা বলেন এবং আমরা তা বুঝতে সক্ষম হই, তাহলে আমরা তাঁর আনুগত্য করবো। আর যদি তিনি অসত্য কিছু বলেন, তাহলে আমরা তা প্রত্যাখ্যান করবো। বস্তুত তিনদিন পর্যন্ত হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং খারেজীদের মধ্যে কুরআনের উদ্ধৃতি সহকারে আলোচনা হলো। এর ফলে চার হাজার মানুষ নিজের ধারণা ত্যাগ করে তাওবা করলো।

www.bjilibrary.com

তাদের মধ্যে ইবনুল কাওয়াহ ছিলো। হযরত ইবনে আব্বাস তাদেরকে কুফায় হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে নিয়ে এলেন, কিন্তু অবশিষ্ট খারেজী নিজেদের মতের ওপর স্থির হলো। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু তাদের কাছে বাণী প্রেরণ করে বললেন, তোমরা যদি হত্যা কাণ্ড, ডাকাতি এবং জিম্মী প্রতিবেশীদের ত্যক্ত বিরক্ত না করো তাহলে যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করতে পারো। অন্যথায় আমি তোমাদের সাথে লড়াই করবো।"

খারেজীরা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর কথা শুনলেন না। সুতরাং আমীরুল মু'মিনীন রাদিয়াল্লাহ আনহু কুফা থেকে তাদেরকে উৎখাতের জন্যে রওয়ানা হলেন। অন্যদিকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু বসরা থেকে সাত হাজার মানুষসহ হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাহায্যের জন্যে রওয়ানা করলেন এবং নাখলিয়াহ নামক স্থানে তাঁর বাহিনীর সাথে মিলিত হলেন। নাহরোয়ানের কাছে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর এবং খারেজীদের মধ্যে রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হলো। এ যুদ্ধে খারেজীদের শিক্ষণীয় পরাজয় ঘটলো। যুদ্ধে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু অত্যন্ত বাহাদুরী প্রদর্শন করলেন।

নাহরোয়ানের যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর বেঁচে যাওয়া খারেজীরা ইরানে প্রবেশ করে এবং সেখানকার জিম্মীদেরকে সাথে নিয়ে হৈ চৈ ও গণ্ডগোল শুরু করে দিলো। ইরানবাসীরা অধিকাংশ প্রদেশ থেকে সরকারী কর্মচারীদের বের করে দিলো এবং খিরাজ ও জিযিয়া প্রদানে অস্বীকৃতি জানালো। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু নিজের সকল রাজস্ব আদায়কারী ও কর্মচারীদেরকে ডেকে পাঠালেন এবং তাদের কাছে এ বিশৃঙ্খলার প্রশ্নে মত চাইলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু আরজ করলেন ঃ "ইরানের অবস্থা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব আমি নিচ্ছি।"

বস্তুত বসরার সীমানা ইরানের বিদ্রোহী জেলাসমূহের সীমানার সাথে মিলিত ছিলো এবং হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বসরার নেতৃত্বের দায়িত্ব খুব ভালোভাবেই আনজাম দিচ্ছিলেন। এজন্যে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁকে সমগ্র ইরানের শাসনও অর্পণ করলেন এবং সেখানকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার সকল দায়িত্বও তাঁর ওপরই ন্যস্ত করলেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু বসরা ফিরে যিয়াদ বিন আবিয়াহর নেতৃত্বে এক বিরাট বাহিনী ইরানে প্রেরণ করলেন। এ বাহিনী প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিলো বিদ্রোহীদের উৎখাত। অল্প সময়ের মধ্যেই যিয়াদ বিদ্রোহীদেরকে দমন করলো এবং কারমান, ফারিস এবং ইরানের অন্যান্য সকল প্রদেশে পূর্ণ শান্তি ও শৃংখলা ফিরিয়ে আনলেন।

www.bjilibrary.com

কিছুদিন পর হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বসরার ইমারতের পদ থেকে পদত্যাগ এবং মক্কা মোয়াজ্জামা গিয়ে নির্জন বাস শুরু করলেন। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বসরার ইমারত থেকে কখন পদত্যাগ করেছিলেন, এ ব্যাপারে বিভিন্ন রাওয়ায়েত রয়েছে। কেউ লিখেছেন যে, এ ঘটনা ৩৮ হিজরীতে ঘটে। কেউ বলেছেন, এ ঘটনা ঘটে ৩৯ এবং ৪০ হিজরীতে। এক বর্ণনায় এও বলা হয়েছে যে, তিনি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাত (৪০ হিজরী) পর্যন্ত বসরার ইমারাতের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। "দায়েরায়ে মায়ারেফে ইসলামিয়া"তে বর্ণিত আছে ঃ "এ বিচ্ছিন্নতা (বসরার ইমারাত) ৩৮ হিজরীতেই ঘটেছিলো। এ মত গ্রহণ প্রশ্নে শক্তিশালী কারণসমূহ রয়েছে।"

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বসরার ইমারাত থেকে কেন বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন ? এ প্রশ্নেও ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ এ কারণ হিসেবে লিখেছেন যে, বসরার কাজী আবুল আসওয়াদ দাওয়েলী তাঁর বিরুদ্ধে বাইতুল মালের অপচয়ের অভিযোগ এনেছিলেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর কাছে এর জবাব চেয়েছিলেন।

জবাবে তিনি লিখেছিলেন ঃ "আমীরুল মু'মিনীন ! আপনাকে যাকিছু বলা হয়েছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আমার কাছে যাকিছু আছে আমি তার রক্ষক। আপনি কোনো ধরনের খারাপ চিন্তা অন্তরে স্থান দিবেন না।"

এ চিঠি প্রাপ্তির পর হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর কাছে বাইতুল মালের পুংখানুপুংখ হিসাব চেয়ে পাঠালেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের এটা খুব মনে লাগলো এবং আমীরুল মু'মিনীনকে লিখে পাঠালেন ঃ "বসরাবাসীদের সম্পদ আমি অপচয় করেছি এ অভিযোগ আপনি বেশী গুরুত্ব দিতে চান বলে আমি অনুভব করছি। এজন্যে আপনি এ পদে যাকে উপযুক্ত মনে করেন তাকেই নিয়োগ করুন। আমি এ পদ ছেড়ে দিচ্ছি।"

এ ধরনের আরও কিছু বর্ণনা আছে, যা নিয়ে পাশ্চাত্য বিশারদরা খুব কাদা ছোঁড়াছুড়ি করেছেন। কিন্তু আমরা যখন দেখি যে, হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মৃত্যু পর্যন্ত সবসময় মুসলমানরা অত্যন্ত মর্যাদা এবং সম্মান করেছেন তখন একথাই বলতে হয় যে, ঐসব বর্ণনায় বেশী রং ছড়ানো হয়েছে। হতে পারে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে কোনো ব্যাপারে তাঁর মতবিরোধ হয়েছিলো। কিন্তু তিনি বাইতুল মালের সম্পদ অপচয় করেছিলেন একথা বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না।

www.bjilibrary.com

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের পর হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু খেলাফাতের দায়িত্ব পেলেন। এ সময় তিনি হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সেনাপতি নিয়োগ করলেন। দায়েরায়ে মায়ারেফে ইসলামীয়াতে বর্ণিত আছে যে, ইতিমধ্যে তিনি (ইবনে আব্বাস) আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে আপোষ প্রচেষ্টা শুরু করলেন। কিন্তু একথা পরিষ্কার করে বলা হয়নি যে, তিনি এ কাজ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে করেছিলেন। অথবা ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুর বলার পর করেছিলেন। খুব সম্ভব তিনি ইবনে আব্বাসই ছিলেন, যিনি খেলাফাতের দুই দাবীদারের মধ্যে আপোষ করিয়েছিলেন।

ঘটনা যাই হোক, এটা বাস্তব যে, সাইয়েদেনা হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফত থেকে সরে দাঁড়ানোর আগেই হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে চিঠি লিখে জান ও মালের নিরাপত্তা নিয়ে নিয়েছিলেন এবং মক্কা গিয়ে নীরবতা অবলম্বন করেছিলেন।

আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর সুদীর্ঘ খেলাফাতকালে হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হেজাজেই স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। কিন্তু এ যুগে তিনি আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে সাক্ষাতের জন্য প্রায়ই দামেস্ক যেতেন। বনু হাশেমের স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি সেখানে গমন করতেন। সাইয়েদেনা হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইন্তেকালের সময় তিনি দামেস্কেই ছিলেন। আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে সাক্ষাত হলো। তিনি ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইন্তেকালে তাঁর কাছে গভীর শোক প্রকাশ করলেন। হাফেজ ইবনে আবদুল বার (র) আল ইসতিয়াবে বর্ণনা করেছেন যে, এ সময় উভয় বুযর্গের মধ্যে নিম্নলিখিত কথোপকথন হয়েছিলো ঃ

হযরত আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ঃ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ! আল্লাহ তোমাদেরকে আবি মুহাম্মাদুল হাসান বিন আলীর মৃত্যুতে সওয়াব দিক।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস অশ্রু সংবরণ করতে করতে বললেন ঃ ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহর কসম ! তাঁর মৃত্যুতে আপনার কবর পূর্ণও হবে না এবং দীর্ঘায়ু হবেন না। আল্লাহর কসম ! তাঁর মৃত্যুতে আমাদেরকে মহান ব্যক্তির মৃত্যুর দুঃখ পেতে হয়েছে। আল্লাহর কসম! তাঁর পরে আমাদের কিইবা করার ছিলো।

হযরত আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ঃ সে কতো বয়সের হয়েছিলো ?

www.bjilibrary.com

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু ঃ তাঁর জন্মের ঘটনা এত মশহুর যে, তাঁর বয়স জিজ্ঞেস করা আপনার প্রয়োজন নেই।

হযরত আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহু ঃ আমার ধারণা, তিনি ছোট ছোট শিশু রেখে গেছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু ঃ আমরা সবাই ছোট ছিলাম। অতপর বড় হয়েছি। আল্লাহ নিজের রহমতের সুশীতল ছায়াতলে আবি মুহাম্মদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে টেনে নিয়েছেন। তবে, এখনো আবু আবদুল্লাহকে [হুসাইন রাদিয়াল্লাহ আনহু] জীবিত রেখেছেন এবং তাঁর মতো ব্যক্তিরা সালেহ হিসাবেই পরিগণিত।

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু যখনই হযরত আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে মিলিত হতেন তখনই তাঁকে অত্যন্ত সম্মান করতেন এবং তোহফা ও উপঢৌকন দিতেন।

প্রখ্যাত শিয়া ঐতিহাসিক মুহাম্মদ বিন আলী বিন তাবা (ইবনে তাকতাকী) বর্ণনা করেছেন ঃ

আশরাফ কুরাইশদের মধ্যে আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু, আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রাদিয়াল্লাহ আনহু, আবদুল্লাহ বিন জাফর রাদিয়াল্লাহ আনহু, আবদুল্লাহ বিন ওমর, আবদুর রহমান বিন আবি বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু, আবান বিন ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং আবি তালিবের বংশধররা আমীর মুয়াবিয়ার কাছে গমন করতেন। তিনি তাদেরকে অত্যন্ত খাতির এবং মেহমানদারী করতেন। তাঁদের সকল প্রয়োজন পূরণ করতেন। পক্ষান্তরে এ সকল ব্যক্তি তাঁর সাথে কঠিন ভাষায় কথা বলতেন। কিন্তু আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁদের কথা হেসে উড়িয়ে দিতেন অথবা এড়িয়ে যেতেন এবং তাদেরকে মূল্যবান উপঢৌকন ও বিরাট অংকের অর্থ দিতেন।"-(আল ফাখরী)

৪৯-৫০ হিজরী অথবা অন্য বর্ণনা মতে ৫১-৫২ হিজরীতে আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহু কাসতানতুনিয়া দখল করার জন্যে সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু কুরাইশ যুবকদের সাথে এ বাহিনীতে যোগ দেন এবং রোমীয়দের বিরুদ্ধে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর সৌভাগ্য অর্জন করেন। এ বাহিনী সম্পর্কে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন যে, আমার উম্মতের যে প্রথম বাহিনী কাইসারের শহরে জিহাদ করবে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন।

৬০ হিজরীতে আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহুর মৃত্যুর পর ইয়াজিদ সিংহাসনে বসলো। অন্যদিকে সাইয়েদিনা হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহ আনহু

৮—

www.bjilibrary.com

কূফাবাসীর পীড়াপীড়িতে মক্কা থেকে বের হবার প্রস্তুতি নিলেন। এ সময় হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এলেন এবং বললেন—"হে চাচাত ভাই ! আমি জানতে পেরেছি যে, তুমি নাকি কূফা যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করো ?" হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু জবাব দিলেন, "ইচ্ছাতো তাই।"

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন ঃ "হে চাচার পুত্র ! আমি আল্লাহর কাছে তোমার জন্যে ক্ষমা চাই। এ ইচ্ছা পরিত্যাগ করো।"

সাইয়েদেনা হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু জবাবে বললেন ঃ "আমি দৃঢ়ভাবেই ইচ্ছা করেছি। এখন যেতেই হবে।"

হযরত ইবনে আব্বাস বললেন ঃ "তুমি কি সেই জাতির কাছে যেতে চাও, যারা নিজেদের ওয়ালিকে শহর থেকে বের করে দিয়েছে এবং আইন-শৃংখলা নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে যদি তারা এ কাজ করেই থাকে তাহলে তুমি অবশ্যই তাদের কাছে চলে যাও। আর যদি তাদের ওয়ালি তাদের ওপর যথাযথ শাসন কাজ চালায় এবং তাদের কাছ থেকে রাজস্ব ইত্যাদি আদায় করে তাহলে তার অর্থ হলো যে, তারা তোমাকে যুদ্ধের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ার দাওয়াত দিচ্ছে। আমার আশংকা যে, তারা তোমাকেও সেভাবেই পরিত্যাগ করবে যেভাবে তোমার পিতা এবং ভাইকে পরিত্যাগ করেছিলো।"

সাইয়েদেনা হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন ঃ "হে চাচার পুত্র ! আপনার বক্তব্য আমি চিন্তা করবো।"

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু সেই সময় ফিরে গেলেন। কিন্তু যখন তিনি জানতে পারলেন যে, হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজের ইচ্ছার ওপর দৃঢ় রয়েছেন তখন তিনি তৃতীয়বার তাঁর কাছে গেলেন এবং বললেন ঃ হে চাচার পুত্র ! আমি এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার জন্য অনেক চেয়েছি। কিন্তু অন্তর মানে না। আমি আবারো বলছি, তুমি কূফা যেয়ো না। এতে তোমার ক্ষতির আশংকা রয়েছে। কূফাবাসী বিশ্বাসঘাতক। তাদের ওপর ভরসা করো না। তুমি এ শহরের বাসিন্দাদের নেতা। একথা যদি তুমি না মান, ইয়েমেন চলে যাও। সেখানে দুর্গ, ঘাটি এবং সুড়ঙ্গ রয়েছে। এলাকাও দৈর্ঘ এবং প্রস্থে বিশাল ও সংরক্ষিত। সেখানে তোমার পিতার সমর্থনকারীরাও আছে। এমনিতে তুমি সেখানে মানুষের কাছ থেকে দূরে থাকবে। তবে তুমি মানুষের কাছে চিঠিপত্র আদান-প্রদান করতে পারবে। সেখান থেকেই তুমি নিজের প্রতিনিধিদেরকে সমগ্র দেশে প্রেরণ করতে পারো। যদি তুমি এ কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করো তাহলে তুমি তোমার উদ্দেশ্য সফল হবে বলে আশা করি।"

www.bjilibrary.com

সাইয়েদেনা হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু জবাব দিলেন ঃ "হে চাচার পুত্র ! আল্লাহর কসম ! আমি জানি আপনি আমার সত্যিকার শুভাকাংখী এবং বন্ধু। কিন্তু আমি এখন দৃঢ়ভাবে কুফা যাওয়ার ইরাদাহ করে ফেলেছি।"

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন ঃ "তুমি যদি একান্তই যেতে চাও তাহলে মহিলা ও শিশুদেরকে সাথে নিও না। আল্লাহর কসম ! আমার ভয় হয় যে, হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে যেভাবে পরিবার-পরিজনের সামনে শহীদ করা হয়েছিলো সেভাবে তোমাকেও না শহীদ করে ফেলা হয়।"

সাইয়েদেনা হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু জবাব দিলেন ঃ "হে চাচার পুত্র ! আমিতো পরিবার-পরিজন সহই যাবো।"

এবার হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু চুপ মেরে গেলেন। আল্লাহর ইচ্ছা এবং বিধিলিপিও ছিলো কারবালার হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটার। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে যাচ্ছিলেন। পথে হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে সাক্ষাত হলো। তাঁর ধারণা ছিলো যে, হযরত ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু খেলাফতের দাবীদার। এজন্যে তিনি হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর মক্কা ত্যাগে খুশী হবেন। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা ছিলো অন্যরূপ। স্বয়ং ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু সাইয়েদেনা হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মক্কায় অবস্থান করার এবং কুফায় না যাওয়ার পরামর্শ ইতিমধ্যেই দিয়েছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজের ধারণা অনুযায়ী ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ "হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর গমনে তোমার অন্তর ঠাণ্ডা হয়েছে।" অতপর এ কবিতা আবৃত্তি করলেন। কবিতার ভাবার্থ হলো ঃ

"হে পাখী ! এখনতো সমগ্র ময়দানের মালিক তুমি ! ডিম পাড়ো, তা দাও এবং যা যতক্ষণ চাও করো।"

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর সন্দেহ সঠিক বলে প্রমাণিত হলো। সাইয়েদেনা হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে কারবালার ময়দানে নিজের অনেক আত্মীয়-স্বজন এবং সমর্থক ও সাহায্যকারীসহ শিশু এবং মহিলাদের সামনে শহীদ করে ফেলা হলো। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এ হৃদয়বিদারক ঘটনা শুনে এত দুঃখিত হয়েছিলেন যে, সমগ্র জীবনই কেঁদে কেঁদে কাটিয়েছিলেন।

www.bjilibrary.com

হযরত ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহ আনহুর শাহাদাতের পর হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রাদিয়াল্লাহ আনহু মক্কায় খেলাফাতের দাবী এবং জনগণের কাছ থেকে খেলাফাতের বাইয়াত নেয়া শুরু করলেন। হেজাজের বিরাট সংখ্যক মানুষ তাঁর হাতে হৃষ্টচিত্তে বাইয়াত করলো। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁর হাতে বাইয়াতে অস্বীকৃতি জানালেন। তিনি ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহ আনহুর শত্রু হয়ে গিয়েছিলেন, তা নয়। বরং এর অন্য কারণ ছিলো। ইতিমধ্যে তিনি রাজনৈতিক ঝগড়া-বিবাদ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করেছিলেন। আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহু নিজের জীবদ্দশায় তাঁকে ইয়াজিদের আনুগত্য প্রকাশের কথা বলেছিলেন। এ সময়ও তিনি তা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁকে বাইয়াতের ওপর জোর দিলেন। কিন্তু তিনি তা মানলেন না।

কতিপয় বর্ণনায় আছে যে, বাইয়াত প্রশ্নে অব্যাহত অস্বীকৃতির কারণেই ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁকে এবং মুহাম্মদ বিন হানফিয়াকে গ্রেফতার করেছিলেন। ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহ আনহুর অন্য বড় শত্রু মুখতার বিন আবি ওবায়েদ ছাকাফি এ খবর পেলো। সে কুফা থেকে এক বড় বাহিনী প্রেরণ করলো। এ বাহিনী হঠাৎ করে আক্রমণ করে তাদেরকে মুক্ত করলো। এ বাহিনী ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহ আনহুর সৈন্যদের সাথেও সংঘর্ষে লিপ্ত হতে চাইলো। কিন্তু ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু নিষেধ করলেন এবং বললেন আমি হেরেমে রক্তারক্তি পসন্দ করি না। এ প্রসঙ্গে ইবনে আসির রাহ্মাতুল্লাহ আলাইহি মুখতারের দূত ও সে বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত এক ব্যক্তির জবানীতে দু'টি আশ্চর্য ধরনের কথা বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে একটি হলো ঃ হযরত ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহ আনহু মুহাম্মদ বিন হানাফিয়াহ রাহ্মাতুল্লাহ আলাইহি এবং ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহুকে জীবন্ত জ্বালিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। এ লক্ষ্যে তিনি তাঁর অবস্থান গৃহের (যেখানে তিনি আটক ছিলেন) চারপাশে স্তূপাকৃতির লাকড়ী জড়ো করেছিলেন।

দ্বিতীয়টি হলো ঃ যখন এ বাহিনী মক্কা পৌঁছলো তখন ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহ আনহু কা'বার গিলাফ ধরে আশ্রয় চাইলো। মনে হয় ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহ আনহুর বিরোধীরা তাঁর দুর্নামের লক্ষ্যে কথা দু'টি রচনা করেছিলো। বুদ্ধি ও বিবেকের সাথে পর্যালোচনা করলে ব্যাপারটি নিসন্দেহে ভুল বলে প্রমাণিত হবে। হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রাদিয়াল্লাহ আনহু যদিও বয়সের দিক দিয়ে ছোট ছিলেন, তবুও জ্ঞান, মর্যাদা ও মধুর চরিত্রের দিক থেকে তিনি বড় বড় সাহাবা রাদিয়াল্লাহ আনহুমদের মধ্যে পরিগণিত

www.bjilibrary.com

হতেন। বাইয়াতের অস্বীকৃতির কারণে তিনি কাউকে জীবিত জ্বালিয়ে দেয়ার কথা চিন্তাও করতে পারতেন না। হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত মুহাম্মদ বিন হানফিয়া (র) কোনো মামুলি ধরনের ব্যক্তিত্ব ছিলেন না যে, তাদেরকে জ্বালিয়ে দেয়া যেতো। আর মক্কাবাসী তা শুধু তামাসার সাথে দেখতো। হযরত ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু আরবের অন্যতম বাহাদুর ছিলেন। বিরোধীদের একটি বাহিনী দেখে তিনি কা'বার গিলাফ ধরে আশ্রয় চেয়েছিলেন একথা নির্ভেজাল মিথ্যা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।

বিভিন্ন বর্ণনা সামনে রাখলে ঘটনাটি এ দাঁড়ায় ঃ

১. ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও মুহাম্মদ বিন হানফিয়াহকে (র) বাইয়াত বা আনুগত্যের দাবী জানিয়েছিলেন। যখন তাঁরা তা মানলেন না তখন তাঁদেরকে তাঁদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দিলেন।

২. মুখতার বিন আবি ওবায়েদ ছাকাফি হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকারীদের প্রতিশোধ নিলো। এতে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং মুহাম্মদ বিন হানফিয়া রাহমাতুল্লাহ আলাইহি খুশী প্রকাশ করেছিলেন। পরে মুখতার ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলো। ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সন্দেহ হলো যে, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ও মুহাম্মদ বিন হানফিয়া রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তাকে সমর্থন করছেন। তিনি সাবধানতা স্বরূপ উভয় বুযর্গকেই ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নিজের গৃহে এবং মুহাম্মদ বিন হানফিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জমজমের চার দেয়ালের মধ্যে নজর বন্দী করে রাখলেন। কিন্তু তাঁরা সবসময়ই মক্কার বাইরে যাওয়ার শক্তি রাখতেন। হযরত মুহাম্মদ বিন হানফিয়াহ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কুফা গমনের ইচ্ছাও করেছিলেন। কিন্তু তাঁর কুফা আগমন মুখতার পসন্দ করতো না। এজন্যে তিনি মক্কাতেই অবস্থান করেছিলেন।

৩. মুখতার সেনাবাহিনীর একটি সশস্ত্র দলকে মক্কা প্রেরণ করলো। তারা দুই বুযর্গকেই মিনা নিয়ে এলো। এরপর তাঁরা ফিরে গেলো। মিনায় কিছুদিন অবস্থানের পর তাঁরা দু'জনেই তায়েফ চলে গেলেন। এক বর্ণনা মতে তায়েফ গমনের পূর্বে হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু কঠিন ভাষায় হযরত ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে কথা বললেন। এ সত্ত্বেও ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সাথে বাদানুবাদ করলেন না। মুখতার প্রেরিত বাহিনীর বিরুদ্ধে ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু মুখোমুখি হননি। কারণ, হেরেম শরীফে তিনি প্রথম রক্তারক্তি করতে চাননি।

www.bjilibrary.com

৪. এটা ঠিক যে, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাইয়াত বা আনুগত্য করেননি। তাই বলে তিনি ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর শত্রু ছিলেন না। তিনি প্রকাশ্যে তাঁর গুণ ও মর্যাদার স্বীকৃতি দিতেন। তিনি বলতেন, যদি তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামায প্রত্যক্ষ করতে চাও, তাহলে ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর নামায প্রত্যক্ষ করো।-(মুসনাদে আহমাদ)

সহীহ আল বুখারীতে ইবনে আবি মালিকা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি থেকে বর্ণিত আছে যে, একদিন আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বললাম, আপনি কি ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে লড়াই করে আল্লাহর হেরেমকে হালাল করতে চান ? জবাবে বললেন, আল্লাহর কসম ! হেরেমে রক্তারক্তি করা বনু উমাইয়া এবং ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ভাগ্যে লেখা রয়েছে। আল্লাহর কসম ! আমি এ ধরনের সাহস করতে পারি না।

আমি বললাম, জনগণ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে বাইয়াত করছে। জানি না, তিনি কিসের ভিত্তিতে খেলাফতের দাবী করছেন। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, কেন করবেন না। তাঁর পিতা যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহচর ছিলেন। তাঁর নানা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হেরা গুহার সাথী ছিলেন। তাঁর মা আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা প্রিয় নবীর যুক্তিবাদী সাহাবিয়াহ ছিলেন। তাঁর খালা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা উম্মুল মু'মিনীন ছিলেন। তাঁর পিতার ফুফু খোদায়জা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন সঙ্গিনী ছিলেন এবং তাঁর দাদী সুফিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফুফু ছিলেন। উপরন্তু তিনি স্বয়ং ইসলামের একজন পবিত্র ব্যক্তিত্ব এবং কুরআনের কারী। আল্লাহর কসম ! তিনি যদি আমার সাথে কোনো ইহসান করেন, তাহলে তা হবে আত্মীয়তার ইহসান। আর তিনি যদি আমাকে লালন-পালন করেন, তাহলে তা হবে নিজের একজন মর্যাদাবান প্রতিবেশীর লালন-পালনের মতো।

ইমাম জাহাবী (র) এবং অন্যান্য চরিতকার বর্ণনা করেছেন যে, জীবনের শেষ পর্যায়ে হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে এসেছিলো। তায়েফে অবস্থানকালেই (৬৮ হিজরী ৬৮৭ খৃঃ) কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। যখন জীবনের আর কোনো আশা রইলো না তখন মৃত্যু শয্যার

www.bjilibrary.com

চারপাশে একত্রিত বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ও অনুরাগীদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"আমি এমন একটি দলের মধ্যে দুনিয়া থেকে বিদায় নেব, যারা আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশী প্রিয় ও অধিক নিকটবর্তী। এজন্যে আমি যদি তোমাদের মধ্যেই মৃত্যুবরণ করি তাহলে নিসন্দেহে তোমারই সেই দল বা জামায়াত।"

সাতদিন রোগ ভোগের পর জ্ঞান ও মর্যাদার এ সূর্য আল্লাহর দরবারে হাজির হলেন। মৃত্যুর খবর প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে চারদিকে বিলাপ ও ক্রন্দন ধ্বনি শুরু হলো। শেষ নজর দেখার জন্য মানুষের ঢল নামলো। হযরত মুহাম্মদ বিন হানফিয়া (র) জানাযার নামায পড়ালেন এবং মুফাসসিরদের নেতাকে তায়েফে দাফন শেষে বললেন ঃ "আল্লাহর কসম ! উম্মতের একজন অত্যন্ত বড় আলেম দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন।"

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু ছিলেন গভীর জ্ঞানের অধিকারী। তাঁর জীবন ইতিহাসের সবচেয়ে আলোকোজ্জ্বল অধ্যায় ছিলো এটি। এদিক থেকে প্রকৃত অর্থেই তিনি ছিলেন বিরাট জ্ঞানী বা জ্ঞান সমুদ্র। বড় বড় মর্যাদাবান সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাবেয়ীন (র), তাবে তাবেয়ীন (র) এবং অতীতের সকল আলেম তাঁর জ্ঞান, শ্রেষ্ঠত্ব মেধা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং প্রশংসা করেছেন। সাইয়েদেনা হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে তাঁর যে স্থান এবং মর্যাদা ছিলো তার উল্লেখ ওপরে করা হয়েছে। হযরত আলী কাররামুল্লাহ ওয়াজহাহু বলতেন, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু কুরআনের তাফসির কালে মনে হয় যেনো তিনি স্বচ্ছ পর্দার নেপথ্য থেকে অদৃশ্য বস্তুসমূহ দেখছেন।

হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন মাসউদের বক্তব্য হলো, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু ছিলেন কুরআনের অতি উত্তম ভাষ্যকার।

হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু বলতেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যাকিছু অবতীর্ণ হয়েছে তা উম্মতে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে ইবনে আব্বাসই বেশী জানেন।

হযরত ওবায়দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু বলেছেন, আমি আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকে কাউকেই বেশী সুন্নাতের আলেম, তাঁর চেয়ে বেশী সঠিক রায় সম্পন্ন এবং তার থেকে বড় সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন কাউকেই দেখিনি।

www.bjilibrary.com

হযরত উবাই রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন কায়াব আনসারীর পুত্র মুহাম্মদ (র) বর্ণনা করেছেন, একদিন আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু আমার পিতার কাছে বসেছিলেন। তিনি চলে গেলে আমার পিতা বললেন, একদিন এ ব্যক্তি এ উম্মাতের বড় আলেম বা জ্ঞানী হবেন।

হযরত তাউস তাবেয়ী (র) বলেছেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ৭০জন সাহাবী দেখেছি। তাঁরা যখন কোনো সমস্যা বা মাসয়ালার ব্যাপারে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে আলাপ করতেন এবং মতপার্থক্য সৃষ্টি হতো, তখন অবশেষে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতের ওপরই সিদ্ধান্ত গৃহীত হতো।

হযরত কাসেম বিন মুহাম্মদের (র) বর্ণনা আছে যে, তিনি আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর মজলিসে কখনো কোনো অপ্রয়োজনীয় কথা শুনেননি। তাঁর ফতওয়াই সুন্নাতে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বেশী সাদৃশ্য রাখতো।

"দায়েরায়ে মায়ারেফে ইসলামীয়া" গ্রন্থে আল্লামা মুহাম্মদ হুসাইনুজ জাহাবীর (র) একটি বর্ণনা উদ্বৃত করা হয়েছে। এ বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর জ্ঞান ও মর্যাদার উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পাঁচটি কারণ ছিলো।

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জন্যে দোয়া করেছিলেন যে, হে আল্লাহ তাকে কিতাব এবং হিকমাতের জ্ঞান, দীনের সমঝ এবং কুরআন ব্যাখ্যার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দান করো।

২. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবারে তিনি প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন।

৩. তিনি বড় বড় সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুমদের সাহচর্য লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন।

৪. মুখস্ত শক্তির সাথে অভিধান এবং আরবের সাহিত্যও তাঁর নখদর্পণে ছিলো (তিনি ওমর বিন রবিয়ার ১৮০টি কবিতা পংক্তি শুধু একবার শুনেই মুখস্ত করে নিয়েছিলেন)।

৫. তিনি ইজতিহাদের যোগ্যতা লাভ করেছিলেন।

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু দীনি জ্ঞান ছাড়াও অন্যান্য প্রচলিত জ্ঞানেরও জ্ঞান সমুদ্র হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন সকল

www.bjilibrary.com

জ্ঞানের আধার। কুরআন, তাফসীর, হাদীস, ফিকাহ ও ফারায়েজের সাথে সাথে সাহিত্য, ভাষা, অভিধান, চরিত ও যুদ্ধের ইতিহাস, নসবনামা, কাব্য ও কবি এবং অংকে পারদর্শী ছিলেন। মুহাদ্দিসবৃন্দ ও নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা তাঁর কুরআন সম্পর্কিত পাণ্ডিত্যের অসংখ্য ঘটনা পেশ করেছেন। এ সকল ঘটনা থেকে জানা যায় যে, তিনি কুরআনে হাকিমের সব আয়াতের খুঁটিনাটি বিষয়েও সম্পূর্ণরূপে ওয়াকিবহাল ছিলেন। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু যখন কুরআন মজীদের কোনো আয়াতের প্রশ্নে অনুসন্ধান-মূলক কোনো কিছু জানতে চাইতেন তখন সাহাবা কেরাম রাদিয়াল্লাহ আনহুমকে সে ব্যাপারে প্রশ্ন করতেন। কিন্তু যখন তিনি সন্তোষজনক জবাব পেতেন না, তখন তিনি হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহুর স্মরণাপন্ন হতেন এবং তাঁর তাফসীরের ওপর আস্থা আনতেন। কুরআন মজীদের অপরিচিত বাক্য হৃদয়ঙ্গম করার জন্য তিনি প্রাচীন আরব কবিদের কাব্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতেন। যদিও অন্যান্য সাহাবা রাদিয়াল্লাহ আনহুমও এ পদ্ধতি অবলম্বন করতেন, কিন্তু ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু এ ব্যাপারে বেশী প্রসিদ্ধ ছিলেন।

কুরআনে হাকীমের তাফসীর ও ব্যাখ্যার প্রশ্নে হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহুর অসাধারণ পারদর্শীতা ছিলো। এ নৈপুণ্যতা এবং পারদর্শীতার ব্যাপারে সকল চরিতকারই ঐকমত্য পোষণ করেন। এমনিভাবে কুরআনের আয়াতের শানেনুযুল এবং নাসেখ ও মানসুখের বিদ্যায় তিনি গভীর পাণ্ডিত্য রাখতেন। এ বিদ্যাতেও সমকালীন যুগে তাঁর সমকক্ষ খুব কম সাহাবীই ছিলেন।

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে তাফসীরের একটি কিতাব সংশ্লিষ্ট করা হয়। এ কিতাবের নাম "তানবিরুল মিকবাস মিন তাফসীর ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু।" এ তাফসীরকে "আল কামুসুল মুহিত" গ্রন্থের সংকলনকারী আবু তাহের মুহাম্মদ বিন ইয়াকুব ফিরোজাবাদী (৮১৭ হিজরীতে মৃত্যু) একত্রিত করেছেন। মিসরে তা কয়েকবার প্রকাশিত হয়েছে।

হাদীসের ব্যাপারেও ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহুর ব্যাপক অনুসন্ধিৎসা ছিলো। রিসালাত যুগে তিনি অল্প বয়স্ক ছিলেন। তবে তাঁর মুখস্ত শক্তি ছিলো অসাধারণ। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে যাকিছু শুনতেন তা মুখস্ত করে ফেলতেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর তিনি বড় বড় সাহাবা রাদিয়াল্লাহ আনহুমের সাহচর্য গ্রহণ করেন এবং তাঁদের হাদীস শোনা ও তা মুখস্ত করার বিশেষ ব্যবস্থা নেন। তিনি সবসময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকতেন।

www.bjilibrary.com

যখনই খবর পেতেন যে, অমুক ব্যক্তির কাছে কোনো হাদীস আছে, তাহলে নিজেই তার কাছে যেতেন এবং তা সংগ্রহ করতেন।

হযরত আবু সালমাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বর্ণনা করেছেন, হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু বলতেন, যার ব্যাপারেই আমি শুনতাম যে, সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো হাদীস শুনেছে তাহলে আমি স্বয়ং তার বাড়ীতে গিয়ে তা হাসিল করতাম। প্রকৃতপক্ষে আমি চাইলে বর্ণনাকারীকে নিজের কাছে ডেকে পাঠাতে পারতাম।

হযরত আবু রাফে রাদিয়াল্লাহ আনহু প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গোলাম ছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু কাতিব বা লিখককে সাথে নিয়ে তাঁর কাছে যেতেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৈনন্দিন তৎপরতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন। যে তথ্য তাঁর কাছে পেতেন তা লিখককে দিয়ে লিখিয়ে নিতেন। এ অনুসন্ধানের কারণে তিনি হাজার হাজার হাদীস মুখস্ত করে ফেলেছিলেন। কিন্তু তিনি হাদীস বর্ণনায় অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন। এমনকি এক যুগ এমনও এসেছিলো যে, তিনি হাদীস বর্ণনা পুরোপুরি ছেড়ে দিয়েছিলেন। তিনি বলতেন, যখন থেকে মানুষ রসনা তৃপ্তির জন্যে হাদীস বর্ণনা শুরু করে তখন থেকে আমি হাদীস বর্ণনা করা ছেড়েই দিই। এত সতর্কতা সত্ত্বেও তিনি দু' হাজার ছ' শত ষাটটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি হাদীস বর্ণনাকারীদের প্রথম শ্রেণীভুক্ত। বেশী হাদীস বর্ণনাকারীর মধ্যে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুর পর তাঁর নামই এসে থাকে। তাঁর হাদীস বর্ণনাকারী এবং শিষ্যের সংখ্যা হাজার পর্যন্ত ছিলো। কতিপয়ের নাম ঃ

হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু, হযরত মিসওয়ার বিন মাখরামাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু, হযরত আবু আবুত তোফায়েল রাদিয়াল্লাহ আনহু, ভাই হযরত কাসির বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু, পুত্র মুহাম্মদ (র) বিন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু, পুত্র আলী (র) বিন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু, নাতি মুহাম্মদ (র) বিন আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু, ভ্রাতুষ্পুত্র আবদুল্লাহ (র) বিন ওবায়দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু, হযরত সাঈদ (র) বিন মুসাইয়িব রাদিয়াল্লাহ আনহু, হযরত আবু সালমাহ (র) বিন আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহ আনহু, হযরত কাসিম (র) বিন মুহাম্মদ, হযরত আতা (র), হযরত সাঈদ (র) বিন জাবির, হযরত আকরামাহ (র), হযরত তাউস (র), হযরত সোলায়মান বিন ইয়াসার (র), হযরত আমীরুশ শাবী (র), হযরত আবদুল্লাহ বিন আবি মালিকাহ (র), হযরত আমর বিন মায়মুন (র), হযরত নাফে বিন জাবির (র), হযরত মুহাম্মদ বিন সিরিন (র), হযরত ইয়াজিদ বিন আসাম (র), হযরত

www.bjilibrary.com

মুজাহিদ (র), হযরত আবুল আলিয়া (র), হযরত আমর বিন দিনার (র), হযরত আম্মার বিন আবি আম্মার (র), হযরত ইয়াহিয়া বিন ইয়ামার (র), হযরত আবদুল্লাহ বিন শাদ্দাদ (র), হযরত কুরাইব (র) ও হযরত আবু রাজা আতারদী (র)।

ফিকাহ এবং ইজতিহাদে হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর অত্যন্ত উঁচু স্থান ছিলো। হাফেজ ইবনে হাজার (র) "তাহজীবুত তাহজীবে" লিখেছেন, ইমাম আবু বকর মুহাম্মদ বিন মূসা (র) (খলিফা মামুনুর রশীদের প্রপৌত্র) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফতওয়াসমূহ ২০ খণ্ডে একত্রিত করেছেন।" এ থেকে হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর দীনের সমঝ ও জ্ঞানের পরিধি সম্পর্কে খুব ভালোভাবেই আন্দাজ করা যায়। ইবনে আসির (র) বর্ণনা করেছেন, "তিনি ফারায়েজ এবং অংকেও প্রসিদ্ধ ছিলেন।"

কবিতা এবং কাব্যেরও তিনি যোদ্ধা ছিলেন। অনেক সুন্দর কবিতা রচনা করতেন। ইবনে রাশিক (র) "কিতাবুল উমদাতে" তাঁর কতিপয় কবিতা নমুনা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি ভাষাবিদ ছিলেন। জাহেলী যুগের কবিদের হাজার হাজার ভালো কবিতা তাঁর নখদর্পণে ছিলো। ভাষা, অভিধান এবং বংশনামার ওপরও তিনি গভীর জ্ঞান রাখতেন। মোটকথা তিনি সকল ধরনের জ্ঞানের এক প্রতিষ্ঠান বা আধার ছিলেন। কথা ছিলো সুমিষ্ট। কথাবার্তায় ছিলেন অত্যন্ত মার্জিত রুচিসম্পন্ন। তাঁর বক্তৃতা ছিলো অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। শাকীক তাবেয়ী (র) বর্ণনা করেছেন, একবার ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হজ্জের সময় ভাষণ দিলেন। এ ভাষণে সূরা আন নূরের তাফসীর এমনভাবে পেশ করলেন যা আমি কোনোদিন শুনিওনি এবং দেখিওনি। ভাষণটি যদি রোম এবং পারস্যবাসীরা শুনতো তাহলে সেখানকার কোনো বস্তুকেই ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত রাখা যেতো না। ইবনে আবি শাইবার (র) বর্ণনায় আরো খানিক এগিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি বললো, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর সুন্দর ও মিষ্টি বর্ণনায় আমি তাঁর মাথা চুম্বন করতে চাইতাম।

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন জ্ঞানের ভাণ্ডার। কিন্তু তিনি এ জ্ঞান ভাণ্ডার নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি। বরং সমগ্র জীবন তা খোদার সৃষ্টির মধ্যে বিতরণ করে গেছেন। তাঁর শিক্ষার পরিসর ছিলো ব্যাপক। হাজার হাজার ছাত্র তাঁর শিক্ষায় সমৃদ্ধ হয়েছেন। "মুসতাদরাকে হাকিমে" আবু সালেহ (র) তাবেয়ী থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি একবার হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর গৃহের সামনে বিরাট ভীড় দেখলেন।

www.bjilibrary.com

ভীড়ও এমন ভীড় যাতে মানুষের যাতায়াতের পথ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলো। তিনি এ ভীড়ের খবর ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দিলেন। খবর পেয়ে তিনি অযুর পানি চাইলেন। অযুর পর আমাকে বললেন, কুরআনে কারীমের তাফসীর অথবা তার গূঢ় অর্থ সম্পর্কে যারা জানতে চায় তাদেরকে ভেতরে ডেকে আনো। আমি তাদেরকে ডাকলাম। মুহূর্তের মধ্যে সমগ্র ঘর এবং পার্শ্ববর্তী কামরা পূর্ণ হয়ে গেলো। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এক এক করে প্রত্যেকের প্রশ্নের জবাব দিলেন এবং প্রত্যেককে খুশী করে বিদায় করলেন। এরপর তিনি আমাকে বললেন, ফিকাহ, হাদীস এবং হারাম-হালাল সম্পর্কে যারা জানতে চায় তাদেরকে ডাকো। আমি তাদেরকে ডাকলাম। তাদের আগমনেও ঘর ভরে গেলো। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদেরকে সন্তোষজনক জবাব দিয়ে বিদায় দিলেন। অতপর বললেন, এখন ফারায়েজ প্রভৃতি বিষয়ে যারা জানতে চায় তাদেরকে ডাকো। তাদের ভীড়েও ঘরে তিল ধারণের স্থান রইলো না। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের প্রশ্নের এবং সমস্যার সমাধান করলেন। সর্বশেষ আরবী ভাষা, সাহিত্য, কাব্য এবং ভাষা সম্পর্কিত প্রশ্নকারীদের ডেকে পাঠালেন। তাদের সংখ্যাধিক্যের অবস্থাও একই ধরনের ছিলো। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের প্রশ্নাবলীরও জবাব দিলেন এবং সন্তুষ্ট করলেন। আবু সালেহ (র) বলেন, আমি কোনো ব্যক্তির এতবড় মজলিশ কখনো দেখিনি।

ইবনে আসির (র) বলেছেন, কোনো ব্যক্তি যদি জ্ঞানের কোনো শাখা সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করতেন, তাহলে তিনি তার জবাব অবশ্যই পেতেন।

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু কোনো কোনো সময় জ্ঞান সম্পর্কিত আলোচনার জন্যে দিন নির্দিষ্ট করে দিতেন। কোনোদিন তাফসীর সম্পর্কে শিক্ষা দিতেন। কোনোদিন হাদীস এবং ফিকাহ। কোনোদিন কুরআনের ব্যাখ্যা সম্পর্কিত বিষয়ে আলোকপাত করতেন। কোনোদিন আরবের কাহিনী বর্ণনা করতেন এবং কোনোদিন যুদ্ধ সংক্রান্ত ঘটনাবলী শুনাতেন। কোনোদিন ভাষা এবং সাহিত্য সম্পর্কে বর্ণনা দিতেন। কোনোদিন কবি এবং কাব্যের মজলিশ সুশোভিত করতেন। কোনোদিন নসবনামা বা বংশ তালিকার ফিরিস্তি তুলে ধরতেন। মোটকথা তাঁর মজলিশ ছিলো জ্ঞানের সাগর সদৃশ।

পাঠদান ছাড়াও তিনি কখনও কখনও নামাযের পর খুতবার মাধ্যমেও মানুষকে শিক্ষা দিতেন। সহীহ মুসলিমে আবদুল্লাহ বিন শাকিক (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু আসরের নামাযের পর আমাদের সামনে ভাষণ শুরু করলেন। ইত্যবসরে সূর্য ডুবে

www.bjilibrary.com

গেলো এবং তারা ঝলমলিয়ে উঠলো। মানুষ উচ্চস্বরে নামাযের কথা বলতে লাগলো। বনু তামিমের এক ব্যক্তি অব্যাহতভাবে নামাযের জন্যে চেঁচানো শুরু করলো। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তার ওপর ক্রোধান্বিত হলেন। তিনি তার দিকে ঘুরে দেখলেন এবং বললেন, তোমার মায়ের মৃত্যু হোক। তুমি আমাকে সুন্নাতের তালিম দিচ্ছো। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি যে, তিনি কখনও কখনও জোহর, আসর এবং মাগরিব ও এশার নামায এক সাথে পড়তেন।

বর্ণনাকারী (আবদুল্লাহ বিন শাকিক) বলেন, এ কথায় আমার অন্তরে খটকা লাগতে লাগলো। আমি হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর কথার সত্যতা স্বীকার করলেন এবং বললেন তিনি যা কিছু বলেছেন তা সঠিক।

এক স্থানে অবস্থান ছাড়া সফরেও হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে মানুষ অবগাহন করতো। মক্কা মুকাররমার বাইরে অবস্থান করলে এবং হজ্জের সময় মক্কায় এলে জ্ঞান পিপাসু ছাত্ররা তাঁকে ঘিরে ধরতো এবং জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করতো।

মক্কায় স্থায়ীভাবে বসবাসের সময় মদীনা মুনাওয়ারা গমন করলে সেখানকার বাসগৃহও জ্ঞান পিপাসুদের দ্বারা পূর্ণ থাকতো। বসরা, কুফা, দামেস্ক, তায়েফ যেখানেই যেতেন সেখানেই মানুষ তাঁর জ্ঞান সমুদ্র থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য ঘিরে ধরতো।

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, ইসলাম বিজয়ের পরিধি যখন বিস্তৃত হলো তখন ভিন্ন ভাষী লোকজনও মাসয়ালা তাহকীক করা অথবা জ্ঞান অর্জনের জন্যে ইবনে আব্বাসের খিদমতে হাজির হওয়া শুরু করলো। তিনি তাদের সুবিধার্থে কতিপয় ভাষ্যকার নিয়োগ করলেন। এসব ভাষ্যকার একদিকে যেমনি আরবী জানতেন তেমনি অপরদিকে তাদের ভাষাও জানতেন।

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকদীরের মত নাজুক ও সূক্ষ্ম বিষয় নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করাকে খুবই অপসন্দ করতেন। কেননা স্বয়ং প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ধরনের তর্ক-বিতর্ক নিষেধ করেছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর সুস্পষ্ট অভিমত ছিলো যে, তাকদীরের ওপর ঈমান আনা প্রত্যেক মুসলমানদের জন্য ফরয। এ প্রশ্নে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় টেনে বের করায় পথ ভ্রষ্টতা বা গোমরাহীর পথ খুলে যায়। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে বর্ণিত আছে, একবার হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু খবর পেলেন যে, জনৈক ব্যক্তি তাকদীর অস্বীকার করে থাকে। সে যুগে তিনি অন্ধ হয়ে

www.bjilibrary.com

গিয়েছিলেন। এ সত্ত্বেও তিনি বললেন, আমাকে সেই ব্যক্তির কাছে নিয়ে চলো। লোকজন জিজ্ঞেস করলো, আপনি তার কাছে গিয়ে কি করবেন ? তিনি বললেন, যদি হয় তাহলে তার নাক কেটে ফেলবো। আর যদি গর্দানে হাত পড়ে যায়, তাহলে তা উড়িয়ে দেবো। আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, "আমি বনু ফাহরের মহিলাদেরকে কা'বা তাওয়াফ করতে দেখেছি এবং তাদের সবাই শিরক পূর্ণ কাজে ব্যাপৃত রয়েছে।" তাকদীরের অস্বীকৃতি এ উম্মতের শিরকে ব্যাপৃত হওয়ার প্রথম আলামত। স্রষ্টার কসম ! যাঁর হাতে আমার জীবন রয়েছে, এ ধরনের মানুষের ফেতনা-ফাসাদ এ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে না। বরং যেভাবে তারা তাকদীরের অমঙ্গল বা মন্দের অস্বীকৃতি জানিয়েছে, তেমনি তার খোদার মঙ্গলের তাকদীরেরও অস্বীকারকারী হয়ে যাবে।

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু অত্যন্ত শরীফ ও বিনয়ী স্বভাবের মানুষ ছিলেন। মর্যাদাবান ও গুণীদেরকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। বসরার গভর্নর থাকাকালে হযরত আবু আইউব আনসারী রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁর কাছে তাশরীফ আনলেন এবং নিজের প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করলেন। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু অন্তর খুলে তাঁকে সাহায্য করলেন। কেননা হিজরতের পর তিনি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মেযবান ছিলেন। হাফেজ জাহাবী (র) বলেছেন, তিনি ৪০ হাজার দিরহাম এবং ২০জন খাদেম ছাড়াও ঘরে যত আসবাবপত্র ছিলো তা তাঁকে সোপর্দ করে দিলেন।
–(সিয়রে আ'লামুন নাবলা)

অপর এক রাওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, হযরত আবু আইউব আনসারী রাদিয়াল্লাহ আনহু বসরা গমন করলেন। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁর সামনে ঘরের সবকিছু এনে রাখলেন এবং বললেন, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবস্থানের জন্যে নিজের ঘর যেভাবে খালি করে দিয়েছিলেন, আমিও আপনার জন্যে নিজের ঘর খালি করে দিতে চাই। অতপর তিনি নিজের পরিবার-পরিজনকে অন্য ঘরে স্থানান্তর করলেন এবং ঘর ও ঘরের সকল আসবাবপত্র হযরত আবু আইউব আনসারী রাদিয়াল্লাহ আনহুকে দিয়ে দিলেন।–(সিয়রে আনসার প্রথম খণ্ড)

একবার হযরত যায়েদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন সাবেত আনসারী সওয়ার হলেন। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু শিষ্টাচার ও আদব হিসেবে তাঁর ঘোড়ার লাগাম ধরলেন। হযরত যায়েদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন সাবেত বললেন ঃ

www.bjilibrary.com

"হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচার পুত্র ! এ ধরনের করবেন না। এ করা ঠিক নয়।" হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন, "জ্ঞানী ও আলেমদেরকে আমাদের এ ধরনের আদব ও সম্মান করা প্রয়োজন।" (হযরত যায়েদ বিন সাবেত রাদিয়াল্লাহ আনহু বড় আলেম, অহীর লেখক এবং হাবারুল উম্মতের খিতাবে মশহুর ছিলেন)।

হযরত যায়েদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন সাবেত তাঁর হস্ত চুম্বন করলেন এবং বললেন ঃ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আহলে বাইয়াতকে এ ধরনের শ্রদ্ধা প্রদর্শন আমারও উচিত।"–(মুসতাদরাকে হাকেম)

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর একবার হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু একজন আনসারী সাহাবীকে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকাল হয়ে গেছে। তাঁর সাহাবী এখনও আমাদের মধ্যে বর্তমান রয়েছেন। চলো তাঁদের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করি। আনসারী সাহাবা রাদিয়াল্লাহ আনহুম বললেন, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু ! আমি তোমার ব্যাপারে অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়ে পড়ি। তুমি জানো মানুষ তোমার জ্ঞানেরই মুখাপেক্ষী। অথচ তুমি অন্যের কাছে যেতে চাও ?

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু একথা শুনে সেই সাহাবীকে ছেড়ে দিলেন। অতপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবী রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে একাকী গমনের নিয়ম বানিয়ে দিলেন। তিনি যখনই শুনতেন যে, অমুক সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস শুনেছেন, তখনই তিনি তাঁর কাছে গমন করতেন। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু তার দরজায় নক করতেন। তিনি ঘর থেকে বের হলে তাঁকে জিজ্ঞেস করতেন, আপনি কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে কোনো হাদীস শুনেছেন ? তিনি বলতেন, হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচার পুত্র ! আপনি এখানে আগমনের কষ্ট কেন স্বীকার করেছেন ? অন্য কাউকে পাঠিয়ে দিতেন। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু বলতেন, না এটা আমার দায়িত্ব।

এ উদ্দেশ্যে তিনি সেসব সাহাবী রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে নির্দ্বিধায় চলে যেতেন, যাদের মর্যাদা তাঁর থেকে বেশী ছিলো না। এসব সাহাবী ইঙ্গিত বা নির্দেশ পেলে দৌড়ে তাঁর কাছে পৌঁছে যেতেন।

www.bjilibrary.com

হাদীস ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের জন্যেও অন্যদের কাছে গমনে তিনি লজ্জা অনুভব করতেন না। হযরত আবু কায়েস সারমাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবি আনাস আনসারী মদীনার একজন অত্যন্ত উঁচু মর্যদার কবি ছিলেন এবং নৈতিকতা সম্পন্ন ভালো কবিতা লিখতেন। ইবনে আসির রাদিয়াল্লাহ আনহু "উসুদুল গাব্বাহ" গ্রন্থে লিখেছেন ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁর কাছে যেতেন এবং তাঁর কাছ থেকে কবিতা হাসিল করতেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহুর প্রগাঢ় ভক্তি এবং ভালোবাসা ছিলো। রিসালাতকালে বেশীর ভাগ সময় তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ পালন করতেন এবং অনেক সময় তাঁর নির্দেশ ছাড়াই এমন কাজ করতেন যাতে তিনি খুশী হয়ে যেতেন ও তাঁর জন্যে দোয়া করতেন। এ ধরনের কতিপয় ঘটনার কথা ওপরে বর্ণনা করা হয়েছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পরও তাঁর প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসা একইভাবে বজায় ছিলো। মুসনাদে আহমদে (র) হযরত সাঈদ (র) বিন জুবায়ের থেকে বর্ণিত আছে, একবার হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন, "পাজ্ঞ শোম্বাহর দিন, কোনো পাজ্ঞ শোম্বাহ" এতটুকুন বলেই তিনি কাঁদতে লাগলেন এবং অপ্রতিরোধ্যভাবে রোদন করলেন। তাঁর অশ্রুতে মাটিতে পড়ে থাকা পাথর গলে গেলো। রোদন থামলে এবং একটু প্রকৃতিস্থ হলে উপস্থিত আমরা জিজ্ঞেস করলাম, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু ! পাজ্ঞ শোম্বার দিনের এমনকি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিলো ? তিনি বললেন, সেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রোগের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছিলো।

হাদীস বর্ণনাকালে অত্যন্ত সতর্ক থাকতেন। যাতে কোনো ভুল রাওয়ায়েত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সংশ্লিষ্ট না হয়ে যায়। এ ধরনের সামান্যতম সন্দেহের উদ্রেক হলেই তিনি তা বর্ণনা করতেন না। একবার জানতে পেলেন যে, কতিপয় মানুষ ভুল কথা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সংশ্লিষ্ট করছে। তিনি বললেন, তোমরা কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন একথা বলতে আযাব নাযিলের অথবা মাটি বিভক্ত হয়ে যাবে এবং তোমরা তাতে সেঁধিয়ে যাওয়ার ভয়ে ভীত হও না !

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এত সমীহ করতেন যে, ফতওয়া দানকালে তাঁর নাম মুখে উচ্চারণ করতেন না। তাঁকে সংশ্লিষ্ট করার দায়িত্ব যাতে নিতে না হয় সে জন্যেই তিনি এ ধরনের করতেন।

www.bjilibrary.com

মুসনাদে দারেমীতে বর্ণিত আছে, যখন তিনি জানতে পেলেন যে, কিছু মানুষ মিথ্যে হাদীস বর্ণনা শুরু করেছেন তখন তিনি হাদীস বর্ণনাই পরিত্যাগ করলেন।

উম্মুহাতুল মু'মিনীনকেও সীমাহীন শ্রদ্ধা করতেন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত মাইমুনাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁর খালা ছিলেন। তাঁর কাছে প্রায়ই যেতেন। তাঁর কাছে হাদীস শুনতেন। তিনি কোনো নির্দেশ দিলে তা পালন করতেন। হযরত মাইমুনাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু ৫১ হিজরীতে ওফাত পান। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহুই তাঁর নামাযে জানাযা পড়ান এবং লাশ কবরে নামান। সহীহ আল বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, যখন তাঁর লাশ দাফনের জন্যে কাঁধে উঠানো হলো তখন ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন, ইনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন সঙ্গিনী ছিলেন। লাশকে বেশী নাড়িও না, আদবের সাথে আস্তে আস্তে নিয়ে চলো।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহ আনহাকে সবসময় সম্মান ও সমীহ করতেন। তবে বিভিন্ন কারণে তিনি একবার তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহ আনহা কঠিন রোগে আক্রান্ত হলেন। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু এ খবর পেলেন। খবর প্রাপ্তির সাথে সাথে তিনি তাঁর গৃহে পৌছলেন এবং ভেতরে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। উম্মুল মু'মিনীন প্রথমত অনুমতি প্রদানে চিন্তা-ভাবনা করলেন। কিন্তু যখন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন ঃ

"আম্মা ! আপনার ভাগ্যবান পুত্র আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু আপনাকে সালাম এবং আপনার খিদমতে হাজির হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেছেন। তাঁকে অনুমতি দিন।" এ সময় উম্মুল মু'মিনীন বললেন, "ভালো কথা, তুমি চাইলে তাকে ডেকে আনো।"

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু ভেতরে এসে সালাম করলেন। উম্মুল মু'মিনীনের কাছে এসে বসে পড়লেন এবং বললেন, "আপনার প্রতি সুসংবাদ।"

উম্মুল মু'মিনীন রাদিয়াল্লাহ আনহাও জবাবে এ উত্তম বাক্যই বললেন। অতপর হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু আরজ করলেন ঃ

"এখন আপনার ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ও অন্যান্য (মরহুম) আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে সেই পর্দাই বিরাজিত, যা শরীর এবং আত্মার মধ্যে বাধা সৃষ্টি করে। এ বাধা অপসারিত হতেই তাঁদের সবার সাথে আপনার সাক্ষাত হবে।"

৯—

www.bjilibrary.com

এরপর তিনি উম্মুল মু'মিনীন রাদিয়াল্লাহু আনহার ফযিলত বর্ণনা শুরু করলেন এবং বললেন ঃ

"আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয়তম পত্নী ছিলেন এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পবিত্র বস্তুকেই ভালোবাসতেন।"

এভাবে তিনি উম্মুল মু'মিনীন রাদিয়াল্লাহু আনহাকে আখিরাতের সফরের প্রতি প্রথমে রাজি করালেন।

সাইয়েদেনা হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু আমাদের ইতিহাসের এক অমূল্য সম্পদ। তাঁর থেকে ফযিলত ও বরকতের প্রস্রবণের যে ধারা শুরু হয়েছিলো তা আজও প্রবাহিত হয়ে চলেছে। প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের সামর্থ অনুযায়ী এ প্রস্রবণ থেকে অবগাহিত হতে পারে।

----

www.bjilibrary.com

হযরত আবু হুরাইরা দাওসী রাদিয়াল্লাহু আনহু

উম্মার মহান আলেম হযরত যায়েদ বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, একদিন আমি মসজিদে নববীতে দোয়া এবং আল্লাহর জিকিরে মশগুল ছিলাম। আমার সাথে আরও দু' ব্যক্তি আল্লাহর জিকির করছিলেন। তাদের মধ্যে একজন ইয়েমেনের দাওস গোত্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাশরীফ আনলেন। আমরা চুপ হয়ে গেলাম। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, নিজেদের কাজ চালিয়ে যাও। এ নির্দেশের পর আমি এবং অন্য ব্যক্তি দাওসী যুবকের সামনে উচ্চস্বরে দোয়া করতে লাগলাম। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের প্রত্যেক বাক্যের শেষে আমীন উচ্চারণ করছিলেন। আমাদের দোয়া শেষ হলে দাওসী যুবক হাত উঠালেন এবং আল্লাহর দরবারে এই আরজ পেশ করলেন ঃ "হে আল্লাহ ! আমার সাথী আগে যাকিছু প্রার্থনা করেছে তা আমাকেও দান করো। এছাড়া এমন জ্ঞান দান করো যা কখনও ভুলে যাবো না।" একথা বলার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমীন বললেন। এরপর আমি এবং আমার অন্য সাথী আরজ করলাম ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! আমরাও এমন জ্ঞান চাই যা কখনও ভুলে যাবো না।"

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ "তাতো ঐ দাওসী যুবকের অংশে এসেছে।"

দাওস গোত্রের এ ভাগ্যবান যুবক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইরশাদ মতো খোদার তরফ থেকে কখনো ভুলে না যাওয়ার জ্ঞান বিশেষভাবে যাকে প্রদত্ত হয়েছিলো—তিনি ছিলেন হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু।

সাইয়েদেনা হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু সেই সব বুযর্গ সাহাবীদের অন্যতম ছিলেন, যাঁরা স্বদেশ থেকে মদীনা আগমনের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে উপস্থিত থাকাকে সমগ্র বিশ্বের মান-ইজ্জতের চেয়েও অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন এবং নবুয়াতের প্রস্রবণ থেকে এমনভাবে অবগাহিত হয়েছিলেন যে, নিজেই জ্ঞানের সাগর হয়ে গিয়েছিলেন। এমন সাগর যা থেকে আল্লাহর লাখ লাখ বান্দাহ নিজের জ্ঞান পিপাসা মিটিয়েছেন।

www.bjilibrary.com

হাদীস বর্ণনাকারী হিসেবে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ্ আনহু উম্মার সেই সাত স্তম্ভ তালিকার প্রথম দিকে স্থান পেয়েছিলেন যাদের কাছ থেকে সহস্রাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ্ আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা পাঁচ হাজার তিন শ' চুয়াত্তর (৫৩৭৪)। অন্যদিকে আরো ৬জন বুযর্গ বেশী সংখ্যায় হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁদের নাম এবং বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা নীচে দেয়া হলো ঃ

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু–২,২৬০, উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহ্ আনহা–২,২১০, হযরত আবদুল্লাহ্ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহ্ আনহু–১,৬৩০, হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ আনসারী রাদিয়াল্লাহ্ আনহু–১,৫৪০, হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহ্ আনহু বিন মালিক আনসারী–১,২৮৬, ও হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহ্ আনহু–১,১৭০।

একবার কতিপয় লোক হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ্ আনহুর সামনে অভিযোগ উত্থাপন করে বললো যে, আপনি বেশী হাদীস বর্ণনা করেন। প্রকৃতপক্ষে মুহাজির এবং আনসাররা এসব হাদীস বর্ণনা করেননি। এর জবাবে তিনি বললেন ঃ

"আমার মুহাজির ভাইয়েরা ব্যবসা-বাণিজ্য এবং আনসার ভাইয়েরা কৃষি কাজে ব্যস্ত থাকতেন। আর আমি ক্ষুণ্নি বৃত্তি নিবারণের জন্যে সবসময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাজির থাকতাম। এ কারণে যখন তারা চলে যেতেন তখন আমি তাঁর খিদমতে উপস্থিত থাকতাম। আমি ছুফ্ফার ফকির দলের একজন ছিলাম। যখন এ সকল লোক ভুলে যেতেন তখন আমি স্মরণ করে নিতাম।"–(সহীহ্ আল বুখারী)

প্রথম প্রথম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কিছু কিছু ইরশাদ হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু বিস্মৃত হতেন। ব্যাপারটি তাঁর কাছে অত্যন্ত দুঃখজনক ছিলো। একদিন তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি আপনার কিছু কিছু ইরশাদ ভুলে যাই।"

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ "চাদর প্রসারিত করো।"

www.bjilibrary.com

তিনি চাদর প্রসারিত করলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাতে নিজের পবিত্র হাত রাখলেন। অতপর বললেন, একে বুকের সাথে লাগাও। হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু হুকুম পালন করলেন। তিনি নিজে বলেছেন, এ ঘটনার পর তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো ইরশাদ আর কখনো ভুলেননি।"-(সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল ইলম)

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুর বংশীয় নাম ছিলো আবদি শামস। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন মত অনুযায়ী তাঁর ইসলামী নাম দিয়েছিলেন আবদুর রহমান অথবা উমায়ের। কিন্তু ইতিহাসে তিনি নিজের পদবীযুক্ত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু নামে খ্যাত হয়েছিলেন। দাওস গোত্রের (ইজদ-এর একটি শাখা) সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিলো। গোত্রটি ইয়েমেনে বসবাস করতো। তাঁর বংশনামা নিম্নরূপ ঃ

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু আবদুর রহমান (উমায়ের) বিন আমের বিন আবদি জিশশারা বিন তোরায়েফ বিন গিয়াস বিন হানিয়াহ বিন সায়াদ বিন ছা'লাবাহ বিন সালিম বিন গানাম বিন দাওস।

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু নিজের পদবীর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, আমি একটি বিড়াল (হিররাহ) পালন করতাম। রাতে তাকে একটি গাছের ওপর রেখে দিতাম এবং সকালে যখন বকরী চরাতে যেতাম তখন বিড়ালটি সাথে নিয়ে যেতাম ও তার সাথে খেলতাম। বিড়ালের সাথে অসাধারণ সম্পর্ক দেখে মানুষেরা আমাকে আবু হুরাইরা বলা শুরু করে।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, একবার হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো যে, আপনার এ পদবী কে দিয়েছিলেন। জবাবে তিনি বললেন, একবার আমি একটি বিড়াল পেলাম। আমি বিড়ালটিকে আস্তিনের মধ্যে নিয়ে ঘুরে বেড়াতাম। সেই সময় হতে আমাকে আবু হুরাইরা বলা শুরু হয়।

সহীহ আল বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে "আবুহার" অথবা "আবু হুরাইরা" বলে ডাকতেন।

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু শৈশবকালেই পিতৃ স্নেহ থেকে বঞ্চিত হন এবং অত্যন্ত দারিদ্রতার মধ্যে লালিত-পালিত হন। প্রতিদিন তিনি বাড়ীর বকরী জঙ্গলে নিয়ে যেতেন এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত চরাতেন। ধীরে ধীরে তাঁর অবস্থার পরিবর্তন হতে লাগলো। এক পর্যায়ে তিনি একটি গোলাম রাখার যোগ্য হয়ে গেলেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তার অবস্থার কথা খুবই কমই জানা

www.bjilibrary.com

যায়। তবে, তিনি সেই যুগে লেখাপড়া শিখে ছিলেন এবং কবিতাও লিখতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়াত প্রাপ্তির পর দাওস গোত্রের এক ভাগ্যবান নেতা তোফায়েল রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আমর মক্কা গমন করেন এবং সেখানে ইসলাম গ্রহণ করে দেশে ফিরেন। তিনি দেশে ফিরে নিজের সম্প্রদায়ের কাছে ইসলামের দাওয়াত দেন। কিন্তু চার ব্যক্তি ছাড়া কেউ তাঁর আহ্বানে সাড়া দেয়নি। এ চার ব্যক্তি ছিলেন ঃ হযরত তোফায়েলের পিতা, মাতা, পত্নী এবং হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু। কয়েক মাস দিনরাত প্রচেষ্টার পরও যখন দাওস গোত্রের অন্যান্য ব্যক্তি ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হলো না তখন হযরত তোফায়েল রাদিয়াল্লাহ আনহু ভগ্ন হৃদয়ে পুনরায় মক্কা গমন করলেন এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন ঃ

"ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! আমার সম্প্রদায় অত্যন্ত বক্র। আমি অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু তারা হক দাওয়াত কবুল করতে আগ্রহ দেখায়নি। আপনি এ বদবখত সম্প্রদায়ের জন্য বদদোয়া করুন।"

রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদদোয়ার পরিবর্তে দোয়া করলেন ঃ

"হে আল্লাহ ! দাওস গোত্রকে হেদায়াত দান করো।"

অতপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত তোফায়েল রাদিয়াল্লাহ আনহুকে ফিরে গিয়ে তাবলিগ অব্যাহত রাখার নির্দেশ দিলেন। এবার হযরত তোফায়েল রাদিয়াল্লাহ আনহু নিজের গোত্রের কাছে ফিরে গিয়ে তাবলীগ শুরু করলেন। তাঁর কথা মানুষেরা অত্যন্ত যত্নের সাথে শুনতে লাগলো এবং আস্তে আস্তে ইসলামের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠলো। অতপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দোয়ার এত প্রভাব হলো যে, কয়েক বছরের মধ্যেই দাওস গোত্রের অনেক পরিবার ইসলাম গ্রহণ করলেন। এ যুগে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনা তাশরীফ আনেন এবং বদর, ওহোদ ও খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। সপ্তম হিজরীর প্রথম দিকে হযরত তোফায়েল রাদিয়াল্লাহ আনহু নিজের গোত্রের ৮০জনকে সাথে নিয়ে মদীনায় পৌঁছেন। এ কাফেলায় হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুও নিজের মাতাসহ শরীক ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই সময় খাইবার যুদ্ধে গমন করেছিলেন এবং সেখানেই অবস্থান করছিলেন। হযরত তোফায়েল রাদিয়াল্লাহ আনহু, হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু ও কাফেলার অন্যান্য পুরুষদের সাথে নিয়ে

www.bjilibrary.com

মদীনা থেকে খাইবার পৌছেন। পথিমধ্যে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে এ কবিতা আবৃত্তি করেন ঃ

ইয়া লাইলাতা মিন তাওলিহা ওয়া আনাইহা/আলা আন্নাহা মিন দারিল কুফরি নাজাতি।

(রাতের দীর্ঘত্ব ও কষ্ট কতইনা খারাপ, তবুও তিনি আমাকে দারুল কুফর থেকে মুক্তি দিয়েছেন।)

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বদেশ ত্যাগের সময় একজন গোলামকেও সাথে নিয়েছিলেন। রাস্তায় সেই গোলাম হারিয়ে যায়। হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু খাইবার পৌছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিদার এবং বাইয়াত হলেন। এ সময় হঠাৎ করে তাঁর গোলামও সেখানে উপস্থিত হয়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "আবু হুরাইরা ! তোমার গোলাম এসে গেছে।"

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু আরজ করলেন ঃ "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর রাস্তায় আমি তাকে আযাদ করে দিলাম।"

বাইয়াত গ্রহণের পর হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সান্নিধ্য এমনভাবে অবলম্বন করলেন যে, মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তাঁর কাছেই থেকে যান। হাফেজ ইবনে কাসির "আল বিদায়া ওয়ান নেহায়া" গ্রন্থে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর মুখে এ বর্ণনা উল্লেখ করেছেন ঃ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাইবার তাশরীফ নিয়েছিলেন। আমি সে যুগে মদীনা এসেছিলাম। সাবা' রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন আরফাতার গিফারীর ইমামতিতে ফযরের নামায পড়লাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে মদীনায় নিজের নায়েব হিসেবে রেখে গিয়েছিলেন। সাবা' প্রথম রাকায়াতে সূরা মারইয়াম এবং দ্বিতীয় রাকায়াতে ওয়াইলুললিল মুতাফফিফিন পড়লেন। আমি মনে মনে বললাম, "অমুক ব্যক্তির সর্বনাশ হোক ! সে দু' পাল্লা বানিয়ে রেখেছে। এক পাল্লা দিয়ে কম মেপে অন্যকে দেয় এবং অন্য পাল্লা দিয়ে মানুষের কাছ থেকে বেশী নেয়।"

ফযরের নামাযের পর হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু খাইবার রওয়ানা হয়ে গেলেন। সেখানে পৌছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাজির হলেন। নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা বললেন এবং তাঁর সামনে নিজের খাবার রেখে দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনন্দ চিত্তে তা গ্রহণ করলেন। এরপর তিনি অন্যান্য দাওসী মুহাজিরদের সাথে খাইবারের যুদ্ধে অংশ নিলেন। আল্লামা ইবনে সায়াদ (র)

www.bjilibrary.com

বর্ণনা করেছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাওসী মুজাহিদদেরকে খাইবার আক্রমণকারী বাহিনীর ডানদিকে মোতায়েন করলেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাইবারের যুদ্ধ শেষে মদীনা ফিরে গেলেন। হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুও তাঁর সাথে ফিরলেন এবং মদীনায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করলেন।

মদীনা মুনাওয়ারা ফিরে আসার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাত কাল পর্যন্ত (৭ হিজরী-১১ হিজরী) হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু জীবনের সবকিছু হাসিল করেন। এ যুগের বেশীর ভাগ সময় তিনি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সান্নিধ্যে কাটান। একদিকে দারিদ্রের কারণে অন্যদিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফয়েজ বেশী বেশী লাভের আশায় তিনি আসহাবে সুফফা রাদিয়াল্লাহ আনহুর পবিত্র জামায়াতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। সফর হোক বা মুকিম, একাকীত্ব হোক বা মানুষের ভীড়, রাত হোক বা দিন, হজ্জ হোক বা যুদ্ধ হোক তিনি সবসময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সান্নিধ্যে থাকার চেষ্টা করতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্দর অবয়ব দর্শনে নিজের চক্ষু উজ্জ্বল করা এবং নবুয়াতের জ্ঞানের প্রস্রবণ অবগাহন করাই তাঁর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে বর্ণিত আছে, একবার তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ! আপনার সুন্দর চেহারা দর্শন আমার অন্তরের প্রশান্তি এবং চক্ষুর শীতলতা আনে।"

উম্মাহর ফকীহ হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু বলতেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আবু হুরাইরাই রাদিয়াল্লাহ আনহু আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী উপস্থিত থাকতেন।

একবার হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহ আনহুকে কোনো এক ব্যক্তি বললেন ঃ "আবু মুহাম্মাদ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এরশাসমূহ এ ইয়েমেনীই (আবু হুরাইরা) বেশী জানে, না আপনারা বেশী জানেন, তা আমরা জানি না।" হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন ঃ

"এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে এমন অনেক কথা শুনেছেন যা আমরা শুনিনি। তার কারণ হলো, আমরা ঘর-বাড়ী, পরিবার-পরিজন ও সম্পদশালী ছিলাম। এসব দেখা শুনার পর সকাল-সন্ধায় যে সময় পেতাম সেই সময়ে আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কাটাতাম।

www.bjilibrary.com

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু মিসকীন ছিলেন। তিনি ধন-সম্পদ এবং বিবি-বাচ্চার ঝঞ্ঝাট মুক্ত ছিলেন। এজন্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতের ওপর হাত রেখে তাঁর সাথে সাথে থাকতেন। ফলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বেশী বেশী ইরশাদ শোনার সুযোগ তাঁর হয়েছিলো। আমাদের মধ্যে কেউই তাঁর বিরুদ্ধে এ অভিযোগ করেননি যে, তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে না শুনেই হাদীস বর্ণনা করেছেন।"

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এত সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন যে, অন্যান্য সাহাবী যেখানে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যেসব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে ইতস্ততঃ করতেন সেখানে তিনি তা নির্দ্বিধায় জিজ্ঞেস করতেন।

"মুসতাদরাকে হাকিমে" হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে প্রশ্ন করার ব্যাপারে আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু অত্যন্ত নির্ভিক ছিলেন। সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এমন প্রশ্ন করতো যা আমরা পারতাম না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুর হাদীস বর্ণনার আগ্রহের কথার স্বীকৃতি দিয়েছেন। একবার তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "ইয়া রাসূলুল্লাহ ! কিয়ামতের দিন কোন্ ভাগ্যবান আপনার সুপারিশের বেশী যোগ্য হবে ?"

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ "হাদীসের প্রতি তোমার লোভ দেখে প্রথম থেকেই আমার ধারণা ছিলো যে, এ প্রশ্ন তোমার আগে আর কেউ করবে না।"

দিনরাত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সান্নিধ্যের ফায়েজ থেকে উপকৃত হওয়ার কারণ তিনি বিপুল পরিমাণে হাদীস নিজের অন্তরে সংরক্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এজন্যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন ঃ "আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু জ্ঞানের আধার।"–(সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল ইলম)

জ্ঞান অর্জনের অসীম উৎসাহ হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুকে জীবিকা অর্জনের চিন্তা বিমুক্ত করে রেখেছিলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লামের খিদমতে প্রতিটি মুহূর্ত উপস্থিত থাকার ফলে তিনি দারিদ্র ও বুভুক্ষার মুসিবত বরদাশত করেন। এক নাগাড়ে কয়েকদিন ভুখা থাকতেন। ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করতেন। এ সত্ত্বেও তিনি জীবিকার জন্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সান্নিধ্য ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলেন না। জ্ঞান অর্জনের জন্যে ভুখা নাঙ্গা থাকার কষ্ট স্বীকার করা এবং দারিদ্র ও বুভুক্ষার জীবন গ্রহণ করা সহজ কাজ নয়। প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে এ কাজ সম্ভবও নয়। কিন্তু হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুই এ কাজ করতে পেরেছিলেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জনের প্রশ্নটি দুনিয়ার প্রতিটি বস্তুর ওপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

হাফেজ ইবনে হাজার (র) "আল ইসাবাহ" গ্রন্থে লিখেছেন, "একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গনিমাতের সম্পদ এলো। তিনি স্নেহ করে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমিও কি কিছু পাওয়ার আশা করো ?"

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু আরজ করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আপনার কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করাই আমার একমাত্র সাধ। সম্পদ আমার কোন্ কাজে আসবে।"

ইবনে সায়াদ রাদিয়াল্লাহ আনহু "তাবকাতে" হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুর এ বর্ণনা উল্লেখ করেছেন ঃ

"যখনই পেটে কিছু পড়তো, তখনই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাজির হতাম। এ কারণেই কোনো সময় মিহি আটার রুটি খাইনি। ভালো পোশাক পরিনি। কোনো দাস-দাসীও ভাগ্যে জোটেনি। (কেননা এসব কিছু আয়ের ওপর নির্ভরশীল) যখন ক্ষুধা লাগতো তখন কাউকে কুরআনের কোনো আয়াত পাঠ এবং তার তাফসীর বর্ণনার অনুরোধ করতাম। প্রকৃতপক্ষে সে আয়াত আমি জানতাম। উদ্দেশ্য থাকতো এভাবে সে ব্যক্তি আমাকে সাথে নিয়ে যাবে এবং খানা খাইয়ে দেবেন। আমি সে ৭০ আসহাবে সুফফাহার অন্তর্ভুক্ত ছিলাম যাদের কারোরই গায়ের চাদর পর্যন্ত ছিলো না। শুধু ধারীদার কাপড় অথবা কম্বল ছিলো। তারা তা গলায় জড়িয়ে নিতো। যখন ক্ষুধার তাড়নায় ছটফট করতো তখন ঘর থেকে বেরিয়ে মসজিদে এসে উপস্থিত হতো।"

হাফেজ জাহাবী (র) "সিয়রে আ'লামুন নুবলা" গ্রন্থে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুর দারিদ্র সম্পর্কে এক ঘটনা বর্ণনা করেছেন। একবার কয়েক দিন পর্যন্ত তাঁর ভাগ্যে খাবার জুটলো না। ক্ষুধায় অস্থির হয়ে বাইরে বেরুলেন

www.bjilibrary.com

এবং কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে সড়কের ওপর প্রায় সটান হয়ে পড়লেন। ইত্যবসরে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু সে পথে যাচ্ছিলেন। মনে চাইলো যে, তিনি তাঁকে বলেন, "ক্ষুধায় অস্থির আছি, কিছু খাওয়ান।" কিন্তু সাহস হলো না, অবশ্য কুরআনে করীমের একটি আয়াতের তাফসীর জিজ্ঞেস করলাম। এ আয়াতে গরীব-মিসকীনদের সাহায্যের তাকীদ দেয়া হয়েছে। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু সেই আয়াতের মর্মার্থ বলে চলে গেলেন। তারপর হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু এলেন। তিনিও একই ধরনের করলেন। এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমন ঘটলো। তিনি তাঁর চেহারা দেখেই অনুমান করলেন যে, চরম ক্ষুধায় কাতর রয়েছে। তিনি তাঁকে সাথে করে বাড়ী নিয়ে গেলেন। সেখানে দুধে পরিপূর্ণ এক বড় পাত্র ছিলো। উপঢৌকন স্বরূপ তা কেউ পাঠিয়েছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুকে বললেন, যাও সকল আহলে সুফফাহকে ডেকে আনো। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ পালন করলেন। অতপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সেই দুধ সবাইকে দিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি তাই করলেন এবং প্রত্যেকেই আসুদাহ হয়ে পান করলেন। অবশিষ্টটুকু তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে পেশ করলেন। তিনি বললেন, এটুকু তুমি পান করো। তিনি পান করলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অতপর বললেন, পান করো। তিনি আবার পান করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবে বারবার বলতে লাগলেন, পান করো। আর তিনি পান করতে লাগলেন। অবশেষে তিনি আরজ করলেন, সেই সত্বার শপথ যিনি হকসহ আপনাকে প্রেরণ করেছেন ; আমার পেটে আর জায়গা নেই। অতপর বাকী দুধ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিলেন এবং স্বয়ং তা পান করলেন।

নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু সম্পর্কে এ ধরনের আরো অনেক ঘটনা বর্ণনা করেছেন। নিসন্দেহে একথা বলা যায় যে, সক্ষম সাহাবীরা হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং অন্যান্য আসহাবে সুফফাহর খোঁজ খবর নিতেন। সর্বোপরি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের ব্যাপারে খেয়াল রাখতেন। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা ছিলো যে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও ক্ষুধার তাড়না থেকে রেহাই পেতেন না। তাঁর কাছে কখনো খাবার থাকতো। আবার কখনো থাকতো না। যখন থাকতো সবাইকে বণ্টন করে দিতেন। যখন থাকতো না তখন হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুর মত জ্ঞান পিপাসুরা অবশ্যই কষ্ট ভোগ করতেন।

www.bjilibrary.com

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু হিজরতের সময় নিজের আম্মাকেও সাথে নিয়ে এসেছিলেন। বিভিন্ন রাওয়ায়েত অনুসারে তাঁর নাম ছিলো মাইমুনাহ অথবা উমাইমাহ। যৌবনকালেই তিনি বিধবা হয়েছিলেন। অত্যন্ত দুঃখ-কষ্টে তিনি হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুকে লালন-পালন করেন। এজন্যে তিনি তাঁর মায়ের প্রতি অত্যন্ত অনুগত ছিলেন। দুঃখজনক ঘটনা হলো, হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু মদীনা আসার পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর আম্মা মদীনা আসার পরও নিজের বাপ-দাদার ধর্মের ওপর কায়েম ছিলেন। হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু মায়ের শিরকের কারণে অন্তরে অন্তরে খুব কষ্ট পেতেন। যখনই আম্মাকে তাওহীদের দাওয়াত দিতেন তখনই তিনি তা প্রত্যাখ্যান করতেন। একদিন তিনি ইসলামের দাওয়াতের জবাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে একদম অযাচিত বাক্য ব্যবহার করে বসলেন। এতে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু অত্যন্ত মনোকষ্ট পেলেন। তিনি কাঁদতে কাঁদতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হলেন এবং ঘটনা বলে আরজ করলেন ঃ

"ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমার আম্মার জন্যে দোয়া করুন। যাতে আল্লাহ পাক তাঁকে হক কবুলের তাওফিক দেন।"

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তৎক্ষণাৎ দোয়া করলেন ঃ হে খোদা ! আবু হুরাইরার মাকে হেদায়াত দিন।"

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু খুশী চিত্তে বাড়ী ফিরে গেলেন। গিয়ে দেখলেন কপাট বন্ধ এবং মা গোসল করছেন। গোসল শেষে দরযা খুললেন এবং বললেন ঃ

হে পুত্র ! সাক্ষী থেকো যে, আমি আল্লাহ ও তাঁর সত্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর নিষ্ঠার সাথে ঈমান আনলাম।"

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন এবং আনন্দাশ্রু ফেলতে ফেলতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! আপনার প্রতি সুসংবাদ। আপনার দোয়া কবুল হয়েছে। আল্লাহ আমার মাকে হেদায়াত দিয়েছেন।" হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ খবর শুনে খুশী হলেন।

এখন হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু আরজ করলেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল ! দোয়া করুন, আল্লাহ যেন সব মু'মিনের অন্তরে আমার এবং আমার আম্মার জন্যে মুহাব্বত সৃষ্টি করে দেন।"

www.bjilibrary.com

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়া করলেন।

এ দোয়ার আসর হলো। স্বয়ং হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু বলেছেন, যে মু'মিন ব্যক্তি তাদের ব্যাপারে শুনতেন তিনিই তাদেরকে ভালোবাসতেন।-(আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, হাফিজ ইবনে কাসির)

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু নিজের আম্মাকে অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন। যখন তিনি ঘরে আসতেন তখন বলতেন ঃ "আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া আমতাহ ওয়া রাহমাতুল্লাহু ওয়া বারাকাতুহু।"

তিনি জবাবে বলতেন ঃ "ওয়া আলাইকাসসালাম ইয়া বুনাইয়া ওয়া রাহমাতুল্লাহু ওয়া বারাকাতুহু।"

অতপর হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু বলতেন, "আল্লাহ তাআলা আপনার ওপর সেই ধরনের রহমত বর্ষণ করুন যেভাবে আপনি শৈশবকালে আমার ওপর রহম করেছিলেন এবং আমাকে লালন-পালন করেছিলেন।"

তিনি জবাব দিতেন, "হে পুত্র ! তুমি জওয়ান হয়ে আমাকে যেভাবে খিদমত করেছো তেমনি যেন আল্লাহ পাক তোমার ওপর রহমত বর্ষণ করেন।"

মাতার সাথে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুর কি ধরনের বিশেষ সম্পর্ক ছিলো তা এ ঘটনা থেকেই অনুমান করা যায়। একবার তিনি কয়েকজন আসহাবে সুফফাহর সাথীসহ ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত হলেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ "এখন কিভাবে এলে ?"

তিনি আরজ করলেন ঃ "ইয়া রাসূলাল্লাহ ! ক্ষুধায় টেনে নিয়ে এসেছে।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি খেজুরের কাঁধি আনলেন এবং প্রত্যেককে দু'টি করে খেজুর প্রদান করে বললেন ঃ "এ খেজুর দু'টি খাও এবং তারপর পানি পান করো। এ দু'টি খেজুরই আজকের জন্য তোমাদের যথেষ্ট হবে। হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু একটি খেজুর খেলেন এবং অপরটি রেখে দিলেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, "আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু খেজুর কেনো রেখে দিলে ?" তিনি বললেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মায়ের জন্যে।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তুমি এ খেজুর খেয়ে নাও। তোমার মায়ের জন্যও আমি দু'টি খেজুর দিবো।" তিনি নির্দেশ পালন

www.bjilibrary.com

করলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মায়ের খিদমতে পেশ করার জন্যে তাঁকে আরো দু'টি খেজুর প্রদান করলেন।

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু আজীবন মায়ের খিদমত করেছেন এবং জীবিত অবস্থায় তাঁর একাকীত্বের ভয়ে হজ্জ আদায়ের জন্যেও যাননি।

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে একজন দরবেশ ছাত্রই ছিলেন না। বরং একজন মুজাহিদও ছিলেন। খাইবারের যুদ্ধের পর তিনি মক্কা বিজয়, হুনাইন এবং তাবুকের যুদ্ধেও বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহযাত্রী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।

কিছু কিছু সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুকে বিশেষ কোনো অভিযানের দায়িত্বও অর্পণ করেছিলেন। মুসনাদে আহমদে হযরত সুলাইমান বিন ইয়াসার রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুর মুখ দিয়ে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে এক বাহিনীর সাথে প্রেরণ করলেন এবং কুরাইশের দু'জনের নাম নিয়ে (ইসলামের দুশমন) বললেন, তাদেরকে পেলে আগুন দিয়ে পুড়ে দিও। কিন্তু আমরা যখন যাত্রা শুরু করলাম তখন বললেন, আমি তোমাদেরকে অমুক অমুককে জ্বালিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলাম। কিন্তু আগুনের শাস্তি প্রদান একমাত্র আল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট। যদি তাদেরকে পাও তাহলে না পুড়িয়ে তরবারী দিয়ে হত্যা করো।"

সুনানে ইবনে মাযাতেও বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো একবার এক বিশেষ অভিযানে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুকে প্রেরণ করেন। যখন তিনি রওয়ানা দিচ্ছিলেন তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং তাঁকে বিদায় জানান এবং বলেন, আমি তোমাকে খোদার আমানতে সমর্পণ করছি। তাঁর আমানত কখনো নষ্ট হয় না।

নবম হিজরীতে তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তনের পর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনশ' মুসলমানের এক কাফেলা হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহুর ইমারতে হজ্জের জন্যে মক্কা প্রেরণ করেন। তিনি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুকে এ কাফেলার নকিব এবং হযরত সায়াদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবি ওয়াক্কাস, হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ আনসারী রাদিয়াল্লাহ আনহু ও হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুকে আহ্বানকারী এবং মুয়াল্লিম নিয়োগ করেন।

www.bjilibrary.com

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের (১১ হিজরী) পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ সময় সমগ্র আরবে ধর্মদ্রোহিতার আগুন প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠে। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু নজীরবিহীন হিম্মত এবং আস্থার সাথে এ ফেতনার বিরুদ্ধে জিহাদ করেন ও কয়েক মাসের মধ্যে তা উৎখাত করেন। হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু সিদ্দিকে আকবার রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে একাত্ম হয়ে ধর্মদ্রোহিতার বিরুদ্ধে পরিচালিত জিহাদে অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অংশগ্রহণ করেন। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে স্বয়ং তার থেকে বর্ণিত আছে ঃ

"যখন ধর্মদ্রোহিতার ফেতনা শুরু হলো তখন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে বললেন, আপনি ধর্মদ্রোহী বা মুরতাদদের সাথে লড়াই করতে চান। অথচ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে একথা শুনেছি। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু ফরমালেন, আমি নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবো না এবং যে ব্যক্তি এর মধ্যে পার্থক্য করবে আমি তার বিরুদ্ধে লড়াই করবো। বস্তুত আমরা হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহুর নেতৃত্বে মুরতাদদের (যাকাত অস্বীকারকারী) বিরুদ্ধে জিহাদ করলাম এবং তাতে মঙ্গল পেলাম।"

হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু নিজের খিলাফাতকালে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুকে বাহরাইনের গভর্নর নিযুক্ত করলেন। এর পূর্বে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবদুল্লাহ হাজরামীর সাথে বাহরাইন গিয়েছিলেন এবং সেখানকার মানুষকে দীনি হুকুম-আহকাম ও মাসয়ালা-মাসায়েল শিক্ষা দিয়েছিলেন। গভর্নর নিযুক্ত হওয়ার কারণে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুর ক্ষুধা ও দারিদ্রের যুগ সমাপ্ত হয়।

হাফেজ ইবনে হাজার (র) আল ইসাবাহ গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু বাহরাইন থেকে ফিরে এলেন। এ সময় তাঁর কাছে দশ হাজার দিরহাম বা দিনার ছিলো। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু নিজের গভর্নরদের ওপর কড়া দৃষ্টি রাখতেন। তিনি যখন জানলেন তখন হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এতো অর্থ কোথায় পেলে ? তিনি বললেন, আমার কয়েকটি মাদী ঘোড়া ছিলো তাদের বাচ্চা হয়েছিলো। কিছু গোলামদের আয় ছিলো এবং কিছু অর্থ পর্যায়ক্রমিক-ভাবে আমি জমিয়েছিলাম। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু এ ব্যাপারে অনুসন্ধান করালেন এবং হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুকে বাহরাইনের

www.bjilibrary.com

আমীর বানিয়ে পুনরায় প্রেরণ করতে চাইলেন। কিন্তু তিনি এ পদ গ্রহণে আপত্তি করলেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন, তুমি ইমারতের পদ গ্রহণ পসন্দ করছো না। অথচ ইউসুফ আলাইহিস সালাম এ পদের জন্য আকাংখা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি তোমার চেয়ে উত্তমও ছিলেন।

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু আরজ করলেন, "আমীরুল মু'মিনীন। ইউসুফ আলাইহিস সালাম নবীর পুত্র নবী ছিলেন। আর আমি বেচারা হলাম উমাইয়ার পুত্র। আমি পাঁচটি জিনিসে ভয় পাই। এ কারণেই ইমারতের পদে সমাসীন হওয়াকে অপসন্দ করি। সেই পাঁচটি জিনিস হলো ঃ জ্ঞান ছাড়া কিছু বলা, শরয়ী দলীল ছাড়া কোনো ফায়সালা করা, আমাকে প্রহার করা, আমাকে অসম্মান করা এবং আমার সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া।"

হাফেজ জাহাবী রাদিয়াল্লাহ আনহু 'সিয়ারে আলামুন নুবলা' গ্রন্থে ভিন্ন ধরনের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু চার লাখ দিনার অথবা দিরহাম বাহরাইন থাকাকালে জমা করে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে দিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কারো ওপর যুলুম করোনিতো ? হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন, "না"। অতপর হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু প্রশ্ন করলেন, "তুমি নিজের জন্য সেখান থেকে কি এনেছো ?" তিনি বললেন, "বিশ হাজার।" হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু জিজ্ঞেস করলেন, এ সম্পদ তুমি কেমন করে হাসিল করেছ ? তিনি জবাব দিলেন। ব্যবসার মাধ্যমে।" আমীরুল মু'মিনীন বললেন, "নিজের মূল পুঁজি রেখে দাও এবং অবশিষ্ট অর্থ বাইতুল মালে জমা দাও।"

ইবনে আসাকির (র) 'তারিখে দামেশকে' লিখেছেন, হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু ইয়ারমুকের যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন।

হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুর খেলাফতকালে ইয়ারমুকের যুদ্ধ অত্যন্ত রক্তাক্ত যুদ্ধ হিসেবে পরিগণিত। এ যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়ে সিরিয়ার খৃষ্টানদের ভাগ্যের প্রায় ফায়সালা হয়ে গিয়েছিলো। এ সংঘর্ষে কয়েকবার রোমীয়রা মুসলমানদের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করেছিলো। হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং তাঁর মত অন্যান্য বাহাদুররা যদি এ যুদ্ধে সে চাপ রুখে না দাঁড়াতেন তাহলে মুসলমানরা পরাজিত হতেন। এ ধরনেরই এক হামলার সময় রোম পক্ষ মুসলমানদের ওপর প্রচণ্ড বেগে আপতিত হলো। হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুর গোত্র ইজদ অটল থেকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে সেই হামলা প্রতিহত করলো। হযরত জুন্দুব রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আমর ইজদি নিজের পতাকা ক্ষিপ্রতার সাথে উড়িয়ে উচ্চস্বরে বললেন ঃ

www.bjilibrary.com

"হে ইজদ কাওম ! তোমাদের মধ্যে কেউই চিরকাল বেঁচে থাকবে না। তোমরা যদি পুরো দৃঢ়তার সাথে দুশমনের বিরুদ্ধে মুকাবিলা না করো, তাহলে মান-ইজ্জত নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবে না। কান খুলে শোন, মৃত্যুবরণ-কারীদের জন্য জিন্নতী অবধারিত।"

এ সময় হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু অগ্রসর হলেন এবং নিজের গোত্রকে আহ্বান জানিয়ে বললেন ঃ

"হে বাহাদুররা ! বেহেশতের হুররা তোমাদের প্রতীক্ষায় রয়েছে। তাদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্যে নিজেদের শহীদ করে নাও। আল্লাহর সান্নিধ্য এবং সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে কোমর বাঁধ। তোমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছো সেই স্থান ছাড়া আল্লাহর কাছে নেকীর বেশী পসন্দনীয় স্থান আর নেই।"

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুর আহ্বানে ইজদ গোত্রের বাহাদুররা তাঁর চারপাশে একত্রিত হলো এবং সবাই মিলে এমন প্রচণ্ড জবাবী হামলা চালালো যে, রোমীয়দের ব্যূহ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলো। একথা স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে, দাওস গোত্র ইজদেরই একটি শাখা। এজন্যে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুকে দাওসী অথবা ইজদী যাই বলা হোক না কেন তাতে কিছু এসে যায় না।

চরিতকাররা ব্যাখ্যা না করলেও কার্যকরণ থেকে জানা যায় যে, হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু সিরিয়ার আরও কয়েকটি যুদ্ধে বাহাদুরী প্রদর্শন করেছিলেন।

ইবনে আসির (র) বর্ণনা করেছেন, হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুর খিলাফতের শেষ পর্যায়ে আজারবাইজানে সৈন্য প্রেরণ করা হয়। এ সময় হযরত আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন রবিয়াহ তুর্কীদের বিরুদ্ধে নিয়োজিত হন। এ সৈন্য বাহিনীতে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুও শরীক ছিলেন। কিন্তু এ অভিযান সমাপ্ত না হতেই হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু শহীদ হন এবং হযরত ওসমান জুনুরাইন খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর খিলাফতকালে হযরত আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন রবিয়াহ বালনজরের ওপর হামলা করেন। এ যুদ্ধে তিনি শহীদ হন। শাহাদাতের পর তাঁর ভাই সালমান বিন রবিয়াহ (র) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁর সাথে বালনজর থেকে জিলান হয়ে জারজান গমন করেন এবং এসব শহর পদানত করার জন্য সংঘটিত সংঘর্ষসমূহে জীবন পণ লড়াই করেন।

হযরত ওসমান গনি রাদিয়াল্লাহ আনহুর শাসনামলের প্রথমার্ধে পূর্বাঞ্চলীয় দেশসমূহে সংঘটিত যুদ্ধসমূহে অংশগ্রহণের পর হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ

১০—

www.bjilibrary.com

আনহু মদীনা মুনাওয়ারাতে ফিরে আসেন এবং নীরবে হাদীস প্রচারের কাজে ব্যাপৃত হন। যখন হযরত ওসমান গনি রাদিয়াল্লাহ আনহুর বিরুদ্ধে হৈ চৈ শুরু হলো এবং বিদ্রোহীরা তাঁর গৃহ অবরোধ করলো তখন হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু অত্যন্ত উৎসাহের সাথে জনগণকে আমীরুল মু'মিনীনের সাহায্য-সহযোগিতার ব্যাপারে প্রস্তুত করার চেষ্টা করেছিলেন।

হাফিজ ইবনে হাজার (র) এবং হাফিজ ইবনে কাসির (র) বর্ণনা করেছেন, হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু সেই সকল সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহুকে রক্ষার জন্য এসেছিলেন এবং তাঁর গৃহে উপস্থিত ছিলেন। হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন ঃ

"আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি, তোমরা আমার পর ফেতনা এবং মতবিরোধে লিপ্ত হবে। মানুষেরা জিজ্ঞেস করল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ! এ ফেতনার যুগে আমাদেরকে কি করতে হবে। তিনি বললেন, তোমাদেরকে আমানতদার ও তার সহযোগীদের সাথে থাকতে হবে।"

একথায় হযরত ওসমান জুন্নুরাইন রাদিয়াল্লাহ আঁনহুর প্রতিই ইঙ্গিত ছিলো।

আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওসমান গনি রাদিয়াল্লাহ আনহু অত্যন্ত শরীফ মানুষ ছিলেন। তিনি এ নাজুক সময়েও নিজের সমর্থকদেরকে তলোয়ার উঠানোর অনুমতি দেননি। এ সত্ত্বেও ইবনে সায়াদ (র) ও ইবনে আসিরের (র) বর্ণনা মতে আমীরুল মু'মিনিনের কতিপয় সমর্থক বিদ্রোহীদেরকে পিছ পা করার জন্যে তরবারী ব্যবহার করেই ছেড়েছিলো। তাঁদের মধ্যে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুও ছিলেন। কিন্তু বিধি লিপি কে খণ্ডাতে পারে ! কতিপয় বিদ্রোহী পেছনের দিক থেকে প্রাচীর টপকিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলো এবং বয়সের ভারে নুজ আমীরুল মু'মিনীনকে কুরআন তেলাওয়াতরত অবস্থায় অত্যন্ত নৃশংসভাবে শহীদ করে ফেললো। এ লোমহর্ষক ঘটনায় হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু খুবই দুঃখ পেলেন এবং তিনি সম্পূর্ণ নির্জনত্ব অবলম্বন করলেন। হযরত আলী কাররামুল্লাহ ওয়াজহাহুর খিলাফতকালে সংঘটিত যুদ্ধসমূহে (উষ্ট্র ও সিফফিনের যুদ্ধ) তিনি সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করলেন। তিনি বলতেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, আমার পরে অনেক ফেতনা সৃষ্টি হবে। এ ফেতনায় বসে থাকা ব্যক্তি দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তি অপেক্ষা অনেক উত্তম এবং দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তি চলাচলকারীর থেকে শ্রেষ্ঠ। যারা এ ফেতনাসমূহের প্রতি

www.bjilibrary.com

আকৃষ্ট হবে, ফেতনাও তাদের প্রতি আকৃষ্ট হবে। কেউ যদি এ ফেতনাসমূহ থেকে বাঁচার স্থান পায়, তাহলে সে যেন সেখানে আশ্রয় নেয়।

–(মুসনাদে আহমদ)

কতিপয় রাওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর খেলাফতকালে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু কোনো কোনো সময় মদীনাবাসীদেরকে নামায পড়িয়েছেন।

৪০ হিজরীতে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু শহীদ হন এবং হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহ আনহু খিলাফতের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। তিনি কয়েক মাস পর আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহুর পক্ষে খিলাফত ছেড়ে দেন। এ সময় হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহুর আনুগত্য বা বাইয়াত হন। আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহু বিভিন্ন প্রদেশে গভর্নর নিয়োগ করেন। তিনি মারওয়ান ইবনুল হাকামকে মদীনার গভর্নর নিযুক্ত করলেন। তিনি যখন মদীনার বাইরে যেতেন তখন হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুকে নিজের স্থলাভিষিক্ত বা ভারপ্রাপ্ত নিয়োগ করতেন।

তাবারী (র) বর্ণনা করেছেন, মারওয়ান নিজের ইমারতকালে ৪৪ এবং ৫৫ হিজরীতে দু'বার হজ্জের জন্যে মক্কা মুয়াজ্জামা গিয়েছিলেন। এ সময় সে এক অথবা দু'বারই হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুকে মদীনা মুনওয়ারাতে নিজের স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন।

ইমাম আহম্মদ বিন হাম্বল (র) এবং হাফিজ জাহাবী (র) ভিন্ন ধরনের কথা বলেছেন। তাঁরা বলেন, মদীনার গভর্নর মারওয়ানের ওপর যখন আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহু অসন্তুষ্ট হতেন তখন তাকে বরখাস্ত করতেন এবং তার স্থলে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুকে গভর্নর নিযুক্ত করতেন। আবার যখন হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুর ওপর নারাজ হতেন তখন তার স্থানে মারওয়ানকে মদীনার গভর্নর বানিয়ে দিতেন।

–(মুসনাদে আহমদ এবং সিয়রে আ'লামুননুবলা)

যাহোক, হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু কয়েকবার অবশ্যই মদীনার ইমারতের দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

–(আমীরে মুয়াবিয়ার খিলাফতকাল দ্রষ্টব্য)

৫৮ হিজরীতে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু কঠিন রোগে আক্রান্ত হলেন। এমনকি বাঁচার আর আশা রইলো না। মানুষ সেবা-শুশ্রূষার জন্যে আসতো। এ অবস্থাতেও তিনি ন্যায় কাজের নির্দেশ এবং অন্যায় কাজ

www.bjilibrary.com

থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়ার দায়িত্ব পালন করতেন। দুনিয়া সম্পর্কে অন্তর বিতৃষ্ণায় ভরে গিয়েছিলো। হযরত আবু সালমাহ (র) বিন আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহ আনহু শুশ্রূষার জন্যে এলেন এবং তাঁর সুস্থতার জন্যে দোয়া করলেন। তখন তিনি বললেন ঃ

"হে আল্লাহ ! আমাকে আর দুনিয়াতে রেখো না।" দু'বার তিনি একথা দোহরালেন। অতপর হযরত আবু সালমাহ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ

"আবু সালমাহ সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন রয়েছে। সেদিন আর সুদূর নয় যখন মানুষ মৃত্যুকে লাল স্বর্ণের খনির চেয়েও বেশী প্রিয় মনে করবে। তুমি জীবিত থাকলে দেখবে যখন মানুষ কোনো মুসলমানের কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে তখন আকাংখা প্রকাশ করে বলবে, হায় ! তার পরিবর্তে আমাকে যদি এ কবরে দাফন করা হতো।"

মৃত্যু যন্ত্রণায় একদিন কাঁদতে লাগলেন। লোকজন এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন ঃ

"দুনিয়ার চাকচিক্য থেকে বিদায় নেয়ার জন্যে কাঁদছি না। আমি কাঁদছি অন্য কারণে। সফর দীর্ঘ। অথচ সেই সফরের কোনো পুঁজি বা সম্বল নেই। আমি এখন বেহেশত ও দোযখের চরাই উতরাইয়ে আছি। জানি না কোন্ রাস্তায় যেতে হয়।"

মারওয়ান ইবনুল হাকাম শুশ্রূষার জন্যে এলো এবং তাঁর সুস্থতার জন্যে দোয়া করলো।

তিনি বললেন, "হে আল্লাহ! আমি তোমার দিদার বা সাক্ষাত চাই। তুমিও আমার সাক্ষাত পসন্দ করো।"

যখন শেষ সময় এলো তখন ওসিয়ত করলেন ঃ

"আমার কবরের ওপর তাঁবু টাংগিয়ো না। জানাযার পেছনে আগুন নিয়ে যেও না এবং তাড়াতাড়ি জানাযাহ নিয়ে যেও। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, যখন মু'মিনকে লাশ বহনকারী খাটিয়ার ওপর রাখা হয় তখন সে বলে যে, আমাকে তাড়াতাড়ি নিয়ে যাও। আর যখন কাফের এবং ফাজেরকে খাটিয়ার ওপর রাখা হয়, তখন সে বলে আমাকে কোথায় নিয়ে চলেছো।"

এরপর তিনি আল্লাহর দরবারে হাজির হলেন। এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিলো ৭৮ বছর। এক রাওয়ায়েতে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুর

www.bjilibrary.com

মৃত্যু সন ৫৭ হিজরী বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু ওয়াকেদী (র), আবু ওবায়েদ (র) এবং অন্যান্য চরিতকারের মতে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহার নামাযে জানাযা পড়িয়েছিলেন এবং তিনি ৫৮ হিজরীতে ওফাত পেয়েছিলেন। এ মতের আলোকে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর ওফাতের তারিখ ৫৮ হিজরীর রমযানে মানতে হয়। হাফিজ ইবনে কাসির (র) এবং হাফেজ ইবনে হাজরের (র) মতে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর ওফাতের সাল হলো ৫৯ হিজরী।

তৎকালীন মদীনার আমীর ওলিদ বিন উতবাহ হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর জানাযার নামায পড়িয়েছিলেন। বড় বড় সাহাবীর মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু জানাযায় উপস্থিত ছিলেন। হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু জানাযার অগ্রভাগে যাচ্ছিলেন এবং হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাগফিরাত কামনা করছিলেন। জানাযার নামাযের পর হযরত ওসমান জুন্নুরাইনের পুত্ররা খাটিয়া কাঁধে নিয়ে জান্নাতুল বাকীতে পৌঁছে দিয়েছিলেন এবং ইসলামের এ মহান ব্যক্তিত্বকে ফাখখে মুহাজিরিনে সমাধিস্থ করা হয়।

ইবনে সায়াদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, ওলিদ বিন উতবাহ আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যু সংবাদ প্রেরণ করলো। এ সংবাদ পেয়ে তিনি ওলিদকে লিখলেন, আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তরাধিকারদেরকে দশ হাজার দিরহাম দেবে এবং তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে। কেননা আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর সমর্থনকারীদের মধ্যে ছিলেন এবং অবরোধের সময় তাঁর গৃহে উপস্থিত ছিলেন।

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু এক বিধবা স্ত্রী ও চার সন্তান রেখে যান। [তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর বিয়ে করেছিলেন] সন্তানদের মধ্যে ছিলো তিনজন পুত্র এবং একজন কন্যা। পুত্রদের নাম ছিলো আল মুহাররার, আবদুর রহমান এবং বেলাল। কন্যার নাম জানা যায়নি। অবশ্য এতটুকু জানা যায় যে, তাবেয়ী সরদার হযরত সাঈদ (র) মুসাইয়্যিব রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে তাঁর শাদী হয়েছিলো। বড় পুত্র আল মুহাররার (র) নিজের পিতা, হযরত ওমর ও হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি হযরত ওমর বিন আবদুল আজীজের (র) খেলাফতকালে ওফাত পান।

www.bjilibrary.com

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু জ্ঞান ও ফযীলতের দিক দিয়ে অত্যন্ত উঁচু মর্যাদায় সমাসীন ছিলেন। তিনি সৃষ্টির সেরা হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইরশাদসমূহের এতবড় ভাণ্ডার উম্মতকে উপহার দিয়েছেন যার ইহসান কখনো এ উম্মত ভুলে যেতে পারে না। তাঁর থেকে বর্ণিত ৫,৩৭৪টি হাদীসের মধ্যে ৩২৫টি ঐকমত্যের হাদীস। বুখারী ৭৯টিতে এবং মুসলিম ৯৩টিতে ভিন্নমত পোষণ করেন।

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বহুসংখ্যক হাদীস সরাসরি বর্ণনা করেছেন। এছাড়াও তিনি অনেক সাহাবী রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকেও হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহ আনহা এবং মহান সাহাবীরা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সেসব সাহাবী হলেন ঃ হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু, হযরত ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহ আনহু, হযরত উবাই বিন কা'ব আনসারী, হযরত উসামাহ রাদিয়াল্লহ আনহু বিন যায়েদ হিব্বুননবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং হযরত ফযল রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু।

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকেও উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহ আনহা ছাড়া হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহা, হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু, হযরত আবু মূসা আশয়ারী রাদিয়াল্লাহ আনহু, হযরত আবু রাফে' রাদিয়াল্লাহ আনহু, হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রাদিয়াল্লাহ আনহু, হযরত ওয়াসেলাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসকা, হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রাদিয়াল্লাহ আনহু, হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ আনসারী রাদিয়াল্লাহ আনহু, হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন মালেক এবং হযরত যায়েদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন সাবিত হাদীস বর্ণনা করেছেন। এছাড়াও এক বিরাট সংখ্যক বড় বড় তাবেয়ী তাঁর থেকে হাদীস রাওয়ায়েত করেছেন। তাদের মধ্যে কতিপয়ের নাম হলো ঃ

সাঈদ (র) বিন মুসাইয়িব রাদিয়াল্লাহ আন, আবু ইদরিস খাওলানী (র), আবু ওসমান নাহদী (র), আবু জারয়া (র), আবু সালমাহ (র) বিন আবদুর রহমান (র), বিন আওফ, হাসান বসরী (র), মুহাম্মদ (র) বিন সিরিন, সুলাইমান বিন ইয়াসার (র), তাউস (র), মুজাহিদ (র), আতা (র), আমের শা'বী (র), আকরামাহ (র) উরওয়াহ (র), বিন যুবাইর রাদিয়াল্লাহ আনহু, নাফে বিন জাবির (র), কাবিসাহ বিন জাবির (র), হাফস (র), বিন আসেম

www.bjilibrary.com

(র), বিন ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু, আরাজ (র) এবং আমের (র) বিন সায়াদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন আবি ওয়াক্কাস প্রমুখ।

ইমাম বুখারী (র) বলেছেন, হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে হাদীস বর্ণনাকারীর সংখ্যা আটশ'রও বেশী। তাদের মধ্যে বড় বড় জলিলুল কদর সাহাবী ও তাবেয়ীও রয়েছেন।

হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু আমাদের সবার চেয়ে বেশী হাদীস জানতেন। হাফিজ ইবনে কাসির (র) 'আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া' গ্রন্থে লিখেছেন, একবার হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো যে, আপনি নিজেও সাহাবী এবং আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে রাওয়ায়েত করে থাকেন। সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কেন রাওয়ায়েত করেন না ? জবাবে তিনি জানান, আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু যাকিছু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছেন, আমরা তা শুনতে পারিনি। যে হাদীস আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে শুনতে পারিনি তা তাঁর পরিবর্তে আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করা পসন্দ করি।

মদীনার গভর্নর মারওয়ান ইবনুল হাকাম হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর উচ্চমর্যাদার স্বীকৃতি দিতেন এবং তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু কোনো কোনো সময় রাগান্বিত হয়ে তাঁর সাথে কথা কাটাকাটিতে লেগে যেতেন। এর কারণও ছিলো। হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু তার কোনো অন্যায় কাজ দেখলে নির্দ্বিধায় তাতে বাধা দিতেন। একবার কোনো কথায় মারওয়ান অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বললো ঃ

"লোকে বলে, আপনি অনেক বেশী হাদীস বর্ণনা করে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের সামান্য কিছুদিন আগেই মদীনা এসেছিলেন।"

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন ঃ "আমি যখন মদীনায় আসি তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাইবার তাশরীফ নিয়ে গিয়েছিলেন। সে সময় আমার বয়স ৩০ বছরের কিছু বেশী ছিলো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাজির হওয়ার পর আমি তাঁর সাথে ছায়ার মতো থাকতাম। তাঁর সাথে আজওয়াজে মুতাহহিরাতের গৃহে যেতাম। তাঁর খিদমত করতাম। তাঁর সাথে যুদ্ধসমূহে অংশ নিতাম। হজ্জেও তাঁর সাথী হতাম। এজন্যে আমি অন্যান্যদের চেয়ে বেশী হাদীস জানি।

www.bjilibrary.com

আল্লাহর কসম ! আমার পূর্বে যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সান্নিধ্যে এসেছিলেন তাঁরাও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আমার থাকার কথা স্বীকার করেছেন এবং আমার কাছ থেকে হাদীস জিজ্ঞেস করতেন। তাদের মধ্যে হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু, হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহু, হযরত তালহা রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং হযরত যুবাইর রাদিয়াল্লাহ আনহুর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।" তার এ জবাব শুনে মারওয়ান চুপ হয়ে গেলো।

ইমাম হাকিম (র) নিজের গ্রন্থ "মুসতাদরাকে" বর্ণনা করেছেন, একবার মারওয়ান হযরত আবু হুরাইরার পরীক্ষা নিতে চাইলো। সে একজন কাতিবকে গোপনে বসিয়ে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুকে ডেকে বিশেষ বিষয়ের ওপর হাদীস জিজ্ঞেস শুরু করলো। তিনি বর্ণনা করে গেলেন এবং পর্দার আড়ালে থেকে কাতিব তা লিখে নিলেন। দ্বিতীয় বছর সে একই পদ্ধতিতে হাদীস জিজ্ঞেস করলো। এবারও তিনি কমবেশী সেভাবেই হাদীস বর্ণনা করলেন যেমন গত বছর করেছিলেন। এমনকি ধারাবাহিকতায়ও কোনো পার্থক্য হলো না।

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু বলতেন, আবদুল্লাহ বিন আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস ছাড়া কোনো ব্যক্তিই আমার চেয়ে বেশী হাদীস জানে না। কেননা আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইরশাদসমূহ লিখে নিতেন। আর আমি লিখতাম না।-(সহীহ্ আল বুখারী, কিতাবুল ইলম)

"মুসতাদরাকে হাকিমের" এক বর্ণনা মতে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুও হাদীস লিখতেন। এভাবে তিনি একটি কিতাব সংকলন করেন। হাদীস ব্যাখ্যাকারীরা এ দু' বর্ণনার মধ্যে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন যে, হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর নিজের মুখস্তকৃত সকল হাদীস লিখে এক কিতাবে একত্রিত করেছিলেন।

মজার কথা হলো, হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু, হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আসকে নিজের চেয়ে বেশী হাদীসের আলেম মনে করতেন। অথচ তাঁর থেকে মাত্র ৭ শত হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু অধিক বর্ণনা করা সত্বেও হাদীসের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি হুজুর সাল্লাল্লাহু

www.bjilibrary.com

আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর কলংক লেপন করে বা তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দেয় সে ব্যক্তি নিজেকে জাহান্নামের উপযুক্ত বানিয়ে নেয়। ইবনে আসাকির (র) বলেছেন, বাজার দিয়ে অতিক্রমের সময় হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু লোকদেরকে উদ্দেশ করে বলতেন, হে মানুষেরা ! যে ব্যক্তি আমাকে চিনে সেতো চিনেই, আর যে ব্যক্তি আমাকে চিনে না, সে যেনো চিনে নেয় যে, আমি আবু হুরাইরা। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি জেনেবুঝে আমার ওপর মিথ্যা অপবাদ দেয়, সে দোযখে নিজের ঘর বানিয়ে নেয়। আর এ ধরনের বলা তিনি সাধারণ নিয়ম বানিয়ে নিয়েছিলেন।

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু শুধু হাদীসেরই আলেম ছিলেন না। তিনি ফিকাহ এবং ইজতিহাদেও পারদর্শী ছিলেন। তিনি মদীনার অন্যতম ফকিহ হিসেবে পরিগণিত ছিলেন। তিনি অন্যান্য ফকিহ সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহুমের মতো ফতওয়াও দিতেন।

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাতৃভাষা ছিলো আরবী। এছাড়া তিনি ফারসীও জানতেন। হাফিজ ইবনে হাজার (র) বলেছেন, তাওরাতের ব্যাপারেও তাঁর জ্ঞানের গভীরতা ছিলো।

আল্লাহ পাক যে উদারতার সাথে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জ্ঞান সম্পদ দান করেছিলেন, তিনিও জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত উদারতার সাথেই সে সম্পদকে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করে গেছেন। তিনি চলা-ফেরায়, উঠা-বসায় এবং যেখানেই কিছু মুসলমান পেতেন তাদের কাছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী পৌঁছে দিতেন। "মুসতাদরাকে হাকিমে" বর্ণিত আছে যে, তিনি প্রতি জুমার নামাযের পূর্বে ইমাম হুজরা থেকে বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত হাদীস বর্ণনা করতেন।

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে জ্ঞান অর্জন ও তা প্রসারের ইচ্ছা, রাসূল প্রেম, সুন্নাতের আনুগত্য, ইবাদাতের প্রতি নিষ্ঠা, হক কথন, সরলতা এবং উদারতা ছিলো সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক। তিনি জ্ঞান অর্জনের জন্যে যে ধরনের দুঃখ-কষ্ট বরদাশত করেছেন এবং এ ব্যাপারে দিন ও রাতকে একাকার করে দিয়েছেন ইতিহাসের পাতায় তার উদাহরণ খুব কমই পাওয়া যায়। এরপরও সে জ্ঞানকে তিনি নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি। বরং আজীবন অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে তা প্রচার করেছেন।

www.bjilibrary.com

বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি এত অধিক অনুরক্ত ছিলেন যে, বেশীর ভাগ সময়ই তিনি তাঁর কাছে কাটাতেন। তাঁর সাথে অবস্থান এবং খিদমতকে জীবনের সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য বলে মনে করতেন। যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয় ছিলেন তাদেরকেও তিনি ভালোবাসতেন। একবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সামনে নিজের নাতি হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহ আনহুকে কোলে বসিয়ে বললেন, "হে আল্লাহ ! আমি তাকে ভালোবাসি। তুমিও তাকে ভালোবাস এবং তাকে যারা ভালোবাসে তাদেরকেও ভালোবাস।" এরপর হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু যখনই হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহ আনহুকে দেখতেন তখনই স্নেহের আতিশয্যে তার চক্ষু মুদে আসতো।

"মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে" উল্লেখ আছ যে, একবার হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে সাক্ষাত করলেন এবং বললেন, শরীর থেকে একটু কাপড় সরান যাতে আমি সে স্থানে চুমু দিতে পারি যেখানে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুমু দিতেন। তিনি কাপড় সরিয়ে দিলেন এবং হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁর নাভিতে চুমু খেলেন।

প্রতিটি কাজেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত ও আদর্শ অনুসরণ করতেন। ইবাদাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পদাংক অনুসরণ করতেন এবং মুয়ামেলাতেও তিনি তাঁর নির্দেশ পুংখানু-পুংখরূপে পালন করতেন। সাথে সাথে তিনি তা জনগণকেও পালনের পরামর্শ দিতেন। কাউকে কোনো সুন্নাত বিরোধী কাজে লিপ্ত দেখলে তৎক্ষণাৎ তাকে বাধা দিতেন এবং সে প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলেছেন তা শুনিয়ে দিতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর উত্তম খাবার শুধু এজন্যই খেতেন না যে, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো আসুদাহ হয়ে বা পেট পুরে খাবার খাননি। একবার তাঁর সামনে বকরীর ভুনা গোশত পরিবেশন করা হলো। তিনি তা না খেয়ে ক্ষমা চাইলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছেন। তিনি কখনো পেট পুরে যবের রুটিও খাননি।

ইবাদাত এবং জিকরে বিশেষ সম্পর্ক ছিলো। রাতে উঠে স্বয়ং ইবাদাত করতেন ও পরিবার-পরিজনদেরকেও রাত্রি জাগরণকারী বানিয়ে দিতেন। হাফিজ জাহাবী (র) "সিয়রে আলামুননুবলা" গ্রন্থে আবু ওসমান নাহদীর (র) একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, তিনি সাত দিন হযরত

www.bjilibrary.com

আবু হুরাইরাহ্ রাদিয়াল্লাহ্ আনহুর মেহমান ছিলেন। হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু, তাঁর পত্নী এবং তাদের গোলাম পালাক্রমে রাত জেগে ইবাদাত করতেন।

রমযানের রোযা ছাড়া প্রত্যেক মাসের শুরু ও শেষে নিয়মিত তিনটি রোযা রাখতেন। বেশীর ভাগ সময় তাসবীহ-তাহলিলে মশগুল থাকতেন। একটি থলিতে পাথর ও ফলের আটি ভরা থাকতো। তা দিয়ে তিনি তাসবীহ্ পড়তেন। যখন থলি নিঃশেষ হয়ে যেতো তখন পুনরায় ভরে নিতেন। প্রখ্যাত তাবেয়ী হযরত আকরামাহ (র) বলেন, হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু প্রতিদিন ১২ হাজার বার তাসবীহ্ পাঠ করতেন। কোনো কোনো সময় রাতে উচ্চস্বরে তাকবীর বলতেন। একদিন মাজারিব বিন জুজদা রাতে বাইরে বেরুলেন। তিনি হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ্ আনহুর তাকবীর শুনলেন এবং কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন এ সময় আপনি কেন তাকবীর ধ্বনি দিচ্ছেন ? জবাবে বললেন, আল্লাহর শোকর আদায় করছি। এমন এক সময় ছিলো যখন আমি বসরাহ বিনতে গাজওয়ানের পেট ভাতায় চাকরী করতাম। এরপর এমন একদিন এলো যখন আল্লাহ্ পাক তাকে আমার স্ত্রী বানিয়ে দিলেন।

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে যে, তিনি ইবাদাতের রুকনসমূহ সম্পূর্ণরূপে আদায় করতেন এবং অন্যান্যদেরকেও এভাবে পালনের নির্দেশ দিতেন।

হক কথা বলতে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ্ আনহু কাউকেই পরোয়া করতেন না। একদিন তিনি মদীনায় আমীর মারওয়ান ইবনুল হাকাম নির্মিতব্য বাড়ীতে অংকিত ছবি দেখে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে শুনেছি, সে ব্যক্তি থেকে বড় যালেম কে আছে, যে আল্লাহর সৃষ্ট জীবের অনুরূপ জীব সৃষ্টি করে। সামান্য একটা পিঁপড়েই বানিয়ে দেখাও না। (দানা পরিমাণ খাদ্য অথবা যবই না হয় সৃষ্টি করে দেখাও)।

সহীহ্ মুসলিমে উল্লেখ আছে, মারওয়ানের ইমারাতকালে (খাদ্য খেজুর ইত্যাদি ক্রয় বিক্রয় প্রশ্নে) হুণ্ডির প্রচলন শুরু হয়েছিলো। ব্যাপারটি জানতে পেরে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ্ আনহু তৎক্ষণাৎ মারওয়ানের কাছে গেলেন এবং বললেন, তুমি সুদ হালাল করে দিয়েছো। সে বললো, আল্লাহ ক্ষমা করুন। এ কাজ আমি কি করে করতে পারি। তিনি বললেন, তুমি হুণ্ডির প্রচলন করেছো। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্রেতাকে খাদ্য দ্রব্য মেপে-জুকে না নেয়া পর্যন্ত তা বিক্রি নিষিদ্ধ করেছেন। হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুর এ ইরশাদ শুনে মারওয়ান হুণ্ডি ব্যবসা বাতিল ঘোষণা করেন।

www.bjilibrary.com

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুর জীবনের প্রথম যুগ কঠিন দারিদ্রের যুগ ছিলো। দ্বিতীয় যুগ ছিলো সচ্ছলতার যুগ। প্রথম যুগে তিনি কঠিন মুসিবত ও দুঃখ-কষ্ট বরদাশত করেছেন। কিন্তু সবর ও অল্পে তুষ্টি গুণে গুনান্বিত ছিলেন। খাওয়ার জন্যে যা পেতেন তাতেই তিনি তুষ্ট থাকতেন। যখন কিছুই পেতেন না তখন অভুক্ত থাকতেন অথবা রোযা রাখতেন। একদিন তাঁর কাছে ১৫টি খেজুর ছিলো। তিনি ৫টি দিয়ে ইফতার করলেন। পাঁচটি সাহ্রীর সময় খেলেন এবং অবশিষ্ট পাঁচটি ইফতারের জন্য রেখে দিলেন। তাঁর জামাতা হযরত সাঈদ (র) বিন মুসাইব থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু বাড়ী আসতেন এবং জিজ্ঞেস করতেন খাওয়ার কোনো কিছু আছে কি ? নেতিবাচক জবাব পেলে তিনি বলতেন, আমি রোযা রেখেছি। আল্লাহ পাক তাঁকে যখন সচ্ছলতা দিলেন তখন উত্তম রেশমের কাপড়ের উপর থু থু ফেলতেন। (অথবা ভিন্ন রাওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, কাতানের কাপড় পরে তা দিয়ে নাক সাফ করতেন) এবং বলতেন আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু আজ রেশমের কাপড়ের ওপর থু থু ফেলছে (অথবা কাতান দিয়ে নাক পরিস্কার করছে) এক যুগ এমন ছিলো যখন তুমি হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহ আনহা এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিম্বরের মধ্যে মুর্ছা যেতে। এ সময় মানুষেরা তোমার ঘরে পা রেখে বলতো, আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু পাগল হয়ে গেছে। অথচ ক্ষুধার তাড়নায় তোমার এ অবস্থা হতো।

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু প্রকৃতিগতভাবেই অত্যন্ত সাদাসিদে ছিলেন। সচ্ছলতা আসার পরও তাঁর এ অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। মদীনার ইমারাতকালে তিনি এত সাদাসিধে জীবনযাপন করতেন যে, যখন শহর থেকে বেরুতেন তখন গাধায় চড়ে বেরুতেন। গাধার পিঠে অত্যন্ত নিম্নমানের পালান থাকতো। খেজুর গাছের ছাল দিয়ে লাগাম বানানো হতো। অন্য কোনো সওয়ারী সে রাস্তায় এলে তার চালক হেসে বলতো রাস্তা ছেড়ে দাও। আমীরের সওয়ারী আসছে।

সে যুগেও স্বয়ং কাঠের বোঝা বয়ে বাড়ী নিয়ে যেতেন। একদিন কাঠের বোঝা মাথায় করে বাজার অতিক্রম করছিলেন। রাস্তায় ছা'লাবা বিন আবি মালেকুল কারজীর সাথে সাক্ষাত। তাকে বললেন, আবু মালেক তোমাদের আমীরের জন্যে রাস্তার ভীড় কমার জন্যে জায়গা করে দাও। তিনি বললেন, আল্লাহ আপনার ওপর রহম করুন। পথ তো অনেক দূর। হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন, তোমাদের আমীরের কাধে কাঠের বোঝা তাঁর জন্যে পথ প্রশস্ত করো।-(তাবকাতে ইবনে সায়াদ)

www.bjilibrary.com

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু পরকাল ভীতিতে সবসময় ভীত থাকতেন। একবার শাকইয়া আসবাহী (র) মদীনা এলেন। এ সময় হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু কিছু লোকের সামনে হাদীস বর্ণনা করছিলেন। শাকইয়াও তাদের কাছে গিয়ে বসলেন। তাঁর হাদীস বর্ণনা শেষ হলে লোকজন চলে গেলো। শাকইয়া (র) আরজ করলেন, হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবী ! আমাকে এমন হাদীস বলুন, যা আপনি স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে শুনেছেন এবং বুঝেছেন।" হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু ফরমালেন এমন হাদীসই বর্ণনা করবো। একথা বলেই চীৎকার দিয়ে বেহুঁশ হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর হুঁশ ফিরে এলে বললেন, আমি তোমাকে এমন হাদীস শুনাবো যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন সময় বর্ণনা করেছিলেন যখন আমি ছাড়া আর কেউ সেখানে উপস্থিত ছিলো না। একথা বলেই তিনি চীৎকার দিলেন এবং মূর্ছা গেলেন। হুঁশ ফিরে এলে আগের কথাই পুনরুক্তি করে তৃতীয়বার বেহুঁশ হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন। শাকইয়া (র) তাঁকে উঠালেন এবং মুখের ওপর হাত ফিরালেন। জ্ঞান ফিরে এলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম আল্লাহর কাছে তিন ব্যক্তিকে পেশ করা হবে। প্রথম কুরআনের আলেম, দ্বিতীয় জিহাদের ময়দানে লড়াই করে মারা যাওয়া ব্যক্তি এবং তৃতীয় বিত্তশালী ব্যক্তি। আল্লাহ পাক কুরআনের আলেম ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করবেন, আমি কি তোমাকে কুরআন তালিম দেইনি? সে বলবে, জী। আল্লাহ বলবেন, তুমি কি তার ওপর আমল করেছো ? সে বলবে, দিনরাত কুরআন তেলাওয়াত করেছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যুক। তেলাওয়াত আমার জন্য করোনি। তোমাকে মানুষ যাতে কারী বলে সে জন্যে তেলাওয়াত করেছো এবং সে খিতাব তুমি পেয়েছো। অতপর আল্লাহ পাক জিহাদের ময়দানে নিহত ব্যক্তিকে প্রশ্ন করবেন, তুমি নিহত হয়েছ কেন ? সে বলবে, তুমি তোমার পথে জিহাদের নির্দেশ দিয়েছো। আমি জিহাদ করেছি এবং মৃত্যুবরণ করেছি। আল্লাহ তাআলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছো। তুমি আমার রাহে জিহাদ করোনি। বরং মানুষ যাতে তোমাকে বাহাদুর বলে সে জন্যে লড়াই করেছো। আর এ উপাধি মানুষের কাছ থেকে পেয়ে গেছ। এরপর ধনাঢ্য ব্যক্তিকে প্রশ্ন করবেন, আমি কি তোমাকে ধন-সম্পদ দান করে মানুষের মুখাপেক্ষীহীন করিনি ? সে বলবে, হে আল্লাহ ! অবশ্যই তা করেছ। আল্লাহ পাক জিজ্ঞেস করবেন, তুমি এ সম্পদ কিভাবে ব্যয় করেছ ? সে বলবে, আমি আত্মীয়দের প্রতি অনুগ্রহ করেছি। সাদকাহ দিয়েছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যাবাদী। সাদকাহ ও খয়রাতে তোমার উদ্দেশ্য ছিলো লোকে যাতে তোমাকে দাতা বলে এবং মানুষেরা তোমাকে তা বলেছেও। এ হাদীস বর্ণনা

www.bjilibrary.com

করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার হাঁটুর ওপর হাত মেরে বললেন, আবু হুরাইরা এ তিনজনের জন্যে সর্বপ্রথম জাহান্নামের আগুন প্রজ্জ্বলিত করা হবে।

উদারতা হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিলো। নির্দ্বিধায় তিনি নিজের সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করতেন এবং দান খয়রাতে আত্মিক প্রশান্তি অনুভব করতেন। একবার মারওয়ান তাঁর কাছে একশ' দিনার প্রেরণ করলো। তিনি তা সবই সাদকা করে দিলেন। পরের দিন মারওয়ান সে দিনার ফেরত চেয়ে পাঠালেন। সে জানালো দিনারগুলো অন্যের জন্য নির্দিষ্ট ছিলো। ভুলবশতঃ আপনার কাছে চলে গেছে। তিনি বলে পাঠালেন, দিনারগুলো আমি কাউকে দিয়ে দিয়েছি। আমার বেতন থেকে তা কেটে নিও। তাঁকে পরীক্ষা করাই মারওয়ানের উদ্দেশ্য ছিলো। মেহমানদারীতেও তিনি নজীরবিহীন ছিলেন। কোনো কোনো লোক তাঁর কাছে এসে কয়েক সপ্তাহ অবস্থান করতো এবং তিনি তাদেরকে প্রশস্ত অন্তরে খাতির যত্ন করতেন।

নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহুর অবয়বের বর্ণনা এভাবে দিয়েছেন ঃ

গোধুম বর্ণ, প্রশস্ত বুক, মাথায় ঝাকড়া চুল, চকচকে দাঁত, প্রথম দু'টি দাঁত চওড়া–চুলে লাল অথবা যরদ রঙের খিজাব ব্যবহার করতেন।

তাবারুকান হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত কতিপয় হাদীস এখানে উল্লেখ করা গেলো ঃ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

০ আল্লাহ তাআলা তোমাদের শরীর এবং চেহারা দেখেন না। বরং তাঁর দৃষ্টিতো তোমাদের অন্তরের ওপর।–(মুসলিম)

০ কুস্তিতে অন্যকে পটকান দিয়ে ফেলে দেয়াই বাহাদুরী নয়। বরং প্রকৃত বাহাদুরতো সে ব্যক্তি যে ক্রোধের সময় নিজের নফসকে আয়ত্বে রাখতে পারে।–(বুখারী)

০ আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত মর্যাদাবান। তিনি এটা চান না যে, তার বান্দাহ তার নিষিদ্ধ কাজ করুক।–(বুখারী)

০ সুস্থ ও সবল এবং সম্পদের প্রয়োজন অবস্থায় তুমি দান খয়রাত করো। এ ধরনের সাদকাতে বেশী সওয়াব। কিন্তু মুমূর্ষু অবস্থায় তুমি যদি বলো আমার মৃত্যুর পর অমুক অমুককে এত এত দিও। এ ধরনের দানে সে সওয়াব

www.bjilibrary.com

নেই। কেননা তখন তুমি না দিলেও মৃত্যুর পর তোমার সম্পদ ওয়ারিসরাই নিয়ে নেবে। তোমার কাছ থেকে যেভাবেই হোক সে সম্পদ বেরিয়ে যাবে।
-(বুখারী)

○ সফররত অবস্থায় এক ব্যক্তির প্রচণ্ড পিপাসা লাগলো। এ অবস্থায় সে পানি পেলো। তাতে নেমে সে পানি পান করে বেরিয়ে এলো। বাইরে এসে দেখলো একটি কুকুর মারাত্মক পিপাসায় কাতর হয়ে মাটি চাটছে। পিপাসায় তার যে অবস্থা হয়েছিলো কুকুরেরও একই অবস্থা। সে ব্যক্তি পানিতে নেমে নিজের মোযা পানিতে ভরে তা মুখে করে হাতের সাহায্যে কূপ থেকে উঠে এসে পিপাসার্ত কুকুরকে পান করালো। তার এ কাজ আল্লাহ্‌র খুব পসন্দ হলো এবং তার সব গুনাহ মাফ করে দিলেন। সাহাবীরা আরজ করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! পশুদের সাথে ভালো ব্যবহার করলেও কি সওয়াব পাওয়া যায়? তিনি বললেন, হ্যাঁ। প্রতিটি জীবের সাথে ভালো ব্যবহার করলে তার সওয়াব পাওয়া যায়।-(বুখারী)

○ মুনাফিকের আলামত তিনটি। যখন কথা বলে তখন মিথ্যা বলে। ওয়াদাহ্ করে তা পূরণ করে না এবং আমানত রাখলে তার খিয়ানত করে।
-(মুসলিম)

○ মানুষের নামায পড়ালে তা হাল্কা করে পড়াতে হবে। কেননা নামায আদায়কারীদের মধ্যে কেউবা অসুস্থ, কেউবা বৃদ্ধ আবার কেউবা দুর্বল থাকতে পারে। যখন একা একা নামায পড়বে তখন যত ইচ্ছা দীর্ঘ করবে।-(বুখারী)

○ এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। অতএব, ভাই এর আমানতের খিয়ানত করা যাবে না। তার কাছে মিথ্যা বলা যাবে না। তাকে অসহায় হিসেবে পরিত্যাগ করা যাবে না এবং প্রত্যেক মুসলমানের খুন, ইজ্জত এবং সম্পদ অন্য মুসলমানের ওপর হারাম। হে মানুষেরা! তাকওয়াতো অন্তরের ব্যাপার। স্মরণ রেখো, অন্যের প্রতি অবজ্ঞাসূচক ব্যবহার মানুষের জন্যে খুবই খারাপ ব্যাপার।-(মুসলিম)

○ মানুষেরা! মুসিবত, দুর্ভাগ্য এবং শত্রুর হাসির পাত্র হওয়া থেকে ক্ষমা চাও।-(বুখারী)

○ বিদ্বেষ থেকে বেঁচে থাকো। কেননা ঘৃণা বিদ্বেষ নেকীকে খেয়ে ফেলে। যেমন আগুন লাকড়ী খেয়ে ফেলে।-(বুখারী)

○ দু'টি বস্তু জাহেলীর মধ্যে পরিগণিত। এক, কারোর বংশের ওপর বিদ্রূপ করা। দ্বিতীয়, মৃতের ওপর বিলাপ করা।-(মুসলিম)

www.bjilibrary.com

০ মিথ্যা কসম খাওয়াতে মাল বিক্রয় হয়ে যায়, কিন্তু ব্যবসায়ীর আয়ে বরকত হয় না।–(বুখারী)

০ সবচেয়ে দুর্ভাগা সে ব্যক্তি যার কাছে আমার কথা বলা হয় অথচ সে আমার জন্য শুভ কামনা করে না। অর্থাৎ আমার ওপর দরূদ প্রেরণ করে না।–(মুসলিম)

০ বিছানায় গমনের সময় প্রত্যেকের উচিত নিজের কাপড়ের আঁচল দিয়ে বিছানা ঝাড়া। কেননা তার খালি বিছানায় কীট-পতঙ্গ আছে কিনা তা সে জানে না। অতপর তাকে বলতে হবে, হে আমার রব ! তোমার নাম নিয়ে আমার শরীর বিছানায় রাখছি এবং তোমার মেহেরবানীতেই ঘুম থেকে জাগবো। হে আল্লাহ ! ঘুমন্ত অবস্থায় তুমি যদি আমার রূহ কবজ করো তাহলে এ শরীরের ওপর রহম করো এবং যদি তা না করো তাহলে ঘুম থেকে জাগার পর তা হেফাজত করো। যেমন করে তুমি তোমার নেক বান্দাদেরকে হেফাজত করে থাকো।–(বুখারী)

০ যখন কেউ মৃত্যুবরণ করে তখন তার আমল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু তিন ধরনের কাজ অবশিষ্ট থাকে। প্রথম, সাদকাহ। এর কল্যাণ জারি থাকে। দ্বিতীয়, তার ইলম। যা দিয়ে অন্যরা উপকৃত হয় এবং তৃতীয়, সুসন্তান। যারা তার জন্যে দোয়া করে।–(মুসলিম)

০ এক ব্যক্তি মানুষকে ঋণ দিতো এবং তার কর্মচারীদেরকে বলতো, যদি কোনো ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত হয়, তাহলে তার ঋণ মাফ করে দিও। যাতে আল্লাহও আমাদেরকে ক্ষমা করে দেন। যখন সে মারা যায় তখন আল্লাহও তাকে ক্ষমা করে দেন।–(মুসলিম)

০ যে মহিলা আল্লাহ এবং কিয়ামতের ওপর ঈমান এনেছে তার জন্য নিজের স্বামী অথবা নিষিদ্ধ আত্মীয় ছাড়া একদিন এবং রাতও সফর করা জায়েয নয়।–(বুখারী)

০ তোমাদের মধ্যে কাউকে দাওয়াত দেয়া হলে তা কবুল করো। যদি রোযা রেখে থাক তাহলে সেখানে শুধু দোয়াই লও। আর যদি রোযা না রাখো তাহলে খাওয়ায় শরীক হও।–(মুসলিম)

০ দু'জনের খাদ্য তিন এবং তিনজনের খাদ্য চারজনের জন্য যথেষ্ট।
–(বুখারী)

০ যখন নামাযের (জামায়াত) শুরু হয় তখন তোমরা দৌড়ে এসো না বরং হেঁটে হেঁটে এসো এবং গাম্ভীর্য ও নীরবতা অবলম্বন করো। নামাযের যে

www.bjilibrary.com

অংশ পাও তা ইমামের সাথে পড়ো। আর যা ছুটে যায় তা পরে পুরো করো।-(বুখারী)

০ তোমাদের মধ্যে কেউ কখনো মৃত্যুর আকাংখা করবে না। কেননা সে ব্যক্তি নেককার হলে (জীবিতাবস্থায়) আরো বেশী নেক কাজের সুযোগ লাভ ঘটতে পারে। আর যদি খারাপ হয় তাহলে তাওবার সুযোগ এসে যেতে পারে। -(বুখারী)

০ দান করলে কখনো সম্পদ কমে যায় না এবং মানুষের কসুর ক্ষমা করলে তা কখনো জিল্লতির কারণ হতে পারে না। বরং এ ধরনের মানুষের সম্মান আল্লাহ্ পাক বৃদ্ধি করবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনয়ানবত হয় তার মর্যাদা তিনি বৃদ্ধি করবেন।-(মুসলিম)

০ যে ব্যক্তি সম্পদ জমা করার লক্ষ্যে মানুষের কাছে হাত পাতে, মাল কম বা বেশী পাক সে যেন আগুনের অঙ্গার যাঞ্চা করে।-(মুসলিম)

০ অধিক ও কম বিত্তের নাম ঐশ্বর্যশালী হওয়া নয়। বরং অন্তরের ঐশ্বর্যকেই ঐশ্বর্যশালী বলে।-(বুখারী)

০ নিজের চেয়ে কম মর্যাদার লোকের অবস্থা পর্যবেক্ষণ কর এবং নিজের চেয়ে বেশী মর্যাদার মানুষের অবস্থা বেশী দেখ না। তার পরিণাম এ হবে যে, আল্লাহ্ তোমাকে যে ইনয়াম দিবেন তার অমর্যাদা করতে পারবে না। -(মুসলিম)

০ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং কিয়ামতের ওপর ঈমান এনেছে তার উচিত নিজের প্রতিবেশীকে কোনো ধরনের কষ্ট না দেয়া এবং যার আল্লাহ্ ও কিয়ামতের ওপর ঈমান আছে তার উচিত মেহমানের সম্মান করা। যে আল্লাহ্ এবং কিয়ামতের ওপর ঈমান রাখে তার ভালো কথা বলা উচিত। নচেৎ সে যেন চুপ থাকে।-(বুখারী)

০ যে ব্যক্তি বিধবা এবং মিসকীনদের খোঁজ-খবর নেয় সে আল্লাহর পথে জিহাদকারী, সারারাত তাহাজ্জুদ আদায়কারী এবং সারা জীবন রোযা পালনকারীর সম্মান লাভ প্রাপ্ত হবে।-(বুখারী)

০ এক মুসলমানের অন্য মুসলমানের ওপর পাঁচটি হক রয়েছে—(১) সালামের জবাব দেয়া, (২) রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করা, (৩) জানাযার সাথে যাওয়া, (৪) দাওয়াত কবুল করা, (৫) হাঁচি দিলে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা।

www.bjilibrary.com

হযরত শাকরান সালেহ রাদিয়াল্লাহ আনহু

হযরত শাকরান সালেহ রাদিয়াল্লাহ আনহু অত্যন্ত মর্যাদাবান সাহাবী ছিলেন। তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে এতটুকুন বলাই যথেষ্ট যে, তিনি ফখরে মওজুদাত সারওয়ারে কায়েনাত রহমতে দো আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গোলাম ছিলেন। তাঁর নাম ছিলো সালেহ এবং লকব ছিলো শাকরান। পিতার নাম ছিলো আদি। পিতৃ পুরুষের নিবাস ছিলো হাবশায়।

হাফেজ ইবনে হাজর আসকালানী (র) "আল ইসাবাহ" গ্রন্থে লিখেছেন, তিনি প্রথম হযরত আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আওফের গোলাম ছিলেন। পরে তিনি তাঁকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে উপঢৌকন হিসেবে পেশ করেন। এক রাওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে নিজের খিদমতের জন্য পসন্দ করেছিলেন এবং হযরত আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আওফকে মূল্য দিয়ে কিনে নিয়েছিলেন। কিন্তু এ রাওয়ায়েত বিশ্বস্ত সনদ সম্বলিত নয়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো গোলাম অর্থ দিয়ে ক্রয় করেছিলেন এ ধরনের কোনো রাওয়ায়েত বিশ্বস্ত সনদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অন্য এক রাওয়ায়েতে আছে, হযরত শাকরান সালেহ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরাধিকার হিসেবে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু এ রাওয়ায়েতের সনদও শক্তিশালী নয়। এটাই সঠিক যে, তাঁকে হযরত আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আওফ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পেশ করেছিলেন। এক রাওয়ায়েত মতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে তৎক্ষণাৎ আযাদ করে দিয়েছিলেন। অন্য এক রাওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, বদরের যুদ্ধের পর তাঁকে স্বাধীন করে দেয়া হয়েছিলো। যাহোক, তিনি সবসময়ই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে থাকাটা পসন্দ করতেন এবং তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইনতিকাল পর্যন্ত রিসালাত প্রদীপের পতঙ্গ হিসেবে বিরাজিত ছিলেন।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত শাকরান সালেহ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে বিশেষভাবে একটি দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। সে দায়িত্ব হলো গজওয়ায় (যুদ্ধসমূহে) প্রাপ্ত গনিমাতের মাল এবং কয়েদীদের তত্ত্বাবধান করা। বদরের যুদ্ধে তিনি অত্যন্ত নরম ও স্নেহের সাথে কয়েদীদের তত্ত্বাবধান করেছিলেন। তাতে কয়েদীরা খুশী হয়ে তাঁকে প্রচুর প্রতিদান দিয়েছিলেন। ইবনে সায়াদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর মতে এ প্রতিদান

www.bjilibrary.com

এতবেশী ছিলো যে, তাঁর গনিমাতের মালের অংশ নেয়ার প্রয়োজনই ছিলো না। বরং যারা গনিমাতের মালের অংশ পেয়েছিলেন তাঁদের চেয়েও তিনি বেশী লাভবান হয়েছিলেন। অত্যন্ত সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে দায়িত্ব পালনে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ওপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনু মুসতালিকের যুদ্ধে তাঁকে পরাজিত শত্রুর যুদ্ধের সামান, মাল ও আসবাবপত্র এবং পশু প্রভৃতি একত্রিত করা ও তা তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব অর্পণ করেন। এ দায়িত্বও তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠা ও সতর্কতার সাথে আঞ্জাম দেন।

হযরত শাকরান সালেহ রাদিয়াল্লাহ আনহু প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন এবং তিনি তাঁর প্রতিটি নির্দেশ তাড়াতাড়ি পালনে নিজের জীবন বাজী রাখতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যক্তিগত কাজের নির্দেশ দিতেন অথবা কোনো দীনি খিদমত অর্পণ করতেন, নিষ্ঠা ও দিয়ানতদারীর সাথে তা পালন করাকে তিনি ঈমানের অংশ হিসেবে মনে করতেন। এ কারণেই তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। এবং তাঁকে তিনি অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য মনে করতেন। এমনকি তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজের ওফাতের পূর্বে তাঁর সাথে বিশেষ সুন্দর ব্যবহারের ওসিয়ত করেন।

ইবনে আসির রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বর্ণনা করেছেন, একটি ব্যাপারে হযরত শাকরান সালেহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বেশী সৌভাগ্যবান ছিলেন। তিনি বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাফন দাফনে আহলে বাইত এবং কতিপয় সাহাবী রাদিয়াল্লাহ আনহুমের সাথে শরীক ছিলেন। হাফেজ ইবনে হাজর রাহমাতুল্লাহ আলাইহির মতে যখন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র দেহ কবরে রাখা হয়, তখন হযরত শাকরান সালেহ রাদিয়াল্লাহ আনহু উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাদর মুবারক নিজের হাতে ধরেছিলেন।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর হযরত শাকরান সালেহ রাদিয়াল্লাহ আনহু কোথায় অবস্থান করতেন এবং কতদিন জীবিত ছিলেন তার জবাব নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা নিশ্চিতভাবে দেননি। কেউ লিখেছেন যে, তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মদীনাতেই অবস্থান করেছিলেন। আবার কেউ বলেছেন যে, তিনি বসরায় গিয়ে নিজস্ব বাড়ী বানিয়ে নিয়েছিলেন। মৃত্যু স্থান ও মৃত্যুর সাল সম্পর্কেও সবাই নিশ্চুপ। অবশ্য একথা অত্যন্ত জোরের সাথেই বলা যায় যে, হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুর খেলাফতকালে

www.bjilibrary.com

তিনি বসরায় বসতিস্থাপন করেন এবং কিছুদিন পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। হযরত শাকরান সালেহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে কতিপয় হাদীসও বর্ণিত আছে। হাফেজ ইবনে হাজর রাহমাতুল্লাহ আলাইহির মতে উবায়দুল্লাহ বিন আবু রাফে রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

www.bjilibrary.com

হযরত সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু

একদিন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা মুনাওয়ারার কোনো এক স্থানে সমুপস্থিত। এ সময় এক ইহুদী আলেম এসে বললো, "আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া মুহাম্মদ।" রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন জীবন উৎসর্গকারী সাহাবী সে সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ইহুদী আলেমটির এ ধরনের সম্বোধনে তিনি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হলেন। তিনি তাকে এমন জোরে ধাক্কা দিলেন যে, পড়তে পড়তে কোনোক্রমে রক্ষা পেলো। নিজকে সামলে নিয়ে সে এর কারণ জিজ্ঞেস করলো। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেই জানবাজ সাহাবী রাগতঃস্বরে বললেন, তুমি ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেন বললে না ? সে বললো, আমি তো তার বংশীয় নাম নিয়েছি। এতে অপরাধের কি ছিলো। নবীকুলের নেতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত নরম সুরে বললেন, হ্যাঁ, আমার বংশীয় নাম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

জীবন উৎসর্গকারী এ সাহাবীর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি কি ধরনের গভীর ভালোবাসা ছিলো তা সহজেই অনুমান করা যায়। তিনি কোনো মানুষের মুখ দিয়ে হে আল্লাহর রাসূল এ সম্বোধন ব্যতিরেকে হে মুহাম্মদ শ্রবণও সহ্য করতে পারতেন না। তিনি ছিলেন হযরত সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া স্যাল্লামের গোলাম ছিলেন।

হযরত আবু আবদুল্লাহ সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহুর বংশনামা সম্পর্কে যতটুকু জানা যায় তাতে দেখা যায় যে, তার পিতার নাম ছিলো বাজদদিয়া জাজদার। তিনি ইয়েমেনের প্রখ্যাত হিমাইরী খান্দানের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এ বংশ শাসন, সিংহাসন এবং উঁচু মর্যদায় সমাসীন ছিলো। কোন্ বিপাকে পড়ে হযরত সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে অন্যের দাসত্ব করতে হয়েছিলো তা জানা যায়নি। এ অবস্থায়ই তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে উপস্থিত হন। তাঁর চেহারা ও অবয়বে শরাফত ও মর্যাদার নিদর্শন দেখে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তরে রহমতের দরিয়া উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। তিনি তাঁকে ক্রয় করে আযাদ করে দিলেন এবং বললেন :

"চাইলে তুমি নিজের পরিবার-পরিজনের কাছে চলে যেতে পারো। আর আমার সাথে যদি থাকতে চাও, তাহলে তোমাকে আমার পরিবারের সদস্য হিসেবেই মনে করা হবে।"

www.bjilibrary.com

আল্লাহ পাক সাওবান রাদিয়াল্লাহ আনহুকে সচ্চরিত্র দান করেছিলেন। তিনি নিজের পরিবার-পরিজন এবং স্বদেশ ভূমি থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সান্নিধ্যকেই অগ্রাধিকার দিলেন এবং আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! আমি আপনার সাথেই থাকবো।" এরপর তিনি সকল অবস্থাতেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে অবস্থান করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে আযাদ করে দিলেও তিনি স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে তাঁর গোলামী অবলম্বন করেন। আর এভাবেই তিনি আজীবন দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্য লুটতে থাকেন।

হযরত সাওবান রাদিয়াল্লাহ আনহু শুধুমাত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রত্যেক নির্দেশ আগ্রহসহ পালনই করতেন না। বরং তার জীবনের অবলম্বন বানিয়ে নিতেন এবং ব্যক্তিগত জীবনে তার ওপর আমল করার আপ্রাণ চেষ্টা চালাতেন। মুসনাদে আবু দাউদে স্বয়ং তাঁর থেকে বর্ণিত আছে যে, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি এ ওয়াদা করে (এবং তা পূরণ করে) যে সে কখনো মানুষের কাছে হাত পাতবে না। তাহলে আমি তার জন্য জান্নাতের দায়িত্ব গ্রহণ করলাম। আমি আরজ করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমি কখনো কারো কাছে কিছু চাইবো না।

নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা বর্ণনা করেছেন, হযরত সাওবান রাদিয়াল্লাহ আনহু আজীবন এ ওয়াদা কঠোরভাবে পালন করেছিলেন। এমনকি সওয়ারী অবস্থায় লাঠি তাঁর হাত থেকে মাটিতে পড়ে গেলেও নিজে সওয়ারী থেকে অবতরণ করে তা তুলতেন এবং অবশ্যই কাউকেও এ কাজ করতে বলতেন না।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) "আল ইসাবাহ" গ্রন্থে এর সাথে সদৃশ রাওয়ায়েত এভাবে বর্ণনা করেছেন, একবার রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আহলে বাইতের জন্য দোয়া করলেন। সে সময় হযরত সাওবান রাদিয়াল্লাহ আনহুও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ছিলেন। তিনি আরজ করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমিও কি আহলে বাইতের মধ্যে পরিগণিত ?" ইরশাদ হলো : হ্যাঁ, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি কোনো আমীরের কাছে সওয়ালকারী হিসেবে না যাবে অথবা কোনো দরযার চৌকাঠ না মাড়াবে।"

হযরত সাওবান রাদিয়াল্লাহ আনহু এরপর জীবনে কোনোদিন কারো কাছে হাত পাতেননি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওফাত পর্যন্ত হযরত সাওবান

www.bjilibrary.com

রাদিয়াল্লাহ আনহু অব্যাহতভাবে তাঁর খিদমত করেছিলেন। তারপর সম্ভবত হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুর খেলাফতকালে তিনি সিরিয়া গমন করেন এবং রামলাহতে অবস্থান গ্রহণ করেন। আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহ আনহুকে মিসর অভিযানে নিযুক্ত করেন। এ সময় হযরত সাওবান রাদিয়াল্লাহ আনহু মিসরগামী মুজাহিদদের দলে অন্তর্ভুক্ত হন এবং সেখানে কয়েকটি যুদ্ধে বাহাদুরী প্রদর্শন করেন। মিসর থেকে প্রত্যাবর্তন করে হিমসে ঘর-বাড়ী বানান এবং সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

হযরত সাওবান রাদিয়াল্লাহ আনহু নিজেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গোলাম বলাকে অত্যন্ত গৌরবের ব্যাপার বলে মনে করতেন এবং অন্যরাও তাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গোলাম বলুক তা তিনি আন্তরিকভাবে চাইতেন। মুসনাদে আহমদ (র) বিন হাম্বলে বর্ণিত আছে, একবার হিমসে অবস্থানকালে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। সে সময় আবদুল্লাহ বিন কুরত ইজদী হিমসের গভর্নর ছিলেন। কোনো কারণে তিনি সেবা-শুশ্রূষার জন্য এলেন না। হযরত সাওবান রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁর এ ব্যবহার কঠোরভাবে নিলেন এবং তাঁকে এ চিঠি লিখলেন—

"মূসার (আ) গোলাম যদি তোমার রাজত্বে থাকতো তাহলে তুমি কি তার শুশ্রূষার জন্য আসতে না?" আবদুল্লাহ বিন কুরত এ চিঠি পেয়ে নিজের গাফিলতির জন্য খুবই লজ্জিত হলেন এবং দোষ স্খলনের জন্য হন্তদন্ত হয়ে ঘর থেকে এমনভাবে ছুটে এলেন যে, সবাই মনে করেছিলো কোনো অঘটন ঘটে গেছে। অতপর তিনি হযরত সাওবান রাদিয়াল্লাহ আনহুর খিদমতে হাজির হয়ে নিজের ত্রুটির জন্য ক্ষমা চাইলেন এবং দীর্ঘক্ষণ তাঁর কাছে বসে খোঁজ খবর নিলেন।

"মুসতাদরাকে হাকিম" গ্রন্থ মতে হযরত সাওবান রাদিয়াল্লাহ আনহু ৫৪ হিজরীতে (আমীর মুয়াবিয়ার খেলাফতকালে) হিমসে ইন্তেকাল করেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নৈকট্য এবং অসাধারণ ভালোবাসা হযরত সাওবান রাদিয়াল্লাহ আনহুকে ফযীলাতের খনিতে পরিণত করেছিলো। তাঁর থেকে ১২৭টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাঁর হাদীস বর্ণনাকারী এবং শিষ্যদের মধ্যে মে'দান বিন তালহা রাদিয়াল্লাহ আনহু, আবু ইদরিস খাওলানী (র), রাশেদ বিন সায়াদ (র), আবদুর রহমান বিন গানাম (র), আবু আমের ইলহানী (র) এবং যুবাইর বিন নুফায়ের (র)-এর মতো বড় বড় আলেম ছিলেন। তাঁর সমকালীন কেউ অন্য কোনো সাহাবীর কাছ থেকে

www.bjilibrary.com

কোনো হাদীস শুনলে হযরত সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দিয়ে তার সত্যতাও যাচাই করে নিতেন।

মুসনাদে আবু দাউদে আছে যে, মে'দান বিন তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু যিনি হযরত সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছাত্র এবং উঁচু মর্যাদা সম্পন মুহাদ্দিস ছিলেন। একবার উম্মাহর ফকীহ হযরত আবুদারদা আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে একটি হাদীস শুনলেন। এরপর তিনি হযরত সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিদমতে হাজির হয়ে হাদীসটির সত্যতা যাচাই করে নিলেন। হাদীস প্রচারে হযরত সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু খুব আগ্রহী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে নিজের প্রভু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস মানুষের কাছে পৌঁছাতেন। হাফিজ ইবনে আবদুল বার (র) "আল ইসতিয়াব" গ্রন্থে লিখেছেন, "হযরত সাওবান সেসব সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত যাঁরা হাদীস সংরক্ষণ করেছেন এবং তার প্রসার ঘটিয়েছেন।" হাদীস প্রেমিকরা পীড়াপীড়ি করে তাঁর কাছ থেকে হাদীস শুনতেন।

হযরত সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত কতিপয় হাদীস এখানে উল্লেখ করা গেলো ঃ

(১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযে সালাম ফিরিয়ে যখন এক পাশে বসতেন তখন তিনবার ইসতিগফার পড়তেন এবং বলতেন ঃ আল্লাহুম্মা আনতাস সালামু ওয়া মিনকাস সালামু তাবারাকতা ইয়া জালজালালি ওয়াল ইকরাম।-(সহীহ মুসলিম)

(২) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন কোনো মুসলমান অন্য কোনো মুসলমান ভাইকে সেবা শুশ্রূষা করে তখন সে যেন বেহেশতের মেওয়াহ খুরীতে থাকে (অর্থাৎ বেহেশতের মেওয়াহ খুরীর যোগ্য হয়ে যায়)। সেবা শুশ্রূষা থেকে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত সে এ অবস্থায় থাকে।-(সহীহ মুসলিম)

(৩) একবার আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এক জানাযায় শরীক হলাম। আমরা দেখলাম কিছু মানুষ সওয়ারীর ওপর বসে আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, তোমাদের কি লজ্জা হয় না যে, আল্লাহর ফেরেশতারা পায়ে হেঁটে চলছে আর তোমরা জানোয়ারের পিঠে সওয়ার হয়ে আছ।-(তিরমিযী ইবনে মাযাহ)

(৪) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে মুসলমান আল্লাহর জন্য এক সিজদা করে আল্লাহ তার জন্য এক দরযা বুলন্দ করেন এবং তার ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দেন।-(মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল)

www.bjilibrary.com

(৫) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, নেককার ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসন্ধানে থাকে এবং সবসময়ই এ অবস্থায় কাটায় তখন আল্লাহ পাক জিবরাঈলকে বলেন, আমার অমুক বান্দাহ আমার সন্তুষ্টির অনুসন্ধানে রয়েছে। জেনে রেখ, তার জন্য আমার রহমত বর্ষিত হয়েছে। অতপর জিবরাঈল বলেন, আল্লাহর রহমতও অমুক ব্যক্তির ওপর রয়েছে। অতপর একথা আরশে উত্তোলনকারী ফেরেশতারা বলতে থাকেন এবং তাদের নিকটবর্তী ফেরেশতারাও একথা বলতে থাকেন। এমনকি সাত আসমানের ফেরেশতারাও একই কথা বলতে থাকেন। এরপর সে ব্যক্তির জন্য জমিনের ওপর রহমত বর্ষিত হয়।-(মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল)

(৬) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমিয়েছেন, যে মুসলমান সকাল-সন্ধ্যা, "রাদিইতু বিল্লাহি রাববান ওয়াবিল ইসলামী দিনান ওয়াবিমুহাম্মাদিন নাবিয়ান" এ বাক্য উচ্চারণ করে, আল্লাহ অবশ্যই সে মুসলমানকে কিয়ামতের দিন খুশী করবেন।-(মুসনাদে আহমদ ও জামে তিরমিযী)

(৭) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সঠিক রাস্তার ওপর অবিচল থাকো। কিন্তু তার হক আদায় করতে পারো না। খুব ভালোভাবে বুঝে নিও যে, তোমাদের দীনে সবচেয়ে উত্তম আমল হলো নামায। আর অযুর তত্ত্বাবধান পূর্ণ মু'মিন ছাড়া কেউই করতে পারে না।-(মুয়াত্তা ইমাম মালেক, মুসনাদে আহমদ ও মুসনাদে দারেমী)

(৮) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমিয়েছেন ঃ প্রসারিত সমগ্র ভূখণ্ড আল্লাহ আমাকে দেখিয়েছেন। পূর্ব ও পশ্চিমের প্রতি আমি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম। সন্দেহাতীতভাবে আমার উম্মত এসব ভূখণ্ড দখল করবে যা আমায় দেখানো হয়েছে। লাল এবং সাদা ও এ দু' পদার্থের স্বর্ণ ও রৌপ্য সম্পদও আমার প্রতি রহমত হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। সাধারণ দুর্ভিক্ষে নিক্ষেপ করে আমার উম্মাতকে যাতে হালাক না করা হয় সে দোয়া আমি করেছি। কোনো শত্রু যাতে এমনভাবে তাদের ওপর বিজয়ী না হয় যাতে তারা তাদের বংশকে খতম করে ফেলে এ দোয়াও করেছি। আমার রব এর জবাবে বলেছেন, হে মুহাম্মাদ ! আমি যখন কোনো ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি তখন তার ওপর অটল থাকি। সাধারণ দুর্ভিক্ষে তোমার উম্মতকে হালাক করবো না, তোমার এ আবেদন আমি মঞ্জুর করেছি। এছাড়া তারা নিজেরাই পরস্পরকে নিশ্চিহ্ন এবং গ্রেফতারীর জন্য উদ্যত না হলে শত্রুকে এমনভাবে বিজয়ী করবো না যাতে তারা তাদের বংশ নিপাত করে ফেলে।-(সহীহ মুসলিম)

www.bjilibrary.com

(৯) ওয়াল্লাজিনা ইয়াকনিযুনাজ জাহাবা ওয়াল ফিদদাতা (অর্থাৎ যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে) এ আয়াত নাযিল হয় তখন আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সফরে ছিলাম। কতিপয় সাহাবী বললেন, এ আয়াত শুধুমাত্র স্বর্ণ ও রৌপ্যের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। হায় ! আমরা যদি জানতে পারতাম যে, কোন্ ধরনের সম্পদ ভালো, (অর্থাৎ স্বর্ণ ও রৌপ্য ছাড়া) যা জমা করা যায়। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহর জিকরকারী জবান এবং আল্লাহর শোকর আদায়কারী অন্তর সবচেয়ে উত্তম সম্পদ। আর সেই মু'মিন স্ত্রী যে স্বামীর দীন ও ঈমানের সাহায্যকারী।-(আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

হযরত ইয়াসার নওবী রাদিয়াল্লাহু আনহু

হযরত ইয়াসার নওবী রাদিয়াল্লাহু আনহুর মর্যাদা সম্পর্কে এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, তিনি সারওয়ারে কায়েনাত রহমতে দোআলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গোলাম ছিলেন। চরিতকাররা লিখেছেন যে, তিনি নওবাহর (সুদান) বাসিন্দা ছিলেন। কিন্তু বিশেষ করে বলেননি যে, তিনি কখন মদীনা এসেছিলেন এবং কোন সময় ঈমান এনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রহমতের প্রস্রবণের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়েছিলেন। কোনো পুস্তকে তাঁর বংশ তালিকা সম্পর্কেও বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না। অবশ্য কতিপয় রাওয়ায়েতে এতটুকু শুধু অবগত হওয়া যায় যে, তিনি অত্যন্ত পাক্কা ও সাচ্চা মুসলমান ছিলেন এবং আল্লাহর ইবাদাতের প্রতি ছিলেন একনিষ্ঠ। নামাযের আরকানসমূহ অত্যন্ত সুন্দরভাবে আদায় করতেন। একদিন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখলেন যে, তিনি খুব ইতমিনান এবং শান্তচিত্তে নামায পড়ছেন। তাঁর নামায আদায়ের ধরন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এত পসন্দ হলো যে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাকে আযাদ করে দিলেন। কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি তাঁর ছিলো গভীর ভালোবাসা। হাজার আযাদীর চেয়েও তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গোলামীকে অগ্রাধিকার দিলেন। তিনি আরজ করলেন ঃ "ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আপনার গোলামীর মর্যাদা থেকে আমাকে বঞ্চিত করবেন না। আজীবন আমি আপনার খিদমত করে কাটাতে চাই।"

ইখলাসের জজ্‌বাহ দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাদকার উট চরানোর দায়িত্ব তাঁর ওপর অর্পণ করলেন। সুতরাং তিনি কুবার সাথে মিলিত একটি চারণভূমিতে (নাহিয়ায়ে জিল হাদর) চলে গেলেন এবং অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ পালনে ব্যস্ত রইলেন।

৬ষ্ঠ হিজরীতে উকাল ও উরিনা গোত্রের ৮ ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত হলো এবং ইসলাম গ্রহণ করলো। এক বর্ণনা মতে তারা প্লীহা রোগে আক্রান্ত ছিলো নিজেদের দেশ থেকেই তারা অসুস্থ অবস্থায় এসেছিলো।

অন্য এক বর্ণনা মতে, মদীনার আবহাওয়া তাদের খাপ খায়নি এবং তাদের পেট ফুলে যায়। এ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে নাহিয়ায়ে জিল হাদর যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি আরো বললেন,

www.bjilibrary.com

সেখানকার আবহাওয়া স্বাস্থ্যসম্মত এবং আমাদের উট-উটনিও রয়েছে। খুব ভালো করে তাদের দুধ খাও। ইনশাআল্লাহ তোমাদের স্বাস্থ্য ঠিক হয়ে যাবে।

তারা সেখানে চলে গেলো। হযরত ইয়াসার রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদেরকে নিজের প্রভুর মেহমান মনে করে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে মেজবানী করলেন। কিছুদিনের মধ্যেই তারা সুস্থ হয়ে উঠলো। এখন আল্লাহর শোকর আদায় ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এবং হযরত ইয়াসারের ইহসানের প্রতি কৃতজ্ঞ না হয়ে তারা নিজেদের বদ নিয়তের ভিত্তিতে ইরতিদাদ বা ধর্মদ্রোহিতা ও বিশ্বাসঘাতকতার পথ বেছে নিলো। একদিন ভোরে ১৫টি উট হাকিয়ে নিয়ে চললো। হযরত ইয়াসার রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের এ তৎপরতা অবলোকন করলেন এবং এ কাজ থেকে বিরত থাকতে বললেন। যখন তাঁরা নিষেধ শুনলো না তখন তাদের পেছনে পেছনে গেলেন এবং বাধা দিতে লাগলেন। এ গাদ্দাররা হযরত ইয়াসার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গ্রেফতার করলো। অতপর অত্যন্ত নৃশংসভাবে তাঁর হাত-পা কেটে ফেললো এবং চক্ষু ও জিহ্বাতে কাটা ঢুকিয়ে দিলো। এ কষ্ট সহ্য করতে না পেরে হযরত ইয়াসার রাদিয়াল্লাহু আনহু শহীদ হয়ে গেলেন।

এ ঘটনার খবর পেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। তিনি হযরত কুরাজ রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন জাবের ফাহরীকে বিশটি সওয়ারী সমেত সেই বদবখত লুটেরাদের ধাওয়া করতে পাঠালেন। পথিমধ্যে একজন মহিলার সাথে হযরত কুরাজ রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাক্ষাত হলো। মহিলাটি উটের একটি অংশ নিয়ে যাচ্ছিলো। হযরত কুরাজ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এ গোশত কোথায় পেয়েছ? সে বললো, আমি এদিক আসছিলাম। একস্থানে কতিপয় লোক দেখলাম। তারা একটি উট যবেহ করে গোশত তৈরি করছিলো। তারা এ অংশ আমাকে দিয়েদিলো। তারা সামনের তাবুতে অবস্থানরত আছে। হযরত কুরাজ রাদিয়াল্লাহু আনহু বিদ্যুৎ বেগে সেদিকে অগ্রসর হলেন এবং তাদেরকে গ্রেফতার করে অবশিষ্ট ১৪টি উটসহ ফিরে এলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে সময় চারণ ভূমিতে অবস্থান করছিলেন। গাদ্দারদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে পেশ করা হলো। হযরত ইয়াসার রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে তারা যে ধরনের আচরণ করেছিলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সাথেও একই ধরনের আচরণের নির্দেশ দিলেন। সুতরাং তাদের হাত-পা কাটা হলো এবং চক্ষুতে সিলাই দেয়া হলো। অতপর তাদেরকে হাররাতে নিক্ষেপ করা হলো। সেখানে তারা তড়পিয়ে তড়পিয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করলো।

www.bjilibrary.com

কতিপয় মুফাসসির লিখেছেন যে, সূরা আল মায়েদার এ আয়াত তাদের প্রসঙ্গেই অবতীর্ণ হয়েছিলো ঃ

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُا۟ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓا۟ أَوْ يُصَلَّبُوٓا۟ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَٰفٍ أَوْ يُنفَوْا۟ مِنَ ٱلْأَرْضِ ط (المائدة : ٣٣)

"যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের সাথে লড়াই করে এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের জন্য নির্দিষ্ট শাস্তি হচ্ছে হত্যা কিংবা শূলে চড়ানো ; অথবা তাদের হাত ও পা উল্টো দিক হতে কেটে ফেলা, কিংবা দেশ হতে নির্বাসিত করা।"-(সূরা আল মায়েদা ঃ ৩৩)

----

www.bjilibrary.com

হযরত মুয়াইকিব রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবি ফাতিমাতাদ দাওসী

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়াত প্রাপ্তির প্রথম যুগে কতিপয় সচ্চরিত্র ও সৌভাগ্যবান ব্যক্তি নিশ্চিন্তায় এবং নির্দ্বিধায় তাওহীদের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। শুধু সাড়াই দেননি সত্যের পথে সব ধরনের দুঃখ-মুসিবত তারা হাসিমুখে বরদাশত করেছেন। আল্লাহ্ পাক তাদেরকে আস-সাবিকুনাল আওয়ালুন লকব দিয়ে প্রকাশ্যভাবে নিজের সন্তুষ্টি এবং বেহেশতের সুসংবাদ দিয়েছেন। হক গ্রহণকারী এসব অগ্রগামী পবিত্র আত্মার মর্যাদা সেই সকল সাহাবীর চেয়ে বেশী যারা তাদের পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। সাবিকুনাল আওয়ালুন অর্থাৎ অগ্রগামী এ পবিত্র জামায়াতে মক্কার কতিপয় নেক স্বভাবের সাহাবী যেমন ছিলেন তেমনি সেখানে প্রবাসী কিছু দরিদ্র সাহাবীও ছিলেন। এসব দরিদ্র সাহাবী নিরুপায় হয়ে অথবা প্রয়োজনে (গোলামী অথবা জীবিকান্বেষণে) মক্কায় এসে বসবাস শুরু করেন। মুয়াইকিব রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবি ফাতিমা এমনি ধরনের এক নেক্কার যুবক ছিলেন। তিনি ইয়েমেনের বাসিন্দা ছিলেন এবং সম্পৃক্ত ছিলেন ইজদ গোত্রের শাখা বনু দাওসের সাথে। কিন্তু জীবিকা অন্বেষণে বনু আবদি শামসের মিত্র হয়ে মক্কায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। সকল নেতৃস্থানীয় চরিতকার এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে, হযরত মুয়াইকিব রাদিয়াল্লাহ আনহু তাওহীদের দাওয়াতের (নবুয়াত প্রাপ্তির) একদম প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণ করেন। তবে ইসলাম গ্রহণের পর খায়বার যুদ্ধ (সাত হিজরীর প্রথম দিকে) পর্যন্ত তাঁর জীবন কোথায় এবং কিভাবে কেটেছিলো সে সম্পর্কে চরিতকারদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এতবড় মর্যাদাবান সাহাবী যিনি শুধুমাত্র সাবিকুনাল আওয়ালুন দলের সম্মানিত সদস্যই ছিলেন না, বরং খাতিমে বরদারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হওয়ার সৌভাগ্যও অর্জন করেছিলেন। তাঁর প্রশ্নে চরিতকারদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা বাস্তবতঃ আশ্চর্য ব্যাপারই বটে। চৌদ্দশ বছর পর তাঁর সম্পর্কে পুংখানুপুংখ পর্যালোচনাও কঠিন ব্যাপার। এজন্যে কোনো বিশেষ বর্ণনার ওপর জোর না দিয়ে সব ধরনের বর্ণনা উল্লেখ করাই যুক্তিযুক্ত হবে।

হযরত মুয়াইকিব রাদিয়াল্লাহ আনহুর বংশ তালিকা সম্পর্কে সকল চরিতকারই নীরব ছিলেন। শুধু এতটুকু জানা যায় যে, তিনি আবি ফাতিমাতাদ দাওসীর সন্তান ছিলেন। এটা স্পষ্ট যে, "আবি ফাতিমা" তাঁর পিতার কুনিয়াত ছিলো। প্রকৃত নাম কেউই বর্ণনা করেননি। ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন,

www.bjilibrary.com

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়াত প্রাপ্তির প্রথম যুগে তিনি মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেন। অতপর তিনি নিজের দেশে ফিরে যান। কিন্তু হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) এবং হাফিজ ইবনে আবদুল বার (র) লিখেছেন যে, তিনি মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হাবশায় দ্বিতীয় হিজরতে (নবুয়াত প্রাপ্তির ৬ বছর পর) অংশগ্রহণ করেন। নেতৃস্থানীয় চরিতকারদের অধিকাংশই এ মত সমর্থন করেছেন। ইসলাম গ্রহণের ফলে হযরত মুয়াইকিব রাদিয়াল্লাহ আনহুও অন্যান্য হকপন্থীদের মত কুরাইশ মুশরিকদের যুলুম-নির্যাতনের লক্ষ্যস্থলে পরিণত হন। নবুয়াত প্রাপ্তির পাঁচ বছর পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইঙ্গিতে মুসলমানদের একটি ছোট দল হাবশায় হিজরত করেন। এরপর ৬ষ্ঠ সালে মযলুম হকপন্থীদের একটি বড় কাফেলা হিজরত করে হাবশা গমন করেন। হযরত মুয়াইকিব রাদিয়াল্লাহ আনহু এ কাফেলায় শরীক ছিলেন। কতিপয় রাওয়ায়েতে আছে যে, তিনি বদরের যুদ্ধের পূর্বে হাবশা থেকে ফিরে এসেছিলেন এবং বদর থেকে শুরু করে সকল যুদ্ধেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহযোদ্ধা হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। তিনি বাইয়াতে রেদওয়ানেও অংশ নিয়েছিলেন। কিন্তু হিশাম এবং আরো অনেক চরিতকার বলেছেন, হযরত মুয়াইকিব রাদিয়াল্লাহ আনহু হাবশায় হিজরতকারী এক দলের সাথে হাবশা থেকে মদীনা ফিরে এসেছিলেন। এ সময় প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খায়বারের যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন। এসব সাহাবী বছরের পর বছর বিচ্ছিন্ন থাকার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মিলিত হওয়ার জন্যে অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। এজন্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত তাঁরা অপেক্ষা করতে পারেননি এবং সোজা খায়বার পৌছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাত করে নিজেদের অন্তর ঠাণ্ডা করেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত খুশীর সাথে তাদেরকে স্বাগত জানালেন এবং প্রত্যেকের সাথে মুয়ানিকা এবং মুসাফিহা করলেন। সে সময় খায়বারের যুদ্ধে বিজয় লাভ ঘটেছিলো। এসব সাহাবীর এ যুদ্ধে অংশগ্রহণের সুযোগ ঘটেনি। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবাইকেই গনিমাতের মাল দিয়েছিলেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা ফিরে এলেন। হযরত মুয়াইকিব রাদিয়াল্লাহ আনহুও তাঁর সাথে মদীনা এলেন এবং এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেলেন।

খায়বারের পর মক্কা বিজয়, হুনাইন, তায়েফ এবং তাবুকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হযরত মুয়াইকিব রাদিয়াল্লাহ আনহু এসব যুদ্ধে অংশ নেন। বিদায় হজ্জেও তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথী ছিলেন। মদীনা মুনাওয়ারায় হযরত মুয়াইকিব রাদিয়াল্লাহ আনহুর বিশেষ মর্যাদা ছিলো। এ

www.bjilibrary.com

মর্যাদার কারণ হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের পবিত্র সীলমোহর তাঁর রক্ষণাবেক্ষণে রেখেছিলেন। এ পবিত্র সীলমোহর রৌপ্যের আংটির আকারে ছিলো। এ আংটির ওপর 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' এ শব্দটি খোদাই ছিলো। তিনি চিঠিপত্র এবং ফরমানসমূহে এ সীল মারার জন্যে বানিয়েছিলেন। তিনি কখনো কখনো বাম হাতের আঙ্গুলে তা পরতেন। কিন্তু বেশীর ভাগ সময়ই তা হযরত মুয়াইকিব রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে থাকতো। এভাবে তিনি খাতিমে বরদারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আংটি বহনকারীর উপাধিতে ভূষিত হন। এটা একটা এক ধরনের বড় উপাধি। এর তাৎপর্য প্রসঙ্গে বলা যায় যে, তিনি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে একজন আমানতদার ও দায়িত্ববান ব্যক্তি ছিলেন। এ কারণেই সকল সাহাবাই হযরত মুয়াইকিব রাদিয়াল্লাহ আনহুকে অত্যন্ত মর্যাদা দিতেন এবং শ্রদ্ধা করতেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কতিপয় কাতিব ছিলেন। তাঁর মধ্যে কয়েকজন অহী লিখতেন। কেউ কেউ আমীর ও সুলতানদেরকে পত্র লিখতেন। কেউ বা সাদকার মালের হিসেব রাখতেন। হযরত মুয়াইকিব রাদিয়াল্লাহ আনহু এ হাতে গোনা কয়েকজন সাহাবীর অন্যতম ছিলেন। তিনি লেখা-পড়ায় পারদর্শী ছিলেন। এজন্যে স্থায়ী অহীর কাতিবদের অনুপস্থিতিতে কোনো কোনো সময় তিনি অহী লেখার সৌভাগ্যও লাভ করেছিলেন।

বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহুও হযরত মুয়াইকিব রাদিয়াল্লাহ আনহুর মর্যাদা বহাল রেখেছিলেন। তাকে সম্পদ বিষয়ক তত্ত্বাবধায়ক বানান এবং লেখার কাজও দেন।

হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুও মুয়াইকিব রাদিয়াল্লাহ আনহুকে অত্যন্ত সম্মান করতেন। তিনি নিজের খেলাফতকালে বায়তুল মাল কায়েম করেন এবং হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আরকামকে তার অফিসার ও তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করেন। হযরত মুয়াইকিব রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন উবাইদুল কারীকে বাইতুল মালের সহকারী বানান। আল্লামা শিবলী নুমানী "আল ফারুক" গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

"হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু অত্যন্ত মর্যাদাবান সাহাবী আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আরকামকে কোষাগারের অফিসার নিয়োগ করেন। তিনি লেখা-পড়ায় অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। এর সাথে তাঁর অধীন যোগ্য লোকও নিয়োগ করেছিলেন। নিয়োগপ্রাপ্তদের মধ্যে আবদুর রহমান বিন

www.bjilibrary.com

উবাইদুলকারীও ছিলেন। মুয়াইকিব রাদিয়াল্লাহ আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আংটি বহনের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। এ কারণে তাঁর বিশ্বস্ততা এবং আমানতদারী সম্পূর্ণ বিতর্কের উর্ধে ছিলো।"

কতিপয় রাওয়ায়েতে আছে যে, হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত মুয়াইকিব রাদিয়াল্লাহ আনহুকে হযরত যায়েদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন সাবিতের সহকারী বানিয়ে ছিলেন। হযরত যায়েদ রাদিয়াল্লাহ আনহু লেখকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সম্ভবত হযরত মুয়াইকিব রাদিয়াল্লাহ আনহু কোষাগার ও লেখন দু' দায়িত্বই আঞ্জাম দিতেন।

আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত মুয়াইকিব রাদিয়াল্লাহ আনহুকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। ইবনে সায়াদ রহমাতুল্লাহ আলাই বলেছেন, তাঁর খেলাফতকালে হযরত মুয়াইকিব রাদিয়াল্লাহ আনহু কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হন। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁর চিকিৎসায় বিশেষভাবে মনোযোগ দেন। সমকালীন যুগের খ্যাতনামা চিকিৎসকদের ডেকে তাঁর চিকিৎসায় নিয়োগ করেন। কিন্তু তাতে কোনো ফল হয়নি। অবশেষে দু'জন ইয়েমেনী চিকিৎসকের চিকিৎসায় এটুকু লাভ হয় যে, সম্পূর্ণ আরোগ্য না হলেও রোগ আর বাড়েনি। সাধারণত এ ধরনের রোগীদের সাথে মানুষ মেলা-মেশা এবং খাওয়া-দাওয়া করে না। কিন্তু হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁকে নিজের সাথে দস্তরখানে বসিয়ে খাবার খাওয়াতেন এবং বলতেন এ ব্যবহার শুধু তোমার জন্যই নির্দিষ্ট।

মুসনাদে আবু দাউদে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু নিজের সহায়-সম্পদ ওয়াকফকালে হযরত মুয়াইকিব রাদিয়াল্লাহ আনহুকে দিয়েই ওয়াকফনামা রচনা করেন।

হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুর পর আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওসমান গনি রাদিয়াল্লাহ আনহু সাবেক খলিফাদের মত হযরত মুয়াইকিব রাদিয়াল্লাহ আনহুকে তাজীম করতেন।

ইবনে আসিরের (র) বর্ণনা মতে, হযরত ময়াইকিব রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহুর খেলাফাতকালের শেষ সময় ইনতিকাল করেন।

তাঁর সন্তান-সন্ততির মধ্যে শুধুমাত্র এক পুত্র মুহাম্মদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন মুয়াইকিব রাদিয়াল্লাহ আনহুর সন্ধান পাওয়া যায়। হাফিজ ইবনে হাজারের (র) মত অনুযায়ী তিনি নিজের পিতার কাছ থেকে হাদীসও বর্ণনা করেছেন।

www.bjilibrary.com

হাদীসের কিতাবসমূহে হযরত মুয়াইকিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত কতিপয় হাদীস বর্তমান আছে। তাঁর বর্তমান হাদীসসমূহের মধ্যে দু'টির ব্যাপারে ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম ঐকমত্য পোষণ করেন এবং ইমাম মুসলিম একটি হাদীসের ব্যাপারে ভিন্নমত ব্যক্ত করেছেন।

www.bjilibrary.com

হযরত জাকওয়ান রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন জুনদুব আসলামী

হযরত জাকওয়ান রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন জুনদুব প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসীম আস্থাশীল সাহাবী ছিলেন। তিনি তাঁর ওপর এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। দায়িত্বটি ছিলো কুরবানীর পশুর তত্ত্বাবধান। এ পশুকে আরবী ভাষায় 'বুদন' বলা হয়। এজন্যে হযরত জাকওয়ান রাদিয়াল্লাহ আনহু "সাহিবুল বুদুন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম"-এর উপাধিতে বিখ্যাত ছিলেন। "নাজিয়াহ" তাঁর খেতাব ছিলো এবং মানুষ সাধারণত তাঁকে "জাকওয়ান রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন জুনদুবের" পরিবর্তে "নাজিয়াহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন জুনদুব বলে ডাকতো। বনু আসলাম বিন আফসা গোত্রের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিলো। তাঁর বংশনামা নিম্নরূপ ঃ

জাকওয়ান (নাজিয়াহ) বিন জুনদুব বিন উমাইর বিন ইয়ামার বিন দারিম বিন আমর বিন ওয়াছিলাহ বিন সাহাম বিন মাযান বিন সালামান বিন আসলাম বিন আফসা।

দীনের প্রতি হযরত জাকওয়ান রাদিয়াল্লাহ আনহুর ছিলো উৎসর্গীকৃত মনোভাব এবং প্রচণ্ড নিষ্ঠা। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, চরিতকাররা তাঁর জীবনের কতিপয় ঘটনা ছাড়া বেশী কিছু বর্ণনার প্রয়োজন মনে করেননি। হতে পারে কতিপয় ঘটনা ছাড়া তাঁরা আর অতিরিক্ত কিছু পাননি। যা হোক তাঁর সম্পর্কে যাকিছু জানা গেছে তাই তাঁর মর্যাদা নিরূপণে যথেষ্ট।

হযরত জাকওয়ান রাদিয়াল্লাহ আনহু কখন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এ ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না। তবে এটা প্রতিষ্ঠিত যে, তিনি ৬ষ্ঠ হিজরীর জিলকদ মাসের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। মাররে জাহরান এবং তার আশেপাশে তাঁর গোত্র বসবাস করতো। বিভিন্ন কার্যকারণে মনে হয়, তিনি ইসলাম গ্রহণের পর মরুভূমির আবাসস্থল পরিত্যাগ করে মদীনা চলে গিয়েছিলেন। ৬ষ্ঠ হিজরীর জিলকদ মাসে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চৌদ্দশ জীবন উৎসর্গকারী সাহাবী সমেত পবিত্র কা'বা ঘর জিয়ারত এবং তাওয়াফের উদ্দেশ্যে মক্কা রওয়ানা হন। এ সাহাবীদের মধ্যে জাকওয়ান বিন জুনদুব রাদিয়াল্লাহ আনহুও ছিলেন। ইবনে সায়াদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর মতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে কুরবানীর পশুর তত্ত্বাবধানে নিয়োগ করেছিলেন। অন্যদিকে কোনোভাবে মক্কায় কুরাইশরা মুসলমানদের

www.bjilibrary.com

মক্কা রওয়ানার কথা জানতে পারে। তাদের অনুমতি ছাড়া তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহীরা কি করে মক্কা প্রবেশ করতে পারে ? এটা যেনো তাদের মান-সম্ভ্রমের পরিপন্থী ব্যাপার ছিলো। সুতরাং তারা মুসলমানদের বাধাদানের সিদ্ধান্ত নিলো এবং এ লক্ষ্যে খালেদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদকে (তখন পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেননি) সশস্ত্র লড়াকু বাহিনীসহ মক্কা থেকে রওয়ানা করে দিলো। সহীহ আল বুখারীতে আছে, বনু খাজায়া গোত্রের সরদার বাদিল রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ারকা (যদিও তিনি সে সময় মুসলমান হননি, তবে মুসলমানদের শুভাকাংখী ছিলেন) পথিমধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মিলিত হলেন এবং কুরাইশ মুশরিকদের দুরভিসন্ধির কথা ব্যক্ত করলেন এবং এও বললেন যে, মুশরিকদের একটি দল খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে মক্কা থেকে রওয়ানা হয়ে এসেছে। মক্কায় কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ করার ইচ্ছা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ছিলো না। এজন্যে তিনি সহগামী সাহাবীদের জিজ্ঞেস করলেন ঃ

"তোমাদের মধ্যে এমন কি কেউ আছে, যে মক্কা গমনের সকল রাস্তা চিনে এবং আমাদেরকে কুরাইশদের রাস্তা বাঁচিয়ে অন্য রাস্তায় নিয়ে যাবে। (উদ্দেশ্য হলো, যুদ্ধে আগ্রহী কুরাইশ দলের সামনা সামনি যাতে মুসলমানরা না হয়)।"

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইরশাদ শুনে হযরত জাকওয়ান রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন জুনদুব দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক, এ দায়িত্ব আমি পালন করবো।"

সুতরাং তিনি কুরাইশদের রাস্তা বাদ দিয়ে অন্য রাস্তায় মুসলমানদেরকে নিয়ে গেলেন এবং কোনো বাধা ছাড়াই তাদেরকে হুদাইবিয়া পৌঁছে দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানে মুসলমানদেরকে তাঁবু ফেলার নির্দেশ দিলেন। সহীহ আল বুখারীতে হযরত বারা রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আযিব থেকে বর্ণিত আছে যে, হুদাইবিয়াতে একটি কূপ ছিলো। মুসলমানরা কূপের সব পানি তুলে ফেললো। ফলে কূপটি শুকিয়ে গেলো। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ খবর দেয়া হলো। তিনি কূপের কাছে বসে পড়লেন। কিছু পানি আনালেন এবং কুলি করে কূপের মধ্যে ফেললেন। কিছুক্ষণ পর কূপে অঢেল পানি হয়ে গেলো। এ পানি সবাই এবং উটগুলোও পান করলো।

সহীহ আল বুখারীতেই হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ আনসারী থেকে বর্ণিত আছে যে, হুদাইবিয়াতে পানির স্বল্পতার কারণে আমরা পিপাসার্ত হয়ে

www.bjilibrary.com

পড়লাম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি ছোট্ট পাত্র দিয়ে অযু করছিলেন। সকলেই ঘাবড়াতে ঘাবড়াতে তাঁর খিদমতে উপস্থিত হলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার ? তাঁরা আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমাদের পানি নিঃশেষ হয়ে গেছে। আপনার সামনের পাত্রই এখন সম্বল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে পাত্রে নিজের পবিত্র হাত রাখলেন। রাখার সাথে সাথে তার আঙ্গুলের মাঝ দিয়ে ঝরণার মতো পানি প্রবাহিত হয়ে গেলো। এ পানি সকলেই পান ও অযু করলেন।

অন্য এক রাওয়ায়েতে আছে, হুদাইবিয়াতে যত্রতত্র শুকনো গর্ত ছিলো। সাহাবা রাদিয়াল্লাহ আনহুম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পানি দুষ্প্রাপ্যতার কথা বললেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তুনীর থেকে একটি তীর বের করে হযরত জাকওয়ান রাদিয়াল্লাহ্ আনহুকে দিলেন এবং তীরটি কোনো গর্তে গেড়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি তা একটি গর্তে গেড়ে দিলেন এর বরকতে শুকনো গর্তে পানির ধারা প্রবাহিত হতে লাগলো।

হুদাইবিয়াতে অবস্থানকালেই একদিন হযরত জাকওয়ান রাদিয়াল্লাহ্ আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আরজ করলেন ঃ "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার অনুমতি হলে কুরবানীর পশুগুলোকে হেরেমে নিয়ে গিয়ে আমি যবেহ করে দেবো।"

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "কুরাইশ মুশরিকরা মুসলমানদেরকে মক্কা প্রবেশে বাধাদানের জন্যে লড়াই করে মরার প্রতিজ্ঞা নিয়ে বসে আছে। এ অবস্থায় তুমি কিভাবে পশু হেরেমে নিয়ে গিয়ে যবেহ করতে পারো।"

তিনি আরজ করলেন, "আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর উৎসর্গ হোক। আমি পশুগুলোকে এমন রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাবো যে, কুরাইশরা তার সন্ধানই পাবে না।"

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "ঠিক আছে। তুমি পশুগুলো নিয়ে যাও।"

হাফিজ ইবনে হাজার (র) ইসাবাহ গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত জাকওয়ান রাদিয়াল্লাহ্ আনহু অত্যন্ত সতর্কতা এবং গোপনভাবে পশুগুলোকে হেরেমে নিয়ে গেলেন ও সেখানে যবেহ করে ফিরে এলেন।

"হুদাইবিয়াতে বাইয়াতে রেদওয়ানের" বিরাট ঘটনা সংঘটিত হলো। হযরত জাকওয়ান রাদিয়াল্লাহ্ আনহুও অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে প্রিয়

www.bjilibrary.com

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে লড়াই করে মৃত্যুর বাইয়াত নিলেন। এভাবে তিনি সেসব ভাগ্যবান সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন যাঁদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক এ ভাষায় নিজের সন্তুষ্টির সুসংবাদ দিয়েছেন ঃ

"আল্লাহ অবশ্যই ঈমানদারদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন যখন তারা এ বৃক্ষের নীচে তোমার হাতে বাইয়াত হচ্ছিলেন।"

হুদাইবিয়ার সন্ধির পর খায়বারের যুদ্ধ সংঘটিত হলো। এ যুদ্ধে হুদ-াইবিয়াতে উপস্থিত সকল সাহাবীই অংশগ্রহণ করেছিলেন। হযরত জাকওয়ান রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন জুনদুবও এতে অংশ নেন।

হুদাইবিয়ার সন্ধিপত্র অনুসারে চুক্তি হয়েছিলো যে, মুসলমানরা আগামী বছর কোনো অস্ত্র ছাড়াই মক্কা এসে ওমরাহ আদায় করতে পারবে। বস্তুত সপ্তম হিজরীর জিলকদ মাসে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের এক বড় দল সমভিব্যহারে ওমরাহ পালনের জন্যে মদীনা থেকে রওয়ানা হলেন। ইতিহাসে এ ওমরাহ "ওমরাতুল কাযা" নামে প্রসিদ্ধ। এবারও হযরত জাকওয়ান রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন জুনদুবকে কুরবানীর পশু নিয়ে যাওয়া ও তার তত্ত্বাবধান করার দায়িত্ব সমর্পণ করা হয়। সুতরাং তিনি মুসলমানদের বড় কাফেলা রওয়ানা হওয়ার আগেই নিজের গোত্রের চারজন যুবককে সাথে নিয়ে কুরবানীর পশু মক্কা মুয়াজ্জমা নিয়ে যান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় এলেন। হযরত জাকওয়ান রাদিয়াল্লাহ আনহু সহ সব মুসলমান অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে ওমরাহ আদায় করলেন এবং ওয়াদা অনুযায়ী তিনদিন পর মক্কা মুয়াজ্জমা থেকে ফিরে এলেন।

অষ্টম হিজরীর পবিত্র রমযান মাসে রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা মুয়াজ্জমাতে ইসলামের পতাকা উড্ডীন এবং বায়তুল্লাহ শরীফকে মূর্তি থেকে পবিত্র করলেন। মক্কা বিজয়ের সময় ১০ হাজার জীবন উৎসর্গকারী সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলেন। এ ধারণাই সঙ্গত যে, হযরত জাকওয়ান রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন জুনদুবও তাঁদের সাথে শরীক ছিলেন এবং হুনাইনের যুদ্ধেও তিনি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহগামী ছিলেন।

দশম হিজরীর জিলকদ মাসে সারওয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজ্জের জন্যে মদীনা থেকে রওয়ানা হলেন। আল্লামা ইবনে সায়াদের (র) বর্ণনা মতে, এবারও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পশুর তত্ত্বাবধানের দায়িত্বভার হযরত জাকওয়ান রাদিয়াল্লাহ আনহুর ওপরই ন্যস্ত করেছিলেন। সহীহ মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহ

www.bjilibrary.com

আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তির সাথে (বিদায় হজ্জের সময়) ১৬টি উট প্রেরণ এবং তাকেই তার তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করলেন। তিনি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! এ সকল উটের কোনোটি যদি রোগ অথবা ক্লান্তিজনিত অবসাদে পথ চলতে না পারে, তাহলে আমি কি করবো ? তিনি বললেন, উটটি যবেহ করে ফেলবে এবং তার গলার জুতোগুলো তার রক্তে ডুবিয়ে চুটের ওপর সিল মেরে দেবে। তার গোশত তুমি এবং তোমার সাথী খাবে না।

এ রাওয়ায়েতে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু উটের তত্ত্বাবধায়কের নাম উল্লেখ করেননি। কিন্তু মুয়াত্তায় ইমাম মালেক, মুসনাদে আবু দাউদ, মুসনাদে দারেমী ও জামে তিরমিযির এক হাদীসে প্রমাণিত হয় যে, এ তত্ত্বাবধায়ক হযরত জাকওয়ানই (নাজিয়াতুল আসলামী) ছিলেন। এ হাদীস স্বয়ং হযরত জাকওয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন জুনদুব থেকেই বর্ণিত। তাতে তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! কুরবানীর পশুর মধ্যে যদি কোনো পশু মুমূর্ষু অবস্থায় এসে পৌঁছে তাহলে আমি কি করবো ? তিনি বললেন সে পশুকে যবেহ করে ফেলবে এবং তার রক্ত দিয়ে তার ঘাড়ে সীল মেরে দেবে। অতপর তা মানুষের খাওয়ার জন্য দিয়ে দেবে।

বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর হযরত জাকওয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু দীর্ঘ দিন জীবিত ছিলেন। কিন্তু তার কোনো তৎপরতার খবর পাওয়া যায়নি। ইবনে সায়াদ (র) বলেছেন, তিনি আমীরে মুয়াবিয়ার খেলাফতকালে ওফাত পান।

---

www.bjilibrary.com

হযরত উতবাহ্ রাদিয়াল্লাহ্ আনহু বিন উসাইদ সাকাফী

নবুয়াত প্রাপ্তির প্রথম যুগে একদল সৌভাগ্যবান ব্যক্তি হক দাওয়াতের প্রতি লাব্বাইক বা সাড়া দিয়েছিলেন। তাঁরা কুরাইশ মুশকিরদের ক্রোধ ও গোস্বার স্বীকার হন। কিন্তু আল্লাহর এ সকল পবিত্র বান্দাহ কোনো ধরনের ভয়-ভীতি, চাপ ও যুলুম-নির্যাতনে হক পথ থেকে বিচ্যুত হননি এবং তাঁরা বছরের পর বছর ধরে বিভিন্নমুখী যুলুম-নির্যাতন সবর ও দৃঢ়তার সাথে সইতে থাকেন। হযরত উতবাহ্ রাদিয়াল্লাহ্ আনহুও ইসলামের এ পবিত্র দলের একজন সদস্য ছিলেন। ইতিহাসে তিনি নিজের কুনিয়াত "আবু বুসাইর" নামে খ্যাত।

তার সম্পর্ক তায়েফে বসবাসকারী বনু সাকিফের লড়াকু গোত্রের সাথে ছিলো। কিন্তু কুরাইশের সাথে নিকট সম্পর্কের ভিত্তিতে তারা মক্কায় স্থায়ী বাসীন্দা হয়ে যায়। তার বংশ তালিকা নিম্নরূপ ঃ

আবু বুসাইর উতবাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন উসাইদ বিন জারিয়াহ বিন উসাইদ বিন আবদুল্লাহ বিন আবি সালমাহ্ বিন আবদুল্লাহ বিন গাইরাহ বিন আওফ বিন সাকিফ।

মায়ের নাম ছিলো সালিমাহ্। তাঁর বংশনামা হলো ঃ সালিমাহ্ বিনতে আবদ বিন ইয়াজিদ বিন হাশিম বিন মুত্তালিব।

হযরত উতবাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু সজ্জন প্রকৃতির লোক ছিলেন। হক দাওয়াতের আওয়াজ তাঁর কানে প্রবেশ করতেই তিনি বিনা চিন্তায় এবং নির্দ্বিধায় ইসলাম কবুল করেন। মক্কার মুশরিকদের কাছে তাঁর এ "তৎপরতা" অসহনীয় ব্যাপার ছিলো। তারা ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে যুবক উতবাহ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন। সেখানে তিনি দীর্ঘকাল ধরে অবর্ণনীয় মুসিবতের বোঝা বইতে থাকেন।

৬ষ্ঠ হিজরীতে হুদাইবিয়ার সন্ধির পর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা মুনাওয়ারা তাশরীফ আনলেন। এ সময় হযরত উতবাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু একদিন সুযোগ পেয়ে কাফেরদের কারাগার থেকে ভেগে সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে গিয়ে হাজির হন।

www.bjilibrary.com

হুদাইবিয়ার সন্ধিপত্রে কয়েকটি শর্ত ছিলো। তার মধ্যে একটি শর্ত এও ছিলো যে, কোনো মুসলমান মুশরিকদের কাছ থেকে পালিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে পৌঁছলে তাকে তিনি ফিরিয়ে দেবেন। মক্কার মুশরিকরা হযরত উতবাহ রাদিয়াল্লাহ আনহুর পলায়নে চেঁচিয়ে গাঁ মাথায় করলো। যখন তারা শুনলো যে, সে মদীনা পৌঁছে গেছে, তখন তৎক্ষণাৎ তারা দু' ব্যক্তিকে হুজুরের কাছে প্রেরণ করলো। এ দু' ব্যক্তির কাছে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লিখে পাঠালো যে, চুক্তি মুতাবিক আপনি আমাদের লোককে ফেরত পাঠিয়ে দিবেন।

হযরত উতবাহ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে মক্কায় ফেরত পাঠানোর অর্থই ছিলো তাঁকে পুনরায় মুশরিকদের যুলুম-নির্যাতনের পাঞ্জায় নিক্ষেপ করা। কিন্তু রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অঙ্গীকার ও চুক্তি পালনকে ঈমানের অংশ হিসেবে আখ্যায়িত করতেন। এজন্যে তিনি হযরত উতবাহ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে বললেন ঃ

"আবু বুসাইর, তুমি জানো যে, সন্ধিপত্রের শর্ত অনুযায়ী তোমাকে আমার কাছে রাখতে পারি না। যদি রাখি তাতে চুক্তি ভঙ্গ হবে। আর চুক্তি ভঙ্গ আমাদের দীনে জায়েয নয়। এজন্যে তুমি এখন ফিরে যাও। অদূর ভবিষ্যতে আল্লাহ পাক তোমার এবং অন্যান্য মযলুম মুসলমানদের মুক্তির কোনো পথ করে দেবেন।"

হযরত উতবাহ আরজ করলেন ঃ "ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আপনি আমাকে পনুরায় মুশরিকদের কাছে পাঠাচ্ছেন। এতে তারা আমাকে হক পথ থেকে বিচ্যুত করবে।"

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আবু বুসাইর যাও। শীঘ্রই আল্লাহ পাক তোমার এবং অন্যান্য মুসলমানের মুক্তির একটা ব্যবস্থা করে দেবেন।"

হযরত উতবাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ পালনার্থে কুরাইশদের লোকদের সাথে রওয়ানা দিলেন। জুল হালিফাহ পৌঁছে তাঁর তত্ত্বাবধায়ক দু'জন খেজুর খাওয়ার জন্যে যাত্রা বিরতি করলো। হযরত উতবাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু তাদের একজনকে বললেন ঃ

"জানে বিরাদার ! (প্রাণের ভাই) তোমার এ তরবারী খুবই ভালো মনে হয়।"

তরবারীর মালিক নিজের তরবারীর প্রশংসা শুনে অত্যন্ত খুশী হয়ে বললো, "অবশ্যই এ তরবারী খুবই ভালো, আমি বহুবার তা পরীক্ষা করেছি।"

www.bjilibrary.com

হযরত উতবাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন, "একটু দেখাওনা ভাই।"

সে তৎক্ষণাৎ খাপ থেকে বের করে হযরত উতবাহ রাদিয়াল্লাহ আনহুর হাতে দিলো। উতবাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ পালনার্থে অবশ্য কুরাইশের লোকদের সাথে চলে এসেছিলেন। কিন্তু বছরের পর বছর ধরে তিনি কাফেরদের যুলুম-নির্যাতনের শিকার ছিলেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে কোনো অবস্থাতেই তিনি দ্বিতীয়বারের মতো তাদের কাছে ফিরে যেতে চাইছিলেন না। সুতরাং তরবারী হাতে আসতেই তিনি তার মা-লিকের মাথা উড়িয়ে দিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পালিয়ে মদীনায় মসজিদে নববীতে গিয়ে উপস্থিত হলো। মসজিদে নববীতে তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাকে অপ্রকৃতিস্থ দেখে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "তুমি এত পেরেশান হয়েছো কেন এবং ফিরেই বা এসেছো কেনো?" সে সকল ঘটনা বর্ণনা করলো। এতক্ষণে হযরত উতবাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে উপস্থিত হলেন।

তিনি আরজ করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আপনি চুক্তির শর্ত পূরণ করেছেন এবং নিজের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন। আল্লাহ আমাকে হিম্মত দিয়েছেন এবং স্বাধীন হয়ে গিয়েছি।"

কুরাইশের লোককে হত্যা করে হযরত উতবাহ রাদিয়াল্লাহ আনহুর এভাবে প্রত্যাবর্তন কুরাইশদের উত্তেজিত করার কারণ হতে পারতো। এজন্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

"এ ব্যক্তি (উতবাহ) যুদ্ধের আগুন প্রজ্জ্বলনের অস্ত্র। সে যদি কতিপয় সাহায্যকারী এবং সাথী যোগাড় করতে পারে তাহলে যুদ্ধ বাধিয়ে বসবে।"

হযরত উতবাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ দিয়ে উচ্চারিত এ বাক্য শুনলেন। এতে স্থির বিশ্বাস হলো যে, মদীনায় আর তাঁর পক্ষে থাকা সম্ভব নয়। তিনি নীরবে সেখান থেকে বের হয়ে সমুদ্রপোকূলের দিকে রওয়ানা দিলেন।

হযরত আবু বুসাইর উতবাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু উপকূলবর্তী স্থান "আইসে" গিয়ে অবস্থান নিলেন। আইসের কাছে ছিলো একটি সড়ক। এ সড়ক দিয়েই কুরাইশদের বাণিজ্যিক কাফেলা সিরিয়া যাতায়াত করতো। কিছুদিন পর আরো একজন নির্যাতিত সাহাবী হযরত আবু জানদাল রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন সুহায়েলও মক্কার মুশরিকদের কারাগার থেকে পালিয়ে আইস এসে উপস্থিত হলেন। অন্যান্য নির্যাতিত মুসলমানদের জন্য এখন পথ খুলে গেলো। যে-ই সুযোগ পেত সে-ই কুরাইশদের নির্যাতনের পাঞ্জা থেকে পালিয়ে সোজা আইস

www.bjilibrary.com

এসে পৌঁছতো। কিছুদিনের মধ্যেই হযরত উতবাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে মুসলমানদের একটি দল একত্রিত হলো। তাঁরা মক্কার মুশরিকদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের এক আশ্চর্য ধরনের পরিকল্পনা নিলো। কুরাইশের কোনো বাণিজ্যিক কাফেলা এ পথ দিয়ে অতিক্রম করলেই তারা তার ওপর আক্রমণ করে নাস্তানাবুদ করে ছাড়তো। কুরাইশের মুশরিকরা হযরত উতবাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ অতর্কিত আক্রমণে খুব অস্থির হয়ে পড়লো। কেননা তাদের বাণিজ্যই বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। অবশেষে তারা নিরুপায় হয়ে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পয়গাম প্রেরণ করলো। এ পয়গামে তারা জানালো, আগামীতে যে মুসলমান ভেগে যাবে, সে স্বাধীন হয়ে যাবে। তাকে ফিরিয়ে দেয়ার দায়-দায়িত্ব আর আপনার ওপর বর্তাবে না। এ সাথে তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আরো একটি নিবেদন পেশ করলো। আইসে অবস্থানরত মুসলমানরা আর যাতে তাদের বাণিজ্যিক কাফেলার ওপর হামলা না করে সেই ব্যবস্থা গ্রহণের কথা নিবেদনে উল্লেখ করা হলো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশের এ প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন এবং আইসের স্বাধীন মুসলমানদেরকে লিখে পাঠালেন যে, আবু বুসাইর উতবাহ এবং আবু জানদাল মদীনা চলে আসবে। অবশিষ্টরা বিচ্ছিন্নভাবে নিজেদের বাড়ী পৌঁছে যাবে। সহীহ আল বুখারীতে আছে—এ সময় কুরআন পাকের এ আয়াত নাযিল হয়ঃ

"আল্লাহ সেই সত্তা যিনি মক্কার উপত্যকায় দুশমনের হাত তোমাদের দিয়ে এবং তোমাদের হাত তাদের দিয়ে রুখে দিয়েছেন, তাদের ওপর বিজয়ী হওয়ার পর।"

অন্য এক রাওয়ায়েত অনুযায়ী এ আয়াত তখন নাযিল হয় যখন মুসলমানরা ৮০জন মুশরিককে গ্রেফতার করে। এ মুশরিকরা মুসলমানদের ওপর হামলার ইচ্ছা নিয়ে এসেছিলো। রহমতে দো আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দয়াপরবশ হয়ে তাদের সবাইকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফরমান যখন হযরত উতবাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু পেলেন তখন তিনি মুমূর্ষ অবস্থায় ছিলেন। পবিত্র চিঠি হাতে নিয়ে পড়তে লাগলেন এবং পড়তে পড়তেই আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে পরপারে চলে গেলেন।

হযরত আবু জানদাল রাদিয়াল্লাহু আনহু জানাযার নামায পড়ালেন এবং আইসেই তাঁর লাশ দাফন করলেন এবং স্মৃতির নিদর্শন স্বরূপ কাছেই একটি

www.bjilibrary.com

মসজিদ নির্মাণ করালেন। এরপর তিনি মদীনা মুনাওয়ারা চলে এলেন। অন্যান্য মুসলমানরা যার যার বাড়ী চলে গেলেন।

হযরত আবু বুসাইর উতবাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর পারিবারিক জীবন সম্পর্কে চরিত গ্রন্থগুলো নীরব রয়েছে। অবশ্য এতটুকু জানা যায় যে, তিনি লেখাপড়া জানতেন এবং একজন বাহাদুর ও চিন্তাশীল ব্যক্তি ছিলেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চিঠি থেকে প্রকাশ পায় যে, তিনি তাঁর স্বাধীন চেতা মনোভাবকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। এজন্যেই তিনি তাঁকে মদীনা ডেকে পাঠিয়েছিলেন। যদি জীবিত থাকতেন তাহলে হযরত আবু জানদালের মতই পরের যুদ্ধসমূহে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহগামী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারতেন।

---

www.bjilibrary.com

হযরত মুগিরাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন শু'বা সাকাফী

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ১১ হিজরীতে এ নশ্বর জগত থেকে বিদায় নিলেন। তাঁর ইনতিকালে সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহ আনহুমের ওপর যেন কিয়ামত আপতিত হলো। দুনিয়াটা তাঁদের কাছে তমসাচ্ছন্ন হয়ে গেলো। শোকে দুঃখে তাঁরা মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছার কাছে মাথানত করা ছাড়া আর কিইবা করার ছিলো। জানাযার নামায পড়ে অন্তরের ওপর পাথর চাপা দিয়ে তাঁরা ভালোবাসার আধার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র লাশ কবরে নামিয়ে দিলেন। এ সময় উসকো খুসকো চুল সম্বলিত লম্বা ও সুঠাম দেহী একজন সাহাবীর দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ের এক আশ্চর্যজনক অবস্থা পরিলক্ষিত হচ্ছিলো। শোক-দুঃখে ম্লান এক প্রতিচ্ছবি যেনো। অস্থিরতা এবং অশান্তিতে বার বার হাত ডলছিলেন। হঠাৎ করে আঙ্গুল থেকে আংটিটি খুলে পবিত্র কবরে পড়ে গেলো। হযরত আলী কাররামুল্লাহু ওয়াজহাহু কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি বললেন, কবরে নেমে নিজের আংটি বের করে নাও। তিনি কবরে নামলেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র পায়ে হাত লাগালেন। অতপর বললেন, মাটি নিক্ষেপ করো। যখন কিছু মাটি ফেলা হলো, তখন তিনি অশ্রুসজল নেত্রে অনন্যোপায় হয়ে পবিত্র কবর থেকে বেরিয়ে এলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ সাহাবী সবার শেষে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সৌভাগ্য লাভ হয়েছিলো। এ সাহাবী ছিলেন হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন শু'বা।

হযরত আবু আবদুল্লাহ মুগিরাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন শু'বা তাঁর যুগে একজন নামকরা রাজনৈতিক পরামর্শদাতা ছিলেন। তিনি তায়েফে বসবাসকারী মশহুর কবিলাহ "বনু সাকিফের" আশা-আকাংখার আলোকবর্তিকা স্বরূপ ছিলেন। তাঁর বংশ নামা হলো ঃ

মুগিরাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন শু'বা বিন আবি আমের বিন মাসউদ বিন মুয়াত্তাব বিন মালিক বিন কায়াব বিন আমর বিন আওফ বিন কায়েস।

কতিপয় রাওয়ায়েতে তাঁর কুনিয়াত আবু আবদুল্লাহ ছাড়া আবু ইসাও বর্ণনা করা হয়েছে।

www.bjilibrary.com

বনু সাকিফ গোত্রের লোকেরা বিদ্রোহী প্রকৃতির এবং লড়াকু ছিলো। সবুজ-শস্য-শ্যামল ভূমি, বাগান এবং ধন-সম্পদের আধিক্য তাদেরকে অহমিকার তুঙ্গে তুলে রেখেছিলো। নবুয়াত প্রাপ্তির দশম বছরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাওহীদের দাওয়াতদানের জন্যে তায়েফে তাশরীফ নেন। এ সময় তারা আরবদের প্রথাগত মেহমানদারীকে "তাকে" উঠিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এমন অসদাচরণ করলো যে, মানবতা মুখ থুবড়ে পড়ে রইলো। নবম হিজরীর আগে তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করতে পারেননি। অবশ্য দু' একজন সৌভাগ্যবান সাহাবী এর আগেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হযরত মুগিরাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন শু'বা এমনি ভাগ্যবান সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

হাফিজ ইবনে আবদুল বার (র) "আল ইসতিয়াবে" লিখেছেন, হযরত মুগিরাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন শু'বা পঞ্চম হিজরীতে ঈমান আনেন এবং সে বছরই হিজরত করে মদীনা গমন করেন। কতিপয় রাওয়ায়েতে আছে, তিনি জাহেলী যুগে কয়েকজন লোককে হত্যা করেছিলেন। যদিও বনু সাকিফ গোত্রের প্রখ্যাত সরদার উরওয়াহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন মাসউদ তাঁর তরফ থেকে এ হত্যার দিয়ত বা খেসারত আদায় করেছিলেন তবুও তিনি স্বদেশে অবস্থান করেননি। পালিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে মদীনা চলে আসেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাইয়াত ও ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর সেখানেই তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস করেন।

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত মুগিরাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু নিজের সময়ের বেশীর ভাগ অংশই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কাটাতেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফয়েজ লাভ করতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি তাঁর ছিলো সীমাহীন ও অগাধ ভালোবাসা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতের জন্যে তিনি এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো নির্দেশ দিলেই তৎক্ষণাৎ তিনি তা পালন করতেন। তাঁর অযুর পানি এনে দিতেন। তাঁর জন্যে পবিত্র আবাসস্থল রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও তিনিই আনজাম দিতেন। তাঁর উট চরাতে নিয়ে যেতেন। বস্তুত তিনি ছিলেন শিক্ষিত মানুষ। এজন্যে কোনো কোনো সময় অহী লেখার সৌভাগ্যও তাঁর হতো।

৬ষ্ঠ হিজরীর জিলকদ মাসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওমরাহর উদ্দেশ্যে মক্কা রওয়ানা হলেন। এ সময় ১৪শ সাহাবী তাঁর সাথে ছিলেন। তাঁদের মধ্যে হযরত মুগিরাহ বিন শু'বাও অন্তর্ভুক্ত হন। পথিমধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খবর পেলেন যে, মক্কার মুশরিকরা

www.bjilibrary.com

মুসলমানদেরকে বাধা দিতে চায় এবং তারা একটি সেনাদল এ উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে পাঠিয়েও দিয়েছে। এ অবস্থায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিচিত রাস্তা ছেড়ে অন্য এক রাস্তা দিয়ে হুদাইবিয়া পৌঁছে তাঁবু খাটালেন। কেননা তিনি তো লড়াই করতে চাননি। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুদাইবিয়া থেকে একজন দূত কুরাইশদের কাছে প্রেরণ করলেন। তিনি দূতের মাধ্যমে বলে পাঠালেন যে, তাঁরা লড়াই করতে চান না। ওমরাহ্ আদায় করে ফিরে যাবেন। এর জবাবে কুরাইশরা উরওয়াহ বিন মাসউদ সাকাফীকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আলোচনার জন্যে প্রেরণ করলেন। উরওয়াহ সে সময় ইসলাম গ্রহণ করেননি। যদিও তিনি তায়েফের বাসিন্দা ছিলেন, তবুও মক্কার কুরাইশরাও তাঁকে খুব মানতো এবং নিজেদের একজন বুযর্গ হিসেবে সমীহ করতো। উরওয়াহ্ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌঁছে আলোচনা শুরু করলো। আরবের সাধারণ প্রথা অনুসারে বারবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র দাড়ির দিকে হাত এগিয়ে নিচ্ছিলো। এ সময় হযরত মুগিরা বিন শু'বা রাদিয়াল্লাহ আনহু দাড়ি ঊর্ধমুখী রাখার জন্যে মুখের ওপর কাপড় বেঁধে এবং অস্ত্র সজ্জিত হয়ে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিঠের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। উরওয়ার আলাপ-আলোচনার ধরন তিনি বরদাশত করতে পারছিলেন না। বারবার নিজের তলোয়ারের হাতলের দিকে হাত বাড়াচ্ছিলেন। অবশেষে ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো এবং ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললেন ঃ "তুমি জানো না, কার সাথে কথা বলছো। খবরদার ! হাত আর আগে বাড়িও না।"

উরওয়াহ্ তাঁর কণ্ঠস্বর চিনতে পারলেন এবং বললেন, "হে দাগাবাজ ! তুমি কি আমার ইহসান ভুলে গেছো ? এখানে একটি ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যে ঘটনায় উরওয়াহ রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত মুগিরা তরফ থেকে খুনের বদলা আদায় করেছিলেন।

হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন, তুমি যেই হও না কেনো, নিজের হাত পেছনে রাখো।"

উরওয়াহ কুরাইশদের কাছে ফিরে গেলো এবং তাদেরকে একত্রিত করে এ বক্তব্য পেশ করলেন ঃ

"হে কুরাইশ ভাইয়েরা ! আমি বিশ্বের বড় বড় রাজা-বাদশাদের (রোমের কাইসার, ইরানের কিসরা, হাবশার নাজ্জাশীর) কাছে গমন করেছি—কিন্তু মুহাম্মদের সাথীরা যেভাবে তাঁর প্রতি অনুরক্ত এবং যেভাবে তাঁর তাজিম ও সম্মান করে এ ধরনের আমি কোনো বাদশার দরবারে প্রত্যক্ষ করিনি। মুহাম্মদ

www.bjilibrary.com

থুথু নিক্ষেপ করেন। এসব সাহাবীর সে থুথু নিজের হাতে নেয় এবং তা শরীরে ও চেহরায় মেখে নেয়। মুহাম্মদ অযু করেন। এসব মানুষ ব্যবহৃত পানির প্রতি ফোটার দিকে এমনভাবে ধাবিত হয় যে, তারা যেন পরস্পর লড়াই করে মারা যাবেন। মুহাম্মদ কোনো নির্দেশ দিলে তা প্রত্যেকেই পালনের জন্যে পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। তাঁর সামনে কেউ উচ্চস্বরে কথা বলে না এবং তাঁর দিকে কেউ চোখ তুলে তাকায়ও না। আমার কথা যদি শোনো, তাহলে মুহাম্মাদের সাথে সন্ধি করে ফেলো।”

কুরাইশরা উরওয়াহর কথায় প্রভাবিত হলো, কিন্তু সন্ধির দিকে অগ্রসর হলো না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ওসমান জুন্নুরাইন রাদিয়াল্লাহ আনহুকে দূত বানিয়ে প্রেরণ করলেন। কুরাইশরা মক্কায় তাঁকে আটক করলো। যখন তিনি ফিরলেন না তখন মুসলমানদের মধ্যে গুজব ছড়িয়ে পড়লো যে, ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহুকে কুরাইশ মুশরিকরা শহীদ করে ফেলেছে। এতে মুসলমানদের মধ্যে আবেগ উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহুর খুনের বদলা নেয়া ফরয। একথা বলেই তিনি একটি বাবলা বৃক্ষের নীচে বসে পড়লেন এবং সাহাবা রাদিয়াল্লাহ আনহুমদের কাছ থেকে জীবন উৎসর্গ করার বাইয়াত গ্রহণ করলেন। এ বাইয়াতের নামই বাইয়াতে রিদওয়ান অর্থাৎ খোদার সন্তুষ্টির বাইয়াত। কেননা এ বাইয়াতে অংশগ্রহণকারী সাহাবা রাদিয়াল্লাহ আনহুমদেরকে আল্লাহ পাক প্রকাশ্য ভাষায় নিজের সন্তুষ্টির সুসংবাদ দিয়েছেন। সূরা আল ফাতাহতে এসব পবিত্র আত্মার সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে ঃ

“অবশ্যই আল্লাহ ঈমানদারদের ব্যাপারে খুশী হয়েছেন যখন তারা এ বৃক্ষের নীচে তোমার কাছে বাইয়াত নিচ্ছিলেন।”

হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন শু'বারও বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য হয়েছিলো। এদিক দিয়ে তিনি 'আসহাবিশ শাজারাহ'র” মহান মর্যাদায় দলভুক্ত। এসব সাহাবী ঈমানের আবেগ এবং ত্যাগের চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন। কুরাইশরা যখন একথা জানতে পারলো তখন তাদের সাহসে ভাটা পড়লো। তারা হযরত ওসমান জুন্নুরাইন রাদিয়াল্লাহ আনহুকে ফেরত পাঠিয়ে দিলো এবং সন্ধির দিকে অগ্রসর হলো। বস্তুতঃ সন্ধিনামা লিখিত হলো এবং মুসলমানরা আল্লাহর তরফ থেকে প্রকাশ্য বিজয়ের সুসংবাদ পেয়ে হুদাইবিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন।

হুদাইবিয়ার সন্ধির পর হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু খায়বার, মক্কা বিজয়, তাবুক এবং আরো কয়েকটি যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

www.bjilibrary.com

সাল্লামের সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন। নবম হিজরীর শাবান অথবা রমযান মাসে তায়েফবাসী কতিপয় প্রভাবশালী ব্যক্তির একটি প্রতিনিধি দল আবদি ইয়ালিলের নেতৃত্বে মদীনা প্রেরণ করলো। এ দল মদীনার অদূরে 'জি হারছ' নামক স্থানে পৌঁছলে মুগিরা বিন শু'বা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে সাক্ষাত হলো। তিনি সেখানে উট চরাচ্ছিলেন। তিনি সাকাফী ভাই-বন্ধুদের আগমনের হেতু জানতে পেরে খুব খুশী হলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ খবর দেয়ার জন্যে মদীনার দিকে দৌড় দিলেন। রাস্তায় হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে দেখা হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার ? এ রকম দৌড়াচ্ছো কেন ? হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহু আনহু সাকিফ প্রতিনিধি দলের আগমনের খবর দিলেন। এ খবর পেয়ে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে কসম দিয়ে বললেন, এ সুসংবাদ আমাকে পৌঁছাতে দাও।

হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহু আনহু সিদ্দিকে আকবর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে অত্যন্ত সমীহ করতেন। তিনি তাঁর কথা মেনে নিলেন এবং রাস্তা থেকেই প্রতিনিধি দলের কাছে ফিরে গেলেন।

সাইয়েদেনা সিদ্দিকে আকবার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাকিফ প্রতিনিধি দলের আগমনের সংবাদ দিলেন। খবর পেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও খুব খুশী হলেন। ইত্যবসরে হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রতিনিধি দলের সদস্যদেরকে নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে হাজির হলেন। হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌঁছে কিভাবে সালাম দিতে হবে তা তাদেরকে শিক্ষা দিলেন। কিন্তু তাদের হাড় এবং শিরা-উপশিরায় জাহেলিয়াত বাসা বেঁধে ছিলো। তারা নিজেদের জাহেলী নিয়ম মুতাবেক হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামকে সালাম করলো। এজন্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের প্রতি বিরক্ত হলেন না। হযরত মুগিরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু আরজ করলেন ঃ

"হে আল্লাহর রাসূল ! আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবানী হোক। এরা আমার কাওমের মানুষ। আপনি অনুমতি দিলে তাদেরকে আমার মেহমান বানাতে এবং যত্ন-আত্তির করতে পারি।"

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

"নিজের কাওমের সম্মান করতে আমি তোমাকে নিষেধ করবো না। কিন্তু তাদেরকে এমন স্থানে রাখবে যেখানে তাদের কানে কুরআনের আওয়াজ পৌঁছতে পারে এবং তারা মুসলমানদের নামায পড়া দেখতে পারে।"

www.bjilibrary.com

বস্তুত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইঙ্গিতে মসজিদে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চত্বরে তাঁবু টাঙিয়ে সাকিফ প্রতিনিধি দলকে রাখা হলো।

মদীনায় অবস্থানকালে প্রতিনিধি দলের সদস্যরা কুরআন পাঠ শুনে এবং মুসলমানদেরকে নামায পড়তে দেখে খুব প্রভাবিত হলো। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও প্রতিদিন ইশার নামাযের পর তাদের কাছে তাশরীফ নিতেন এবং বহুক্ষণ ধরে কথাবার্তা বলতেন। অবশেষে প্রতিনিধিদল শর্ত সাপেক্ষে হক গ্রহণে তৈরি হয়ে গেলো। কিন্তু নিজেদের মাবুদ "লাতের" ব্যাপারে তাদের অন্তরে কঠিন ভয় বিরাজমান ছিলো। ইসলাম গ্রহণের শর্ত নিরূপিত হয়ে যাওয়ার পর তারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো ঃ "আমাদের মূর্তি লাতের ব্যাপারে আপনার অভিপ্রায় কি ?" হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ "লাতকে ভেঙ্গে ফেলা হবে।"

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইরশাদ শুনে তারা মুর্ছা যাওয়ার উপক্রম হলো। তারা বললো, "লাত যদি আপনার অভিপ্রায়ের কথা জানতে পারে, তাহলে সে আমাদেরকে ধ্বংস করে ফেলবে।"

হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুও সে সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আর ক্রোধ সম্বরণ করতে পারলেন না। তিনি তাদেরকে তিরস্কার করে বললেন, "তোমরা একটি জীবনহীন পাথরকে এত ভয় করো ?" প্রতিনিধি দলের সদস্যরা অসন্তুষ্ট হয়ে বললো ঃ "ওমর তুমি কথা বলো না, আমরা তোমার কাছে আসিনি।" একথা বলেই তারা হুজুরের খিদমতে আরজ করলো ঃ "আমাদের তো লাতের গায়ে হাত দেয়ার মতো সাহস নেই। আপনি যা ইচ্ছা তাই করুন।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুশী হয়ে বললেন ঃ "ঠিক আছে মূর্তি ভাঙ্গার দায়িত্ব আমাদের। তোমরা এ কাজ করো না।"

এরপর প্রতিনিধি দলের সকল সদস্য ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং স্বদেশে ফিরে গেলেন। সাকিফ প্রতিনিধি দলের প্রত্যাবর্তনের কিছুদিন পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন শু'বা এবং হযরত আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন হারবকে [অন্য এক রাওয়ায়েত মুতাবিক হযরত খালেদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদকেও] তায়েফ প্রেরণ করলেন। লাত এবং তার ইবাদাতখানাকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যেই তাঁদেরকে সেখানে পাঠানো হয়। প্রতিনিধি দলের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর অধিকাংশ বনি সাকিফ এবং তাদের মিত্ররা ইসলাম গ্রহণ

www.bjilibrary.com

করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের অন্তর থেকে "লাতের" ভীতি দূর হয়নি। আল্লামা তাবারী বলেছেন, বনু সাকিফের মহিলাদের অন্তর থেকে কুফর ও শিরকের রং দূর করতে অনেক সময় লেগেছিলো। তারা লাতকে খুব মান্য করতো। তার কাছে অন্তরের কামনা-বাসনা প্রার্থনা করতো। হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন শু'বা তায়েফ পৌঁছেই পাথরের মূর্তি "লাত" ভাঙ্গার কাজ শুরু করলেন। এতে সাকাফী মহিলারা কাঁদতে কাঁদতে বুকের ছাতি ফাটাতে ফাটাতে এবং মাথার কাপড় ফেলে ঘর থেকে বের হয়ে এলো এবং এ কবিতা আবৃত্তি করে নিজেদের পুরুষদেরকে ভর্ৎসনা করতে লাগলো ঃ

"সেসব ভীরুদের জন্য ক্রন্দন করো যারা নিজেদের মূর্তিকে শত্রুর কাছে ন্যস্ত করে দিয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে লড়াইও করেনি।" হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের এ শোরগোলের কোনো পরওয়া করলেন না। প্রথমে লাতের মূর্তি ভাঙ্গলেন। তারপর মন্দিরের প্রাচীরের উপর চড়ে ভাঙ্গা শুরু করলেন। তাঁর সাথীরাও তাঁকে সাহায্য করলেন এবং সবাই মিলে শুধুমাত্র ভবনের প্রতিটি পাথরই ভাঙ্গলেন না বরং ভিত্তি পর্যন্ত খুঁড়ে ফেললেন। মন্দিরের ধ্বংসের পর তায়েফবাসীর অন্তর থেকে ভয় দূর হলো এবং তাদের মধ্যে তাওহীদের ভিত্তি মযবুত হলো। এখন তারা ইসলামের তরবারী হিসেবে আবির্ভূত হলেন। দশম হিজরীতে বিদায় হজ্জের সময় সকল বনী সাকিফই অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে হজ্জে অংশগ্রহণ করলেন। হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন শু'বা এবারও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহযাত্রী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।"

বিশ্বনেতা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইনতেকালের পর তাঁর পবিত্র কবরে হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর আংটি পতিত হওয়ার ঘটনা উপরে বর্ণিত হয়েছে। কতিপয় চরিতকার ধারণা প্রকাশ করেছেন যে, হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহু আনহু ইচ্ছাকৃতভাবে নিজের আংটি পবিত্র কবরে ফেলে দিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে সবার শেষে তিনিই বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন, এ মর্যাদায় স্মরণ করার আশায় তিনি এ কাজ করেছিলেন। ইবনে আসয়াদের (র) বক্তব্য অনুসারে তিনি সবসময় জনসমক্ষে এ ব্যাপারে ফখর করতেন। তিনি বলতেন আমি তোমাদের সবার মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে সবার পরে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলাম।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইনতেকালের পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু খেলাফতের দায়িত্বে সমাসীন হন। এ সময় হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন শু'বা সকল মুসলমানের মত আনন্দচিত্তে

www.bjilibrary.com

তার বাইয়াত করেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলের প্রথম দিকে ধর্মদ্রোহিতার ফেতনা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহু আনহু মুরতাদদের বিরুদ্ধে জিহাদে অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অংশ নেন। ইমাম হাকিম (র) নিজের "মুসতাদরাকে" লিখেছেন, হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহু আনহু ইয়ামামার মুরতাদদের উৎখাতে অগ্রগামী ছিলেন। মুরতাদদের সম্পূর্ণরূপে উৎখাতের পর তিনি মদীনায় ফিরে এসেছিলেন।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর ওফাতের পর হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু খেলাফতের দায়িত্ব লাভ করেন। তিনি সিদ্দিকে আকবর রাদিয়াল্লাহু আনহুর শুরু করা কাজকে সামনের দিকে অগ্রসর করেন এবং ইরাক ও সিরিয়ায় যুদ্ধের তৎপরতা বাড়িয়ে দেন। হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন শু'বা সে সময় আরবের ইরাক অভিযানে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদদের দলে অন্তর্ভুক্ত হন।

১৪ হিজরীর রমযানে মুসলমানরা "বুয়ায়েব" নামক স্থানে ইরানীদেরকে চরমভাবে পরাজিত করেন। এ পরাজয়ে ইরানের পারসিক যাজকদের মর্যাদা ধূলায় লুণ্ঠিত হয় এবং তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়ায়। আরবের ইরাকের যেসব এলাকা মুসলমানরা দখল করে নিয়েছিলো সেখানেও বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু এ অবস্থার খবর পেয়ে ইরাকে মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি হযরত মুছান্না রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন হারিছাকে এক নির্দেশ পাঠালেন। এ নির্দেশে তিনি সকল সৈন্যকে একত্রিত করে আরব সীমান্তের দিকে হটে আসতে বললেন। একই সাথে তিনি সমগ্র আরবে জিহাদের দুন্দুভী বাজিয়ে দিলেন। কিছু দিনের মধ্যেই চারদিকে জিহাদের আবেগে মদীনায় জীবন উৎসর্গকারী মুজাহিদদের প্লাবণ এসে উপস্থিত হলো। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত সায়াদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন আবি ওয়াক্কাসকে ইরাকের এ অভিযানের সেনাপতি নিয়োগ করলেন এবং যথার্থ হিদায়াত দিয়ে তাঁকে মদীনা থেকে রওয়ানা করিয়ে দিলেন। হযরত মুছান্না রাদিয়াল্লাহু আনহুর অধীন সৈন্যও "শাররাফ" নামক স্থানে এসে তাঁর সাথে যোগ দিলো। [সে সময় হযরত মুছান্না রাদিয়াল্লাহু আনহু জাসারের অভিযানে আহত হওয়ার কারণে ওফাত পেয়েছিলেন।] এ স্থানে হযরত সায়াদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুর পত্র পেলেন। এ পত্রে তিনি তাঁকে "শাররাফ" থেকে অগ্রসর হয়ে কাদেসিয়াতে অবস্থান নেয়ার নির্দেশ দিলেন। কাদেসিয়া হলো ইরানের প্রবেশ দ্বার। এ পত্র পেয়েই হযরত সায়াদ রাদিয়াল্লাহু আনহু

www.bjilibrary.com

"শাররাফ" থেকে রওয়ানা হয়ে কাদেসিয়ায় গিয়ে তাঁবু স্থাপন করলেন। পক্ষান্তরে ইরানী শাসক ইয়াজদজরদ একজন নামকরা ইরানী জেনারেল রুস্তম বিন ফররুখ যাদকে একটি বিরাট বাহিনী দিয়ে মুসলমানদের সাথে লড়াইয়ের নির্দেশ দিলো। রুস্তম সব ধরনের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ৬০ হাজার ইরানী লড়াকু সৈন্যসহ মাদায়েন থেকে রওয়ানা হলো এবং মাদায়েনের সন্নিকটে সাবাতের ফওজী ঘাঁটিতে তাঁবু ফেললো। "সাবাত" অবস্থানকালে সে ইরানের সকল এলাকায় ঢেঁড়া পিটিয়ে দিলো। ফলে সকল স্থান থেকেই দলে দলে সৈন্য উপস্থিত হতে লাগলো। ইরানী বাহিনীর সেনাধ্যক্ষ সাবাতেই অবস্থান করছিলো। ইত্যবসরে হযরত সায়াদ রাদিয়াল্লাহ আনহু আমীরুল মু'মিনীন রাদিয়াল্লাহ আনহুর নির্দেশ অনুসারে ১৪ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল সরাসরি ইয়াজদজরদের কাছে মাদায়েন প্রেরণ করলেন। এ প্রতিনিধি দলের একজন সদস্য হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন শু'বাও ছিলেন। হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু সহ এ প্রতিনিধি দলের সকল সদস্যই চেহারার ঔজ্জ্বল্য, বাহাদুরী, বক্তৃতা এবং আলোচনায় অত্যন্ত উঁচু পর্যায়ের লোক ছিলেন। এ প্রতিনিধি দল কিসরার দরবারে পৌঁছে অত্যন্ত সুন্দরভাবে আলাপ-আলোচনা করলেন এবং তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। ইয়াজদজরদ মুসলমানদের কথা শুনে রুষ্ট হলো এবং অত্যন্ত রুক্ষতার সাথে প্রতিনিধি দলকে বের করে দিলো। এমনকি তাদের একজনের মাথায় মাটি ভর্তি একটি টুকরি রেখে বললো, তোমরা আমাদের দেশ জয় করতে এসেছো। কিন্তু এখানে এ মাটি ছাড়া আর কিছুই পাবে না। মাদায়েন থেকে ইসলামী প্রতিনিধি দলের যাওয়ার সাথে সাথেই ইয়াজদজরদ রুস্তমকে নির্দেশ প্রেরণ করলো। নির্দেশে "সাবাত" থেকে রওয়ানা হয়ে কাদেসিয়ায় পৌঁছে মুসলমানদেরকে উৎখাতের কথা বলা হলো।

রুস্তম এক লাখ ৮০ হাজার সৈন্য এবং তিনশ' যোদ্ধা হাতী সমেত সাবাত থেকে কাদেসিয়া অভিমুখে যাত্রা করলো এবং অত্যন্ত ধীরে-সুস্থে কাদেসিয়ার সামনে গিয়ে "আতিক" নামক স্থানে তাঁবু ফেললো। সে ছিলো একজন বিশ্বদ্রষ্টা এবং দূরদর্শী জেনারেল এবং আরবদের বাহাদুরী সম্পর্কেও সে সম্যক অবহিত ছিলো। মুসলমানদের সাথে কোনো ধরনের সন্ধির ব্যাপারে সে আগ্রহী ছিলো যাতে তারা যুদ্ধ ছাড়াই ফিরে যেতে পারে। এজন্য সে হযরত সায়াদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবি ওয়াক্কাসের কাছে পত্র পাঠালো এবং সন্ধির আলোচনার জন্য কোনো বিশ্বস্ত লোক প্রেরণের অনুরোধ জানালো।

হযরত সায়াদ রাদিয়াল্লাহ আনহু প্রথমে হযরত রাবয়ী বিন আমের রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং পরে হযরত হুযাইফা রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন মুহসিনকে

www.bjilibrary.com

দূত হিসেবে রুস্তমের কাছে প্রেরণ করলেন। কিন্তু এ দু' দূতের সাথে আলোচনায় কোনো ফলোদয় হলো না। তৃতীয়বার হযরত সায়াদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন শু'বাকে দূত হিসেবে পাঠালেন। রুস্তম অত্যন্ত শান-শাওকাতের সাথে দরবার সাজালো। অনেক দূর পর্যন্ত কার্পেটের বিছানা বিছালো। রাস্তার দু' পাশে অত্যন্ত উঁচু দরের উর্দি পরিহিত সৈন্যের দল খাড়া করে দিলো এবং স্বয়ং আমীরদের মধ্যে স্বর্ণখোচিত মুকুট মাথায় দিয়ে স্বর্ণ সিংহাসনে বসলো। হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহু আনহু সাধারণ পোশাক পরে বেপরোয়াভাবে রুস্তমের দরবারে প্রবেশ করলেন এবং সোজা রুস্তমের সিংহাসনে উঠে তার উরুর সাথে উরু মিলিয়ে বসে গেলেন। এতে সমগ্র দরবার হতভম্ব হয়ে পড়লো এবং দূতেরা অগ্রসর হয়ে হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে দিলো। মুগিরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ইরানবাসী অত্যন্ত ভদ্র এবং সতর্ক মানুষ বলে শুনেছিলাম। কিন্তু আমি জানতাম না যে, তারা এক ব্যক্তিকে খোদা বানিয়ে সিংহাসনে বসায় এবং তার পূজা করে। আল্লাহর শোকর যে, আরবদের মধ্যে এ নিয়ম নেই। তোমরা স্বয়ং আমাকে এখানে মেহমান হিসেবে ডেকে এনেছো। এজন্য আমার সাথে তোমাদের এ রকম ব্যবহার উচিত নয়। তোমাদের চরিত্র যদি এ-ই হয়, তাহলে বুঝে নিও যে, তোমাদের শেষ দিন ঘনিয়ে এসেছে।

রুস্তম হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর কথা শুনে অত্যন্ত লজ্জিত হলো এবং বললো, আমি তোমাকে আমার কাছ থেকে উঠানোর নির্দেশ দেইনি। কর্মচারীদের এটা ভুল ছিলো। কিন্তু তুমিই বলো, তোমার ধারহীন তরবারী এবং ছোট ছোট তীর দিয়ে আমাদের সাথে কি যুদ্ধ করবে ?'

হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহু আনহু জবাব দিলেন, "আমার তরবারী দেখলে অবশ্যই মনে হবে যে, কিছুই নয়। কিন্তু তার তীক্ষ্ণতা সম্পর্কে আমার পুরো আস্থা আছে। তীরের কথা মনে রেখো, আগুনের ফুলকি ছোট হলেও আগুনই। আর তার চরিত্রই হলো জ্বালানো।"

এ তর্ক-বিতর্কের পর রুস্তম কাজের কথা শুরু করলো এবং তার সালতানাতের শান-শাওকাত ও অসীম সামরিক শক্তির কথা উল্লেখ করে বললো, তোমরা এখনো ফিরে গেলে আমরা তোমাদের পিছু নেব না। বরং তোমাদের সেনাপতি এবং সেনাবাহিনীর সকল অফিসার এবং সিপাহীকে মর্যাদা অনুযায়ী পুরস্কার দেয়া হবে।

হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত আবেগের সাথে জবাবী বক্তৃতা দিলেন এবং অবশেষে তরবারীর হাতলে হাত রেখে বললেন, তোমরা যদি দীনে

www.bjilibrary.com

হক কবুল না করো, তাহলে জিজিয়া প্রদান কবুল করো। নচেৎ আমাদের এবং তোমাদের মধ্যে তরবারীই ফায়সালা করবে।

রুস্তম হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহুর জবাব শুনে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলো এবং তাকে আহ্বান জানিয়ে বললো ঃ

"সূর্যের কসম ! এখন আর তোমাদের সাথে কোনোক্রমেই সন্ধি হবে না। কাল তোমাদের সবাইকে শেষ করে ফেলবো।" হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন, "ঠিক আছে। আল্লাহ যা চান তাই হবে।"

এরপর তিনি নিজের বাহিনীতে ফিরে এলেন এবং হযরত সায়াদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে রুস্তমের অভিপ্রায়ের কথা অবহিত করলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ মুজাহিদদেরকে যুদ্ধের প্রস্তুতির নির্দেশ দিলেন। পরের দিন মুসলমান এবং ইরানীদের মধ্যে কাদেসিয়ায় ঘোরতর লড়াই আরম্ভ হলো। এ যুদ্ধ তিনদিন স্থায়ী হয় এবং ইরানীদের শিক্ষণীয় পরাজয় বরণ করতে হয়।

কাদেসিয়ার পর হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু ইরাকের আরো কয়েকটি যুদ্ধে বাহাদুরী প্রদর্শন করেন। ১৫ হিজরীতে নবনির্মিত বসরাহ শহরের গভর্নর হযরত উতবা রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন গাযওয়ান ইন্তেকাল করেন। আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত মুগিরাহ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে বসরার গভর্নর নিয়োগ করেন। বসরার গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তিনি বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দেন। মিসান ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা তরবারীর মাধ্যমে পদানত করেন। অতপর সেখানে একটি দফতর প্রতিষ্ঠা করেন। এ দফতর থেকে সিপাহীরা বেতন এবং বৃত্তি ও পেনশনধারীরা পেনশন পেতেন। যথাযথভাবে বৃত্তি ও পেনশনধারীদের তালিকা রেজিষ্টারে সংরক্ষণ করা হতো। সে যুগে উম্মে-জামিল নাম্নী এক মহিলা হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন শু'বার কাছে প্রায়ই যাতায়াত করতো। এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সাথে তার সম্পর্ক ছিলো এবং তার স্বামী যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। স্বামীর শাহাদাতের পর আর্থিক সংকটে নিপতিত হয়ে সে বসরার বড় বড় পরিবারে সাহায্যের প্রত্যাশায় আসা যাওয়া করতো। একই উদ্দেশ্যে হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছেও তার গমনাগমন ছিলো। কিন্তু কিছু লোক মহিলাটি সম্পর্কে তাঁর বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করে। এ অভিযোগ পেয়ে হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত আবু মূসা আশয়ারী রাদিয়াল্লাহ আনহুকে ডেকে পাঠান এবং তাঁকে হযরত মুগিরা বিন শু'বা রাদিয়াল্লাহ আনহুর স্থলে বসরার গভর্নর নিয়োগ করেন। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু এ সময় তার মাধ্যমে একটি চিঠি প্রেরণ করেন। এছাড়া

www.bjilibrary.com

মুগিরাহকে সত্বর মদীনা পাঠিয়ে দেয়ার নির্দেশও প্রদান করেন। সে চিঠিতে হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহুকে লিখেছিলেন ঃ

"আমি একটি দুঃসংবাদ পেয়েছি। আবু মূসাকে বসরার গভর্নর নিয়োগ করে প্রেরণ করছি। তাঁকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে অবিলম্বে মদীনা পৌছবে।"

হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু আমীরুল মু'মিনীনের নির্দেশ পালন করলেন এবং বসরার শাসনভার হযরত আবু মূসা আশয়ারী রাদিয়াল্লাহ আনহুর ওপর অর্পণ করে মদীনা মুনাওয়ারায় এসে পৌছলেন। আমীরুল মু'মিনীন তাঁর ওপর আরোপিত অপবাদ যাচাই বা তাহকীক করলেন। কিন্তু সাক্ষ্য-প্রমাণে এ অপবাদ প্রমাণিত হলো না। তাঁর অপবাদ মুক্তির ফলে আমীরুল মু'মিনীন খুব খুশী হলেন। কিন্তু তিনি দ্বিতীয়বার হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহুকে বসরার গভর্নর নিয়োগ করা সঠিক মনে করলেন না। তবে কিছুদিন পর তিনি তাঁকে হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ইয়াসির রাদিয়াল্লাহ আনহুর স্থলে কুফার গভর্নর নিয়োগ করলেন। ২১ হিজরীর ঘটনা। নাহাওন্দের যুদ্ধও এ সালেই সংঘটিত হয়েছিলো। চরিতকাররা সে যুদ্ধে হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহুর অংশগ্রহণের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। বাস্তবতঃ যুদ্ধটি ছিলো ইয়াজদজরদের শেষ প্রচেষ্টা। সে মুসলমানদেরকে ইরান থেকে বহিষ্কার করতে চেয়েছিলো। এ লক্ষ্যে সে একজন অভিজ্ঞ ইরানী জেনারেল মারদান শাহর নেতৃত্বে দেড় লাখ সৈন্যের বাহিনী যুদ্ধের ময়দানে দাঁড় করিয়ে দেয়। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু ইরানীদের এ বিরাট বাহিনী মোতায়েনের খবর পেলেন এবং স্বয়ং ইরানীদের মুকাবিলায় যেতে চাইলেন। কিন্তু হযরত আলী কাররামুল্লাহ ওয়াজহাহু তাঁকে মদীনা ত্যাগ না করার পরামর্শ দিলেন। দ্বিতীয় কোনো অফিসারের নেতৃত্বে সৈন্য প্রেরণের কথা বললেন। অধিকন্তু তিনি ইয়েমেন, সিরিয়া, কুফা ও বসরার গভর্নরদের নামে নিজ নিজ বাহিনীর এক-তৃতীয়াংশ সৈন্য নাহওন্দের দিকে অগ্রসর হওয়ার ফরমান জারী করতে বললেন। এ নাহাওন্দেই ইরানী বাহিনীর সমাবেশ ঘটেছিলো। আমীরুল মু'মিনীন এ পরামর্শ মেনে নিলেন এবং হযরত নু'মান রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন মুকাররানকে সেনাপতি নিয়োগ করে নাহাওন্দের দিকে যাত্রার নির্দেশ দিলেন। আল্লামা বালাজুরী (র) "ফতহুল বুলদান" গ্রন্থে লিখেছেন, সেই সময়ে তিনি যুদ্ধে যদি নু'মান রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন মুকাররান শহীদ হন তাহলে তাঁর স্থলে হযরত হুজাইফা ইবনুল ইয়ামন রাদিয়াল্লাহ আনহুকে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করার হেদায়াত দিয়েছিলেন। যদি তিনিও শহীদ হন তাহলে জারির রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবদুল্লাহ বাজালী নেতা হবেন। আর যদি তিনিও শহীদ

www.bjilibrary.com

হন তাহলে মুগিরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন শু'বা সেনাপতি হবেন বলে হেদায়েতে উল্লেখ ছিলো।

ইসলামী বাহিনী নাহাওন্দ থেকে কয়েক মাইল দূরে "আসপদহান" নামক স্থানে তাঁবু ফেললো। সেখানেই হযরত নু'মান রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন মুকাররান মারদান শাহর একটি চিঠি পেলেন। চিঠিতে আলোচনার জন্য দূত পাঠানোর অনুরোধ জানালো। হযরত নু'মান রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন শু'বাকে দূত হিসেবে প্রেরণ করলেন। কেননা এর পূর্বে তিনি কাদেসিয়াতে এ দায়িত্ব সুন্দরভাবে পালন করেছিলেন। তাঁর যাওয়ার আগেই মারদান শাহ সাড়ম্বরে দরবার সাজালো। নিজে মুকুট পরে সিংহাসনে বসলো এবং তার ডাইনে এবং বামে বিভিন্ন স্থানের আমীর ও যুবরাজ আড়ম্বরপূর্ণ পোশাক পরিধান এবং হাতে সোনার কাঁকন পরে বসে গেলো। তাদের পিছনে বহুদূর পর্যন্ত সশস্ত্র সৈন্যরা কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ালো। তাদের চমকদার নাঙ্গা তলোয়ার চোখ ঝলসে দিচ্ছিলো। হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত সাধারণ পোশাক পরিহিত অবস্থায় সোজা দরবারে ঢুকে সামনের দিকে অগ্রসর হলেন। রাস্তার দরবারীরা তাকে বাধা দিতে চাইলে তিনি বললেন, দূতদের সাথে এ আচরণ করা ঠিক নয়। দরবারীরা রাস্তা থেকে সরে দাঁড়ালে তিনি এদিক ওদিক লক্ষ্য না করে মারদান শাহর সামনে গিয়ে বসলেন।

মারদান শাহর দোভাষীর মাধ্যমে আলোচনা শুরু করলো। সে বললো, তোমরা হলে আরব জাতি। আর আরব জাতির মতো ভুখানাঙ্গা, বদবখত এবং অপবিত্র জাতি আর ভূপৃষ্ঠে নেই। আমার সিংহাসনের চারপাশে যারা দাঁড়িয়ে আছে তারা কবে তোমাদেরকে খতম করে দিতো। কিন্তু তোমরা এত নীচু যে, তাদের তীর তোমাদের অপবিত্র শরীর ভেদ করুক তা আমার পসন্দনীয় নয়। এখনও যদি তোমরা এখান থেকে ফিরে যাও তাহলে আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবো। নচেৎ তোমাদেরকে শিক্ষণীয় পরিণাম ভোগ করতে হবে।

হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহু আনহু মারদান শাহর দর্পপূর্ণ বক্তৃতায় মোটেই ভীত না হয়ে তার চোখে চোখ রেখে বললেন, তোমার বর্ণনামত এক যুগে অবশ্যই আমরা নীচ ছিলাম। কিন্তু শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবির্ভূত হয়ে আমাদেরকে হেদায়াতের পথ দেখিয়েছেন এবং আমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পাল্টে দিয়েছেন। এখন আমাদের জন্য ময়দান পরিষ্কার। যুদ্ধের ময়দানে আমাদের লাশের স্তূপ না হওয়া পর্যন্ত আমরা তোমাদের দেশ ছেড়ে যেতে পারি না। মোটকথা আলোচনা ব্যর্থ হলো এবং উভয় পক্ষের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো। এক রাওয়ায়েত অনুযায়ী এ যুদ্ধে হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলামী বাহিনীর ডান দিকের অফিসার ছিলেন। যদিও

www.bjilibrary.com

ইসলামী বাহিনীর সভাপতি হযরত নু'মান রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন মুকাররান যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন তবুও মুসলমানদের ধৈর্য ও স্থৈর্য মোটেই ভাটা পড়েনি। তারা ইরানীদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। এ যুদ্ধের পর ইরানীরা আর কখনও উঠে দাঁড়াতে পারেনি। এজন্য আরবরা এ বিজয়ের নাম "বিজয়সমূহের বিজয়" নামে আখ্যায়িত করেছে। হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন শু'বার গোলাম আবু লু'লু ফিরোজ এ যুদ্ধে গ্রেফতার হয়েছিলো। উল্লেখ্য যে, এ আবু লু'লুর হাতেই হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু শহীদ হন। হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু কিছুদিন পর প্রত্যহ দু' দিরহাম খিরাজ প্রদানের শর্তে তাকে আযাদ করে দিয়েছিলেন। নাহাওন্দ যুদ্ধের পর ইরানের ওপর অভিযান পরিচালিত হয়। আল্লামা বালাজুরীর (র) বর্ণনা অনুযায়ী হামদান বিজয়ের দায়িত্ব হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহুর ওপরই অর্পিত হয়েছিলো। তিনি অগ্রসর হয়ে হামদান ঘিরে ফেললেন। হামদানবাসী হিম্মত হারিয়ে ফেললো এবং সন্ধির আবেদন জানালো। হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু আবেদন মঞ্জুর করলেন। [কতিপয় ঐতিহাসিক লিখেছেন হযরত নঈম রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন মুকাররান হামদান জয় করেছিলেন]।

উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহুকে কুফার গভর্নর নিয়োগ করেছিলেন। তিনি কুফা পৌঁছে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। আমীরুল মু'মিনীন তাঁকে একটি চিঠি পাঠালেন। চিঠিতে তিনি নগরীর কবিদেরকে ডেকে জাহেলী যুগ ও ইসলামী কালের কবিতা শুনাতে বললেন এবং তাদের অবস্থা লিখে পাঠানোর নির্দেশ দিলেন। এ চিঠি প্রাপ্তির পর তিনি সকল কবিকে একত্রিত করলেন। যখন প্রখ্যাত কবি লবিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন রাবিয়াকে তাঁর কবিতা শুনাতে বলা হলো, তখন তিনি বললেন, সূরা আল বাকারা এবং সূরা আলে ইমরান প্রাপ্তির পর কবিতা এবং কাব্যের প্রতি তাঁর আর কোনো আকর্ষণ থাকেনি। এরপর হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু অন্য একজন কবি আগলাব আজলীকে তাঁর কবিতা শুনাতে বললেন। সে বললো, যুদ্ধের কবিতা বলবো, না কাসিদাহ শুনাবো ? আমার কাছে সব ধরনের কবিতাই বর্তমান আছে। দু' কবির জবাব সম্পর্কে হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুকে অবহিত করা হলো। তিনি হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহুকে লিখলেন, আগলাবের বেতন ৫শ দিরহাম কমিয়ে লবিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর বেতন বাড়িয়ে দাও।" আমীরুল মু'মিনীনের এ নির্দেশে আগলাব অত্যন্ত ব্যথিত হলো এবং সে খেলাফতের দরবারে উপস্থিত হয়ে নির্দেশ পালনের প্রতিদান সম্পর্কে ফরিয়াদ জানালো। সে বললো, নির্দেশ পালনের জন্য আপনি আমার বেতন কমিয়ে দিয়েছেন। এতে হযরত

www.bjilibrary.com

ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে পুনর্বিবেচনা করলেন এবং হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে লিখলেন, আগলাবের বেতন পুনর্বহাল করো। অবশ্য লবিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ধিত বেতন ঠিক রেখো।

ঐতিহাসিকগণ সাধারণভাবে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজের খেলাফতকালে হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে প্রথমে বসরার ও পরে কুফার গভর্নর বানিয়েছিলেন। এ পদে তিনি শাহাদাত পর্যন্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু হাফিজ ইবনে হাজর (র) "আল ইসাবাহ" গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার তাকে বাহরাইনের গভর্নরও নিয়োগ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি এক চিত্তাকর্ষক কাহিনী বর্ণনা করেছেন। কাহিনীটি হলো ঃ বাহরাইনবাসী কয়েকটি কারণে তাঁর প্রতি বিরূপ ভাবাপন্ন হয়ে পড়েছিলো। এজন্যে তারা দরবারে খেলাফতে অভিযোগ দায়ের করলো। সেখানকার এক জমিদার এক লাখ পরিমাণ অর্থ জমা করে হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিদমতে পেশ করলো এবং বললো, মুগিরা রাদিয়াল্লাহু আনহু এ পরিমাণ অর্থ সরকারী রাজস্ব থেকে আত্মসাৎ করে আমার তহবিলে দিয়েছিল। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বরখাস্ত করলেন এবং মদীনা মুনাওয়ারায় ডেকে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। বাহরাইনবাসী হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে যে অপবাদ দিয়েছিলো তা ছিলো সম্পূর্ণ বানোয়াট। কিন্তু তারা তাঁর বিরুদ্ধে কয়েকটি মিথ্যা সাক্ষী পেশ করলো। হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি তাঁর বিরুদ্ধে কৃত ষড়যন্ত্রের গভীরে পৌঁছলেন এবং সাথে সাথে বললেন, তিনি দু' লাখ জমা করেছিলেন। এক লাখ সে জমিদার হজম করে ফেলেছে। একথা শুনে জমিদারের বুদ্ধি চুপসে গেলো। সে হলফ করে নিজের সাফাই পেশ করলো। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু সমগ্র ব্যাপারটি অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করলেন। এতে জানা গেলো যে, হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে দুর্নাম আরোপের জন্যেই এসব করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তিনি নির্দোষ ছিলেন। এ সত্ত্বেও তিনি হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি দু' লাখ আত্মসাতের স্বীকৃতি কেনো দিয়েছিলে? তিনি আরজ করলেন, আমীরুল মু'মিনন ! তারা আমার প্রতি অপবাদ আরোপ করেছিলো। তাদের মিথ্যার চক্রান্ত ফাঁস করার জন্যে এছাড়া আমার আর কোনো গত্যন্তর ছিলো না।

২৪ হিজরীর মুহররম মাসের শুরুতে আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু আবু লু'লু ফিরোজের আঘাতে আহত হয়ে শাহাদাত প্রাপ্ত হন এবং হযরত ওসমান জুন্নুরাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু খেলাফাতের দায়িত্ব

www.bjilibrary.com

লাভ করেন। সে সময় হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন শু'বা কুফার গভর্নর ছিলেন। আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহু অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধন এবং বিভিন্ন প্রদেশে নতুন গভর্নর নিয়োগ করেন। তিনি হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন শু'বাকে বরখাস্ত করে তার স্থলে ইরাক বিজয়ী সায়াদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবি ওয়াক্কাসকে (এছাড়াও তিনি আশারায়ে মুবাশশারাহ ছিলেন) কুফার গভর্নর নিয়োগ করেন। কতিপয় নেতৃস্থানীয় চরিতকার লিখেছেন বরখাস্তের পর হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু আর্মেনিয়া চলে যান এবং সেখানে কিছুদিন অবস্থান করে মদীনা মুনাওয়ারাহ ফিরে আসেন। নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা অবশ্য ব্যাখ্যা করেন যে, হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু কোনো উদ্দেশ্যে আর্মেনিয়া গমন করেছিলেন। বিভিন্ন কার্যকারণে জানা যায় যে, হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহু কর্তৃক প্রেরিত বাহিনীতে যোগ দিয়ে তিনি আর্মেনিয়া গিয়েছিলেন। তিনি আর্মেনীয়দের বিদ্রোহ দমনার্থে এ বাহিনী প্রেরণ করেন। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুর শাহাদাতের ফায়দা উঠিয়ে তারা খিরাজ আদায় বন্ধ করে দিয়েছিলো। সহীহ আল বুখারীতে হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন মালিক থেকে বর্ণিত এক হাদীসে জানা যায়, হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহ আনহুকে আর্মেনিয়া অভিযানের নেতা বানিয়েছিলেন। ধারণা করা হয় যে, হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহুও জিহাদের জন্যে আর্মেনিয়া গমন করেন এবং অভিযানে সফলতার পর মদীনা মুনাওয়ারা ফিরে আসেন। এরপর তিনি হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহুর খেলাফতকালে নির্জনতত্ব অবলম্বন করেন। জনগণ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকতেন এবং বেশীর ভাগ সময় মসজিদে কাটাতেন। ৩৫ হিজরীর শেষের দিকে বিশৃংখলাকারী বিদ্রোহীরা আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহুর গৃহ অবরোধ এবং চরম দুর্ব্যবহার শুরু করে। হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন শু'বা যদিও মনে-প্রাণে আমীরুল মু'মিনীনের সমর্থক ছিলেন। কিন্তু বাস্তবত কিছু করার ব্যাপারে অক্ষম ছিলেন। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে বর্ণিত আছে, অবরোধ চলাকালে একদিন তিনি আমীরুল মু'মিনীনের খিদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন ঃ

"আমীরুল মু'মিনীন ! আপনি সাধারণের বরহক নেতা ! আর আপনি এ কঠিন অবস্থার সম্মুখীন। এ থেকে পরিত্রাণের জন্যে আমি তিনটি প্রস্তাব পেশ করছি। এর মধ্যে যে কোনো একটি গ্রহণ করুন। অবরোধকারীদের সাথে যুদ্ধ করুন। আপনার সমর্থক এবং জীবন উৎসর্গকারীদের একটি শক্তিশালী দল এখানে বর্তমান আছে। আপনি তাদের সহ বের হোন এবং বিদ্রোহীদেরকে শক্তিপ্রয়োগ করে বের করে দিন। আপনি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন এবং

অবরোধকারীরা অন্যায় বা অসত্যের সমর্থক। সাধারণ মানুষ সত্যের বা হকের সমর্থন করবে।

এ প্রস্তাব যদি আপনি অনুমোদন না করেন, তাহলে প্রাচীর ভেঙ্গে দ্বিতীয় আরেকটি দরযা বের করুন এবং সে দরযা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যান। সেখানে আপনি উট তৈরি পাবেন। তাতে চড়ে মক্কা মুয়াজ্জামা চলে যান। সেখানে তারা যুদ্ধ করতে পারবে না। কারণ, সেখানে আল্লাহর হেরেম শরীফ রয়েছে।

তৃতীয় প্রস্তাব হলো, "আপনি সিরিয়া চলে যান। সেখানকার মানুষ বিশ্বাসঘাতক নয় এবং সেখানে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহু বর্তমানে আছেন।"

হযরত ওসমান বললেন ঃ

"বাইরে বেরিয়ে আমি যুদ্ধ করতে চাই না। এতে উম্মাহর মধ্যে হত্যাকাণ্ডের ভিত্তি স্থাপিত হবে। আমি এর ভিত্তিস্থাপন করতে চাই না। যদি মক্কা মুয়াজ্জামাতে চলে যাই, তাহলেও তারা যে কা'বা শরীফের অমর্যাদা এবং খুন খারাবি থেকে বিরত থাকবে এমন আশা নেই। আর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী মুতাবিক সে ব্যক্তি হতে চাই না, যে মক্কা মুয়াজ্জামার অমর্যাদার কারণ হবে। সিরিয়া গমন প্রশ্নে ওজর হলো, দারুল হিজরত এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিবেশীদেরকে পরিত্যাগ করা আমার পক্ষে অসহনীয় ব্যাপার।

পবিত্র আত্মা আমীরুল মু'মিন রাদিয়াল্লাহ আনহুর জবাব শুনে হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু চুপ মেরে গেলেন। কিন্তু আফসোস যে, হতভাগা বিদ্রোহীরা আমীরুল মু'মিনীন রাদিয়াল্লাহ আনহুর পবিত্র নফস ও উম্মার শুভাকাংখার কদর করেনি এবং ৩৫ হিজরীর ১৮ই জিলহাজ্জ প্রাচীর টপকে নৃশংসভাবে তাঁকে শহীদ করে ফেলে। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

হযরত ওসমান জুন্নুরাইন রাদিয়াল্লাহ আনহুর শাহাদাতের পর হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজাহাহু রাদিয়াল্লাহ আনহু খেলাফাতের দায়িত্বে সমাসীন হন। হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু প্রথম দিকে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর সমর্থক এবং পক্ষে ছিলেন। তিনি আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর খিদমতে উপস্থিত হয়ে অত্যন্ত ইখলাসের সাথে পরামর্শ দিলেন ঃ

"হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনার আনুগত্য এবং শুভ কামনা আমার ওপর ফরয এবং মানুষের মধ্যে আপনিই উত্তম ও সঠিক হিসেবে অবশিষ্ট রয়েছেন। বর্তমান দিয়ে ভবিষ্যত অনুমান করা যায়। আজ হারানো অর্থই আগামীকাল খোয়ানো। মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহু, আবদুল্লাহ বিন আমের রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহু কর্তৃক নিয়োগকৃত

www.bjilibrary.com

অন্যান্য গভর্নরকে তাঁদের পদে বহাল রাখুন। অন্ততঃ তাঁদের বাইয়াত ও আনুগত্য লাভ পর্যন্ত এ কাজ করুন। এরপর যাঁকে ইচ্ছা বরখাস্ত এবং যাঁকে ইচ্ছা বহাল রাখবেন।"

হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহুর পরামর্শ গ্রহণ করলেন না এবং বললেন ঃ "দীনের ব্যাপারে আমি চাটুকারিতা ও মুনাফেকীর প্রবক্তা নই।"

হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন ঃ "আপনি যদি আমার পরামর্শ না মানেন, তাহলে যাকে ইচ্ছা বরখাস্ত করুন। তবে, মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহুকে সিরিয়ার গভর্নর হিসেবে বহাল রাখুন। কেননা তিনি বাহাদুর মানুষ। ইয়েমেন ও সিরিয়ার জনগণ তাঁকে মান্য করে। তাকে বহাল রাখার প্রশ্নে আপনি এ দলীল পেশ করুন যে, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন খাত্তাব তাকে সিরিয়ার গভর্নর নিয়োগ করেছিলেন।"

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন, "না, খোদার কসম ! আমি মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহুকে দু' দিনও থাকতে দিবো না।"

হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু আমীরুল মু'মিনীন রাদিয়াল্লাহ আনহুর জবাব শুনে চুপচাপ চলে গেলেন। এক রাওয়ায়েত অনুসারে দ্বিতীয়দিন তিনি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর ইচ্ছানুসারে নিজের মত প্রকাশ করলেন। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে তিনি পূর্বের দিন যে কথা ব্যক্ত করেছিলেন দ্বিতীয় দিনও একই কথার পুনরুক্তি করলেন। কেননা তিনি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর হিকমতের সাথে ঐকমত্য পোষণ করতেন না। এজন্যে তিনি নীরবে মক্কা মুয়াজ্জমা চলে গেলেন এবং কিছুদিন পর সেখান থেকে তায়েফে গিয়ে সেখানকার বাসিন্দা হয়ে গেলেন। তিনি হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর খেলাফতকালে (৩৫-৪০ হিজরী) সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে কাটান। উষ্ট্র এবং সিফফীনের যুদ্ধে তিনি কোনো পক্ষই অবলম্বন করেননি।

আবু হানিফা দিনাওয়ারী "আল আখবারুত তাওয়াল" গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহুর মধ্যে সালিসের চুক্তি হলো। হযরত আবু মূসা আশয়ারী রাদিয়াল্লাহ আনহু (হযরত আলীর সালিস) এবং হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস (আমীর মুয়াবিয়ার সালিস) দুমাতাল জানদালে একত্রিত হলেন। এ সময় হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু তায়েফ থেকে দুমাতাল জানদাল পৌছলেন এবং সালিসীদের ফায়সালার অপেক্ষা করতে থাকলেন। যখন ফায়সালায় বিলম্ব হলো তখন তিনি দুমাতাল জানদাল থেকে দামেস্ক গেলেন এবং আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ

www.bjilibrary.com

আনহুর সাথে সাক্ষাত করলেন। আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে বললেন, আপনি নিজের মত অনুসারে আমাকে পরামর্শ দিন।

হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন ঃ "আমি যদি আপনার পরামর্শদানকারী হতাম তাহলে আপনার সাথে থেকে যুদ্ধ করতাম। অবশ্য উভয় সালিসের অবস্থা যদি আপনি জানতে চান তাহলে বলতে পারি।"

আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন ঃ "অবশ্যই বলুন" হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন ঃ আমি আবু মূসা আশয়ারী রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে নির্জনে মিলিত হয়েছি এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করেছি যে, সে ব্যক্তির ব্যাপারে আপনার কি রায় যিনি পক্ষপাতহীন এবং রক্তারক্তি ও হত্যাকাণ্ডের প্রতি ঘৃণার কারণে গৃহে বসে রয়েছেন।"

তিনি জবাব দিলেন ঃ "এ ধরনের ব্যক্তিরা উত্তম মানুষ। তাঁদের পিঠে নিজের ভাইয়ের রক্তের দাগ নেই এবং তাদের ওপর নিজের ভাইয়ের সম্পদের বোঝা নেই।"

অতপর আমি আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনুল আসের সাথে পৃথকভাবে মিলিত হয়েছি এবং তাকে জিজ্ঞেস করেছি ঃ

"হে আবু আবদুল্লাহ ! সেই ব্যক্তির ব্যাপারে আপনার কি ধারণা, যিনি এসব যুদ্ধ থেকে বিরত থেকেছেন।"

তিনি জবাব দিলেন ঃ "এরা হলো নরাধম। তারা সত্যেরও সমর্থক নয়। আবার বাতিলেরও বন্ধু নয়।

আমার ধারণা, আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজের সাথীকে (হযরত আলী) খেলাফত থেকে সরে দাঁড়াতে বলবে এবং এমন এক ব্যক্তিকে মনোনীত করবেন যিনি এসব যুদ্ধে অংশ নেননি। সম্ভবতঃ তিনি আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মনোনয়ন দেবেন। রইলো আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনুল আসের কথা। হতে পারে সে নিজেকে অথবা নিজের পুত্র আবদুল্লাহকে খেলাফতের হকদার হিসেবে ঘোষণা দিতে পারে।

আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর কথায় খুব প্রভাবিত হলেন এবং তার মত সঠিক বলে উল্লেখ করলেন। কিন্তু তিনি একজন ধৈর্যশীল ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। সে সময় তিনি সালিসীতে কোনো পরিবর্তন সাধন ঠিক মনে করলেন না এবং হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনুল আসকে চুক্তি অনুসারে নিজের সালিস হিসেবে বহালই রাখলেন। আফসোস ! সালিসীতে সন্তোষজনক কোনো ফল লাভ হলো না এবং হযরত

www.bjilibrary.com

আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহুর মধ্যে দ্বন্দ্ব অব্যাহত রইলো। ৪০ হিজরীতে হযরত আলী কাররামুল্লাহু ওয়াজহাহু রাদিয়াল্লাহ্ আনহু আবদুর রহমান বিন মালজাম নামক একজন খারেজীর হাতে শাহাদাতের পেয়ালা পান করলেন। তাঁর পর সাইয়েদেনা হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহ্ আনহু খেলাফতের দায়িত্ব পেলেন। কিন্তু ৬ মাস পর পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ্ আনহুর পক্ষে খেলাফত থেকে সরে দাঁড়ালেন। এভাবে ৪১ হিজরীতে আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ্ আনহু কারোর অংশগ্রহণ ছাড়াই ইসলামী বিশ্বের শাসক বনে গেলেন।

হযরত আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ্ আনহু ছিলেন মহান নৃতত্ত্ববিদ এবং দূরদর্শী শাসক। খেলাফতের মসনদে আসীন হওয়ার পর তিনি বিভিন্ন প্রদেশের জন্যে প্রভাবশালী, সুচতুর ও অভিজ্ঞ শাসকের প্রয়োজন অনুভব করতে থাকেন। এজন্যে তিনি এমন সব লোক বাছাই করলেন যারা বুদ্ধির দূরদর্শিতা এবং রাজনৈতিক বিচক্ষণতার দিক থেকে তুলনাহীন ছিলেন। তিনি হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ্ আনহু বিন শু'বার যোগ্যতা সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিবহাল ছিলেন। এজন্যে তিনি তাঁকে কুফার মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত করেন। কুফার নেতৃত্বে আসীন হওয়ার পর তিনি নিজের দায়িত্ব অত্যন্ত সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দেন এবং খুব বিচক্ষণতার সাথে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের গ্রন্থি উন্মোচন করেন। সর্বপ্রথম তিনি শাবিব বিন বাজরাহ খারেজীর ফেতনার সম্মুখীন হন। এ ব্যক্তি হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুকে শহীদ করার ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিলো। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর শাহাদাতের পর আমীর মুয়াবিয়ারাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে গিয়ে বললো, সে এবং ইবনে মালজাম একত্রে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ্ আনহুকে হত্যা করেছে। এজন্যে সে পুরস্কার প্রাপ্তির যোগ্য। আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ্ আনহু তার কথা শুনে বাড়ী চলে গেলেন এবং আশজা' গোত্রকে বলে পাঠালেন যে, শাবিবকে অবিলম্বে শহর থেকে বের করে দাও নচেৎ তোমাদের অমঙ্গল হবে। [এ সময় আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহু কুফা অবস্থান করছিলেন] শাবিবের কানে আমীর মুয়াবিয়ার নির্দেশ গেলো এবং সে ফেরার হয়ে গেলো। এরপর সে রাতে তার অবস্থান স্থল থেকে বের হতো এবং যাকেই সামনে পেতো তাকেই হত্যা করে পালিয়ে যেতো। হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ্ আনহু কুফার ইমারতি বুঝে নেয়ার পর পরই খালিদ বিন আরফতাহকে একটি বাহিনী দিয়ে শাবিবকে উৎখাতের জন্যে নিয়োগ করলেন। খালিদ শাবিব এবং তার সাথীদেরকে ঘিরে ফেললো। তাদের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো। কিন্তু একে একে সবাই মারা গেলো।

কুফার ইমারাতকালে যিয়াদ বিন আবিহকে আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহুর অনুগত বানানো হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহুর এক বিরাট সাফল্য।

www.bjilibrary.com

যিয়াদ আরবের একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি হিসেবে পরিচিতি ছিলেন। তিনি আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কট্টর বিরোধী এবং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষ থেকে পারস্যের গভর্নর নিয়োগ প্রাপ্ত হন। সাইয়েদেনা হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু খেলাফত থেকে সরে দাঁড়ানোর পর যদিও আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু সমগ্র ইসলামী দুনিয়ার খলীফা হয়েছিলেন তবুও যিয়াদ তার হাতে বাইয়াত করতে অস্বীকার করেন। হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে অনুগত বানানোর জন্যে বুছর বিন আরতাতকে দায়িত্ব দেন। কিন্তু তিনি তাতে ব্যর্থ হন। এরপর আমীর মুয়াবিয়া তার ব্যাপারে খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। একবার হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহু আনহু তার সাথে সাক্ষাতের জন্যে দামেস্ক গেলেন। আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন যিয়াদের ব্যাপারে তার আশংকার কথা ব্যক্ত করলেন।

হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, যিয়াদকে অনুগত বানানোর কাজ আমার ওপর ছেড়ে দিন।

এরপর তিনি যিয়াদের কাছে গেলেন। তার সাথে কথা-বার্তা বললেন। তাকে বুঝালেন। তাকে বললেন, হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু খেলাফত থেকে সরে দাঁড়ানোর পর সমগ্র ইসলামী বিশ্ব আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের স্বীকৃতি দিয়েছে। এখন তোমার তাঁর আনুগত্য না করাটা কোনো যুক্তিযুক্ত ব্যাপার হতে পারে না। বরং তুমি তাঁর সাথে আপোষ করে ফেলো। তিনি অবশ্যই তোমার সাথে ভালো ব্যবহার করবেন।

যিয়াদ হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরামর্শ মেনে নিলেন এবং তাকে বললেন, আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে নিরাপত্তা প্রদানমূলক লিখিত চিঠি প্রেরণ করলে সে তার কাছে গমন করবে। হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহু আনহু আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে গেলেন এবং যিয়াদের সাথে তাঁর আলোচনার কথা অবহিত করলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ লিখিতভাবে তাকে নিরাপত্তামূলক পত্র পাঠালেন। এ পত্র পেয়েই যিয়াদ আমীর মুয়াবিয়ার খিদমতে উপস্থিত হলো এবং তাঁর বাইয়াত করলো। অতপর সে তার কাছে কুফায় বসবাসের অনুমতি প্রার্থনা করলো। তিনি অনুমতি দিলেন। কিন্তু যিয়াদ এবং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর অন্যান্য সমর্থক যেমন হাজার রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন আদী, সুলাইমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন ছারদুল খাজায়ী, শিশ বিন রবয়ী প্রমুখদের ব্যাপারে হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সতর্ক থাকার জন্যে লিখে পাঠালেন। এটা ৪২ হিজরীর ঘটনা।

হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহু আনহু ৪১ হিজরীতে কুফার আমীর নিযুক্ত হয়ে আসেন। এ সময় কুফাবাসী তিন ভাগে বিভক্ত ছিলো।

www.bjilibrary.com

১. বনু উমাইয়ার সমর্থক : তারা সত্যিকারভাবে আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর অনুগত ছিলো।

২. শিয়ানে আলী : তারা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তার সন্তানদেরকেই খেলাফতের একমাত্র হকদার মনে করতো। তাদের কাছে হযরত মুয়াবিয়া যদিও বৈধ খলিফা ছিলেন না। কিন্তু সময়ের মুসলিহাতের কারণে তারা আনুগত্যের মাথা নত করে নিয়েছিলো।

৩. খাওয়ারেজ : তারা বনি উমাইয়া এবং শিয়ানে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু উভয়েরই বিরোধী ছিলো এবং তাদেরকে দীন থেকে খারিজ বলে মনে করতো।

হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহু আনহু কুফা পৌছে নমনীয় কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করলেন। তিনি কোনো ব্যক্তির সাথে তার আকীদা-বিশ্বাস অথবা রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণার ভিত্তিতে তর্ক-বিতর্ক করতেন না। অবশ্য কেউ শান্তি-শৃংখলায় বিঘ্ন সৃষ্টির চেষ্টা করলে সর্ব শক্তি দিয়ে তাতে বাধা দিতেন। মানুষজন এসে তাঁকে বলতো, অমুক ব্যক্তি খারেজী আকীদা রাখে অথবা শিয়া মতাবলম্বী। তিনি জবাবে বলতেন, "এটা আল্লাহর ইচ্ছা। কারণ, তার বান্দার ধ্যান-ধারণায় মতদ্বৈধতা রয়েছে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক স্বয়ং এসব মতদ্বৈধতার ফায়সালা করবেন।"

হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর নমনীয় কর্মপদ্ধতি সত্ত্বেও খারেজীরা নিশ্চিন্তে বসে রইলো না। ৪৩ হিজরীতে তারা মুসতাওরাদ বিন আলকামার নেতৃত্বে এক বিরাট ফেতনার সৃষ্টি করলো। ঐতিহাসিকরা লিখেছেন, তারা হাইয়ান বিন জবিয়ানের বাড়ীতে একত্রিত হলো। এ বৈঠকে তারা ঈদুল ফিতরের (৪৩ হিজরী) দিন সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের পরিকল্পনার কথা অবহিত হলেন এবং তাঁর নির্দেশে হাইয়ান বিন জবিয়ানের গৃহ অবরোধ করা হলো। মুসতাওরাদ এবং তার সাথীরা পালিয়ে গেলো এবং অবশিষ্টরা গ্রেফতার হলো।

মুসতাওরাদ কুফা থেকে বের হয়ে সমর্থকদেরকে একত্রিত করলো এবং বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উড়িয়ে দিলো। হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহু আনহু কুফাবাসীদেরকে একত্রিত করে খারেজীদের বিরুদ্ধে আবেগময় বক্তৃতা করলেন এবং এ ফেতনা নির্মূলের জন্যে তাদের সাহায্য চাইলেন। অতপর তিনি এমন এক কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করলেন, যাতে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর সমর্থকরা খারেজীদের উৎখাতে বেশী তৎপর হয়ে পড়লো এবং তারা বেশ কয়েকটি সংঘর্ষের পর মুসতাওরাদ এবং তার অধিকাংশ সাথীকে নির্মূল করে সাময়িকভাবে এ ফেতনার অবসান ঘটায়।

www.bjilibrary.com

হযরত হাজার রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আদি কুফার হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর অন্যতম প্রভাবশালী সমর্থক ছিলেন। তাঁর স্পষ্টবাদিতা হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহুর দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ সত্ত্বেও তিনি তাঁর তৎপরতা উপেক্ষা করে চলে ছিলেন। একদিন হযরত মুগিরা খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় হাজার রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আদি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং উচ্চস্বরে বললেন ঃ

"ওহে ! তুমি আমাদের বৃত্তি বন্ধ করে দিয়েছো। এটা তোমার অনধিকার চর্চা। তুমি আমাদের বৃত্তি চালু করো এবং আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর বিরুদ্ধে কোনো কথা বলো না।"

এ কথায় দু-তৃতীয়াংশ নামাযী দাঁড়িয়ে গেলো এবং বলতে লাগলো হাজার ঠিকই বলেছে। আমাদের বৃত্তি চালু করো।

হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু চুপচাপ মিম্বর থেকে নেমে এলেন। এমনভাবে মিম্বর থেকে নেমে আসা তাঁর সাথীদের পসন্দ হলো না। তারা বললো, আপনার নরম ব্যবহারের কারণে হাজার রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আদী খুব সাহসী হয়ে গেছে। এ ধরনের নরম ব্যবহারের ফলে সরকার ভীতি বিপর্যস্ত হবে। আমীরুল মু'মিনীন আপনার এ সীমাহীন শরীফ ব্যবহারের কথা জানতে পারলে তিনিও তা পসন্দ করবেন না।

হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু জবাব দিলেন ঃ "তোমরা বুঝতে পারোনি। আমি তো হাজারকে হত্যা করেছি। আমার নরম ব্যবহারের ফলে সে সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেছে। আমার পর যিনি আমীর হয়ে আসবেন, সে আমলেও সে একই ধরনের ভূমিকা গ্রহণ করবে। আর সে আমীর তাকে হত্যা না করে ছাড়বে না। আমি নিজের হাত হাজার এবং তার সাথীদের রক্তে রঞ্জিত করে তাকে সৌভাগ্যবান ও নিজেকে হতভাগা করতে চাই না।"

এ ঘটনার কিছুদিন পরই কুফায় মহামারী আকারে প্লেগ দেখা দিলো। হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহুও এ রোগে আক্রান্ত হলেন এবং মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন (৫০ হিজরী)। এ সময় তার বয়স ছিলো ৭০ বছর। তিনি উরওয়াহ (র) হামজা (র) এবং উক্কার (র) নামক তিন পুত্র রেখে যান।

হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মেধাবী দূরদর্শী ও রাজনৈতিক বিচক্ষণ সাহাবী রাদিয়াল্লাহ আনহুমদের অন্যতম। ঐতিহাসিকরা তার পক্ষে এবং বিপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। জ্ঞান ও দূরদর্শিতার দিক থেকে তিনি আরবের পহেলা কাতারের লোক ছিলেন এবং নিজের অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার কারণে—"মুগিরাতুর রায়" নামে খ্যাত ছিলেন।

www.bjilibrary.com

"মুসতাদরাকে হাকিমে" উল্লেখ করা হয়েছে যে, কঠিন থেকে কঠিনতর এবং জটিল থেকে জটিলতর সমস্যা সমাধানে তিনি অসাধারণ যোগ্যতা রাখতেন। কোনো বিষয়ে কোনো মত স্থাপন করলে তাই সঠিক বলে প্রতিভাত হতো।

হাফিজ ইবনে হাজার (র) "তাহজিবুত তাহজিব" গ্রন্থে কবিসাহ বিন জাবেরের এ বর্ণনা উল্লেখ করেছেন ঃ দীর্ঘদিন যাবৎ আমি মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে ছিলাম। তাঁর অত্যন্ত বিচক্ষণতা ছিলো। কোনো শহরের ৮টি দরযার কোনোটি দিয়েই চিন্তা-ভাবনা এবং সতর্কতা ছাড়া পার হওয়া অসম্ভব হলেও মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু ৮টি দরযা দিয়েই বের হয়ে যেতেন।

অনেক ঐতিহাসিক লিখেছেন কুফার ইমারাতকালে তিনি একবার দামেস্ক গমন করেন। সে সময় তিনি আমির মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহুকে পরামর্শ স্বরূপ বলেছিলেন, হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহুর শাহাদাতের পর মুসলমানদের মধ্যে সৃষ্ট অনৈক্য এবং রক্তারক্তির ব্যাপারে সকলেই ওয়াকিবহাল। জীবদ্দশাতেই আপনি আপনার পুত্র ইয়াজিদকে উত্তরাধিকার মনোনীত করুন। যাতে আপনার মৃত্যু হলে সে মুসলমানদের আশ্রয়স্থল হতে পারে এবং দেশ শাসনে অনৈক্য ও রক্তারক্তির আশংকা দূর হয়।

আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহু সে সময় এ পরামর্শ গ্রহণে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। কিন্তু কয়েক বছর পর যখন মুগিরাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু ওফাত পেলেন তখন তিনি সে অনুযায়ীই কাজ করেছিলেন।

কতিপয় ঐতিহাসিক উল্লেখ করেছেন যে, বিভিন্ন কারণে আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহুকে কুফার গভর্ণর পদ থেকে বরখাস্ত করার ইচ্ছা পোষণ করতেন। হযরত মুগিরাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁর ইচ্ছার কথা জানতে পেরে পদচ্যুতি থেকে বাচাঁর জন্যে দামেস্ক গিয়ে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহুকে পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং সাথে সাথে পরামর্শের পক্ষে কুফাবাসীকে সম্মত করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। নিসন্দেহে ব্যাপারটির এটি একটি অন্ধকার দিক। পক্ষান্তরে এর উজ্জ্বল দিকও হতে পারে। হযরত মুগিরাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু নেক নিয়তের সাথেই মনে করতেন যে, ইসলামী দুনিয়ার ঐক্য দামেস্কের কেন্দ্রীয় শক্তি অক্ষুণ্ন রাখার মাধ্যমেই সম্ভব। আমির মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহু হঠাৎ করে ওফাত পেলে তাঁর উত্তরাধিকার প্রশ্নে বিবাদ এবং রক্তারক্তির সমূহ আশংকা বিদ্যমান ছিল। ফলে মুসলমানদের শক্তি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। যা হোক. তিনি নিজের মত অনুসারে নেক

www.bjilibrary.com

নিয়তের সাথে এ ধারণা পেশ করেছিলেন। এ পরামর্শ ভুল ছিল না সঠিক ছিল তা ভিন্ন আলোচনার বিষয়।

হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ্ আনহু ৯ বছর কুফার গভর্নর ছিলেন। এ সময়কালে তিনি সবসময় নরম ও আপোষমূলক কর্মনীতি অবলম্বন করেন। খারেজীরা যখন আইন-শৃংখলা লণ্ডভণ্ড করে ফেলেছিলো তখনই কেবল তিনি তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ব্যবহার করেছিলেন।

হযরত হাজার রাদিয়াল্লাহ্ আনহু বিন আদি প্রকাশ্যে সরকার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু তাঁর বিরোধিতা শুধুমাত্র কথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো। এজন্য হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁর বিরুদ্ধে কোনো কঠোর আচরণ করেননি। এ সত্ত্বেও তিনি হযরত হাজার রাদিয়াল্লাহ্ আনহু সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তা অক্ষরে অক্ষরে সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছিলো। তাঁর ইন্তেকালের পর কুফাকে বসরার গভর্নর যিয়াদের অধীন করে দেয়া হয়। যিয়াদ হযরত হাজার রাদিয়াল্লাহ্ আনহুকে গ্রেফতার করে দামেস্ক প্রেরণ করে এবং সেখানেই তাঁকে হত্যা করা হয়।

কুফার ইমারাতকালে হযরত মুগিরা রাদিয়াল্লাহ্ আনহু স্বয়ং বলতেন, আমি কুফাবাসীদের রক্তে নিজের হাত রঞ্জিত করে তাদেরকে ভাগ্যবান এবং নিজেকে হতভাগা বানাতে চাই না। আমি নেককারদেরকে ভালো প্রতিদান দিবো এবং যারা ভুল পথে চলে তাদের ক্ষমা করে দিবো। যারা ভালো কথা বলে তাদের প্রশংসা করবো এবং নাদানদেরকে বুঝাবো। ইত্যবসরে আমি দুনিয়া ত্যাগ করে চলে যাবো। আমার পর কুফাবাসীদেরকে অন্য শাসক যখন শাসন করবে তখন তারা আমাকে খুব স্মরণ করবে।

তাঁর ওফাতের পর কুফার এক শেখ বললেন, খোদার কসম ! পরীক্ষাকালে আমরা তাঁকে উত্তম আমীর হিসেবে পেয়েছি। তিনি নেককারদের প্রশংসাকারী এবং ভুলকারীদের ক্ষমা প্রদর্শনকারী ছিলেন। তিনি ওজরকারীদের ওজর কবুল করতেন।

----

www.bjilibrary.com

হযরত হিশাম রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন আস সাহ্‌ম

বনু সহিম সরদার আস বিন ওয়ায়েল (বিন হাশিম বিন সাঈদ বিন সাহাম বিন আমর বিন হাসিস বিন কা'ব বিন লুব্বী) ধন-সম্পদ এবং প্রভাব-প্রতিপত্তির দিক থেকে মক্কার কুরাইশদের মধ্যে উঁচু মর্যাদায় সমাসীন ছিলেন। আপাতঃ দৃষ্টিতে তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন হলেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মক্কাবাসীকে তাওহীদের দাওয়াত দিলেন তখন তার বুদ্ধিমত্তা অচল হয়ে পড়লো। হক গ্রহণ প্রশ্নে শুধু নিজেই অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলো না বরং অন্যদেরকেও হক ও সত্য গ্রহণ থেকে বিরত রাখার জন্য শক্তিও প্রয়োগ করলো। দুষ্ট প্রকৃতির এ লোকটি কুরআনের আয়াতের প্রতি বিদ্রূপবান নিক্ষেপ করলো। আখেরাতের বিচারকে উপহাসের বস্তুতে পরিণত এবং স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর নিকৃষ্ট ও গরীব হওয়ার অপবাদ আরোপ করলো ঃ "আরে তার কথা রাখ। সে তো একজন গরীব (শিকড়হীন) মানুষ। তার কোনো পুত্র সন্তান নেই। মরে গেলে নাম নেয়ারও কেউ থাকবে না।"

আস বিন ওয়ায়েলের দুর্ভাগ্য এমন যে, শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্তও সে হিদায়াত থেকে বঞ্চিত রয়ে গেলো। কিন্তু স্রষ্টার কুদরাতের বিস্ময়কর ব্যাপার হলো যে, এ হতভাগার দু' পুত্র হিশাম রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু শুধু ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্যই লাভ করেননি, বরং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখনিসৃত মু'মিন খেতাবেও ভূষিত হয়েছিলেন।

হযরত আবু মুয়িত হিশাম রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজের ভাই আমর ইবনুল আস থেকে বয়সে ছোট ছিলেন। তবে বড় ভাইয়ের চেয়েও তার মর্যাদা ছিলো বেশী। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনুল আস পরিখার যুদ্ধের (৫ম হিজরী) পর ঈমান এনেছিলেন। কিন্তু হযরত হিশাম রাদিয়াল্লাহু আনহু সব ধরনের ভয়-ভীতির মুখোমুখি অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়াত প্রাপ্তির একদম প্রথম যুগে তাওহীদের আহ্বানের প্রতি সাড়া দিয়েছিলেন। এমনিভাবে তিনি জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত আসসাবিকুনাল আওয়ালিন দলের একজন সদস্য হিসেবে পরিগণিত হন। চরিতকাররা বর্ণনা করেছেন, তাওহীদের দাওয়াতের প্রথম তিন বছরে যে ১৩৩জন পবিত্র আত্মা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন হযরত হিশাম রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম। এ তিন বছর গোপনভাবে তাবলীগের কাজ চলছিলো। এজন্য

www.bjilibrary.com

মুশরিকরা কোনো বিশেষ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেনি। অবশ্য নবুয়াত প্রাপ্তির আড়াই বছর পর মুশরিকদের একদল কতিপয় মুসলমানকে এক বিজন স্থানে নামায পড়তে দেখে অন্যান্য মুশরিককে হকপন্থীদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে শুরু করে। পরিস্থিতি সঙ্গীন রূপ নিলে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবন উৎসর্গকারী সাহাবীদেরকে নিয়ে আরকাম গৃহে স্থানান্তরিত হন। নবুয়াতের ৪র্থ সালের শুরুতে 'ফাসদা বিমা তু'মারু ওয়া আ'রিজ আনিল মুশরিকিনা' (আল্লাহর নির্দেশ প্রকাশ্যে শুনান এবং মুশরিকদের বিরোধিতার পরওয়া করবেন না)। এ আয়াত নাযিল হলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাওহীদের দাওয়াতের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা দিলেন এবং খোলাখুলিভাবে মানুষদেরকে হকের দিকে ডাকতে শুরু করলেন। সাথে সাথে মুশরিকদের ঘৃণা মিশ্রিত ক্রোধ ফেটে পড়লো এবং তারা মুসলমানদের ওপর সীমাহীন যুলুম-নির্যাতনের তাণ্ডব বইয়ে দিলো। হযরত হিশাম রাদিয়াল্লাহ আনহুও তাঁর মাতা-পিতা এবং খান্দানের অন্যান্যদের নির্যাতনের শিকার হলেন। কয়েক বছর তাঁর ওপর বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন চললো। কিন্তু তিনি হক পথ থেকে সরে দাঁড়ানোর কল্পনাও করেননি। যখন মুসলমানদের ওপর কাফেরদের নির্যাতন সহ্যের বাইরে চলে গেল তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদেরকে হাবশায় হিজরতের নির্দেশ দিলেন। সুতরাং নবুয়াত প্রাপ্তির ৫ বছর পর মুসলমানদের একটি ছোট দল হাবশায় হিজরত করলেন। নবুয়াতের ৬ষ্ঠ বছরের পর একটি বড় কাফেলা হাবশায় রওয়ানা দিলো। হযরত হিশাম রাদিয়াল্লাহ আনহুও এ দলে শামিল হয়ে হাবশা চলে গেলেন। হাবশায় হিজরতকারী একটি দল হযরত জাফর তাইয়ার রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবি তালিবের সাথে ১২/১৩ বছর সেখানেই অবস্থান করেন এবং খায়বার যুদ্ধের (৭ম হিজরীর প্রথম দিকে) ফিরে আসেন। কিন্তু এছাড়াও অনেক মুহাজির হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদীনায় হিজরতের আগে মক্কা প্রত্যাবর্তন করেন। হযরত হিশাম রাদিয়াল্লাহ আনহুও প্রত্যাবর্তনকারী সাহাবীদের দলভুক্ত ছিলেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহ আনহুমকে মদীনায় হিজরতের অনুমতি দিলেন। এ সময় হযরত হিশাম রাদিয়াল্লাহ আনহুও মদীনা গমনের জন্য তৈরি হলেন। পরিবারের লোকজন একথা জেনে তাঁকে বন্দী করলো এবং কঠোর পাহারায় রাখলো। এমনিভাবে ৫/৬ বছর কেটে গেলো। ইত্যবসরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরত করে মদীনা মুনাওয়ারায় তাশরীফ নিলেন। এর মধ্যে বদর, ওহোদ এবং পরিখার যুদ্ধ সংঘটিত হলো। পরিখার যুদ্ধের পর একদিন হযরত হিশাম রাদিয়াল্লাহ আনহু সুযোগ পেয়ে কারাগার থেকে পালিয়ে সংগোপনে মদীনায় পৌছে গেলেন।

www.bjilibrary.com

হযরত হিশাম রাদিয়াল্লাহ আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাজির হলেন। তাঁকে দেখে তিনিও খুব খুশী হলেন। ইমাম হাকিম (র) স্বগ্রন্থ "মুশতাদরাকে" লিখেছেন মদীনা আগমনের পর যত যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো, হযরত হিশাম রাদিয়াল্লাহ আনহু সব যুদ্ধেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহযোদ্ধা হিসেবে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছিলেন এবং প্রত্যেক যুদ্ধেই বাহাদুরীর চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছিলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহুর খেলাফতকালে রোমের কাইসারের সাথে যুদ্ধ শুরু হলো। হযরত হিশাম রাদিয়াল্লাহ আনহু যুদ্ধের আবেগে অস্থির হয়ে পড়লেন এবং সিরিয়া গমনকারী মুজাহিদদের দলে শামিল হলেন। রোমিয়রা দু' তিনটি যুদ্ধে পরাজিত হলো। কাইসার তাযারক এবং কাবকালী নামক দু' প্রখ্যাত রোমীয় জেনারেলকে এক বিরাট বাহিনী দিয়ে মুসলমানদের মুকাবিলায় প্রেরণ করলো। এ বাহিনী আজনাদাইন নামক স্থানে তাঁবু ফেললো। সে সময় ইসলামী বাহিনী সিরিয়ার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলো। তারাও সবাই একত্রিত হয়ে আজনাদাইন এসে উপস্থিত হলো এবং রোমীয় বাহিনীর মুকাবিলায় তাঁবু খাটালো। ১৩ হিজরীর ২৮শে জমাদিউল উলা রোমীয় এবং মুসলমানদের মধ্যে ঘোরতর লড়াই হলো। এ যুদ্ধে হযরত হিশাম রাদিয়াল্লাহ আনহু বীরের হক আদায় করলেন। এক সময় মুসলমানদের মধ্যে সামান্যতম দুর্বলতার ভাব পরিলক্ষিত হলো। ঈমানের আবেগে উদ্বেলিত হযরত হিশাম রাদিয়াল্লাহ আনহু আহ্বান জানিয়ে বললেন, "হে মুসলমানরা ! এ খাতনাহীনরা আমাদের তরবারীর সামনে টিকতে পারে না। আমি যা করি তোমরাও তাই করো।" এ বলে বাহাদুরীর সাথে তরবারী চালাতে চালাতে রোমীয়দের ব্যূহে ঢুকে পড়লেন এবং নিধন করতে করতে তাদের বাহিনীর কেন্দ্রস্থলের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। এ সময় তাঁর মুখ দিয়ে উচ্চারিত হচ্ছিলো ঃ

"হে মুসলমানরা ! আমি আস বিন ওয়ায়েলের পুত্র হিশাম। এসো আমার সাথে এসো। বেহেশত তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। আমার সাথে না এলে তোমরা যেনো বেহেশত থেকে পলায়ন করছো।" যুদ্ধে তিনি জীবন বাজী রেখে বাহাদুরী প্রদর্শন করছিলেন। তাঁর আক্রমণে ভীত হয়ে রোমীয়রা চারদিক থেকে তরবারীর বৃষ্টি বর্ষণ শুরু করলো। এভাবে তিনি শাহাদাতের পেয়ালা পান করে জান্নাতুল ফেরদাউসে গিয়ে উপস্থিত হলেন। হযরত হিশাম রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং তার মত অন্য মুজাহিদদের আত্মদান ও বীরত্বের ফলশ্রুতিতে রোমীয়দের শিক্ষামূলক পরাজয় ঘটলো। ইমাম হাকিম (র), ইবনে আসির (র) এবং বালাজুরী (র) হযরত হিশামের শাহাদাতের এ কাহিনী

www.bjilibrary.com

বর্ণনা করেছেন। ঐতিহাসিক ইবনে হিশাম (র) বলেছেন, হযরত হিশাম রাদিয়াল্লাহ আনহু বীরত্ব প্রদর্শন করতে করতে একটি অপরিসর ঘাঁটিতে শহীদ হন। সে ঘাঁটি শুধুমাত্র একজন মানুষই অতিক্রম করতে পারতো। ঘাঁটির অন্যদিকে কতিপয় মুসলমান রোমীয়দের এক বিরাট বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করছিলেন। তাঁরা তাঁকে সাহায্য করতে চাইছিলেন। কিন্তু হযরত হিশাম রাদিয়াল্লাহ আনহুর লাশের ওপর দিয়ে অতিক্রম করা ছাড়া ঘাঁটির অপর প্রান্তে যাওয়া সম্ভব ছিলো না। হযরত হিশাম রাদিয়াল্লাহ আনহুর বড় ভাই হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস ঘটনাক্রমে সেখানে এসে পড়লেন। তিনি অবস্থা দেখে মুসলমানদের সম্বোধন করে বললেন ঃ

"হে মুসলমানরা ! আল্লাহ পাক আমার ভাইকে শাহাদাতের মর্যাদায় ভূষিত করেছেন এবং তার রূহ নিজের কাছে ডেকে নিয়েছেন। এখানে শুধু তার দেহ রয়েছে। এজন্য তোমরা তার লাশের ওপর দিয়ে অগ্রসর হও।"

একথা বলেই তিনি স্বয়ং ঘোড়া ছুটালেন। সাথে সাথে তাঁর পেছনে অন্য মুজাহিদরা অগ্রসর হলেন। এভাবে হযরত হিশাম রাদিয়াল্লাহ আনহুর দেহ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেলো। যুদ্ধ শেষ হলে হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস ভাইয়ের লাশের অংশসমূহ বস্তায় ভরে দাফন করলেন।

ইবনে সায়াদ (র) বলেছেন, হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত হিশামের শাহাদাতের খবর শুনলেন এবং তাঁর মুখ দিয়ে একথাগুলো বেরিয়ে এলো ঃ

"আল্লাহ তাআলা হিশাম রাদিয়াল্লাহ আনহুর ওপর নিজের রহমত বর্ষণ করেছেন। তিনি ইসলামের মহান সাহায্যকারী ছিলেন।" এ ঘটনার কয়েক বছর পর মক্কার এক বৈঠকে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হলো। প্রশ্নটি হলো— হিশাম উত্তম ছিলো, না আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস ? সেখানে হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে একটা ঘটনা শুনাই। তা থেকেই তোমরা আন্দাজ করতে পারবে যে, আমাদের মধ্যে কে উত্তম ছিলো। আমি এবং হিশাম রাদিয়াল্লাহ আনহু দু'জনই যুদ্ধে (আজনাদাইন) অংশ নিয়েছিলাম। যুদ্ধের পূর্বের রাতে আমরা উভয়েই শাহাদাতের জন্য দোয়া করেছিলাম। সকালে হিশামের দোয়া কবুল হলো এবং আমি শাহাদাতের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত থাকলাম। এখন তোমরা বুঝে নাও যে, আল্লাহ কাকে ফযীলত দিয়েছিলেন।

---

www.bjilibrary.com

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদ সাইফুল্লাহ

সাইয়েদেনা হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদ ছিলেন ইসলামের এক মহান সেনাপতি এবং ইতিহাস সৃষ্টিকারী বিজেতা। তাঁর উজ্জ্বল কীর্তি এবং হক পথে জীবন উৎসর্গীকৃত মনোভাবের কথা পাঠ করে প্রত্যেক মুসলমানের দ্রুত হৃৎকম্পন শুরু হয় এবং রক্ত টগবগিয়ে ওঠে।

খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু সেই ব্যক্তি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাঁর জন্যে আল্লাহর কাছে দোয়া করে বলেছিলেন ঃ "হে আল্লাহ ! তুমি তাঁকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আসার সুযোগ দাও।"

খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু তো সেই ব্যক্তি ঃ যখন তিনি হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস এবং হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন তালহা সমভিব্যাহারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাইয়াত নিলেন। এ সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহ আনহুমদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ "মক্কা নিজের কলিজাকে তোমাদের দিকে নিক্ষেপ করেছে।"

খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু তো তিনি ঃ যিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে 'সাইফুল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহর তরবারী উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন এবং তাঁর সম্পর্কে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন ঃ

"খালিদ আল্লাহর এক অন্যতম তরবারী। তিনি এ তরবারীকে কাফেরদের বিরুদ্ধে খাপ থেকে বের করেছেন।"

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদ সাইফুল্লাহ আমাদের ইতিহাসের এক মহান মর্যাদাবান বীর। তাঁর নজীরবিহীন বাহাদুরী এবং অত্যাশ্চর্যজনক সামরিক নিপুণতা ও যোগ্যতার স্বীকৃতি দুনিয়ার সকল চরিতকারই দিয়েছেন। আরবের মরু প্রান্তরের এ উজ্জ্বল সন্তান যদিও যুদ্ধ বিষয়ক কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ছিলেন না, তবুও যুদ্ধের ময়দানে তাঁর অশ্ব চালনা, নিপুণতা, নেতৃত্ব, বাহাদুরী, বিচক্ষণতা এবং ব্যুহ রচনার প্রত্যুৎপন্নমতিতার কথা পাঠ করলে সন্দেহাতীতভাবে স্বীকার করতে হয় যে,

www.bjilibrary.com

দুনিয়ার কোনো বড় জেনারেল এবং বিজয়ী সামরিক যোগ্যতায় তার সমকক্ষতা দাবী করতে পারেন না।

মিসরের একজন ঐতিহাসিক আব্বাস মাহমুদুল উকাদ নিজের রচিত গ্রন্থ "আবকারিয়াতু খালিদ"-এ হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদের সামরিক ব্যক্তিত্বের পর্যালোচনা করে বলেছেন ঃ

"সামরিক নেতৃত্বের সব গুণাবলীই খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর মধ্যে ছিলো। বাহাদুরী, সাহসিকতা, উপস্থিত বুদ্ধি, ক্ষিপ্রতা এবং শত্রুর ওপর অকল্পনীয় আঘাত হানার ব্যাপারে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় এবং মুহূর্তের মধ্যে যুদ্ধের পট পরিবর্তন করে দেয়া তাঁর জন্যে খেলার বস্তু ছিলো।

সন্দেহ নেই যে, খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু সাইফুল্লাহ আমাদের ইতিহাসের অমূল্য সম্পদ নির্দ্বিধায় আমরা তাঁর ওপর গৌরব করতে পারি এবং হকের শত্রুর মুকাবিলায় তাঁর জীবন বাজী রাখার গুণ আমরা আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে পারি।

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদের সম্পর্ক কুরাইশের "বনু মাখজুম" গোত্রের সাথে ছিলো। জাহেলী যুগ থেকেই গোত্রটি অত্যন্ত মর্যাদাশীল গোত্র হিসেবে পরিচিত। কুরাইশরা মক্কায় নগর প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলো। এ প্রশাসনের সামরিক নেতৃত্ব ছিলো বনু মাখজুমের হাতে। সামরিক নেতৃত্বের দু'টি পদ "আল কুববাহ" যুদ্ধের প্রস্তুতির সময় তাঁবু খাটানো কুরাইশদের একটি নিয়ম ছিলো। এ তাঁবুতে প্রত্যেকেই সামর্থ অনুযায়ী যুদ্ধের সরঞ্জাম এনে জমা দিতো। এবং "আল ইয়ান্নাহ" (অশ্বারোহী বাহিনী) এ গোত্রেরই করায়ত্বে ছিলো। গোত্রটি শরাফত, বাহাদুরী এবং যুদ্ধ অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে কুরাইশদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী ছিলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর বংশনামা নিম্নরূপ ঃ

খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদ বিন মুগিরা বিন আবদুল্লাহ বিন উমার (ভিন্ন রাওয়ায়েতে আমর) বিন মাখজুম বিন ইয়াকজাহ বিন মাররাহ বিন কা'বা বিন লুববীউল কারাশী।

তাঁর বংশ ধারা উর্ধতন সপ্তম স্তরে গিয়ে (অর্থাৎ মাররাহ বিন কা'ব) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহুর বংশের সাথে মিলে যায়।

মাতার নাম ছিলো লুবাবাতুস সুগরা। তিনি ছিলেন হারিছ বিন হাযন হিলালীর কন্যা।

www.bjilibrary.com

লুবাবাতুস সুগরা উম্মুল মু'মিনীন হযরত মাইমুনা রাদিয়াল্লাহ আনহা বিনতে হারিস এবং হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবদুল মুত্তালিবের স্ত্রী হযরত উম্মুল ফজল লুবাবাতুস কুবরার সহোদরা ছিলেন। এ সম্পর্কের কারণে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর খালু হতেন।

লুবাবাতুস সুগরার ইসলাম গ্রহণ প্রশ্নে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কারণ, তিনি হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুর খেলাফাতকাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। কিন্তু অন্যান্যরা তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা স্বীকার করেন না।

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদের মশহুর কুনিয়ত (পারিবারিক নাম) ছিলো আবু সুলাইমান। কতিপয় লোক অবশ্য তাঁর দ্বিতীয় কুনিয়াত হিসেবে আবুল ওয়ালিদও উল্লেখ করেছেন।

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর পিতা ওয়ালিদ বনু মাখজুমের সরদার ছিলেন এবং কুরাইশদের অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মধ্যে পরিগণিত হতো। সে সেসব "বড় লোকের" দলে ছিলো যাদের ব্যাপারে কুরাইশরা বলতো, কুরআন তাদের ওপর কেন অবতীর্ণ হয়নি। সূরা 'আয যুখরুফে' এ দিকেই ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে ঃ

"কাফেররা বলে, এ কুরআন সেই দু' বস্তির কোনো বড় মানুষের ওপর কেন অবতীর্ণ হয়নি।" মুফাসসিরগণ দু' বস্তির মর্মার্থ হিসেবে মক্কা মুয়াজ্জামা এবং তায়েফ শহরকেই গ্রহণ করেছেন। কুরাইশরা ওয়ালিদ বিন মুগিরা এবং তায়েফের উরওয়াহ বিন মাসউদ সাকাফিকে "মহান" ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করতেন। তাদের ধারণায় আকাশ থেকে যদি অহী নাযিলের প্রয়োজনই ছিলো, তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বাদ দিয়ে (নাউজুবিল্লাহ) তা তাদের ওপর অবতীর্ণ হওয়াই যথার্থ ছিলো।

শুধুমাত্র ধন-সম্পদের দিক থেকেই নয় বরং ওয়ালিদ বিন মুগিরাহ বাস্তবতঃ মেধা ও ধীশক্তি, বদান্যতা ও দানশীলতা, অধিক সন্তান এবং বাগ্মীতার দিক থেকেও কুরাইশদের মধ্যে অনন্য মর্যাদাশীল আল আদল (ইনসাফ প্রিয়) এবং আল-ওয়াহিদ (একতা) উপাধিতে ভুষিত ছিলো। কথিত আছে যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়াত প্রাপ্তির পূর্বেই সে মদপান সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেছিলো। সে হজ্জের সময় মিনায় হাজীদের খাবার খাওয়াতো এবং কাউকেই সেখানে খাদ্য রান্নার জন্যে আগুন জ্বালানোর অনুমতি দিতো না। এক বছর সে একাই কা'বা শরীফের গিলাফ চড়াতো। পরের বছর

www.bjilibrary.com

কুরাইশের সবাই মিলে এ কাজ করতো। ধন-সম্পদের এত প্রাচুর্য ছিলো যে, সবসময় তার কাছে ১২ হাজার দিনার মওজুদ থাকতো। মক্কা এবং তায়েফে তার অসংখ্য বাগান ছিলো। সারা বছর এসব বাগানে ফল পাওয়া যেত। তার ১০টি পুত্র (অন্য রাওয়ায়েত মতো ১৪ অথবা ৮) ছিলো। পুত্ররা মজলিশে তার সাথে উপস্থিত থাকতো। খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন ওয়ালিদের মত যোগ্য সন্তানও তাদের মধ্যে ছিলেন। শক্তি এবং ক্ষমতার দিক থেকে সকল কুরাইশ সরদারের মধ্যে সে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলো। এ কারণেই হযরত আবদুল মুত্তালিবের পর কুরাইশের নেতৃত্বের যারা দাবীদার ছিলো তাদের মধ্যে সে-ও অন্যতম ব্যক্তিত্ব বলে পরিগণিত। সে ছিলো দৃঢ় সংকল্প সম্পন্ন এবং সাহসী। প্রসঙ্গত একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়। কুরাইশরা যখন (রাসূলের নবুয়াত প্রাপ্তির ৫ বছর পর) সম্পূর্ণরূপে কা'বা ঘরের পুনঃ নির্মাণের ইচ্ছা ব্যক্ত করলো তখন কেউই তার কোনো অংশ ভাঙ্গার জন্যে এগুলো না। অবশেষে ওয়ালিদ বিন মুগিরাহ কোদাল হাতে নিয়ে ভবন ভাঙ্গতে শুরু করলো। এ সময় সে বলেছিলো, "হে কাবা ওয়ালারা ! আমরা যাকিছু করছি তাতে কোনো খারাপ নিয়ত নেই। আমাদের নিয়ত পবিত্র।"

ওয়ালিদ কা'বাকে অত্যন্ত তাজিম করতো। সে কখনো জুতা পায়ে সেখানে প্রবেশ করতো না। চরিতকারদের বর্ণিত গুণাবলীর দাবী অনুযায়ী তার ইসলাম গ্রহণ আবশ্যিক এবং কুরআনে করীমের স্বীকৃতিতেও অগ্রগামী হওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বংশীয় অহমিকা এবং বিত্ত ও ক্ষমতা এ পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। নিজের শাসন এবং মর্যাদা বহাল রাখার উদ্দেশ্যে সে শুধু ইসলাম থেকে বঞ্চিতই থাকেনি বরং ইসলাম প্রসারে বাধাদানের জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলো।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাওহীদের দাওয়াত প্রদান শুরু করলেন। এতে কুরাইশের মুশরিকরা তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলো। তারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার অনুসারীদের ওপর নির্যাতন চালানো এবং হক দাওয়াতে বাধা সৃষ্টির জন্যে কোমর বেঁধে লাগলো। এ কাজে আবু জেহেল, আবু লাহাব, আস বিন ওয়ায়েল, উমাইয়া বিন খালফ, উকবাহ বিন আবু মুয়িত এবং ওয়ালিদ বিন মুগিরা প্রমুখ অগ্রগামী ভূমিকা পালন করে। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হকের তাবলীগ থেকে বিরত রাখার জন্যে শক্তি প্রয়োগ করলো। কিন্তু তিনি তাদের কোনো পরোয়া না করে হকের তাবলীগের দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে চললেন।

নেতৃস্থানীয় চরিতকাররা বলেছেন, কুরাইশের মুশরিকদের কয়েকটি প্রতিনিধিদল বিভিন্ন সময়ে জনাব আবু তালিবের কাছে গমন করে। এসব দল

www.bjilibrary.com

তাঁকে জানায়, হয় আপনি আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রকে [মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] হকের তাবলীগ থেকে বিরত রাখুন অথবা তাকে সমর্থন দান থেকে সরে পড়ুন। এ প্রতিনিধি দলগুলোতে ওয়ালিদ বিন মুগিরাও ছিলো। তার আরেক কাণ্ড খুবই স্মরণীয়। নিজের পুত্র আম্মারাহকে (হযরত খালিদের সহোদর) মুশরিকদের কাছে সমর্পণ করলো। আম্মারাহকে আবু তালিবের হাওলায় দিয়ে তার পরিবর্তে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে চেয়ে নেয়ার জন্যে সে অনুরোধ জানালো। সুতরাং মুশরিকদের একটি দল জনাব আবু তালিবের কাছে গিয়ে বললো ঃ

"হে আবু তালিব ! আম্মারাহ বিন ওয়ালিদ কুরাইশের অত্যন্ত সুদর্শন ও তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন যুবক। তুমি তাকে নিজের পুত্র বানিয়ে নাও। আর তার পরিবর্তে নিজের ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মাদকে আমাদের কাছে ন্যস্ত করো। এ মুহাম্মাদ তোমার বাপ-দাদার ধর্মের বিরোধিতা এবং তোমার কাওমের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করেছে। তাছাড়া সে আমাদের সবাইকে আহাম্মক আখ্যা দিয়েছে। আমরা একজনকে দিয়ে দ্বিতীয়জনকে নিচ্ছি। যাতে তাকে আমরা হত্যা করতে পারি।"

জনাব আবু তালিব তাদের এ প্রস্তাব তাচ্ছিল্যভরে প্রত্যাখ্যান করলেন এবং কোনো মূল্যেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি সমর্থন দান থেকে সরে দাঁড়ালেন না।

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, কুরাইশ মুশকিরদের প্রতিনিধিদলসমূহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সরাসরিও সাক্ষাত করলো এবং তাঁকে বললো, আপনার যদি ধন-সম্পদের প্রয়োজন হয় তাহলে আমরা আপনাকে এত ধন-সম্পদ প্রদান করবো যে, আপনি মক্কার সবচেয়ে বড় ধনী হয়ে যাবেন। আপনি যদি বাদশাহ এবং সরদার হতে চান তাহলে আমরা আপনাকে আমাদের সরদার ও বাদশাহ বানাতে প্রস্তুত আছি। আপনি যদি শাদী করতে চান, তাহলে যে মহিলাকেই পসন্দ করবেন তার সাথেই আপনার বিয়ে দিয়ে দিবো। কিন্তু শর্ত হলো, আপনাকে আমাদের মাবুদসমূহকে খারাপ বলা পরিত্যাগ করতে হবে। আপনি যদি এটা না মানেন তাহলে আমাদের অন্য প্রস্তাব আছে। প্রস্তাবটি হলো, এক বছর আমরা আপনার দীন গ্রহণ করবো এবং অন্য বছর আপনি আমাদের দীন গ্রহণ করবেন।

বিশ্বনবী মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কোনো কথাই মানলেন না এবং বললেন, আমি তোমাদের কাছে যে বস্তু এনেছি তা তোমাদের কাছ থেকে সম্পদ চাওয়ার জন্যে নয়। অথবা তোমাদের মধ্যে

www.bjilibrary.com

মর্যাদাবান হওয়ার জন্যেও নয়। এমনকি তোমাদের বাদশাহ হওয়ার জন্যেও নয়। বরং আল্লাহ আমাকে তোমাদের কাছে নিজের রাসূল বানিয়ে প্রেরণ করেছেন এবং আমার ওপর একখানা কিতাব নাযিল করেছেন। তোমাদের প্রতি সুসংবাদদান এবং ভীতি প্রদর্শনের জন্যেও আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। বস্তুতঃ আমি আমার রবের বাণী তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। এখন যদি তোমরা তা কবুল করো তাহলে দুনিয়া ও আখেরাতে সফল হবে। আর যদি তা প্রত্যাখ্যান করো তাহলে আমার এবং তোমাদের মধ্যে আল্লাহর ফায়সালা না হওয়া পর্যন্ত আমি ধৈর্যধারণ করবো।

কতিপয় রাওয়ায়েতে আছে, ওয়ালিদ বিন মুগিরা কুরআন আল্লাহর কালাম হওয়ার কথা স্বীকার করেছিলেন এবং দু' একবার অস্ফুট স্বরে তা প্রকাশও করেছিলেন। কিন্তু আবু জেহেল তাকে ঈমান গ্রহণের সৌভাগ্য থেকে বিরত রাখে। ইবনে ইসহাক (র), হাকিম (র) বাইহাকী (র) বর্ণনা করেছেন, একবার কুরাইশ নেতৃবৃন্দ (হজ্জের পূর্বে) এক বৈঠকে সিদ্ধান্ত নিল যে, যখন সমগ্র আরব থেকে হাজীদের কাফেলা মক্কা আসবে তখন তাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে সন্দেহ ও ঘৃণা সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালানো হবে। তখন ওয়ালিদ বিন মুগিরা তাদেরকে বললো, আমরা যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে লোকদেরকে বিভিন্ন কথা বলি, তাহলে তারা তা বিশ্বাস করবে না। এজন্যে চিন্তা-ভাবনা করে এক কথা বলার সিদ্ধান্ত নেয়া প্রয়োজন। যাতে সবাই তা একমত হয়ে বলতে পারে। কিছু লোক বললো, আমরা মুহাম্মাদকে গণক বলবো। ওয়ালিদ বিন মুগিরা বললো, খোদার কসম! সে গণক নয়। আমরা গণক দেখেছি। গণকরা যে ধরনের কথা বলে কুরআনের সাথে তার দূরতম কোনো সম্পর্কও নেই।

কিছু লোক বললো, আমরা তাঁকে উন্মাদ বলবো। ওয়ালিদ বললো, আল্লাহর কসম ! সে উন্মাদও নয়। ভালো, মুহাম্মদ যে কালাম পেশ করেছেন, তা কোনো উন্মাদ কি পেশ করতে পারে ! অন্য কতিপয় লোক বললো, আমরা তাঁকে কবি বলবো। ওয়ালিদ বললো, তিনি কবিও নন। আমরা কাব্যের নখ দর্পণ সম্পর্কে অবহিত আছি। তাঁর বাণীকে কাব্য বলা যায় না।

মানুষেরা বললো, ঠিক আছে, তাহলে তাঁকে আমরা যাদুকর বলবো।

ওয়ালিদ একথায়ও একমত না হয়ে বললো, আমরা ওপরে বর্ণিত যে কথাই বলি না কেন, মানুষ তা কখনই গ্রাহ্য করবে না। আল্লাহর কসম ! এ কালামে অত্যন্ত মিষ্টতা আছে। তার মূল অত্যন্ত গভীরে প্রোথিত এবং শাখা-সমূহ খুবই ফলবান।

www.bjilibrary.com

এ কথায় আবু জেহেল রাগতস্বরে বললো, হে আবু আবদুস শামস (ওয়ালিদের কুনিয়াত)। হাজীদের সামনে গিয়ে আমরা কি বলবো তা তুমিই বলে দাও।

ওয়ালিদ বহুক্ষণ ধরে চিন্তা করে বললো, হাজীদের কাছে আমরা আপাততঃ তাকে যাদুকর হিসেবে চিত্রিত করতে পারি। কারণ, তাঁর কথায় স্বামী-স্ত্রী, পিতা-পুত্র এবং ভাই-ভাইয়ের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয়।

সুতরাং ওয়ালিদের কথায় সকলেই ঐকমত্যে পৌঁছলো এবং মুশরিকরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে অভিযানের ভিত্তি হিসেবে এ বানোয়াট কাহিনীই ঠিক করলো।

ওয়ালিদ বিন মুগিরার ভূমিকা প্রসঙ্গে সূরা মুদ্দাসসিরে এ পর্যালোচনা করা হয়েছে ঃ

"(হে পয়গাম্বর) ! আমাকে ছেড়ে দাও, আর সেই ব্যক্তিকে যাকে আমি একা সৃষ্টি করেছি। বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পদ তাকে দিয়েছি। তার সাথে সদা উপস্থিত থাকা বহু পুত্র দিয়েছি। আর তার জন্যে নেতৃত্ব কর্তৃত্বের পথ সুগম করে দিয়েছি। তা সত্বেও সে লালসা পোষণ করে এজন্যে যে, আমি তাকে আরো অধিক দেব। কখনও নয়, আমাদের আয়াতসমূহের প্রতি সে অত্যন্ত শত্রু মনোভাবাপন্ন। আমি তো তাকে শীঘ্রই একটা কঠিন চড়াইতে চড়াবো। সে চিন্তা করেছে এবং কিছু কথাবার্তা রচনার চেষ্টা করেছে। হ্যাঁ, খোদার মার তার ওপর, কি রকমের কথা রচনার চেষ্টা করেছে। পরে (লোকদের প্রতি) তাকালো, পরে কপাল সংকুচিত করলো, মুখ বাঁকা করলো, পরে ফিরে গেলো ও অহংকারে পড়ে গেলো। শেষ পর্যন্ত বললো, এ কিছুই নয়, শুধু যাদু মাত্র, এতো পূর্বে থেকেই চলে আসছে। এতো একটা মানবীয় কালাম।"–(সূরা আল মুদ্দাসসির ঃ ১২-২৫)

কতিপয় মুফাসসির কুরআনে হাকীমের আরো কিছু আয়াত বিশেষ করে ওয়ালিদ বিন মুগিরা সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছেন।

ওয়ালিদ বিন মুগিরা কুফরী অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরতের তিন মাস পর ৯৫ বছর বয়সে মারা যায়।

কোনো পুস্তকে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন ওয়ালিদের জন্ম তারিখ সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু বিভিন্নভাবে জানা যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়াত প্রাপ্তির সময় তাঁর বয়স ২৪-২৫ বছর ছিলো। কেননা অধিকাংশ ঐতিহাসিক ২১ অথবা ২২ হিজরীতে তাঁর

www.bjilibrary.com

বয়স ৬০ বছর ছিলো বলে বর্ণনা করেছেন। ইবনে আসাকির বলেছেন, হযরত খালিদ হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুর সমবয়সী ছিলেন। শৈশবকালে একবার তিনি কুস্তি খেলতে গিয়ে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর পায়ের গোছা ভেঙ্গে ফেলেছিলেন। বহু চিকিৎসার পর তা ঠিক হয়। এ হিসেব অনুযায়ী তিনি নবুয়াত প্রাপ্তির প্রায় ২৭ বছর পূর্বে ও নবীর হিজরতের প্রায় ৪০ বছর আগে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২১-২২ হিজরীতে তাঁর বয়স ৬০ বছরের বেশী ছিলো। (আল্লাহই এ ব্যাপারে ভালো জানেন)।

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু মুখে সোনার চামচ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পিতা ছিলো সরদারদের সরদার। তার কাছে ধন-সম্পদ, দাস, উট, ঘোড়া, বাড়ী, বাগান মোটকথা সব জিনিসেরই প্রাচুর্য ছিলো। এজন্যে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু অত্যন্ত শান-শাওকাত এবং প্রাচুর্যের মধ্যে লালিত-পালিত হন। যৌবনকালে জীবিকার প্রশ্নে নিশ্চিন্ত ছিলেন। প্রকৃতি তাঁকে 'সাইফুল্লাহ' হওয়ার জন্যে সৃষ্টি করেছিলো। এজন্যে তিনি আরাম-আয়েশে মশগুল হননি এবং এমন সব বৃত্তি বা কাজ অবলম্বন করেছিলেন যাতে সুস্থতা, শক্তি, বাহাদুরী, হিম্মত, শ্রম এবং উদ্যমশীল হয়ে গড়ে ওঠার পক্ষে সহায়ক হয়েছিলো। এসব বৃত্তির বিশদ বর্ণনা হলো ঃ

১- কুস্তি লড়া–হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু খুব কসরত করতেন এবং সমবয়সী যুবকদের সাথে কুস্তি লড়তেন।

২- অশ্বারোহণ–ঘোড়া তত্ত্বাবধান, ঘোড় দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ এবং (একজন ভালো অশ্বারোহী হওয়ার জন্যে) বেশী বেশী ঘোড়ায় সওয়ার হওয়া।

৩- যুদ্ধ ক্যাম্পের (আলকুব্বাহ) ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ।

৪- সেনা কৌশল প্রশিক্ষণ (তরবারী চালনা, নেযাবাজী প্রভৃতি)।

এ সামরিক প্রশিক্ষণ তিনি কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গ্রহণ করেননি। বরং খোলা ময়দান এবং প্রস্তরময় ঘাঁটিতেই তা লাভ করেছিলেন। অভিজ্ঞ বয়স্কদের তত্ত্বাবধান এবং কাওমের সামরিক ট্রাডিশনই শিক্ষক হিসেবে কাজ করেছে।

প্রকৃতিগতভাবেই তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাসম্পন্ন, সতেজ মনের অধিকারী, বীর এবং ভয়হীন। দৃষ্টি ছিলো ঈগলের। আর অন্তর ছিলো বাঘের। কোনো কঠিন বিষয় এবং ভয়কে মোটেই পরোয়া করতেন না। তিনি যুদ্ধ সংক্রান্ত খোদা প্রদত্ত মন ও মনন লাভ করেছিলেন। বংশীয় ঐতিহ্য তার প্রকৃতিগত যোগ্যতাবলীকে আরো প্রোজ্জ্বল করে তুলেছিলো। এভাবে তিনি বিরাট অভিজ্ঞতাসম্পন্ন নিপুণ যোদ্ধা এবং মহান সেনাপতি হন। যুদ্ধে পারদর্শিতার

www.bjilibrary.com

কারণে তিনি বিশ্বের ইতিহাসে প্রখ্যাত ও চিরকালীন মর্যাদায় ভূষিত হন। পিতার মৃত্যুর পর 'আল কুব্বাহ' এবং 'আলইয়ান্নাহ'র দায়িত্ব ও নেতৃত্ব তাঁর ওপরই অর্পিত হয়। তিনি এ দায়িত্ব সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পালন করেন। পিতা অগাধ ধন-সম্পদ রেখে গিয়েছিলো। এজন্যে তিনি ও তাঁর ভাইয়েরা রুটি-রুজির জন্যে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হননি। ব্যবসা-বাণিজ্যও তিনি কর্মচারীদের দ্বারা সম্পাদন করতেন। কুরাইশের অনেক সরদারই বাণিজ্যিক কাফেলার সাথে দূর-দূরান্তের (সিরিয়া, মিসর ইত্যাদি) সফরে যেতেন। কিন্তু বাণিজ্য ব্যাপদেশে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মক্কার বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন হয়নি।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্যের দাওয়াত প্রদান শুরু করলেন। এ সময় হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর এক সৌভাগ্যবান সহোদর ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন ওয়ালিদ নবীর নবুয়াত প্রাপ্তির প্রথম দিকেই (ভিন্ন রাওয়ায়েত অনুযায়ী বদরের যুদ্ধের অব্যবহিত পরই) সেই আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন। কিন্তু হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু পিতার অনুসরণ করলেন এবং মুশরিকদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইসলাম বিরোধিতায় কোমর বেঁধে দাঁড়ালেন। এ সত্ত্বেও তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যুলুম-নির্যাতন প্রশ্নে কোনো নীচতা অবলম্বন করেননি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদীনায় হিজরত এবং পিতার মৃত্যুর পরও ৭ বছরের বেশী সময় ধরে তিনি মুশরিকদের সমর্থক ছিলেন। বদরের যুদ্ধে (দ্বিতীয় হিজরী) মুশরিক বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত থেকেও কোনো কৃতিত্ব প্রদর্শনের সুযোগ পাননি। ওহোদের যুদ্ধে (তৃতীয় হিজরী) মক্কার অশ্বারোহী বাহিনীর নেতৃত্ব প্রদান করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহোদ পাহাড়ের ফটকের রাস্তায় ৫০জন তীরন্দাজ মোতায়েন করেন। উদ্দেশ্য ছিলো যাতে কাফেররা এ পথ অতিক্রম করে পেছনের দিক থেকে মুসলমানদের ওপর হামলা করতে না পারে। যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে কাফেররা পরাজিত হয় এবং ফটকের রাস্তায় মোতায়েনকৃত বেশীর ভাগ তীরন্দাজই [হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশের পরিপন্থী] নিজেদের স্থান পরিত্যাগ করে। তখন ঈগল দৃষ্টি সম্পন্ন খালিদ মুসলমানদের দুর্বলতা অনুমান করতে সক্ষম হন এবং নিজের বাহিনীসহ সেই ফটকের রাস্তায় মুসলমানদের পিছন দিক থেকে হামলা করে বসেন। এ অপ্রত্যাশিত হামলায় মুসলমানদেরকে সমূহ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়।

খন্দকের যুদ্ধে (পঞ্চম হিজরী) খালিদ মক্কার অশ্বারোহী বাহিনীর অন্যতম ছিলেন। এ বাহিনী পরিখার পাশে পাশে টহল দিয়ে ফিরতো। যাতে পরিখার কোনো অংশ দুর্বল হয়ে পড়লে অথবা মুসলমানরা অসতর্ক হলে তিনি পরিখা

www.bjilibrary.com

অতিক্রম করে মুসলমানদের ওপর হঠাৎ করে হামলা করে বসতে পারেন। কিন্তু মুসলমানদের সজাগ দৃষ্টি তাঁকে সেই সুযোগ দেয়নি। দু' তিন সপ্তাহ পর কাফেরদের মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টি হলে খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন ওয়ালিদ ও আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনুল আসকে তারা তাদের পেছনের দিক হেফাজতের অনুরোধ জানায়। সুতরাং তাঁরা দু'জন দু'শ অশ্বারোহী সহ কাফের বাহিনীর পেছনের দিক রক্ষার দায়িত্ব নেন।

৬ষ্ঠ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ১৪শ সাহাবী সমভিব্যাহারে কা'বা যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে মক্কা রওয়ানা হলেন। কাফেররা এ খবর পেয়ে মুসলমানদের বাধাদানের ইচ্ছা ব্যক্ত করলো এবং খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন ওয়ালিদকে দু'শ অশ্বারোহী সহ মুসলমানদের বাধা (অথবা আরো যাচাই) দানের জন্যে মক্কা থেকে রওয়ানা করেছিলো। "কিরাগুল গামিম" নামক স্থানে পৌছলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের আগমনের খবর পেলেন। বস্তুতঃ তিনি যুদ্ধ করতে চাননি। এজন্যে রাস্তা পরিবর্তন করে হুদাইবিয়া পৌছলেন এবং সেখানে তাঁবু স্থাপন করলেন।

হুদাইবিয়ার সন্ধি পরবর্তী বছরে (৭ হিজরী) চুক্তি অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবন উৎসর্গকারী সাহাবীদের সহ যখন কাযা ওমরার উদ্দেশ্যে মক্কা প্রবেশ করলেন, তখন খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন ওয়ালিদ মক্কার বেশীর ভাগ লোকের সাথে শহরের বাইরে বেরিয়ে গেলেন। কেননা তিনি মুসলমানদের মক্কায় প্রবেশের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করার ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছিলেন। মক্কায় তিন দিন অবস্থানকালে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর সহোদর ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন ওয়ালিদকে (যিনি অত্যন্ত মুখলিস মুসলমান ছিলেন) বললেন— "আফসোস ! খালিদ আমার কাছে এলো না। যদি সে আসতো তাহলে আমরা তাকে উষ্ণ সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করতাম। খালিদের মত ব্যক্তির ইসলাম থেকে দূরে থাকা উচিত নয়।" এক রাওয়ায়েতে আছে, সে সময় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইসলাম কবুলের জন্যে দোয়াও করেছিলেন।

হযরত ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজের ভাইয়ের আন্তরিক শুভাকাংখী ছিলেন। তিনি মদীনা ফিরে গিয়ে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এ পত্র লিখলেন ঃ

"বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম—তোমার ইসলাম বিরোধিতায় আমি বিস্মিত। তোমার মতো একজন বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ইসলামের সত্যতা

সম্পর্কে বেখবর থাকতে পারে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার কাছে তোমার ব্যাপারে জানতে চেয়েছেন যে, খালিদ কোথায় ? আমি আরজ করেছি, খালিদকে আল্লাহই আনতে পারেন। তিনি বলেছেন, খালিদের মত বুদ্ধিমান মানুষ ইসলামের তাৎপর্য সম্পর্কে অনবহিত থাকতে পারে না। সে যদি মুসলমানদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতো, সেটাই তার জন্যে উত্তম হতো। ভাই আমার ! দীর্ঘদিন যাবত তুমি পথভ্রষ্ট থেকেছো। এখন হক সম্পর্কে অবহিত হও এবং ইসলামের রজ্জু মযবুতভাবে আকড়ে ধরো।"

এ পত্র হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে ইসলামের প্রতি আসক্ত করে তুললো। কিছুদিন পরই তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে ঈমান আনলেন। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ স্বয়ং তাঁর ইসলাম গ্রহণের কাহিনী এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

"ওয়ালিদের চিঠি আমার অন্তরের ওপর আচ্ছাদিত তমসার জাল ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেললো এবং আমি ইসলামের প্রতি অগ্রসর হলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার সম্পর্কে যা কিছু বলেছিলেন তাতে অত্যন্ত খুশী হলাম এবং তাঁর খিদমতে উপস্থিত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম। তৎকালীন সময়ে এক স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি অপ্রশস্ত এবং বিরাণ স্থান থেকে বের হয়ে এক প্রশস্ত ও সবুজ এবং শ্যামল প্রান্তরে এসে পড়েছি। (এ স্বপ্ন দেখার পর) মদীনা গমনের সম্পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করে প্রথমতঃ সাফওয়ান বিন উমাইয়া ও ইকরামাহ বিন আবু জেহেলের সাথে সাক্ষাত করলাম এবং তাদেরকে বললাম, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরব ও আযমের ওপর বিজয়ী হতে চলেছে। আমরা যদি তাঁকে সাহায্য করি তাহলে যে মর্যাদায় তিনি ভূষিত হতে চলেছেন তাঁর অংশীদার আমরাও হবো। তারা উভয়েই আমার কথা মানতে পরিষ্কার অস্বীকৃতি জানালো। অতপর আমার বন্ধু ওসমান বিন তালহার সাথে সাক্ষাত করলাম এবং বললাম, ওসমান ! আমাদের অবস্থা সেই খেঁকশিয়ালের মতো যে নিজের আবাসস্থলে লুকিয়ে বসে থাকে। সেখানে যদি পানি ঢেলে দেয়া হয়, তাহলে সে সেখান থেকে বের হতে বাধ্য হয়। আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে, মুসলমানরা আমাদের ওপর বিজয়ী হবে। সেই সময় আগমনের পূর্বেই কি আমাদের ইসলাম গ্রহণ উত্তম নয় ?

আমি অত্যন্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে ওসমানকে একথা বলেছিলাম। কেননা তার পিতা এবং চার ভাই ওহোদের যুদ্ধে মারা গিয়েছিলো। আমার ধারণা ছিলো, সেও সাফওয়ান এবং ইকরামার মতো আমার কথা মানবে না। কিন্তু আমি চরমভাবে বিস্মিত হলাম। ওসমান নির্দ্বিধায় আমার প্রস্তাব মেনে নিলো।

www.bjilibrary.com

পরবর্তী দিন আমরা দু'জন প্রত্যূষে মদীনা রওয়ানা হয়ে গেলাম। "হাদাহ" নামক স্থানে আমর ইবনুল আসের সাথে আমাদের সাক্ষাত হলো। তিনি হাবশা থেকে আসছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, সুলাইমান কোথায় যাচ্ছো ? আমি বললাম, খোদার কসম ! খুব হয়েছে। আমার দৃঢ় আস্থা হয়েছে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল। ইসলাম গ্রহণের জন্যে আমি তাঁর কাছে যাচ্ছি। বস্তুতঃ আমরা এক সাথে মদীনা পৌঁছলাম। আমাদের আগমনের খবর পেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত খুশী হলেন এবং মুসলমানদেরকে বললেন, মক্কা নিজের কলিজার টুকরা তোমাদের সামনে এনে দিয়েছে। আমি নতুন কাপড় পরিধান করলাম এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবাসস্থলের দিকে রওয়ানা হলাম। রাস্তায় আমার ভাই ওয়ালিদের সাথে দেখা হলো। সে বললো, তাড়াতাড়ি চলো। তোমাদের আগমনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব খুশী হয়েছেন এবং তোমাদের জন্যে প্রতীক্ষা করছেন। আমরা তাড়াতাড়ি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাজির হলাম। আমাদেরকে দেখে তাঁর চেহারা হাস্যোজ্জ্বল হয়ে উঠলো। আমি কাছে গিয়ে সালাম করলাম। তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে তার জবাব দিলেন। আমি আরজ করলাম, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কেউই ইবাদাতের যোগ্য নয় এবং আপনি তার রাসূল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহর শোকর, তিনি তোমাকে হিদায়াত নসীব করেছেন। আমারও এটাই আশা ছিলো যে, তোমার অন্তর্দৃষ্টি একদিন তোমাকে অবশ্যই সোজা রাস্তা দেখাবে।

আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল ! কয়েকবার আমি আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে গোনাহর কাজ করে ফেলেছি। আল্লাহর কাছে আপনি আমার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করুন। তিনি বললেন, ইসলাম পূর্বেকার সকল গোনাহকেই অস্তিত্বহীন করে দেয়। আমি (বিস্মিত হয়ে) বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ! ইহাই কি যথার্থ ? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

এরপর তিনি দোয়া করলেন। তিনি বললেন, হে খোদা ! অতীতে তোমার দীনের বিরোধিতায় খালিদ যাকিছু করেছে তা ক্ষমা করে দাও।

আমার পর আমর ইবনুল আস এবং ওসমান বিন তালহাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাইয়াত নিয়েছিলো।

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন ওয়ালিদ মদীনা মুনাওয়ারাতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। এভাবে তিনি হিজরতের মর্যাদাও লাভ করেন। এ ঘটনা মক্কা বিজয়ের ৬ মাস পূর্বে ঘটেছিলো। হযরত খালিদ

www.bjilibrary.com

রাদিয়াল্লাহ আনহু বলেন, ঈমান আমার পর অবস্থানের জন্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে একটি বাড়ী দান করেছিলেন।

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদ ইসলামের তরবারীধারী বাহুতে পরিণত হলেন। তিনি তরবারীর মাধ্যমে প্রতিটি যুদ্ধক্ষেত্রে খোদাদ্রোহী বা তাগুতী শক্তিকে নাকানি-চুবানি খাইয়ে ছেড়েছিলেন। সর্বপ্রথম মুতার যুদ্ধে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর তরবারী ঝলসে উঠেছিলো। আর তাঁর ইসলাম গ্রহণের দু' মাস পরেই এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো। হুদাইবিয়ার সন্ধির পর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুলতান এবং আমীরদের নামে ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত পত্রাবলী প্রেরণ করেন। এ ধরনের একটি তাবলিগী পত্রসহ তিনি হযরত হারিস রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন উমাইর ইজদীকে বসরার শাসকের কাছে প্রেরণ করেন। হযরত হারিস রাদিয়াল্লাহ আনহু মুতা নামক স্থানে পৌছলে বলকার শাসক শুরাহবিল বিন আমর গাসসানি তাঁকে শহীদ করে ফেলে। এর প্রতিশোধ গ্রহণার্থে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত যায়েদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন হারেসার নেতৃত্বে তিন হাজার সৈন্যের এক বাহিনী প্রেরণ করেন। বাহিনীটি রওয়ানার প্রাক্কালে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন, যদি যায়েদ শহীদ হয়ে যায়, তাহলে জাফর রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবি তালিব সেনাপতি হবেন। যদি তিনিও শাহাদাত প্রাপ্ত হন, তাহলে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন রাওয়াহা আনসারী সেনাবাহিনী প্রধান হবেন।

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদ এ বাহিনীতে একজন সাধারণ সিপাহী হিসেবে যোগ দেন। মুসলমানদের আগমনের সংবাদ পেয়ে বসরার শাসক মিত্র গোত্রদের মিলিয়ে এক বিরাট বাহিনী একত্রিত করলো। ঘটনাক্রমে রোমের কাইসারও উক্ত এলাকার "মুয়াব" নামক স্থানে তাঁবু স্থাপন করেছিলো। সে হাজার হাজার রোমীয় সিপাহীকে বসরার শাসকের সাহায্যের জন্যে প্রেরণ করলো। এভাবে শত্রুর সংখ্যা দেড় লাখ গিয়ে পৌছলো। মুসলমান এবং শত্রু সৈন্যের সংখ্যার অনুপাত ছিলো ১ ঃ ৬০। (অন্য রাওয়ায়েত মুতাবিক ১ ঃ ৮৩)। এ সত্ত্বেও মুসলমানরা আল্লাহর ওপর ভরসা করে খোদাদ্রোহী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন।

মুতার রণ ক্ষেত্রে উভয় বাহিনীর মধ্যে ঘোরতর লড়াই হলো। এ যুদ্ধে হযরত যায়েদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন হারেসা হযরত জাফর রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবি তালিব এবং হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন রাওয়াহা একের পর এক অত্যন্ত বাহাদুরীর সাথে লড়াই করে শহীদ হন। এরপর হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদ বাহিনীর কমাণ্ড হাতে নিলেন এবং

www.bjilibrary.com

নিজের নজীর বিহীন বাহাদুরী ও সামরিক যোগ্যতার বদৌলতে মুসলমানদেরকে শত্রুর ঘেরাও থেকে বের করে আনলেন। যদিও শত্রুর সংখ্যাধিক্য এবং সাজ-সরঞ্জামের (এ কারণেও যে মুসলমানেরা নিজেদের কেন্দ্র থেকে অনেক দূরে ছিলেন) কারণে তাদেরকে পদানত করা যায়নি। তবুও মাত্র তিন হাজারের একটি ক্ষুদ্র দলের বেঁচে যাওয়াটাই বাস্তবে তাদের বিজয় বলে অভিহিত করতে হয়। (অন্য এক রাওয়ায়েতে আছে, মুসলমানরা শত্রু পক্ষের অসংখ্য মানুষকে হত্যা করে পিছিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলো)। এ প্রচণ্ড লড়াইয়ে মুসলমানদের মাত্র ১২ ব্যক্তি শহীদ হন। পক্ষান্তরে শত্রু পক্ষের হাজার হাজার মানুষ ময়দানে লাশ হয়ে পড়েছিলো।

সকল নেতৃস্থানীয় চরিতকার বিশ্বস্ততা ও ধারাবাহিকতায় এ রাওয়ায়েত নকল করেছেন যে, মুসলমানেরা মূতার যুদ্ধে জীবন মরণ লড়াইয়ে লিপ্ত। সে সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের একটি দল সহ মসজিদে নববীতে উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ করে তিনি বললেন ঃ

"যায়েদ রাদিয়াল্লাহ আনহু নিশান হাতে নিয়েছে এবং শহীদ হয়ে গেছে। এরপর জাফর রাদিয়াল্লাহ আনহু ঝাণ্ডা হাতে নিলো এবং সে-ও শহীদ হয়ে গেলো। অতপর আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন রাওয়াহা পতাকা গ্রহণ করলো এবং সেও শাহাদাত প্রাপ্ত হলো। এখন সেই ব্যক্তি ঝাণ্ডা হাতে নিলো যে আল্লাহর অন্যতম তরবারী।"

অন্য এক রাওয়ায়েতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এ বাক্যাবলী সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে ঃ

"তাদের (যায়েদ, জাফর এবং আবদুল্লাহ) পর খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদ ঝাণ্ডা হাতে নিলেন। হে খোদা ! সে তোমার তরবারীসমূহের অন্যতম। তাকে সাহায্য করো।"

সেদিন থেকেই হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু সাইফুল্লাহ (আল্লাহর তরবারী) উপাধিতে ভূষিত হলেন।

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বলেছেন, মুতার যুদ্ধে তার হাতে ৯টি তরবারী ভেঙ্গেছিলো। শুধুমাত্র একটি ইয়েমেনী তরবারী অবশিষ্ট ছিলো। মুতার যুদ্ধের সময় রণ ক্ষেত্রের চিত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে পেশ করা হয়েছিলো। অথবা অহীর মাধ্যমে সকল খবর অবহিত করা হয়েছিলো। এ দু'য়ের যেটিই ঘটুক না কেন চরিতকাররা এ ব্যাপারে একমত যে, মুজাহিদদের মদীনা প্রত্যাবর্তনের বেশ কিছুদিন আগেই হুজুর সাল্লাল্লাহু

www.bjilibrary.com

আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত যায়েদ রাদিয়াল্লাহ আনহু, হযরত জাফর রাদিয়াল্লাহ আনহু ও হযরত আবদুল্লাহর শাহাদাতের খবর সাহাবীদেরকে প্রদান করেছিলেন। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর অসাধারণ তৎপরতা এবং কৃতিত্বের কথাও তিনি উল্লেখ করেছিলেন। এ ঘটনাকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুজিযার মধ্যে গণ্য করা হয়।

মক্কা বিজয়কালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলো ১০ হাজার সাহাবী। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদও তাদের সাথে ছিলেন। মক্কা বিজয়ের কথা শতাব্দী বছর পূর্বে তাওরাতে (কিতাবে ইসতিসনা) এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ "খোদাওন্দ সিনা থেকে এলেন। শায়ীর থেকে সেখানে আবির্ভূত হলেন এবং ফারান পর্বত থেকে চমকিত হলেন এবং ১০ হাজার পবিত্র আত্মাসহ এসেছিলেন তাঁর দক্ষিণ হস্তে নুরানী শরীয়াত ছিলো।"

মদীনা থেকে রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে ইসলামী বাহিনীর দক্ষিণ দিকের অফিসার নিয়োগ করলেন। এ বাহিনীতে সুলাইম, মাযিনা, আসলাম, গিফার, জাহিনা প্রভৃতি আরব গোত্রসমূহ অন্তর্ভুক্ত ছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পবিত্র হেরেম শরীফে যুদ্ধ করতে চাননি। এজন্য কাফেররা বাধা না দেয়া পর্যন্ত তিনি কারোর ওপর তরবারী না ওঠানোর জন্য মুসলমান বাহিনীর প্রতিটি সদস্যের প্রতি নির্দেশ দিয়েছিলেন। মক্কার মুশরিকরা সামষ্টিকভাবে মুসলমানদের বাধা দেয়ার হিম্মত করেনি। অবশ্য ইকরামাহ বিন আবু জেহেল এবং সাফওয়ান বিন উমাইয়া বনি বকর এবং আহাবিশ গোত্রের কিছু লোকজনকে একত্রিত করে মুসলমানদের সে বাহিনীর ওপর হামলা (তীর নিক্ষেপ) করে বসলো, যার নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদ। তিনি উঁচু অংশ দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন। বাধ্য হয়ে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং তার সাথীরা তরবারী খাপ থেকে বের করলেন। তাঁরা মুশরিকদেরকে ভালোমতো ধোলাই দিলেন। শেষে তারা পালিয়ে গেলো। এ সংঘর্ষে তাদের ২৮জন মারা গেলো (তাদের মধ্যে ২৪জন ছিলো কুরাইশ এবং ৪জন ছিলো হাযিল গোত্রের) এবং মুসলমানদের ২জন (অন্য রাওয়ায়েত মতে তিনজন) শহীদ হলেন। অন্য আর এক রাওয়ায়েতে আছে, শাহাদাত প্রাপ্ত দু' মুসলমান হযরত কুরয রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন জাবের ফাহরী এবং হাবিশুল আশয়ার রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্য কোনো রাস্তায় গিয়ে পড়েছিলেন। মুশরিকরা একাকী পেয়ে তাদেরকে শহীদ করে ফেলে।

www.bjilibrary.com

সহীহ্ আল বুখারীতে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ঘটনার কথা জানতে পেরে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। তিনি আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! প্রথমে তারাই আমাদের ওপর আক্রমণ করেছিলো। আমরা আত্মরক্ষামূলক সেই হামলার জবাব দিয়েছিলাম।"

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "ভালো, আল্লাহর যা মর্জি।"

মক্কা বিজয়ের ৫দিন পর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে ৩০জন অশ্বারোহী সহ নাখলাহ উপত্যকায় অবস্থিত কুরাইশদের এক বড় মূর্তি "আল উজ্জা"কে মিসমার করার জন্য প্রেরণ করলেন। কিনানার কুরাইশ এবং মুদির প্রভৃতি গোত্রের লোকেরা এ মূর্তিকে সীমাহীন সম্মান করতো। উজ্জার মন্দিরের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বভার ন্যস্ত ছিলো বনু শাইবানের ওপর এবং মক্কা থেকে ১০ মাইল দূরে এক বাগানে (আমেরের বাগান) তা অবস্থিত ছিলো। এ বাগানের সংশ্লিষ্টতার কারণে তা নাখলাহ উপত্যকার নামে বিখ্যাত ছিলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু ৮ম হিজরীর ২৫শে রমযান সেখানে পৌঁছে উজ্জা এবং তার মন্দির ধ্বংস করে ফেললো। সেখান থেকে মক্কা ফিরে এসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাড়ে তিন'শ সাহাবীসহ ইসলামী দাওয়াতের লক্ষ্যে তাঁকে বনু জাযিমার দিকে প্রেরণ করলেন। তারা ছিলো বনু কিনানার একটি শাখা। ইয়ালামলামের দিকে মক্কা থেকে একদিনের দূরত্বের পথে তারা বসবাস করতো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ মত তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তারা আগেই ইসলাম কবুল করেছিলেন কিন্তু তাদের মধ্যে কিছু ব্যক্তি অজ্ঞতার কারণে সঠিক বাক্যে নিজেদের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করতে পারলো না এবং আসলামনা (অর্থাৎ আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি)—এর পরিবর্তে "সাবানা" (অর্থাৎ আমরা দীন পরিবর্তন করেছি) বললেন। এর আসল মর্মার্থ ছিলো আমরা পিতার ধর্ম পরিত্যাগ করে নতুন দীন (ইসলাম) গ্রহণ করেছি। বস্তুত কুরাইশ মুশরিকরা মুসলমানদেরকে সাবি বলতো। এজন্য বনু জাযিমার ঐ লোকেরাও ইসলাম গ্রহণের কথা "সাবি" শব্দ দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু মনে করলেন, তারা বেদীন হওয়ার কথা প্রকাশ করছে। সুতরাং তিনি তাদেরকে হত্যা করালেন। কতিপয় রাওয়ায়েতে আছে, হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বনু জাযিমার সকলকে গ্রেফতার করে নিয়ে সাথীদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। অতপর তাদের হত্যার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু হযরত আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহ আনহু

www.bjilibrary.com

বিন আওফ, হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু, হযরত আবু কাতাদাহ এবং অন্যান্য অনেক সাহাবী নিজেদের কয়েদীকে ছেড়ে দিলেন। অবশ্য বনু সুলাইম নিজের কয়েদীদেরকে হত্যা করে ফেললো।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ঘটনার খবর পেয়ে খুবই দুঃখিত হলেন এবং আকাশের দিকে হাত তুলে বললেন, "হে আল্লাহ ! খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদ যাকিছু করেছে তা থেকে আমি মুক্ত।" অতপর হযরত আলী কাররামুল্লাহ ওয়াজহাহুকে তাদের সবার শোণিত পাতের মূল্য বা খেসারত দিয়ে প্রেরণ করলেন। তিনি বনু জাযিমার কাছে গমন করলেন এবং যত মানুষ নিহত হয়েছিলেন তাদের সবার খেশারত বা দিয়াত আদায় করলেন। এমনকি কারোর কুকুরের মূল্যও তিনি আদায় করেছিলেন। এরপর যত মাল বেঁচে ছিলো তাও তিনি তাদের মধ্যে বন্টন করে দেন।

বনু জাযিমার অভিযানের পর ৮ম হিজরীর শাওয়াল মাসে হুনাইনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদ ইসলামী বাহিনীর অগ্রবর্তী দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। বনু সুলাইম গোত্রের একশ' সোয়াশ সৈন্য এ দলে ছিলো। বনু হাওয়াযেন গোত্র নিজেদের অবস্থান থেকে মুসলমানদের ওপর তীব্রভাবে তীর নিক্ষেপ করলো। তাতে তাদের মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টি হলো। কিন্তু অবিলম্বে পরিস্থিতি সামলে নিয়ে মুসলমানরা প্রচণ্ডভাবে জবাবী হামলা করলো। ফলে বনু হাওয়াযেন গোত্র এবং তাদের সাথীদের পরাজয় ঘটলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদ এ যুদ্ধে জান-প্রাণ দিয়ে লড়াই করলেন এবং কয়েকটি আঘাত পেলেন। যুদ্ধ শেষ হলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সেবা শুশ্রূষার জন্য তাশরীফ আনলেন। ইবনে আসির রাদিয়াল্লাহ আনহু বর্ণনা করেছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ক্ষতস্থানসমূহে ফুঁ দিলেন এবং তিনি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠলেন।

ইবনে বুরহান উদ্দীন হালাবী (র) "আস সিরাতুল হালাবিয়া" গ্রন্থে লিখেছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর সেবা শুশ্রূষার জন্যে বিভিন্ন নির্দেশ দিয়েছিলেন।

হুনাইনের যুদ্ধের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তায়েফ অবরোধ করলেন। এবারও তিনি হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে ইসলামী বাহিনীর অগ্রবর্তী দলের অফিসার নিয়োগ করলেন। অবরোধকালে হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহ আনহু অবরুদ্ধ মুশকিরদের যুদ্ধের আহ্বান জানালেন। কিন্তু কেউই তাঁর মুকাবিলা করতে বের হয়ে আসার সাহস করলো না। প্রায় এক

www.bjilibrary.com

মাস পর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন কারণে অবরোধ প্রত্যাহার করে নিলেন।

নবম হিজরীর প্রথম দিকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনু মুসতালিক গোত্রের মুরতাদ হয়ে যাওয়ার খবর পেলেন। এ গোত্র দু' বছর আগে ইসলাম গ্রহণ করেছিলো। তাদেরকে শিক্ষাদানের জন্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে প্রেরণ করলেন। প্রেরণের মুহূর্তে তারা নামায পড়ে কিনা তা ভালোভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করার নির্দেশও তিনি তাঁকে দিলেন। যদি নামায পড়ে তাহলে তাদের ওপর আক্রমণ থেকে বিরত থাকতে বললেন। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু নিজের বাহিনীসহ বনু মুসতালিক গোত্রের বস্তিতে পৌছলেন। এ সময় রাত হয়ে গিয়েছিলো। কতিপয় ব্যক্তিকে তিনি বনু মুসতালিকের অবস্থা অবহিত হওয়ার জন্য প্রেরণ করলেন। তাঁরা ফিরে এসে জানালো, সমগ্র গোত্রই ইসলামের ওপর কায়েম আছে। তারা নিয়ম মত আযান দেয় এবং নামায পড়ে। সকালে সকালে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বস্তিতে প্রবেশ করলেন। বনু মুসতালিক গোত্রের লোকেরা তাঁকে উষ্ণ সম্বর্ধনা জ্ঞাপন এবং খুব খাতির আত্তির করলো। সুতরাং তিনি তাদের সাথে কোনো সংঘর্ষে লিপ্ত হলেন না এবং ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সব অবহিত করলেন।

নবম হিজরীর রযব মাসে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোমীয়দের আশংকামূলক হামলা মুকাবিলার জন্য ৩০ হাজার সাহাবী সমেত তাবুক তাশরীফ নিলেন। এ দীর্ঘ কঠিন সফরে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহযাত্রী ছিলেন। তাবুক পৌছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে কোনো রোমীয় সৈন্য পেলেন না। তবুও তিনি সেখানে সাবধানতামূলকভাবে ২০ দিন অবস্থান করলেন। তিনি এ সময় আশেপাশের খৃষ্টান সরদারদেরকে অনুগত বানানোর দিকে মনোযোগ দিলেন। তারা রোমের কাইসারের করদাতা ছিলো এবং মুসলমানদের বিরোধিতায় রোমীয়দের সাহায্য করতো। আইলাহ ও আজরাহর সরদাররা কোনো বাধা ব্যতিরেকেই আনুগত্য কবুল করলো। শুধুমাত্র দাওমাতুল জানদালের সরদার একিদর বিল আবদুল মালিক নাছরানী আনুগত্য করলো না। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদকে চার শ'র কিছু বেশী লোক দিয়ে তাকে অনুগত করার কাজে নিয়োগ করলেন। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু দাওমাতুল জানদালের কাছে পৌছলেন। এ সময় একিদরের সহোদর হাসান এবং অন্যান্য বহু লোক সহ শিকারে বেরিয়েছিলো। জঙ্গলেই তাদের সাথে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ

www.bjilibrary.com

আনহুর সংঘর্ষ হয়ে গেলো। হাসান সংঘর্ষে মারা গেলো এবং হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ্ আনহু একিদরকে গ্রেফতার করলেন। বাকীরা পালিয়ে দুর্গে আশ্রয় নিলো। একিদর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌঁছে জিযিয়া প্রদান, দুই হাজার উট, আটশ' ঘোড়া, চারশ' যিরা এবং চারশ' নিযাহ্ দেয়ার প্রস্তাব পেশ করলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ্ আনহু এ প্রস্তাব মেনে নিলেন। সুতরাং একিদর এবং তার অন্য সহোদর মাছাদিয়া জিনিসপত্তর নিয়ে তাবুক পৌঁছলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে অবস্থান করছিলেন। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু একিদরকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে পেশ করলেন। সে আনুগত্য কবুল করে হাদীয়া পেশ করলো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিযিয়া কবুল করে নিলেন এবং তার জান ও মালের লিখিত নিরাপত্তা দান করলেন। এভাবে সে দাওমাতুল জানদালের ওপর ইসলামী রাষ্ট্রের একজন করদাতা সরদার হিসেবে বহাল হলো।

দশম হিজরীতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদকে চারশ' অশ্বারোহী সহ ইসলামের দাওয়াত প্রদানের জন্যে বনু আবদুল মাদানের দিকে নাজরান প্রেরণ করলেন। এ গোত্র বনু হারিস বিন কাবের একটি শাখা। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু মদীনা থেকে রওয়ানা হলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সময় তাঁকে তাদের প্রতি তিনবার ইসলামের দাওয়াত দানের হেদায়াত দিলেন। তারা যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে সেখানে কিছুদিন অবস্থান করে তাদেরকে ইসলামের হুকুম-আহকামের শিক্ষাদানের নির্দেশ প্রদান করলেন। আর যদি তারা বিদ্রোহ করে, তাহলে তাদের সাথে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে যুদ্ধের ইখতিয়ার দিয়ে দিলেন। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ্ আনহু নাজরান পৌঁছে বনু আবদুল মাদানকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। এ দাওয়াত তারা হৃষ্টচিত্তে কবুল করলো এবং ঈমান আনলো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ মুতাবেক হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু সেখানে অবস্থান করলেন এবং তাঁদেরকে কুরআন, সুন্নাহ ও আহকাম এবং মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কিত শিক্ষাদানে মশগুল হয়ে পড়লেন। কিছুদিন পর তিনি এক পত্রে সকল অবস্থা লিখে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবহিত করলেন। জবাবে তিনি লিখলেন, বনু আবদুল মাদানের একটি প্রতিনিধিদলসহ তুমি মদীনা চলে এসো। সুতরাং হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু তাদের একটি প্রতিনিধিদলসহ মদীনা পৌঁছলেন এবং সেই দলকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাজির করলেন। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু

www.bjilibrary.com

আলাইহি ওয়া সাল্লামের দর্শন এবং বাইয়াতের গৌরবে গৌরবান্বিত হয়ে স্বদেশ ফিরে গেলেন।

ইবনে জারীর তাবারী (র) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দশম হিজরীতে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদকে ইসলামের তাবলীগের জন্যে ইয়েমেন প্রেরণ করেছিলেন। তিনি সেখানে ৬ মাস অবস্থান করে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকলেন। কিন্তু তাদের ওপর কোনো প্রভাব পড়লো না। এরপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী কাররামাল্লাহ ওয়াজহাহুকে সেখানে পাঠালেন। তাঁর তাবলীগের ফলে ইয়েমেনের অধিকাংশ মানুষ অল্প দিনেই ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেন।

ইবনে সায়াদ (র) এবং ইবনে হিশাম (র) এ ঘটনাকে অন্যভাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা লিখেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর নেতৃত্বে ইয়েমেনে একটি বাহিনী প্রেরণ করলেন। অন্যদিক থেকে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদকেও একটি বাহিনীসহ পাঠালেন এবং বললেন, তুমি যখন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে মিলিত হবে তখন সম্মিলিত বাহিনীর নেতা হবেন আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু। তিনি তাদেরকে প্রথমে হামলা না করার নির্দেশও দিলেন। যদি ইয়েমেনবাসীরা তোমাদের ওপর হামলা করে বসে তাহলে তোমরা আত্মরক্ষা করতে পারো। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু ইয়েমেন পৌছে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তার জবাবে ইয়েমেনবাসীরা মুসলমানদের ওপর পাথর এবং তীর নিক্ষেপ করলো। হকপন্থীরা প্রথম জবাবেই তাদেরকে পিছু হটিয়ে দিলো। কিন্তু তাদের ওপর কোনো কঠোর আচরণ করলেন না এবং দ্বিতীয়বার তাদের সামনে ইসলাম পেশ করলেন। এবার তারা স্বেচ্ছায় এবং আনন্দচিত্তে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিলেন।

মিসরীয় ঐতিহাসিক আবু যায়েদ শালবী নিজের পুস্তক "খালিদ সাইফুল্লাহতে" তাবারীর (র) রাওয়ায়েতের সমালোচনা করেছেন। তিনি এ বর্ণনাকে জ্ঞান এবং ইতিহাস উভয় দিক থেকেই গ্রহণযোগ্য নয় বলে অভিহিত করেছেন।

দশম হিজরীতেই হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিদায় হজ্জে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহযাত্রী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন।

মখদুম মুহাম্মদ হাশিম সিন্ধী (র) নিজের পুস্তক "বাযলুল কুওয়াতে" লিখেছেন, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ১১ হিজরীতেই

www.bjilibrary.com

(ইন্তেকালের কিছুদিন পূর্বে) হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর নেতৃত্বে একটি বাহিনী বনু খাছয়ামের দিকে প্রেরণ করেছিলেন। তারা ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশের পরিবর্তে সেজদায় অবনত হয়ে পড়েছিলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে তাদের কিছু লোককে হত্যা করে ফেলেন। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ খবর পেয়ে নিহতদের অর্ধেককে দিয়াত আদায় করেছিলেন।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু খলিফা নির্বাচিত হন। এ সময় মিথ্যা নবুয়াতের অনুসরণকারীরা এবং ধর্মদ্রোহীরা সমগ্র আরবে এক বিশৃংখলার রাজত্ব কায়েম করে। বিশৃংখলাকারীদের মধ্যে তিন শ্রেণীর লোক ছিলো। কোনো নবুয়াতের দাবীদারের প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করে এক শ্রেণীর লোক সম্পূর্ণরূপে ইসলাম পরিত্যাগ করেছিলো। দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছিলো নামায এবং যাকাতে কম ও মাফ চাওয়ার দাবীদার ব্যক্তিরা। যাকাত অস্বীকারকারী ছিলো তৃতীয় দলে। তারা যাকাতকে খিরাজ মনে করে একে নিজের স্বাধীনতা বিরোধী মনে করতো। এ তিন দলের বিরুদ্ধে জিহাদ প্রশ্নে আল্লাহ তাআলা হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহুর বুক প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন। বস্তুতঃ এ ভয়াবহ এবং নাজুক পরিস্থিতিতে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর মত পূর্ণ ঈমান, দৃঢ় ও স্থিরচিত্ত এবং নির্ভীক ব্যক্তিত্বেরই প্রয়োজন ছিলো। মুরতাদ অথবা ধর্মদ্রোহীদের সামনে তিনি কোনোক্রমেই মাথানত করলেন না। ভয়ংকর পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে কতিপয় সাহাবী তৃতীয় দলভুক্তদের (যাকাত অস্বীকারকারী) সাথে নরম ব্যবহারের পরামর্শ দিলেন। কিন্তু তিনি বললেন ঃ

"[রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর] অহীর সিলসিলা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।—দীন পূর্ণত্বে পৌছেছে। আমার জীবনেই কি তা খণ্ডিত এবং কর্তিত করা হবে ? আল্লাহর কসম ! যদি (ফরয যাকাত থেকে) সামান্য রশির অংশ দিতেও কেউ অস্বীকার করে তাহলে আমি তার বিরুদ্ধে জিহাদ করবো।"

তিনি যা বলেছিলেন অতপর তা বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছেন। ঈমানী শক্তি এত প্রবল ছিলো যে, এ নাজুক পরিস্থিতিতেও তিনি হযরত উসামা রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে সাতশ' সাহাবী সমেত সিরিয়ার সীমান্তের দিকে (রোমীয়দের বিরুদ্ধে মুতার যুদ্ধের প্রতিশোধ গ্রহণার্থে) প্রেরণ করলেন। সে মুহূর্তে মদীনা থেকে এত সংখ্যক সাহাবীকে বাইরে প্রেরণের ভয়াবহতা সম্পর্কে যখন তাঁকে পরামর্শ দেয়া হলো। তখন তিনি বললেন ঃ

www.bjilibrary.com

"সেই সত্ত্বার কসম ! যার কজায় আমার জীবন রয়েছে। আমি যদি এটাও বুঝতাম যে, হিংস্র প্রাণী আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। তবুও আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ পালনার্থে উসামা বাহিনীকে অবশ্যই প্রেরণ করতাম। বস্তিতে যদি আমি ছাড়া একজন শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণকারীও অবশিষ্ট না থাকতো তাহলেও উসামা বাহিনী প্রেরণের নির্দেশ অবশ্যই দিতাম।"

উসামা বাহিনী প্রেরণের পর বনু আসাদ, ফাযারাহ, গাতফান, ছা'লাবাহ, মাররাহ, আবাছ, কিনানাহ এবং জবিয়ানের মুরতাদ গোত্রসমূহ মদীনা মুনাওয়ারার ওপর হামলার পরিকল্পনা করলো। তাদের এক অংশ 'আবরাক' এবং অপর অংশ 'জুল কিসসা'তে তাঁবু ফেললো। উভয় স্থানই মদীনার উপকণ্ঠে ছিলো। মুরতাদরা জুল কিসসা থেকে একটি প্রতিনিধি দল হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে প্রেরণ করলো। প্রতিনিধি দলটি যাকাত মাফ চাওয়ার বক্তব্য নিয়ে এসেছিলো। কিন্তু রাসূলের খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু তাদেরকে পরিষ্কার জবাব দিলেন। প্রতিনিধি দলের ফিরে যাওয়ার তৃতীয় দিনে মুরতাদরা মদীনার ওপর হামলা করে বসলো। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু মদীনাবাসীর একটি দল সহ তাদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে মুকাবিলা করলেন এবং তাদের ভেগে যেতে বাধ্য করলেন। মুসলমানরা তাদের পেছনে পেছনে জি হাসসা পর্যন্ত ধাওয়া করলো। সেখানে তারা নিজেদের অনেক লোক রেখে এসেছিলো। তারা মশকে বাতাস ভরে রেখেছিলো। ধাওয়া করতে করতে উষ্ট্রারোহী মুসলমানরা যখন সেখানে পৌছলো তখন তারা মশকগুলোকে উটের সামনে ঝুলিয়ে দিলো এবং সাথে সাথে নেচে কুঁদে ঢাক ও ঢোল প্রভৃতি বাজানো শুরু করলো। এতে উট ভড়কে গেলো এবং পিছনে হটতে আরম্ভ করলো। মুরতাদরা মনে করলো যে, মুসলমানরা পালিয়ে গেছে। তারা জি হাসসার পশ্চাতে জুল কিসসায় অবস্থানরত সাথীদেরকে ডেকে আনলো এবং পুনরায় মদীনার ওপর হামলার পরিকল্পনা আঁটতে লাগলো। এদিকে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু উষ্ট্রবাহিনী মদীনা ফিরে আসার সাথে সাথে দ্বিতীয়বার হামলার ব্যবস্থা করলেন এবং রাতেই রওয়ানা করে অতি প্রত্যুষে মুরতাদদের ওপর হঠাৎ করে হামলা করে বসলেন। হোবাল বাহিনীর সরদার (নবুয়াতের দাবীদার তোলায়হার ভাই) মারা গেলো এবং অবশিষ্ট সৈন্য স্তম্ভিত হয়ে পালিয়ে গেলো। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু জুল কিসসা পর্যন্ত তাদেরকে ধাওয়া করলেন। অতপর নু'মান রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন মুকাররানকে কিছু সৈন্যসহ সেখানে রেখে মদীনা ফিরে এলেন। তাঁর প্রত্যাবর্তনেব পর বনু জবিয়ান এবং আবাছের মুরতাদরা সুযোগ পেয়ে বহু মুসলমানকে নৃশংসতার সাথে শহীদ করে ফেললো। (এক

www.bjilibrary.com

রাওয়ায়েত অনুসারে এ যালেমরা মুসলমানদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে ফেলেছিলো এবং তাদেরকে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছিলো)। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু এ নির্যাতনের খবর পেয়ে কসম খেয়ে বললেন, মুরতাদদের কাছ থেকে মুসলমান হত্যার প্রতিশোধ না নেয়া পর্যন্ত তিনি শান্তির সাথে বসবেন না। ইত্যবসরে হযরত উসামা রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহ আনহু অভিযানে সফল হয়ে মদীনা ফিরে এসেছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁকে মদীনায় নিজের স্থলাভিষিক্ত করলেন এবং স্বয়ং একটি বাহিনী নিয়ে মুরতাদদের মুকাবিলার জন্য রওয়ানা হয়ে গেলেন। 'আবরক' নামক স্থানে আবাছ, জুবিয়ান, বকর এবং ছালাবার মুরতাদরা তাঁর মুখোমুখি হলো। মুসলমানদের কাছে তারা পরাজিত হলো এবং আবরক থেকে বিতাড়িত হলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খলীফার নির্দেশ মুতাবিক আবরাককে (বনি জুবিয়ানের আবাসস্থল) মুজাহিদদের ঘোড়ার চারণ ভূমিতে পরিণত করা হলো।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু মদীনা ফিরে এলেন। ফিরে এসে আরবের ব্যাপক এলাকায় ছড়িয়ে থাকা মুরতাদদেরকে পুরোপুরি উৎখাতের চিন্তা করলেন। এ লক্ষ্যে তিনি ১১টি বাহিনী গঠন করলেন এবং প্রত্যেক বাহিনীকে বিভিন্ন এলাকার মুরতাদ ও বিদ্রোহীদের উৎখাতে নিয়োগ করলেন। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুও এক বাহিনীর আমীর নিযুক্ত হলেন। তুলাইহা বিন খুয়ায়েলদ আসদী এবং তারপর মালিক বিন নুয়াইরাহ বাতাহীকে উৎখাতের জন্যে তাঁকে নিয়োগ করা হলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু নিজের বাহিনীসহ বাযাখার দিকে অগ্রসর হলেন। স্থানটি ছিলো তুলাইহা বিন খুয়ায়েলদের আবাসস্থল। লোকটি বনু আসাদ বিন খুযায়মার গোত্রভুক্ত এবং আরবের অন্যতম বাহাদুর হিসেবে পরিগণিত হতো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু বিদায় হজ্জের পর তার ধ্যান-ধারণা পাল্টে যায় এবং নিজেই নবুয়াতের দাবী করে বসে। বনু আসাদ এবং অন্যান্য গোত্রের বহু মানুষ তার অনুসারী হয়ে পড়ে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ খবর পেয়ে হযরত জিরার রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আযুওয়ারকে তাকে উৎখাতের জন্যে নিয়োগ করেন। হযরত জিরার রাদিয়াল্লাহ আনহু "ওয়ারদাত" নামক স্থানে তুলাইহাকে পরাজিত করেন। যুদ্ধের সময় একবার তুলাইহা হযরত জিরার রাদিয়াল্লাহ আনহুর সামনে এসে পড়লো। তিনি তার ওপর তরবারী চালালেন। কিন্তু সে বেঁচে গেলো। এতে তার অনুসারীদের মধ্যে (পরাজিত হওয়ার পরও) এ খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো যে, তুলাইহার শরীরের ওপর কোনো অস্ত্র কাজ করে না।

www.bjilibrary.com

এদিকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওফাত পেলেন। হযরত জিরার রাদিয়াল্লাহ আনহু মদীনা ফিরে এলেন। তাঁর প্রত্যাবর্তনের পর তুলাইহার শক্তি আরো বেড়ে গেলো। আসাদ, আবাছ, গাতফান, জবিয়ান এবং তাই গোত্রসমূহ তাকে সমর্থন করলো। অবশ্য তাই গোত্রের নেতা হযরত আদি রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন হাতেম ইসলামের ওপর কায়েম রইলেন। তিনি মদীনা গিয়ে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহুকে নিজের গোত্রের পথভ্রষ্টতা সম্পর্কে অবহিত করলেন। এ সময় তিনি হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর রওয়ানা হওয়ার আগেই হযরত আদি রাদিয়াল্লাহ আনহুকে তাঁর গোত্রে প্রেরণ করলেন। যাতে তিনি নিজের গোত্রের লোকদেরকে বুঝিয়ে শুনিয়ে পুনরায় ইসলামে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে পারেন। এমন যাতে না হয় যে, হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু তাদেরকে ধ্বংস এবং উৎখাত করে ছাড়ে।

হযরত আদি রাদিয়াল্লাহ আনহু নিজের গোত্রে পৌছে সবাইকে একত্রিত করলেন এবং সবাইকে বুঝালেন যে, ইসলামী বাহিনী এখানে আসার জন্যে এক পায়ে খাড়া হয়ে আছে। এটাই উত্তম যে, তাদের আগমনের পূর্বেই তোমরা ইসলামে ফিরে এসো। নচেৎ তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু বাদ-প্রতিবাদের পর তারা হযরত আদি রাদিয়াল্লাহ আনহুর কথা মেনে নিলো এবং আনুগত্যের অঙ্গীকারের সাথে সাথে তিনদিনের সময় চেয়ে তাঁর কাছে এক আবেদন পেশ করলো। আবেদনে তারা জানালো, তাই গোত্রের যারা তুলাইহার বাহিনীতে রয়েছে তাদের কাছে তারা যাবে এবং তাদেরকে ফিরিয়ে আনবে। অন্যথা আনুগত্যের ঘোষণা তাদেরকে মুসিবতে নিক্ষেপ করবে। তুলাইহা তাদেরকে হত্যা করবে অথবা জেলে প্রেরণ করবে। হযরত আদি রাদিয়াল্লাহ আনহু তাদের বক্তব্য অনুযায়ী হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে গমন করলেন এবং তাঁকে তিনদিন পর্যন্ত তাই আগমন ঠেকিয়ে রাখলেন। ইত্যবসরে তাই গোত্রের লোকেরা নিজের সাথীদেরকে তুলাইহার বাহিনী থেকে কোনো বাহানা বানিয়ে ফিরিয়ে আনলো এবং সবাই পুনরায় মুসলমান হয়ে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

এরপর হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু জাদিলা গোত্রের ওপর হামলার ইরাদা করলেন। হযরত আদি রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁকে বললেন, তাই গোত্র একটি পাখীর মতো। তার এক বাহু বা ডানা হলো জাদিলা। আপনি একটু অপেক্ষা করুন তাঁদেরকেও পুনরায় ইসলামে ফিরিয়ে আনার জন্য আমি চেষ্টা করে দেখি। আল্লাহ পাক যেভাবে তাই গোত্রকে হেদায়াত দিয়েছিলেন সম্ভবতঃ সেভাবে তাদেরকেও দিতে পারেন। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত আদি রাদিয়াল্লাহ আনহুর দরখাস্ত আনন্দচিত্তে মঞ্জুর করলেন। সুতরাং হযরত

১৬—

www.bjilibrary.com

আদি রাদিয়াল্লাহু আনহু জাদিলা গোত্রের কাছে গেলেন এবং বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ প্রচেষ্টায় তাদেরকে পুনরায় ইসলামে ফিরিয়ে আনলেন। এভাবে তাদের এক হাজার সওয়ার ইসলামী বাহিনীতে শামিল হলো।

অতপর হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত উক্কাসা রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন মিহসান এবং হযরত সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন আকরাম আনসারীকে শত্রুর খোঁজ নেয়ার জন্যে বাযাখার দিকে প্রেরণ করলেন। ঘটনাক্রমে তাঁরা তুলাইহার এক ভাইকে পেলেন এবং তাঁকে হত্যা করে ফেললো। (কতিপয় রাওয়ায়েতে তার নাম হোবাল বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু অন্য রাওয়ায়েত মুতাবিক মুরতাদরা মদীনার ওপর যখন তার নেতৃত্বে হামলা করে তখন সে নিহত হয়) তুলাইহা যখন এ খবর পেল তখন সে নিজের অন্য ভাই সালমাকে নিয়ে বের হলো। সালমা হযরত সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এবং তুলাইহা হযরত উক্কাসা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে শহীদ করে ফেললো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু অগ্রযাত্রা করে সেই স্থানে পৌঁছে তাদের উভয়ের লাশ দেখে তাই গোত্রে ফিরে এলেন। কেননা তুলাইহার অবস্থা না জেনে তার ওপর চূড়ান্ত আঘাত হানা অনুচিত। কিছুদিন সেখানে অবস্থানের পর তিনি শত্রু শক্তি সম্পর্কে ধারণা লাভ করলেন এবং তাই গোত্রের কাছে আরো সাহায্য কামনা করলেন। তারা বললো, বনু কায়েসের সাথে মুকাবিলায় আমরা আপনাকে অতিরিক্ত সাহায্য দিতে পারি। কিন্তু বনু আসাদের সাথে আপনাকেই মুকাবিলা করতে হবে। কেননা তারা আমাদের মিত্র।

নিজের গোত্রের এ বক্তব্য হযরত আদি রাদিয়াল্লাহু আনহুর মনঃপুত হলো না। তিনি বললেন, খোদার কসম! আমি বনু আসাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে কোনোক্রমেই দ্বিধা করবো না। তারা যখন ইসলামের দুশমনই হয়ে গেছে তখন আমাদের মিত্র থাকলো কি করে?

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু মানুষের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপারে খুব ওয়াকিবহাল ছিলেন। তিনি হযরত আদি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, বনু কায়েস এবং বনু আসাদ যে কোনো গোত্রের সাথে লড়াই করাই জিহাদ। এজন্যে তুমি তোমার গোত্রের মতের বিরোধিতা করো না। তারা সন্তুষ্টচিত্তে যাদের সাথে যুদ্ধ করতে চায় তাদেরই মুকাবিলায় অগ্রসর হও।

অতপর হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তুলাইহার মুকাবিলার জন্যে বাযাখার দিকে অগ্রসর হলেন। তুলাইহার বাহিনীতে বনু ফাযারার সাত শ' মুরতাদসহ আইনিয়াহ বিন হাসান ফাযারীও শরীক ছিলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বাযাখা পৌঁছলেন। এ সময় আইনিয়াহ বিন হাসান নিজের

www.bjilibrary.com

গোত্রসহ তাঁর সামনাসামনি হলো এবং উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হলো। তুলাইহা একদিকে (মানুষকে ধোঁকা দেয়ার জন্যে) অহীর অপেক্ষার বাহানা বানিয়ে চাদর মুড়ি দিয়ে বসে গেল। আইনিয়াহ যখন স্ববাহিনীতে দুর্বলতার লক্ষণ দেখতে পেল তখন দৌড়ে তুলাইহার কাছে এলো এবং জিজ্ঞেস করলো ঃ "জিবরাঈল (আ) এসেছেন কি ?"

সে বললো ঃ "না"।

আইনিয়া একথা শুনে পুনরায় যুদ্ধে চলে গেলো। যখন মুসলমানদের চাপ আরো বেড়ে গেলো তখন সে পুনরায় তুলাইহার কাছে এলো এবং জিজ্ঞেস করলো, "জিবরাঈল (আ) এসেছেন কি ?" তুলাইহা বললো, এখনো আসিনি। আইনিয়া বললো, মুসিবত চরমে উঠেছে। শেষ পর্যন্ত জিবরাঈল (আ) কবে আসবেন। একথা বলে আবারো যুদ্ধের ময়দানে চলে গেলো। এতক্ষণে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর চাপ এতো বেড়ে গেলো যে, তাদের পরাজয় নিশ্চিত হয়ে উঠলো। আইনিয়া তৃতীয়বার দৌড়াতে দৌড়াতে তুলাইহার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো এখনো জিবরাঈল (আ) আসেননি ? তুলাইহা বললো, হ্যাঁ এসেছিলেন। আইনিয়া বললো, কোনো অহী এনেছিলেন ? তুলাইহা বললো, অহী এনেছিলেন যে, "তোমার কাছেও সে ধরনের পেষণ যন্ত্র আছে যে ধরনের পেষণ যন্ত্র মুসলমানদের কাছে আছে এবং তোমার স্মরণ সে ধরনের যা তুমি কখনো ভুলবে না।" অন্য কথায় মুসলমানরা যে ধরনের সংঘর্ষে লিপ্ত সে ধরনের সংঘর্ষ তোমাদেরকেও করতে হবে এবং এ যুদ্ধের কাহিনী তোমরা কখনো ভুলতে পারবে না।

একথা শুনে আইনিয়া ক্রোধে ফেটে পড়লো এবং বললো ঃ "অবশ্যই আল্লাহ জেনে গেছেন যে, অদূর ভবিষ্যতে এমন ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে যা তুমি কখনো ভুলবে না।" একথা বলেই সে যুদ্ধের ময়দানে এলো এবং তার স্বরে বললো ঃ

"হে বনি ফাযারা ! খোদার কসম ! তুলাইহা নবী নয়। বরং সে একজন মিথ্যুক। আমি ফিরে যাচ্ছি। তোমরাও যুদ্ধ থেকে হাত গুটিয়ে নাও এবং স্বগোত্রে ফিরে যাও।"

বনু ফাযারা। একথা শুনেই পলায়নপর হলো। অবশিষ্টদের মধ্যে কিছু পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেলো এবং কিছু মুসলমান হয়ে গেলো। তুলাইহা প্রথম থেকেই ঘোড়া প্রস্তুত রেখেছিলো। তাতে নিজের স্ত্রীসহ সওয়ার হয়ে পালিয়ে গেলো। পালানোর সময় নিজের অনুসারীদের বললো, তোমাদের মধ্যে যারা পরিবার-পরিজনসহ পালাতে পার তারা পালাও। এভাবে মুহূর্তের মধ্যে ময়দান

www.bjilibrary.com

পরিষ্কার হয়ে গেলো। তুলাইহা বনু কালাবে গিয়ে আশ্রয় নিলো। পরে তুলাইহা দ্বিতীয়বার ইসলাম গ্রহণ করেছিলো এবং হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে ইরানীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন যুদ্ধে জীবন পণ অংশ নিয়ে নিজের বিচ্যুতির খেসারত দেন। বলা হয়ে থাকে যে, এ ধরনের এক যুদ্ধেই সে অত্যন্ত বাহাদুরীর সাথে লড়াই করে শহীদ হন।

বাযাখা থেকে তুলাইহার পলায়ন সুদূরপ্রসারী ফল দিয়েছিলো। অনেক গোত্র (বনু আমের বিন ছা'ছায়া, বনু সলিম, বনু হাওয়াযিন, বনু কাব প্রভৃতি) ধর্মদ্রোহিতা থেকে তাওবাহ করে দ্বিতীয়বার ইসলামের দুর্গে পরিণত হয়। প্রকৃতপক্ষে তুলাইহার প্রতি এসব গোত্রের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিলো। তারা অপেক্ষা করছিলো কোন্ পক্ষ বিজয়ী হয়। তুলাইহার পরাজয়ে তাদের সাহসে ভাটা পড়লো এবং হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিদমতে হাজির হয়ে তারা আনুগত্য প্রকাশ করলো। আনুগত্য প্রকাশকালে তারা তাঁর কাছে বাইয়াত করলো যে, তারা আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ঈমান আনছে। তারা নামায পড়বে এবং যাকাত দেবে। এ সকল বিষয়ে তারা তাদের পরিবার-পরিজনের পক্ষ থেকেও বাইয়াত করছে। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বাইয়াত গ্রহণ করে তাদের সবাইকে নিরাপত্তা দিলেন।

আসাদ, গাতফান এবং তাদের মিত্র গোত্রসমূহকেও হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ক্ষমা করে দিলেন। কিন্তু তাদের তাওবাহর সময় একটি শর্ত আরোপ করলেন। শর্তটি হলো ধর্মদ্রোহিতা কালে যারা নির্মমভাবে বহু মুসলমানকে হত্যা করেছিলো তাদেরকে মুসলমানদের কাছে ন্যস্ত করতে হবে। বস্তুত তাদেরকে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর সামনে হাজির করা হলো। তিনি তাদেরকে হত্যা করালেন। অবশ্য তাদের দু' নেতা কুররাত বিন হাইবিরাহ এবং আইনিয়াহ বিন হাসান ফাযারীকে গ্রেফতার করে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে প্রেরণ করা হলো। কতিপয় রাওয়ায়েত মতে তিনি তাদেরকে হত্যা করান এবং কতিপয় রাওয়ায়েত অনুযায়ী তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন।

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন ওয়ালিদ বাযাখায় এক মাস অবস্থান করলেন। এ সময়ে তিনি সেখানে শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠা এবং যাকাত আদায়ের কাজে ব্যস্ত রইলেন। ইত্যবসরে তিনি একটি খবর পেলেন। খবরের সারমর্ম হলো, বনু ফাযারার এক মহিলা উম্মে যুমাল সালামা বিনতে মালিক বিন হুজাইফা একটি বাহিনী সমেত মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ মহিলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে গ্রেফতার হয়ে মদীনা এসেছিলো এবং উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহার

www.bjilibrary.com

সুপারিশে মুক্তি পেয়েছিলো। মুসলমান হয়ে সে নিজের কবিলায় ফিরে যায় এবং সেখানে গিয়ে মুরতাদ বা ধর্মদ্রোহী হয়। তুলাইহার পরাজিত বাহিনীর কিছু সদস্য তার কাছে গিয়ে আশ্রয় নেয়। পূর্ব থেকেই মুরতাদদের একটি দল তার সাথে ছিলো। এভাবে বড় একটি বাহিনী তার পতাকাতলে সমবেত হলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে উৎখাতের জন্যে হাওয়াবের দিকে অগ্রসর হলেন। সেখানেই উম্মে যুমাল অবস্থান করছিলো। স্বয়ং উটে চড়ে মুকাবিলার জন্যে বের হলো। মুরতাদরা তার উটের চারপাশে একত্রিত হয়ে ভয়ানক যুদ্ধ করলো। উম্মে যুমালও অত্যন্ত বাহাদুরীর সাথে লড়াই চালালো। অসংখ্য মুরতাদ তাকে উৎসাহদানের জন্যে পতঙ্গের মত জীবন বাজী রেখে ঝাঁপিয়ে পড়লো। অবশেষে মুসলমানরা উটের কুঁচ কেটে মাটিতে শুইয়ে দিলো এবং উম্মে যুমালকে হত্যা করলো। এরপরই সব মুরতাদ কোনো মতে জীবন নিয়ে পালিয়ে গেলো।

তুলাইহা এবং উম্মে যুমালকে উৎখাতের পর হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন ওয়ালিদ মালিক বিন নুয়াইরাতুল ইয়ারবুয়ীর সাথে লড়াইয়ের জন্যে বাতাহর দিকে অগ্রসর হলেন। বনু তামিম গোত্রের শাখা বনু ছালাব বিন ইয়ারবুর সরদার ছিলো মালিক বিন নুওয়াইরাহ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে সে ইসলাম গ্রহণ করেছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনু তামিমের বিভিন্ন শাখার আমীর নিয়োগ করেছিলেন। এ সময় মালিক বিন নুওয়াইরাহ বনু ছালাবাহ বিন ইয়ারবুর আমীর নিয়োগপ্রাপ্ত হন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের পর ধর্মদ্রোহিতার ফেতনা শক্তিশালী হয়ে উঠলে মালিক বিন নুওয়াইরাহ এক আশ্চর্য ধরনের ভূমিকা অবলম্বন করে। সে পুরো মুরতাদও ছিলো না। আবার পাক্কা মুসলমানও ছিলো না। তার এ ভূমিকায় মনে হতো যে, মুসলমানরা সফল হলে সে মুসলমান থাকবে। আর মুরতাদরা সফল হলে মুরতাদ হয়ে যাবে। তাকে উৎখাত আবশ্যিক হয়ে পড়েছিলো। কেননা সে যাকাত প্রেরণ বন্ধ করে দিয়েছিলো। অন্যদিকে বনু তামিমের অন্যান্য শাখার নেতা যবরকান রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন বদর, সাফওয়ান বিন সাফওয়ান এবং ওয়াকি বিন মালিক প্রমুখ খেলাফতের দরবারে যাকাতের অর্থ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। মালিক বিন নুওয়াইরাহ কিছুদিন পূর্বে নবুয়াতের মিথ্যা দাবীদার জনৈক ছাজাহকে সমর্থন করেছিলো এবং তার কাছে মুরতাদদের যাতায়াত ছিলো। এক রাওয়ায়েতে আছে, রাহরাহানের ঝর্ণার কাছে কতিপয় সাথী নিয়ে সে যাকাতের উটের ওপর হামলা চালিয়ে তা লুটে নেয়। হামলার সময় চেঁচিয়ে সে নিজের সাথীদের বলেছিলো ঃ

www.bjilibrary.com

"এ উট তোমাদের সম্পদ। লুট করো। কাল কি হবে সে ব্যাপারে কোনো পরওয়া করবে না।"

ছাজাহ মুছাইলামা কাজ্জাব থেকে পৃথক হয়ে নিজের গোত্রে ফিরে গেলো এবং বেশীর ভাগ লোক তাওবা করে পুনরায় মুসলমান হলো। এতে মালিক বিন নুওয়াইরাহ অত্যন্ত ঘাবড়ে গেলো। তার কাছে অবস্থানরত মুরতাদদেরকে তার কাছে গমনাগমন নিষেধ করলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বাতাহ পৌছে মুজাহিদদেরকে বিভিন্ন গ্রামের দিকে প্রেরণ করলেন। প্রেরণের সময় তাদেরকে হেদায়াত দিলেন। হেদায়াতে তিনি বললেন, গ্রামে পৌছেই প্রথমে তোমরা আযান দেবে। আযানের জবাবে গ্রামবাসীরাও আযান দিলে তাদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে না। আর যদি কেউ আযানের জবাব না দেয় এবং তোমাদের বাধা দেয় তাহলে তাদের সাথে লড়াই করবে। মুজাহিদরা টহল দিতে দিতে মালিক বিন নুওয়াইরাহর গ্রামের কাছে পৌছে আযান দিলো। এ সময় গ্রামবাসীর আচরণ সম্পর্কে মুজাহিদদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হলো। কোনো কোনো সাহাবী জানান, তারা জবাবে গ্রাম থেকে আযানের আওয়াজ শুনেছেন। অন্যান্যরা জানান যে, গ্রামবাসীরা কোনো জবাব দেয়নি। সুতরাং তারা মালিক বিন নুওয়াইরাহ এবং তার সাথীদেরকে গ্রেফতার করে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে এনে হাজির করলো এবং সকল ঘটনা অবহিত করলো। তিনি তাদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে আটক রাখার নির্দেশ দিলেন এবং পরের দিন সকালে তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে বলে জানালেন। রাতে অত্যন্ত ঠাণ্ডা পড়েছিলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু কয়েদীদের প্রশ্নে এক নির্দেশে বললেন ঃ "দাফিয়্যু আছরাকুম" অর্থাৎ কয়েদীদেরকে ঠাণ্ডা থেকে বাঁচাও। কতিপয় আরব কবিলার ভাষায় বাক্যটির অর্থ কয়েদীদের হত্যা করো এও হতে পারতো। প্রখ্যাত সাহাবী জিরার রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আযুর এ অর্থই বুঝলেন এবং মালিক বিন নুওয়াইরাহ ও তার সাথীদের হত্যা করে ফেললো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু শুনে বললেন, "আল্লাহ যা চান তাই হয়।"

অন্য এক রাওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে মালিক বিন নুওয়াইরাহ অশোভন কথাবার্তা বলেছিলো এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শানে বেআদবীমূলক উক্তি করেছিলো। এজন্যেই তাকে হত্যা করা হয়। কথিত আছে যে, হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে কথোপকথনের সময় সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে বার বার "ছাহিবুকা" অর্থাৎ তোমার সাহেব এ বাক্য উচ্চারণ করেছিলো। আরো স্পষ্ট করে বললে বলা যায় যে, সে বলেছিলো তোমার সাহেব এটা

www.bjilibrary.com

বলতো। তোমার সাহেব তোমাকে এ নির্দেশ দিয়েছিলো ইত্যাদি। এতে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু অত্যন্ত রাগান্বিত হয়েছিলেন এবং বলেছিলেনঃ "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের সাহেব নন।" এরপর উভয়ের মধ্যে অত্যন্ত তিক্ত বাক্য বিনিময় হয়। মালিক বিন নুওয়াইরাহর বাচন ভঙ্গীতে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু উপসংহারে পৌছেছিলেন যে, সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত অস্বীকারকারী এবং ইসলাম ত্যাগ করেছে। সুতরাং তিনি তাকে হত্যা করান।

হযরত আবু কাতাদাহ আনসারী রাদিয়াল্লাহ আনহুও হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি মালিক বিন নুওরাইরাহকে হত্যা করা পসন্দ করেননি। কেননা তাঁর ধারণায় মালিকের গ্রাম থেকে আযানের আওয়াজ এসেছিলো। এজন্যে তাঁকে হত্যা করা বৈধ ছিলো না। বস্তুত তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে মদীনা চলে আসেন এবং হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর ব্যাপারে অভিযোগ করেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে মদীনা ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। তিনি আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা তাঁর কাছে পেশ করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খলীফা তাঁর ওজর কবুল করে নিলেন। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু সে সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি হযরত আবু কাতাদাহর মতের প্রতি সমর্থন দিলেন এবং হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে বরখাস্ত ও তাঁর থেকে কিসাস নেয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন, যে তরবারীকে আল্লাহ কাফেরদের ওপর নিক্ষেপ করেছেন তা আমি পুনরায় খাপে ভরতে পারি না।"

একথা বলে ব্যাপারটি শেষ করে দিলেন। তিনি অবশ্য বাইতুল মাল থেকে মালিক বিন নুওয়াইরাহর উত্তরাধিকারদেরকে রক্তের বদলা আদায় করেছিলেন। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু এ ব্যাপারে যদি কোনো কঠোরতা করেও থাকেন তাহলে সম্ভবতঃ তা ছিলো তাঁর ইজতিহাদি ভুল। এজন্যে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁকে দায়িত্বমুক্ত বলে অভিহিত করেছিলেন।

ধর্মদ্রোহিতার ফেতনা প্রশ্নে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু আরোপিত দায়িত্ব হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু অত্যন্ত সফলতার সাথে আঞ্জাম দেন। এরপর খেলাফত থেকে তিনি নতুন নির্দেশ লাভ করেন। নির্দেশে মুসায়লামা কাজ্জাবকে উৎখাতের দায়িত্বও তাঁর ওপর ন্যস্ত করা হয়। মুসায়লামা বিন হাবিবের সম্পর্ক ছিলো ইয়ামামার (নাজদ) বনু হানিফা গোত্রের সাথে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগের শেষ দিকে সে বনু

www.bjilibrary.com

হানিফা গোত্রের প্রতিনিধি দলের সাথে মদীনা আসে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাত করে। সাক্ষাতকালে সে এক অভিনব কথা বললো। সে জানালো, আপনার পর যদি আপনি আমাকে আপনার স্থলাভিষিক্ত করেন, তাহলে আমি এখনই আপনার হাতে বাইয়াত করছি।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র হাতে একটি লাঠি ছিলো। তিনি তা উঠিয়ে বললেন ঃ "উত্তরাধিকার নিয়োগ বা স্থলাভিষিক্তকরণ তো বড় জিনিস, আমি তোমাকে এ লাঠি দানও পসন্দ করি না। আল্লাহ তোমার জন্যে যা নির্ধারণ করে রেখেছেন তাই ঘটবে।"

অন্য এক রাওয়ায়েতে আছে, মুসায়লামা মুসলমান হয়েছিলো। কিন্তু স্বগোত্রে ফিরে মুরতাদ হয়ে গেলো এবং বলতে লাগলো যে, আমিও নবী। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের নবুয়াতে আমাকে অংশীদার বানিয়ে নিয়েছে। এজন্যে তাকে কাজ্জাব বা মিথ্যাবাদী বলা হয়। সে ইয়ামামাহ থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে এ চিঠি লিখলো ঃ খোদার রাসূল মুসায়লামা খোদার রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তরফ থেকে আসসালামু আলাইকা। আমি আপনার কাজে অংশীদার হয়েছি। অর্ধেক রাজত্ব আমার এবং অর্ধেক কুরাইশদের। কিন্তু কুরাইশরা হলো এক চরমপন্থী জাতি।"

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে এ জবাব প্রেরণ করলেন ঃ

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম। "আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের চিঠি মুসায়লামা কাজ্জাবের নামে। যে ব্যক্তি হেদায়াতের আনুগত্য করে তার ওপর সালাম। অতপর তুমি জেনো যে, রাজত্ব আল্লাহর। তিনি নিজের বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাকে ওয়ারিশ বানান এবং পরকালীন মঙ্গল পরহেযগারদের জন্যে।"

এ পত্র প্রেরণের কিছুদিন পরই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাত হয়। তখন মুসায়লামা অত্যন্ত জোরেশোরে নিজের নবুয়াতের প্রচার শুরু করে। বনু হানিফার এক ব্যক্তির নাম ছিলো আয়াছ বিন আনফুরা। ইসলাম গ্রহণের পর সে ইয়ামামা থেকে হিজরত করে মদীনা গিয়েছিলো এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র খিদমতে কুরআন ও হাদীস শিক্ষা লাভ করে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তরফ থেকে ইয়ামামাবাসীর জন্যে শিক্ষক নিয়োগ প্রাপ্ত হন। এ হতভাগা ইয়ামামা পৌঁছে মুসায়লামার সাথে মিলিত হয়ে প্রকাশ্যে ঘোষণায় বললো যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়াতে মুসায়লামা অংশীদার। রাসূল সাল্লাল্লাহু

www.bjilibrary.com

আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে সে স্বয়ং একথা শুনেছে। তার কথায় হাজার হাজার মানুষ পথভ্রষ্ট হলো এবং মুসায়লামার দাবী মেনে নিলো। মুসায়লামা অনেক সাজানো এবং ভারী ভারী কথা প্রণয়ন করলো। এসব কথা সে লোকদেরকে শুনাতো এবং বলতো এসব হলো অহী। শঠতা এবং প্রতারণার জোরে সে আশ্চর্য ধরনের বস্তু প্রকাশ এবং তাকে তাঁর মুজিযা হিসেবে চিত্রিত করতো। মদ এবং বদ কাজকে হালাল আখ্যায়িত করতো। এভাবে মুসায়লামার শক্তি দিন দিন বৃদ্ধি পেতে লাগলো। খেলাফতের পক্ষ থেকে মুসায়লামাকে উৎখাতের জন্যে দু'টি বাহিনী প্রেরণ করা হয়েছিলো। দু' বাহিনীর একটির নেতৃত্বে ছিলো হযরত ইকরামা রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবি জেহেলের ওপর। অপরটির নেতৃত্ব দিয়েছিলেন হযরত শুরাহ বিল হাসনাহ রাদিয়াল্লাহ আনহুর। উভয় বাহিনী ঐকবদ্ধ্যভাবে মুসায়লামার ওপর হামলার পরিবর্তে পৃথক পৃথক যুদ্ধ করলো এবং পরাজিত হলো। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু পরাজয়ের খবর পেয়ে হযরত ইকরামা রাদিয়াল্লাহ আনহু ও হযরত শুরাহবিল রাদিয়াল্লাহ আনহুকে অন্য অভিযানে নিয়োগ করলেন এবং হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে মুসায়লামার বিরুদ্ধে মুকাবিলার নির্দেশ দিলেন। এ সাথে তাঁর সাহায্যার্থে মুহাজির এবং আনসার সমন্বয়ে গঠিত নতুন বাহিনী প্রেরণ করলেন। এক রাওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদ মালিক বিন নুওয়াইরাহকে হত্যার প্রশ্নে জবাবদিহি শেষে মদীনা থেকে রওয়ানা দিচ্ছিলেন। এমন সময় হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু তাকে মুসায়লামার সাথে যুদ্ধের জন্যে ইয়ামামা গমনের নির্দেশ দেন এবং মুহাজির ও আনসারদের একটি বাহিনী তাঁর সাথে প্রেরণ করেন। এ সময় হযরত যায়েদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন খাত্তাব (হযরত ওমর ফারুকের ভাই) মুহাজিরদের এবং হযরত সাবিত রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন কায়েস আনসারী আনসারদের আমীর ছিলেন। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু ইয়ামামা পৌঁছলেন। মুসায়লামার নেতৃত্বে সে সময় ৪০ হাজার লোক একত্রিত হয়েছিলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর আগমনের খবর পেয়ে সে অগ্রসর হলো এবং আকরাবা (ইয়ামামার একটি বস্তি) নামক স্থানে তাঁবু স্থাপন করলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুও নিজের বাহিনীসহ সেখানে পৌঁছলেন। উভয় বাহিনী যখন পরস্পরের সামনা সামনি হলো তখন সর্বপ্রথম আয়াস বিন আনফুয়াহ ময়দানে এলো এবং মুসলমানদেরকে যুদ্ধের আহ্বান জানালো। হযরত যায়েদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন খাত্তাব তাঁর মুকাবিলায় সামনে এলেন এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই তাকে হত্যা করলেন। সাধারণ যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো। মুসায়লামার পুত্র শুরাহবিল নিজের কবিলাকে সম্বোধন করে বললো, হে বনু আবু হানিফা ! আজ জাতীয় মান- মর্যাদার দিন। জান-প্রাণ দিয়ে যুদ্ধ

করো। মুসলমানরা বিজয়ী হলে তোমাদের পরিবার-পরিজন তাদের কব্জায় চলে যাবে। এজন্যে নিজেদের মাল-ইজ্জত রক্ষা করো।

শুরাহবিলের ডাকে বনু হানিফার লোকজন চরমভাবে উত্তেজিত হলো এবং অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে মুসলমানদের ওপর হামলা করে বসলো। তাদের প্রচণ্ড হামলায় মুসলমানদের ব্যূহে বিশৃংখলা দেখা দিলো এবং পেছনে হটতে লাগলো।

ঐতিহাসিক তাবারি লিখেছেন, "মুসলমানরা এ ধরনের ঘোরতর যুদ্ধের সম্মুখীন কখনো হয়নি।" এ সঙ্গীন মুহূর্তে মুসলমান অফিসারবৃন্দ চিন্তাশক্তি লোপ পাওয়ার মতো অবর্ণনীয় বাহাদুরী, ধৈর্য ও স্থৈর্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। তাদের অধিকাংশই দীনে হকের জন্যে বীরত্বের সাথে লড়াই করতে করতে শাহাদাত প্রাপ্ত হন। তাদের বীরত্বব্যঞ্জক এ ত্যাগ দেখে মুসলমানদের ফসকে যাওয়া কদম আবার অটল হয়ে উঠলো এবং নতুনভাবে উজ্জীবিত হয়ে মুরতাদদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো। এ সময় হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এমন প্রচণ্ড হামলা চালালো যে, শত্রুর পা থরথর করে কাঁপতে লাগলো। তারা পিছু হটতে থাকলো। হটতে হটতে মুসায়লামার মশহুর সরদার মুহকাম বিন তোফায়েলের অবস্থানস্থলে গিয়ে পৌঁছলো। সে তার বাহিনীকে উৎসাহ যোগালো এবং মুসলমানদের ওপর প্রচণ্ড জবাবী হামলা চালালো। হযরত আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তার দিকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করলেন। তীর ঘাড়ে গিয়ে লাগলো এবং তৎক্ষণাৎ লাশ হয়ে সে মাটিতে পড়ে গেলো। এ ঘটনায় মুসলমানদের হিম্মত আরো বৃদ্ধি পেলো এবং চারদিক প্রকম্পিত করে মুরতাদদেরকে আরো পিছনে হটিয়ে দিলো। তখন উভয় পক্ষই জীবন বাজী রেখে যুদ্ধে লিপ্ত। কখনও এক পক্ষ পিছনে হটে। আবার কখনো অপর পক্ষ। এমনি মুহূর্তে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রত্যেক গোত্রকে পৃথক হয়ে যাওয়ার এবং স্ব স্ব পতাকাতলে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিলেন। এ কৌশলের মাধ্যমে তিনি মুসলমানদের দুর্বলতা কোন্ গোত্রের কারণে প্রকট হচ্ছে তা অনুধাবন করতে চাইলেন। কৌশলটি খুবই ফলবান ছিলো। প্রত্যেক গোত্র নিজের মান-ইজ্জত বজায় রাখার জন্যে অত্যন্ত বীরত্বের সাথে লড়াই চালিয়ে যেতে লাগলো। কিন্তু মুসলমানদের প্রচণ্ড হামলা সত্ত্বেও মুসায়লামা ময়দানে দৃঢ়তার সাথে টিকে রইলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বুঝে নিলেন যে, মুসায়লামার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত সাফল্য সম্ভব নয়। তিনি ব্যূহ ভেদ করে মুসায়লামার কাছে পৌঁছলেন এবং মুকাবিলার জন্যে আহ্বান জানালেন। সে দৃকপাত করতেই হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তার সামনে সন্ধির শর্তাবলী পেশ করা শুরু করলেন। মুসায়লামা প্রত্যেক শর্তেই মুখ এমনভাবে ফিরিয়ে

www.bjilibrary.com

নিলো যেনো, অহীর অপেক্ষা করছে। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এ অবস্থায়ই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং মুসলমানদেরকেও হামলার আহ্বান জানালেন। মুসায়লামা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পালালো এবং "হাদিকাতুর রাহ্মান" নামক নিজের বাগানে ঢুকে পড়লো। তার বাহিনীও বাগানে প্রবেশ করলো এবং চতুর্বেষ্টনীর প্রাচীরের দরযা বন্ধ করে দিলো। মুসলমানদের মধ্যে হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন মালিকের [রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খাদেম] সহোদর হযরত বারা রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন মালিকও ছিলেন। তাঁর এক আশ্চর্য ধরনের অভ্যাস ছিলো। তিনি যখন আবেগাপ্লুত হতেন তখন তাঁর শরীর কাঁপতে থাকতো। এ অবস্থায় কয়েকজন তাঁকে জাপটে ধরতো। যখন তাঁর শরীরের কাঁপন শেষ হতো তখন তিনি বাঘের মতো শত্রুর ওপর ঝাপিয়ে পড়তেন। এ যুদ্ধেও তাঁর একই অবস্থার উদ্ভব হলো। দুশমনকে মেরে কেটে একাকার করার জন্যে তিনি বাগানের প্রাচীরের দরযায় উপস্থিত হলেন। কিন্তু দরযা তাঁর পথে বাধা হয়ে দাঁড়ালো। তিনি মুসলমানদেরকে তাঁকে উঠিয়ে বাগানের মধ্যে নিক্ষেপের কথা বললেন। অবশেষে মুসলমানরা তাঁকে প্রাচীরের ওপর দাঁড় করিয়ে দিলো এবং তিনি বাগানে লাফিয়ে পড়লেন। অসংখ্য মুরতাদ তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। কিন্তু তিনি লড়াই করতে করতে বাগানের ফটকে পৌঁছে তা খুলে দিলেন। বাইরে অবস্থানরত ইসলামী বাহিনী ভেতরে প্রবেশ করলেন এবং উভয় পক্ষের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধ হতে লাগলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু মুসলমানদেরকে আহ্বান জানিয়ে বললেন : মুসলমানরা ! দৃঢ় এবং স্থির থাকো। আর মাত্র তোমাদের একটি হামলা বাকী। এরপরই শত্রুপক্ষ উৎখাত হবে। এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে মুসলমানরা কিয়ামাতের মত শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো দুশমনরা যুদ্ধের ময়দানে আর কোনোক্রমেই তিষ্টাতে পারলো না। মুসায়লামা পালাতে শুরু করলো। এ সময় তাঁর সাথীরা বললো, তোমার খোদার সে ওয়াদার কি হলো, যা তোমার সাথে করতো। সে বললো, এখন সে কথার সময় নয়। নিজের জীবন যদি বাঁচাতে চাও তাহলে বাঁচাও। ইত্যবসরে দু'টি বর্শা এক সাথে এসে তার ওপর পড়লো। হযরত হামযা রাদিয়াল্লাহ আনহুর হত্যাকারী ওয়াহশী রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন হারব একটি নিক্ষেপ করেছিলেন। অপরটি নিক্ষেপ করেছিলেন হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন যায়েদ বিন আছেম আনসারী। কিছুক্ষণ পূর্বে মুসায়লামা তাঁর ভাই হযরত হাবিব রাদিয়াল্লাহু আনহু যায়েদকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সাথে হত্যা করেছিলো। বর্শার আঘাত লাগতেই মুসায়লামার ভবলীলা সাঙ্গ হলো এবং মুরতাদরা দিগ্বিদিকজ্ঞান শূন্য অবস্থায় পালানো শুরু করলো। মুসায়লামা কাজ্জাবের নিহত হওয়াটা বাস্তবত ধর্মদ্রোহী যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ছিলো। এ যুদ্ধ "ইয়ামামার যুদ্ধ" নামে প্রসিদ্ধ। মুরতাদদের ১০

www.bjilibrary.com

হাজার (অন্য এক রাওয়ায়েত ২১ হাজার) লোক নিহত হয়েছিলো এবং যে স্থানে মুসায়লামা নিহত হয়েছিলো সে স্থানের নাম "হাদিকাতুল মওত" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলো। মুসলমান শহীদদের সংখ্যা ছিলো প্রায় এক হাজার তাঁদের মধ্যে তিনশ' মুহাজির এবং আনসার ছিলেন। অবশিষ্ট সাতশ' ছিলেন কুরআনে পাকের হাফেজ। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন ওয়ালিদ এক দূতের মাধ্যমে বিজয়ের সুসংবাদ মদীনা প্রেরণ করলেন। তার সাথে বনু হানিফার একটি প্রতিনিধি দলও ছিলো। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রতিনিধি দলটির সদস্যদেরকে বললেন, আফসোস ! তোমরা মুসায়লামা কাজ্জাবের ধোঁকায় কিভাবে পড়লে ? তারা এজন্যে লজ্জা প্রকাশ এবং ক্ষমা প্রার্থনা করলো। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তার শিক্ষা কি ছিলো ?

তাঁরা বললো, তার অহীর নমুনা এই, "হে ব্যাঙ ! তুমি পবিত্র। পানি পানকারীদেরকে বাধা দাও না এবং পানি অপরিষ্কারও করো না। দেশের অর্ধেক আমাদের এবং অর্ধেক কুরাইশদের। কিন্তু কুরাইশরা একটি যালেম জাতি।" হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু এ বাজে কথা শুনে বললেন ঃ "সুবহান আল্লাহ ! তোমাদের অবস্থার জন্যে আফসোস। এ বাণীতে আল্লাহর কোনো শান নেই—তোমরা কোথায় গিয়ে উপনীত হয়েছো ?"

প্রতিনিধি দলটি মদীনা মুনাওয়ারা থেকে ফিরে যেতে প্রস্তুত হলো। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদেরকে হেদায়াত দিয়ে বললেন, এখন চিরদিনের জন্যে ইসলামের ওপর কায়েম থাকবে এবং এমন কাজ করবে যাতে আল্লাহ এবং রাসূল সন্তুষ্ট হন। ধর্মদ্রোহীতার ফেতনা অবসানের পর হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন ওয়ালিদ ইয়ামামার এক উপত্যকা 'আল ওবোরে' মুকিম হলেন। সেখানে অবস্থান করছিলেন। ১২ হিজরীর ১২ই মুহাররাম হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর একটি নির্দেশ পেলেন। নির্দেশে হযরত মুছান্না রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন হারিছাকে সাহায্যের জন্যে ইরাক রওয়ানা এবং উব্বুলা সীমান্ত থেকে হামলার কথা বলা হয়েছিলো।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু আরবের আভ্যন্তরীণ বিশৃংখলা (ধর্মদ্রোহীতার ফেতনা) আয়ত্বে এনেই অবিলম্বে বাইরের দু'টি বৃহৎ শত্রুর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। শত্রু দু'টি ইসলামকে ধ্বংসের চিন্তায় লিপ্ত ছিলো। শত্রু দু'টি হলো রোম এবং পারস্য (ইরান)। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খলীফার কাছে এ দু' বহিঃশত্রুর উৎখাত কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ছিলো —তা এ ঘটনার মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায়। সে সময় একজন সাহাবী নিজের গোত্রের কোনো একটি বিষয় তাঁর সামনে পেশ করতে চাইলেন। কিন্তু তিনি

www.bjilibrary.com

রাগান্বিত হয়ে জবাব দিলেন, আমি তো সে দু' বাঘ কাবু করার চিন্তায় আছি। যারা মুসলমানদেরকে তাক করে বসে আছে। আর তোমরা আমাকে সাধারণ কাজে ব্যস্ত রাখতে চাও।

ইসলামের অভ্যুদয়কালে (আরবের ইসলামী রাষ্ট্র) উত্তর সীমান্ত সে যুগের দু'টি বৃহৎ রাষ্ট্রের সীমান্তের সাথে সংযুক্ত ছিলো ইরাক থেকে পূর্ব দিকের এলাকা (সিরিয়া) রুমাতুল কুবরা বায নতিনী শাসকদের শাসনাধীন ছিলো এবং পশ্চিম দিকের এলাকা ইরানী বাদশাহীর দখলে ছিলো। ইরাকের সংযুক্ত এলাকায় বসবাসরত আরব গোত্রসমূহ ইরানী শাসনাধীন থাকতো এবং সিরিয়া সংযুক্ত এলাকায় বসবাসরত আরব কবিলাগুলো রোমীয় শাসনের আনুগত্য করতো।

এ দু' শক্তির ইচ্ছা বা প্রভাবের বাইরে আরবরা নিজেদের কোনো শক্তিশালী ও স্বাধীন রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন ঘটাক তা তারা কোনোক্রমেই চাইতো না। বস্তুত কিসরা (ইরানের বাদশাহ) এবং কাইসার (রোমের বাদশাহ) উভয়ের চোখেই আরবের নতুন ভূমিষ্ঠ ইসলামী রাষ্ট্র কাঁটার মতো বিদ্ধ হতো। এ কারণেই আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অভিযান শুরু করলেন।

ইরানী শাসনাধীন গোত্রসমূহের মধ্যে একটি গোত্রের নাম ছিলো "বনু শাইবান"। নবম হিজরীতে এ গোত্র নিজের এক সরদার হযরত মুছান্না রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন হারেছার নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল মদীনা প্রেরণ করেন। প্রতিনিধি দলটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। ১১ হিজরীতে বাহরাইন ধর্মদ্রোহীতার ফেতনায় জড়িয়ে পড়ে। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বাহরাইনের মুরতাদদের উৎখাতের জন্যে হযরত আলা' হাজরামী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে প্রেরণ করেন। এ সময় ইরানী শাসক বাহরাইনের মুরতাদদের সাহায্য করেছিলো। কিন্তু "বনু শাইবান" গোত্র সে সময় হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে পুরোপুরি সহযোগিতা করেছিলো। মুরতাদ বা ধর্মদ্রোহীরা যখন সম্পূর্ণরূপে উৎখাত হলো এবং ইসলামী শাসন সমগ্র আরবে বহাল হলো তখন হযরত মুছান্না রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজের কবিলাকে সাথে নিয়ে ইরানী শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ব্যাপক তৎপরতা শুরু করলেন। এ তৎপরতার কয়েকটি কারণ ছিলো। সবচেয়ে বড় কারণ হলো, ইরানী শাসকরা নিজেদের অধীন আরব এলাকার বাসিন্দাদের ওপর অমানবিক ব্যবহার করতো। তাদের ফসল কাটার সময় হলে ইরানী শাসকরা আসতো এবং পুরো খাদ্যশস্য নিয়ে যেতো এবং বখশিশ হিসেবে আরবদেরকে কিছু মুদ্রা দিয়ে যেতো।

www.bjilibrary.com

দ্বিতীয়তঃ ইরানী সাম্রাজ্য রাজনৈতিক বিশৃংখলার শিকার হয়েছিলো। চার বছরের মধ্যে ন'জন বাদশাহ একের পর এক ইরানের সিংহাসনে আরোহণ করেছিলো।

আরবে একটি মযবুত ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ছিলো তৃতীয় কারণ। এ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্যে আরবরা ইরানী নির্যাতনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরার সাহস পেয়েছিলেন। হযরত মুছান্না রাদিয়াল্লাহু আনহু কয়েক মাস পর্যন্ত গেরিলা তৎপরতার মাধ্যমে ইরানী শাসকদেরকে অত্যন্ত পেরেশান করে রাখেন। কিন্তু কয়েক শতাব্দীর পুরাতন একটি বিশাল সাম্রাজ্যকে গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে পরাজিত করা ছিলো অসম্ভব ব্যাপার। এজন্যে তিনি খেলাফতের দরবারে উপস্থিত হয়ে ইরানের রাজনৈতিক বিশৃংখলা এবং নিজের তৎপরতার কথা বিশদভাবে বর্ণনা করলেন এবং সাহায্যের আবেদন জানালেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর কথা অত্যন্ত মনোযোগ ও হামদরদীর সাথে শুনলেন এবং বড় বড় সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহুমদের সাথে পরামর্শক্রমে তাঁকে ফিরে যেতে বললেন। ফিরে গিয়ে বনু শাইবান এবং তার মিত্র গোত্রসমূহকে সুসংগঠিত করার নির্দেশ দিলেন। শীঘ্রই সাহায্য পৌছে যাবে বলে আশ্বাসও দিলেন। এ সাহায্য না পৌছা পর্যন্ত ইরানীদের সাথে কোনো বড় যুদ্ধে জড়িয়ে না পড়ার পরামর্শও দিলেন। মুছান্না রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফিরে যাওয়ার পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন ওয়ালিদকে মুছান্না রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাহায্যার্থে অবিলম্বে ইরাক পৌছার এবং ইরানীদের বিরুদ্ধে অভিযানের নেতৃত্ব স্বহস্তে নেয়ার নির্দেশ দিলেন।

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ধর্মদ্রোহিতার যুদ্ধসমূহ সবেমাত্র শেষ করেছিলেন। এ অবস্থায় তাঁর অধীন সৈন্য সংখ্যা খুব কম ছিলো। ইয়ামামার যুদ্ধে এক হাজার লোক শহীদ হয়েছিলেন। বিরাট সংখ্যক ছিলো আহত। বহুসংখ্যক মুসলমান নিজের গোত্রে ফিরে গিয়েছিলেন। উপরন্তু যারা একবার মুরতাদ হয়ে দ্বিতীয়বার মুসলমান হয়েছিলেন তাদেরকে সেনাবাহিনীতে না নেয়ার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খলিফা রাদিয়াল্লাহু আনহুর নির্দেশ ছিলো। কিন্তু হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন বিরাট সাহসী জেনারেল। পরিস্থিতি যতই কঠিন হোক না কেন তিনি তা কোনোক্রমেই ভ্রূক্ষেপ করতেন না। তিনি শুধুমাত্র দু' হাজার মুজাহিদসহ এ অভিযানে রওয়ানা হয়ে গেলেন। পথিমধ্যে মুদার ও রবিয়া গোত্রের অতিরিক্ত আট হাজার সৈন্য যোগ করলেন এবং এমনিভাবে ১০ হাজার সৈন্যের বাহিনী নিয়ে ইরাকের সীমান্তে পৌছে গেলেন। সেখানে হযরত মুছান্না রাদিয়াল্লাহু আনহু

www.bjilibrary.com

'নাবাজ' নামক স্থানে আট হাজার সৈন্যসহ তাঁর অপেক্ষা করছিলেন। এভাবে ইসলামী বাহিনীর মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছিলো ১৮ হাজার। এ পুরো বাহিনীর নেতৃত্ব হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন ওয়ালিদ গ্রহণ করলেন।

ইরাকের প্রাথমিক যুদ্ধসমূহ বিন্যস্তকরণ প্রসঙ্গে দু' ধরনের বর্ণনা বা রাওয়ায়েত পাওয়া যায়। এক রাওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু সর্বপ্রথম 'উব্বুলাহ' পৌঁছেন। উব্বুলাহ ছিলো ইরানের এক গুরুত্বপূর্ণ বন্দর। আরব এবং ভারতের জল ও স্থলের সংযোগ স্থান ছিলো এটা। এজন্যে স্থানটি জাকজমকপূর্ণ। এখানেই ইরানী বাহিনী ও মুজাহিদিনে ইসলামের মধ্যে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে ইরানীরা পরাজিত হয়।

দ্বিতীয় রাওয়ায়েতে আছে, হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বানকিয়া ও বারসুমাকে পদানত করে উব্বুলাহর দিকে অগ্রসর হন। এর পূর্বে তিনি সেখানকার শাসক হুরমুজকে একটি পত্র প্রেরণ করেন। পত্রে তিনি লিখেন ঃ

"তোমরা যদি ভালো চাও তাহলে ইসলাম গ্রহণ করো। যদি এ প্রস্তাব না মানো তাহলে জিযিয়া দিয়ে মুসলমানদের আশ্রয়ে এসে যাও। যদি এ প্রস্তাবও মঞ্জুর না করো, তাহলে পরিণামের জন্যে তোমরাই দায়ী হবে। আমি এমন এক জাতি সাথে নিয়ে এসেছি যারা মৃত্যুকে এত ভালোবাসে যেমন তোমরা বেঁচে থাকাকে ভালোবেসে থাকো।"

হুরমুজ ইরানী সাম্রাজ্যের প্রথম শ্রেণীর আমীরদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সে এক লাখ দিরহাম মূল্যের মুকুট পরিধান করতো। সে ছিল চরম বদ স্বভাব এবং যালেম। নিজের এলাকার আরবদের ওপর বিভিন্নমুখী নির্যাতন চালাতো। এজন্যে সে আরবদের চক্ষুশুল ছিল। এমন কি কোন খারাপ লোকের তুলনা করতে হলে তারা বলতো ঃ "অমুক ব্যক্তি তো হুরমুজের চেয়েও খারাপ প্রকৃতির লোক।"

হুরমুজ হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর পত্র পেয়ে সকল অবস্থা লিপিবদ্ধ করে ইরানী দরবারে প্রেরণ করলো এবং স্বয়ং এক বিরাট বাহিনীসহ মুসলমানদের মুকাবিলার জন্যে অগ্রসর হলো। ইরানীরা এত আবেগাপ্লুত হয়েছিলো যে, কয়েকটি দল পরস্পর জিঞ্জিরাবদ্ধ করে রেখেছিলো। যাতে কোনো কিছু ঘটে গেলে যুদ্ধের ময়দান থেকে তারা পিছপা হতে না পারে। কাজেমার সন্নিকটে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু শত্রুর সামনাসামনি হলেন। ইরানীরা জলভাগ কব্জা করে নিয়েছিলো। এজন্যে মুসলমানরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজের বাহিনীকে সম্বোধন

www.bjilibrary.com

করে বললেন, আমার জীবনের কসম ! দু' বাহিনীর যারাই স্থিরতা ও বাহাদুরীর প্রমাণ দিতে পারবে তাদের কব্জাতেই জলভাগ থাকবে।

অতপর তিনি সেখানেই নেমে লড়াই করে জলভাগ দখলের নির্দেশ দিলেন। মুসলমানরা এ নির্দেশ পেয়েই শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। ধোঁকাবাজ হুরমুজ এ সময় একটি চাল চাললো। সে কয়েক শ' সৈন্য গুপ্তস্থানে লুকিয়ে রেখে আগে অগ্রসর হয়ে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে মুকাবিলার হুংকার দিলো। এর উদ্দেশ্য ছিলো, যেই খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু নিজের ব্যূহ থেকে বের হয়ে সামনে অগ্রসর হবেন অমনি গুপ্তস্থানে লুকায়িত সৈন্যরা ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে হত্যা করবে। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু হুরমুজের মুকাবিলার জন্যে অগ্রসর হলেন। এ সময় হুরমুজের লোকেরা গুপ্তস্থান থেকে বের হয়ে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। হযরত কা'কা রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আমর তামিমি শত্রুর ওপর কড়া নজর রেখেছিলেন। তিনি হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে বিপদের মধ্যে দেখতে পেলেন। অতপর নিজের বাহিনীর একটি দল নিয়ে ইরানী অশ্বারোহীদেরকে ঘিরে ফেললেন। এদিকে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু হুরমুজের ওপর হামলা চালিয়ে মুহূর্তের মধ্যে তার জীবনলীলা সাঙ্গ করে ফেললেন। তার হত্যার কারণে ইরানীদের মধ্যে তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হলো এবং তারা উন্মাদের মত মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। দীর্ঘক্ষণ প্রচণ্ড যুদ্ধ হতে থাকলো। কিন্তু সেনাপতির অনুপস্থিতির কারণে অবশেষে ইরানীদের মধ্যে পরাজয়ের আলামত প্রকট হয়ে উঠলো। এমনকি তাদের ডান ও বামের বাহিনী সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে পড়লো। অবশিষ্ট সৈন্যরা নিরুপায় হয়ে পালিয়ে গেলো।

এ যুদ্ধে প্রচুর সম্পদ গনিমাতের মাল হিসেবে মুসলমানদের হস্তগত হলো। ইরানীরা যে জিঞ্জির দিয়ে নিজেদেরকে বেঁধে রেখেছিলো তা যুদ্ধের ময়দান থেকে সংগ্রহ করে একত্রিত করা হলো। এর ওজন হয়েছিলো সাড়ে সাত মণ। এ কারণে এ যুদ্ধকে "জাতুসসালাসিল"ও বলা হয়ে থাকে। মদীনায় প্রেরিত গনিমাতের মালের অংশের মধ্যে একটি হাতীও ছিলো। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহুর নির্দেশে হাতীটিকে শহরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখানো হলো। মহিলারা হাতীটি দেখে বলতে লাগলেন ঃ আমাদের চোখের সামনে যে জন্তুটি রয়েছে তাকি আল্লাহর সৃষ্ট জীব ?

প্রদর্শনীর পর হাতীটি ইরাকে ফেরত পাঠিয়ে দেয়া হলো। গনিমাতের মালের মধ্যে হুরমুজের মাথার মুকুটও ছিলো। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু এ মূল্যবান মুকুট হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে প্রদান করলেন। কেননা তিনিই হুরমুজকে হত্যা করেছিলেন।

www.bjilibrary.com

এ যুদ্ধকে কাজেমার যুদ্ধ এবং জাতুস সালাসিল ছাড়াও হাফিরের যুদ্ধও বলা হয়ে থাকে। কেননা কতিপয় ঐতিহাসিকের কাছে এ যুদ্ধ হাফিরের সন্নিকটে সংঘটিত হয়েছিলো। আর হাফির বসরা থেকে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত। এ যুদ্ধ হাফির এবং কাজেমার মধ্যবর্তী কোনো এক স্থানেও সংঘটিত হতে পারে।

কাজেমার যুদ্ধের পর হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু খবর পেলেন যে, একটি বিরাট ইরানী বাহিনী মাযারে তাঁবু ফেলেছে এবং মুসলমানদের ওপর হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে ইরানী বাদশাহ কারেন বিন কারইয়ানিস নামক এক জেনারেলের নেতৃত্বে হুরমুজের সাহায্যার্থে এ বাহিনী প্রেরণ করেছিলো। ওয়াসিত এবং বসরার মধ্যবর্তী মাযার নামক স্থানে পৌছেই কারেন হুরমুজের হাশর এবং পরাজয়ের খবর পেয়ে মাযারের সন্নিকটে নাহারে ছানির তীরে তাঁবু স্থাপন করলেন। হুরমুজের পরাজিত বাহিনীর দু'জন অফিসার কুবাজ এবং আনুশাজান বেঁচে এসেছিলো। কারেন তাদেরকে স্ব বাহিনীর ডান ও বামের অফিসার নিয়োগ এবং মুসলমানদের ওপর প্রচণ্ড হামলার প্রস্তুতি নিলো। কিন্তু মুসলমানদের ওপর কারেনের হামলার পূর্বেই হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু অগ্রসর হয়ে মাযার পৌছে ইরানীদের মুখোমুখী হলেন। উভয় পক্ষের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হলো। এ যুদ্ধে কারেন, কুবাজ ও আনুশাজানসহ ৩০ হাজার ইরানী সৈন্য নিহত হয়। অবশিষ্টরা পালিয়ে যায়। তাদের মধ্যে কিছু নাহার ছানিতে ডুবে মারা গেলো এবং অন্যান্যরা অতিকষ্টে জীবন বাঁচালো। এ যুদ্ধে মুসলমানদের প্রভূত গনিমাতের মাল হস্তগত হয়েছিলো। হিসেবে প্রত্যেক অশ্বারোহী ৩০ হাজার দিরহাম পেয়েছিলেন।

ইরানের বাদশাহ ইরদেশের মাযারে ইরানীদের শিক্ষণীয় পরাজয়ের খবর যখন অবহিত হলো। তখন সে মুসলমানদের অগ্রযাত্রা প্রতিরোধের জন্যে অভিজ্ঞ দু' জেনারেল আন্দর যা'বার ও বাহমনকে একের পর এক বিরাট বাহিনীসহ প্রেরণ করলো। এ দু' বাহিনী ওয়ালাজাহ নামক স্থানে পরস্পর মিলিত হলো। হিরাহ এবং কাসকারের মধ্যবর্তী স্থানে বসবাসরত আরবী বংশোদ্ভূত বিরাট সংখ্যক খৃষ্টান ও কৃষকও ইরানীদের সাহায্যের জন্যে ময়দানে এসে উপস্থিত হলো। এভাবে এক বিরাট বাহিনী 'ওয়ালজাহ'তে সমবেত হলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু ইরানীদের এ বিরাট সমাবেশের খবর পেলেন। তিনি সুয়াইদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন মুকাররান রাদিয়াল্লাহ আনহুকে কিছু সৈন্যসহ মাযারে রেখে এবং অবশিষ্ট সৈন্যসহ ওয়ালাজাহ রওয়ানা হলেন। ওয়ালাজাহর কাছে পৌছে তিনি দেখলেন যে, সমুদ্রোপকূলবর্তী এলাকার স্থানে স্থানে কাটা এবং ঢালু। এ অবস্থায় বিপুল সংখ্যক শত্রুবাহিনীকে পরাজিত করার জন্যে তিনি এক সুন্দর কৌশল অবলম্বন করলেন। তিনি কিছু সৈন্যকে

www.bjilibrary.com

ঢালু স্থানে লুকিয়ে থাকতে বললেন এবং নিজে শক্তিশালী কতিপয় দলসহ শত্রুর সামনাসামনি হলেন। দীর্ঘক্ষণ ধরে ঘোরতর যুদ্ধ হতে থাকলো। ইরানীদের মধ্যে যখন দুর্বলতার লক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে উঠলো তখন তিনি ঢালু স্থানে লুকায়িত সৈন্যদেরকে যুদ্ধের ময়দানে পৌছে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। এসব সৈন্য কালবিলম্ব না করে মুহূর্তের মধ্যে শত্রুর ওপর আল্লাহর গযব হিসেবে ঝাঁপিয়ে পড়লো। অসংখ্য ইরানী নিহত হলো এবং অবশিষ্টরা অনন্যোপায় হয়ে পালিয়ে গেলো। আন্দর যা'যও এ পলায়নরত সৈন্যদের মধ্যে ছিলো। মরুভূমিতে সে পানির পিপাসায় কাতরাতে কাতরাতে মারা গেলো। অবশ্য বাহমান যুদ্ধে বেঁচে গিয়েছিলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু যুদ্ধের পর সাধারণ নাগরিকদের ওপর জিযিয়া আরোপ করলেন এবং তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন।

ওয়ালাজাহর যুদ্ধে আরবী বংশোদ্ভূত খৃষ্টান গোত্রসমূহের বহু লোক নিহত হয়েছিলো। তারা এর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে উলাইইসে (কুফার সন্নিকটে ইরাকী সীমান্তের একটি স্থান) সমবেত হয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগলো। ওদিকে বাহমন ইরানের দরবারে পৌছলো এবং সেখান থেকে বিরাট বাহিনী নিয়ে উলাইইস উপস্থিত হলো। সে এ বাহিনী স্থানীয় ইরানী শাসক জাবানের হাতে সোপর্দ করলো এবং সে পুনরায় পরামর্শের জন্যে ইরানের শাহের কাছে গমন করলো। ফিরে না আসা পর্যন্ত যেন সে যুদ্ধে লিপ্ত না হয়ে পড়ে এ নির্দেশও সে দিলো। ইত্যবসরে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু উলাইইস পৌছে গেলেন এবং অবসর নেয়া ছাড়াই খৃষ্টান গোত্রসমূহের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। সে সময় জাবান বাহিনী নিশ্চিন্তে খাওয়ায় মশগুল ছিলো। কেননা বাহমন ফিরে না আসা পর্যন্ত তাদের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার নির্দেশ ছিলো না। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু পূর্ণ শক্তির সাথে হামলা করে খৃষ্টান ও ইরানী সৈন্যদেরকে গাজর কাটার মতো কাটলেন। বলা হয়ে থাকে যে, এ যুদ্ধে ৭০ হাজার খৃষ্টান ও ইরানী নিহত হয়েছিলো।

উলাইইস যুদ্ধের পর হযরত খালিদ আমগেশিয়ার দিকে অগ্রসর হলেন। সেখানকার অধিবাসীরা মুসলমানদেরকে তাদের দিকে আসতে দেখে ঘাবড়ে গেলো এবং শহর ছেড়ে চলে গেলো। সুতরাং হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বিনা বাধায় তা দখল করে নিলেন। সেখান থেকে বহু গনিমাতের মাল লাভ হলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তার পঞ্চমাংশ বিজয়বানীসহ খেলাফতের দরবারে প্রেরণ করলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু খুব খুশী হলেন এবং তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো ঃ

www.bjilibrary.com

"হে কুরাইশ ! তোমাদের বাঘ আরেক বাঘের ওপর হামলা করে তার গর্তে ঢুকে তার ওপর বিজয় লাভ করেছে। এখানকার মহিলারা খালিদের মত সন্তান জন্ম দিতে অক্ষম।"

আমগেশিয়ার কাছেই ঐতিহাসিক হিরাহ শহর। সেখানকার ইরানী শাসক আজাদবিহ (অথবা আরাজবিহ) জানতে পারলো যে, মুসলমানরা এখন হিরার ওপর সৈন্য পরিচালনা করবে। এ অবস্থায় সে নিজের পুত্রকে একটি শক্তিশালী বাহিনী সমেত মুসলমানদের প্রতিরোধের জন্যে সম্মুখে রওয়ানা করিয়ে দিলো এবং নিজেও স্ববাহিনীসহ শহরের বাইরে বেরিয়ে তাঁবু স্থাপন করলো। যাতে প্রয়োজনে অবিলম্বে পুত্রের সাহায্যে এগিয়ে যেতে পারে। আমগেশিয়া এবং হিরার মধ্যবর্তী স্থানে ছিলো ফোরাত নদী। ইবনে আযাদ বিহ নদীতে বাঁধ বেঁধে তা থেকে পানি বের হওয়ার নহরে প্রবাহিত করলো। মুসলমানরা নৌকায় চড়ে নদী পথে হিরার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো। এ অবস্থায় তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লো। কেননা পানির গতি পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ার ফলে তাদের নৌকাগুলো কাদায় আটকে গেলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু মুসলমানদেরকে সেখানেই নৌকা রেখে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে শত্রুর ওপর হামলার নির্দেশ দিলেন। মুসলমানরা নির্দেশ পালন করে ঘোড়ায় চড়ে এক পক্ষীয়ভাবে ইবনে আযাদ বিহর বাহিনীর ওপর ঝাপিয়ে পড়লো। তারা ফোরাত নদীর ওহানার, কাছে তাঁবু স্থাপন করেছিলো। ইবনে আযাদ বিহ এ হঠাৎ আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত ছিলো না। কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় সৈন্য সহ নিহত হলো। মুসলমানরা বাঁধ ভেঙ্গে নদীকে স্বাভাবিক গতিতে প্রবাহিত করলো এবং হিরার দিকে অগ্রসর হলো। একই সময় ইরানের শাহ ইরদশেরের মৃত্যু হলো। আযাদ বিহ ইরানের শাহের মৃত্যু এবং নিজের পুত্রের নিহত হওয়ার খবর একই সাথে পেলো। এ খবরে সে হতোদ্যম হয়ে পড়লো এবং নিজের লোক লশকরসহ পালিয়ে গেলো। বস্তুত মুসলমানরা বিনা বাধায় হিরার কাছে পৌঁছলেন এবং গারিয়াইন ও কাছরে আবইয়াজের মধ্যবর্তী স্থানে তাঁবু স্থাপন করলেন। এখানে আযাদ বিহ অবস্থান করছিলো। হিরাতে যারা ছিলো তারা দুর্গ বন্ধ করে বসে রইলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু তাদের কাছে প্রেরিত এক পয়গামে জানালেন যে, তোমরা যদি জিযিয়া প্রদানে সম্মত হও এবং দুর্গের দরযা খুলে দাও তাহলে তোমাদের কিছু করা হবে না। তোমাদের হেফাজত করা আমাদের কর্তব্য হয়ে পড়বে। হিরাবাসীরা এ পয়গামের জবাবে মুসলমানদের ওপর পাথর নিক্ষেপ শুরু করলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু মুসলমানদেরকে তাদের ওপর অব্যাহতভাবে তীর নিক্ষেপের নির্দেশ দিলেন। মুসলমানরা বৃষ্টির মতো তীর নিক্ষেপ শুরু করলো। এতে হিরার অসংখ্য বাসিন্দা মারা গেলো। শহরের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও পাদরীরা দুর্গের সরদারদের প্রতি মুসলমানদের ওপর

www.bjilibrary.com

পাথর নিক্ষেপ বন্ধ এবং দুর্গবাসীকে মুসলমানদের তীর নিক্ষেপ থেকে রক্ষার আহ্বান জানালো। নেতৃবৃন্দ বাধ্য হয়ে তাদের একটি প্রতিনিধিদল সন্ধি প্রশ্নে আলোচনার জন্য হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে দেখা করার কথা বলে পাঠালো এবং যুদ্ধ বন্ধের অনুরোধ জানালো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের অনুরোধ মঞ্জুর করলেন। সুতরাং তাদের পাঁচজন সরদার আদি, আমর, পাসরানে আদি, হাইরী বিন উকাল, আমর বিন আবদুল মাসিহ্ এবং আয়াস বিন কাবিসা সমন্বয়ে গঠিত প্রতিনিধি দল হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন ওয়ালিদের খিদমতে হাজির হলো এবং বার্ষিক এক লাখ নব্বই হাজার দিরহাম জিযিয়া প্রদান মঞ্জুর করিয়ে সন্ধি করে ফেললো। এ সময় যে সন্ধিনামা লিখিত হয়েছিলো তার বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

"বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম।" এটা সে চুক্তি। যা খালিদ বিন ওয়ালিদ আদি, হাইরী বিন উকাল, আমর বিন আবদুল মাসিহ্ এবং আয়াস বিন কাবিসার সাথে সম্পাদন করেছেন। এসব ব্যক্তি হিরাবাসীদের পক্ষ থেকে চুক্তিটি বাস্তবায়নের গ্যারান্টি দাতা হিসেবে সম্মতি দিয়েছেন। চুক্তি অনুযায়ী হিরাবাসী প্রতি বছর এক লাখ নব্বই হাজার দিরহাম জিযিয়া প্রদান করবে। এ জিযিয়া সন্যাসী এবং পাদরীদেরকেও আদায় করতে হবে। অবশ্য যারা গরীব, অভাবগ্রস্ত, দুনিয়াত্যাগী সন্যাসী এবং শারীরিক প্রতিবন্ধীরা এ জিযিয়ার আওতামুক্ত থাকবে। এ জিযিয়া যদি নিয়ম মত আদায় করা হয় তাহলে হিরাবাসীর হিফাজতের দায়িত্ব আমার (খালিদ বিন ওয়ালিদ অথবা মুসলমানদের) ওপর যদি আমি (অথবা মুসলমান) তাদের হিফাজত করতে না পারি তাহলে জিযিয়া নেয়া হবে না। আর যদি হিরাবাসী কাজে অথবা কথায় চুক্তি ভঙ্গ করে তাহলে তারা আমাদের আশ্রয় (হিফাজত) থেকে বের হয়ে যাবে। এ চুক্তি ১২ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে লিপিবদ্ধ হয়।"

হিরার সন্ধির পর আশেপাশের এলাকার বাসিন্দারাও বার্ষিক ২০ লাখ দিরহাম প্রদানের শর্তে সন্ধি করলো। হিরাহ্ এবং সংলগ্ন এলাকার ওপর মুসলমানদের পূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত কা'কা' রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন আমর তামিমি, হযরত জারার রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন আযুর, হযরত মুছান্না রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন হারিছাহ এবং সৈন্য বাহিনীর আরো কতিপয় অফিসারকে সীমান্ত হিফাজতের কাজে নিয়োগ করলেন এবং শত্রুর ওপর অব্যাহত আক্রমণের নির্দেশ দিলেন। যাতে তারা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে না পারে। সুতরাং এসব অফিসার নিজেদের সীমান্তসমূহ হতে অগ্রসর হয়ে দজলা নদীর তীর পর্যন্ত দুশমনদের সমগ্র এলাকা ছিনিয়ে নিলো।

এছাড়াও হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বিভিন্ন বিজিত এলাকায় শাসক নিয়োগ করলেন এবং তাদের স্ব স্ব এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা কায়েম রাখা ও

www.bjilibrary.com

জিযিয়া আদায়ের দায়িত্ব দিলেন। কতিপয় ঐতিহাসিক লিখেছেন, সে সময়ই বানকিয়াদ ও বারুসমার বাসিন্দা পাদরী সলুবা বিন নাসতুনাকে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে প্রেরণ করলো এবং বার্ষিক ১০ হাজার দিরহাম প্রদানের চুক্তিতে আবদ্ধ হলো। এর বিনিময়ে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বানকিয়া ও বারুসমারের হিফাজতের দায়িত্ব নিলেন এবং লিখিত চুক্তি লিখে দিলেন। হিরাবাসীদের কৃত চুক্তিতে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছিলো এ চুক্তিও অনুরূপই ছিলো। অন্য এক রাওয়ায়েতে এও বলা হয়েছে যে, বানকিয়া ও বারুসমাবাসীরা হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর মুকাবিলা করেছিলো। কিন্তু যখন দেখলো যে, মুসলমানরা তাদের উৎখাত করে ছাড়বে তখন তারা সন্ধির দিকে অগ্রসর হলো এবং এ উদ্দেশ্যে দিরানতিফের পাদরী সলুবাকে নিজেদের প্রতিনিধি বানিয়ে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে প্রেরণ করেছিলো।

এসব ব্যবস্থা সম্পাদনের পর হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত কা'কা' রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন আমরকে হিরাতে নিজের নায়েব নিয়োগ করলেন এবং স্বয়ং ইরানীদের মযবুত ঘাঁটি আম্বারের দিকে অগ্রসর হলেন। আম্বারবাসীরা হযরত খালিদের আগমনের খবর পেয়ে দুর্গ বন্ধ করে বসে গেলো। মুসলমানরা শহরের কাছে পৌঁছলে আম্বারবাসীরা তীর নিক্ষেপ শুরু করলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু দুর্গের চারদিকে চক্কর লাগিয়ে ইরানীদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পরীক্ষা করে দেখলেন। পরীক্ষার পর তিনি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, আম্বারবাসী যুদ্ধের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে অবহিত নয়। এজন্যে খুবই সহজে তাদেরকে তীরের নিশানা বানানো যায়। বস্তুত তিনি শত্রু সৈন্যের চোখ তাক করে তীর নিক্ষেপের জন্য মুসলমানদের প্রতি নির্দেশ দিলেন। তারা নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করলেন এবং মুহূর্তের মধ্যে শত্রুর এক হাজার সৈন্যের চোখ অকেজো করে দিলেন। আম্বারবাসী এ ধরনের মুসিবতের সম্মুখীন আগে কখনও হয়নি। তাদের মধ্যে চরম বিশৃংখলা দেখা দিলো। আম্বারের ইরানী সেনাপতি শেরজাদ সেনাবাহিনীতে অস্বাভাবিক অবস্থা প্রত্যক্ষ করে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে সন্ধির আলোচনা শুরু করলো। কিন্তু এমন শর্ত আরোপ করলো যে, হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষে তা গ্রহণ করা সম্ভব ছিলো না। সুতরাং আলাপ-আলোচনায় কোনো ফল হলো না। ইতিমধ্যে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু সৈন্য বাহিনীকে এমন স্থানে নিয়ে এসেছিলেন যে, সেখানে পরিখার প্রশস্ততা সামান্যই ছিলো। তিনি অসুস্থ এবং অকেজো উট যবেহ করে পরিখা বা খন্দকের মধ্যে নিক্ষেপের নির্দেশ দিলেন। এভাবে খন্দকের এক অংশ ভরে গেলো এবং পুলের মত তৈরি হলো। ইসলামী বাহিনী এর ওপর দিয়ে অতিক্রম করে পরিখার অপর পাশে পৌঁছে

www.bjilibrary.com

গেলো। মুসলমানদের চাপ সহ্য করা এখন ইরানীদের সাধ্যাতীত হয়ে উঠলো। বাধ্য হয়ে তারা হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর শর্তে সন্ধি করলো এবং মুসলমানরা শহর কবজা করে নিলো। আম্বারের পতনের পর আশেপাশের এলাকার পাশের বাসিন্দাদের হিম্মতেও ভাটা পড়লো এবং কোনো বাধা ছাড়াই তারা আনুগত্য কবুল করে নিলো।

এরপর হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত যবরকান রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন বদরকে আম্বারে নিজের নায়েব বানালেন এবং আইনুত তামারের দিকে অগ্রসর হলেন। সেখানে প্রখ্যাত এক ইরানী জেনারেল মেহরান পসর বাহরাম চোবিন ইরানীদের এক বিরাট বাহিনীসহ যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। তার সাহায্যার্থে তাগলাব, আয়াদ এবং নামর প্রভৃতি অসংখ্য আরবী বংশোদ্ভূত গোত্রও আকাহ বিন আকার নেতৃত্বে উপস্থিত হয়েছিলো। মেহরান এক বাস্তব কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে এসব আরব বংশোদ্ভূত খৃষ্টান গোত্রসমূহকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সামনে এগিয়ে এনেছিলো। আকাহ কুরখ নামক স্থানে নিজের বাহিনীর ব্যূহ রচনায় ব্যস্ত ছিলো। এমন সময় হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তার মাথার ওপর গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং বিশ্রাম গ্রহণ ছাড়াই আকার বাহিনীর ওপর হামলা করে বসলেন। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ব্যূহ ভেদ করে আকার কাছে পৌঁছে গেলেন এবং তাঁকে গ্রেফতার করলেন। নিজের সরদারের গ্রেফতারীর কারণে সৈন্যরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লো এবং পালিয়ে গেলো। মুসলমানেরা পিছু ধাওয়া করে হাজার হাজার লোককে গ্রেফতার করলো। যারা বেঁচে গেলো তারা আইনুত তামার দুর্গে আশ্রয় নিলো। মেহরান আরব খৃষ্টানদের হাশর দেখে দুর্গ ছেড়ে পালিয়ে গেলো। হযরত খালিদ দুর্গ অবরোধ এবং শত্রুর ওপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করলেন। এতে তারা দুর্গের দরযা খুলে দিতে বাধ্য হলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু সকল আরব খৃষ্টানকে গ্রেফতার করলেন। তিনি তাদের অপকর্মে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। এজন্যে আকাহ সমেত সকলের গর্দান উড়িয়ে দিলেন।

যে সময় হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরাকের অভিযানসমূহে ব্যস্ত ছিলেন, ঠিক তখনই দাওমাতুল জানদালে বিদ্রোহ হয়ে গেলো। কালাব, বাহরা, গাসসান, তানুখ এবং দাজাআম গোত্রসমূহ একিদার ও জুদিকে সরদার বানিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা তুলে ধরলো। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আয়াজ বিন গানাম রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এ বিদ্রোহ দমনের জন্যে দাওমাতুল জানদালে প্রেরণ করলেন। তিনি সেখানে পৌঁছে শত্রু পক্ষকে খুব শক্তিশালী বলে মনে করলেন এবং সাহায্যের জন্যে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন ওয়ালিদকে ডেকে পাঠালেন।

www.bjilibrary.com

অন্য এক রাওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁকে হযরত আয়াজ রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাহায্যার্থে সেখানে পৌঁছার নির্দেশ দিয়েছিলেন। যা হোক, আইনুত তামারের যুদ্ধ শেষ করে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু আবিম বিন কাহেল আসলামীকে সেখানে রেখে এক বাহিনীসহ দাওমাতুল জানদালের দিকে রওয়ানা হলেন। যখন দাওমাতুল জানদালের কাছে পৌঁছলেন তখন একিদার খালিদ বিন ওয়ালিদের সাথে যুদ্ধ করার অক্ষমতার কথা বলে অপর বিদ্রোহী নেতা জুদীকে পরিত্যাগ করে চলে গেলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু একিদারের পলায়নের কথা অবহিত হয়ে একটি সৈন্যদল তার পেছনে প্রেরণ করলেন। এ দল তাকে গ্রেফতার করলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু চুক্তি ভঙ্গ এবং বিদ্রোহের অপরাধে তাকে হত্যা করলেন। [একিদার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে আনুগত্য কবুল করেছিলো। কিন্তু পরে সে বিদ্রোহে অংশ নেয়]। অতপর হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু ও হযরত আয়াজ রাদিয়াল্লাহ আনহু দু' দিক থেকে দাওমাতুল জানদাল ঘিরে নেন। বিদ্রোহীদের সাহায্যের জন্য আরব বংশোদ্ভূত কয়েকটি খৃষ্টান গোত্রও উপস্থিত হয়েছিলো। তারা সবাই মিলে জুদী বিন রবিয়া, ওদিয়া কালবী, ইবনে রুমানস কালবী, ইবনুল আইহাম এবং ইবনে হাদারজানের নেতৃত্বে মুসলমানদের সামনাসামনি হলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু ও হযরত আয়াজ রাদিয়াল্লাহ আনহু তাদেরকে পরাজিত করলেন। জুদী এবং ওদিয়া মুসলমানদের হাতে গ্রেফতার হলো। অবশিষ্ট সৈন্য পিছপা হয়ে দুর্গের দিকে যাত্রা করলো। যখন দুর্গ পূর্ণ হয়ে গেলো তখন অভ্যন্তরের লোকেরা দরযা বন্ধ করে দিলো এবং বনু কালাবের সাথে সংশ্লিষ্ট নিজের সাথীদেরকে মুসলমানদের রহম-করমের ওপর ছেড়ে দিলো। বনু কালাব হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর বাহিনীর এক সরদার আছেম রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আমর তামিমীর কাছে দয়ার আবেদন জানালো। কেননা তাঁরা তামিম গোত্র বনু কালাবের মিত্র ছিলো। হযরত আছেম রাদিয়াল্লাহ আনহু তাদেরকে নিরাপত্তা দিলেন। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু তাদের চুক্তির মর্যাদা দিলেন এবং বনু কালাবের লোকদের ক্ষমা করে দিলেন। এরপর তিনি দুর্গের ফটক উপড়ে ফেললেন এবং অবস্থানরত সকল বিদ্রোহীদেরকে গ্রেফতার করলেন। তারপর তিনি সেখানে জুদীসহ তাদের সবাইকে বিদ্রোহের অপরাধে হত্যা করলেন।

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু দাওমাতুল জানদালেই ছিলেন। ঠিক এমনি সময়ে ইরাকে ইরানীরা পুনরায় বিশৃংখলার সৃষ্টি করলো। তাদের দু' সরদার রোযবিহ ও যাররে মাহর হাছিদ এবং খানাফসের ওপর হামলা করে বসলো। আম্বারের শাসনকর্তা হযরত যবরকান রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন বদর

www.bjilibrary.com

ইরানীদের তৎপরতার খবর পেয়ে হিরার শাসনকর্তা হযরত কা'কা' রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আমর তামিমীর কাছে সাহায্য চাইলেন। হযরত কা'কা রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁর পয়গাম পেয়েই আ'বাদ বিন ফাদকীস সা'দী ও উরওয়াহ বিন জা'দুলবারেকীর নেতৃত্বে পৃথক দু'টি বাহিনী হাছিদ এবং খানাফসের দিকে রওয়ানা করিয়ে দিলেন। ইরানীদের অগ্রযাত্রা রোধ করার লক্ষ্যেই বাহিনী দু'টি প্রেরণ করা হয়েছিলো। তারা রিফে রোযবিহ এবং যাররে মাহরের রাস্তা অবরোধ করলো। এখানে তারা বনু রবিয়ার অপেক্ষায় ছিলো। বনু রবিয়া মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলো। ইত্যবসরে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদ আয়াজ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন গানামকে সাথে নিয়ে দাওমাতুল জানদাল থেকে হিরাহ ফিরে এলেন। পৌঁছেই তিনি ইমরুল কায়েস কালবীর পত্র পেলেন। পত্রে তিনি জানান যে, হাযিল বিন ইমরান মুছাইয়াখে এবং রবিয়া বিন বাশার আছছানি ও আল-বাশার নামক স্থানে সৈন্য একত্রিত করছে এবং শীঘ্রই এ সৈন্য সমেত রোযবিহ ও যাররে মাহারের সাহায্যের জন্যে রওয়ানা হচ্ছে। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু এ পত্র পেয়েই হযরত কা'কা রাদিয়াল্লাহ আনহু ও আবু লাইলাকে রোযবিহ এবং যাররে মাহরের মুকাবিলার জন্যে রওয়ানা করলেন। অতপর হিরাতে হযরত আয়াজ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন গানামকে রেখে স্বয়ং তাদের পেছনে রওয়ানা হলেন। হযরত কা'কা রাদিয়াল্লাহ আনহু ও হযরত আবু লায়লা রাদিয়াল্লাহ আনহু সবেমাত্র আইনুত তামার পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুও এসে তাদের সাথে মিলিত হলেন। এখান থেকে তিনি হযরত কা'কা' রাদিয়াল্লাহ আনহুকে হাছিদ ও হযরত লায়লা রাদিয়াল্লাহ আনহুকে খানাফসের দিকে প্রেরণ করলেন। রোযবিহ এবং যাররে মাহার সম্মিলিতভাবে হাছিদে হযরত কা'কা' রাদিয়াল্লাহ আনহুর মুকাবিলা করলেন। কিন্তু যুদ্ধে উভয়ই নিহত এবং তাদের সৈন্য শোচণীয়ভাবে পরাজিত হলো। পরাজিত বাহিনী পালিয়ে খানাফসে আশ্রয় নিলো। ইতিমধ্যে হযরত আবু লায়লা রাদিয়াল্লাহ আনহু খানাফসে গিয়ে পৌঁছলেন। ইরানী শাসক মাহবুজান মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহস পেলো না। সে নিজের সৈন্যসহ খানাফস থেকে বের হয়ে মুছাইয়াখ চলে গেলেন। বস্তুত হযরত আবু লায়লা রাদিয়াল্লাহ আনহু কোনো বাধা ছাড়াই খানাফস দখল করে নিলেন। এরপর হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত কা'কা' রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত আবু লায়লা রাদিয়াল্লাহ আনহু, হযরত আ'বাদ রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং হযরত উরওয়াহ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে মুছাইয়াখের দিকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিলেন। সাথে সাথে হেদায়াত দিলেন যে, তাঁরা যেন অমুক রাতে অমুক স্থানে সকলেই একত্রিত হয়। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুও স্বয়ং নির্ধারিত রাতে তাঁদের

www.bjilibrary.com

কাছে পৌছে গেলেন। অতপর সম্মিলিত ইসলামী বাহিনী ইরানী এবং তাঁদের আরব মিত্রদের ওপর আঘাত হানলেন। খৃষ্টান আরবদের সরদার হাযিল বিন ইমরান কোনোমতে জান নিয়ে পালালো। কিন্তু মুছাইয়াখে অবশিষ্ট অন্যান্য সকল খৃষ্টান আরব ও ইরানীরা যমদূতের সম্মুখীন হলো।

মুছাইয়াখ অভিযান শেষে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বনু তাগলাবের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। গোত্রটি কয়েকবার ইরানীদের সাথে ঐকবদ্ধ্য হয়ে মুসলমানদের ওপর হামলা চালিয়েছিলো। তিনি হযরত কা'কা' রাদিয়াল্লাহ আনহু ও হযরত আবু লায়লা রাদিয়াল্লাহ আনহুকে বনু তাগলাবের বস্তি আছছানী এবং আল-বাশারের ওপর মারাত্মক আঘাত হানার নির্দেশ দিলেন। এখানে রবিয়া বিন বুজায়ের তাগলাবী সৈন্য সমেত উপস্থিত ছিলো। তাদের পেছনে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুও নিজের বাহিনীসহ রওয়ানা হলেন। একটি নির্দিষ্ট রাতে মুজাহিদরা তিন দিক থেকে আছ ছানির ওপর হামলা করে বসলো এবং সকল শত্রুকে (মহিলা, শিশু এবং বৃদ্ধ ছাড়া) মৃত্যুর দরযায় পৌছে দিলো। আছছানীর পর আল বাশার (যার অপর নাম আযযামিল)-এর পালা এলো। সেখানেও তাগলাবীদের একটি বাহিনী মওজুদ ছিলো। হাযিল বিন ইমরান মুছাইয়াখ থেকে পালিয়ে সেখানে আশ্রয় নিয়েছিলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু এক ধাওয়াতেই আল-বাশার দখল করে নিলেন এবং শত্রু বাহিনী পরিষ্কার করে ফেললেন। এরপর তিনি আর-রিজাবের দিকে অগ্রসর হলেন। এখানে আকাহর (নিহত) পুত্র হিলাল সৈন্যসহ উপস্থিত ছিলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর আগমনের সংবাদ পেয়ে সে শহর ছেড়ে পালিয়ে গেলো। এভাবে আর-রিজাবও মুসলমানরা পদানত করলো।

আর-রিজাব দখলের পর হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু আল ফারাজের দিকে এগিয়ে গেলেন। ইরাক, সিরিয়া এবং আলজীরিয়ার সীমান্ত এখানে এসে মিলিত হয়েছিলো। যুদ্ধের দৃষ্টিকোণ থেকে স্থানটি ছিলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু আল ফারাজ পৌছলে তাঁর মুকাবিলায় শুধুমাত্র ইরানী এবং সিরীয়বাসীরাই ঐকবদ্ধ্য হলো না, বরং তাগলাব, নামর এবং আয়াদের আরবী বংশোদ্ভূত গোত্রসমূহও তাদের সাথে একত্রিত হলো। এ সম্মিলিত বাহিনী ফোরাত নদী পার হয়ে অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে মুসলমানদের ওপর হামলা করে বসলো। মুসলমানরা হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর নেতৃত্বে এমন দৃঢ়তা এবং বাহাদুরীর সাথে হামালার জবাব দিলো যে, যুদ্ধ কাকে বলে তা শত্রু পক্ষ সম্যক উপলব্ধি করতে পারলো। তারা পিছু হটতে বাধ্য হলো। এ সময় হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু হুংকার ছেড়ে বললো, মুসলমানরা ! তাদেরকে ঘিরে নাও এবং কাউকেই বেঁচে যেতে দেবে না। তাঁর হুংকারে মুসলমান জানবাজরা শত্রু সৈন্য ঘিরে ঘিরে মারা শুরু

www.bjilibrary.com

করলো। এভাবে তাদের বেশীর ভাগ সৈন্যই মুসলমানদের তরবারীর শিকারে পরিণত হলো। অল্প সংখ্যক যারা পিছু হটতে পেরেছিলো তারা ফোরাত নদীতে ডুবে মারা গেলো। বিজয়ের পর হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু সৈন্যদেরকে কয়েকদিন বিশ্রাম গ্রহণের কথা বললেন। সুতরাং সমগ্র বাহিনী আল ফারাজেই থেমে গেলো। ১০ দিন পর ১২ হিজরী ২৫শে জিলকদ হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু সৈন্য বাহিনীকে হিরার দিকে রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং নিজে পশ্চাত বাহিনীর সাথে যাবেন বলে ঘোষণা করলেন। বাহিনী রওয়ানা হতেই তিনি অত্যন্ত সংগোপনে কয়েকজন ব্যক্তিকে সাথে নিয়ে বিদ্যুৎ বেগে মক্কা মুয়াজ্জামা পৌঁছে পবিত্র হজ্জ সমাপন করে একই গতিতে ফিরে এলেন। বর্ণনা করা হয়ে থাকে যে, আল-ফারাজ থেকে আগত বাহিনীর শেষ অংশ তখনো হিরাহ পৌঁছেনি। বস্তুত তিনি গোপন হজ্জ থেকে ফিরে সেই বাহিনীর পশ্চাত ভাগের সাথে এসে মিলিত হলেন। সৈন্যদের কেউই তাঁর হজ্জ গমন সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলো না। প্রত্যাবর্তনের পর যখন তারা হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং তাঁর সাথীদের মস্তক মুণ্ডন অবস্থায় দেখলো তখন উপলব্ধি করতে পারলো যে, তাঁরা হজ্জ করে এসেছেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর গোপন হজ্জের খবর পেয়ে লিখলেন, ভবিষ্যতে আর এ রকম করো না। কেননা নিজের বাহিনী থেকে সেনাপতির একা একা অনুপস্থিত হয়ে যাওয়ায় বিভিন্ন ধরনের ভীতির কারণ হতে পারে।

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু সবেমাত্র হিরাহ পৌঁছে ছিলেন। ঠিক তখনি খেলাফতের দরবার থেকে সিরিয়া গমনের নির্দেশ পেলেন। সুতরাং তিনি ইরাকের বিজয়কৃত এলাকাসমূহের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব হযরত মুছান্না রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন হারেছার ওপর অর্পণ করে সিরিয়া রওয়ানা হয়ে গেলেন।

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু এক বছর ২ মাস ইরাকে অতিবাহিত করেন। এ সময় তিনি ১৫টি যুদ্ধে অংশ নেন এবং সবক'টিতেই জয় লাভ করেন।

যে সময় হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু আরব ইরাকে ইরানী শাহানশাহীর ওপর আঘাত হানছিলেন, ঠিক সে সময় রোমের বাদশার সাথেও সংঘর্ষ শুরু হয়েছিলো এবং চারটি ইসলামী বাহিনী হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল জাররাহ, হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস, হযরত ইয়াযিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবি সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং হযরত শুরাহ বিল রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন হাসানা রাদিয়াল্লাহ আনহুর নেতৃত্বে সিরিয়ার বিভিন্ন স্থানের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। রোমীয়রা পূর্ণ শক্তি দিয়ে পদে পদে তাদেরকে বাধা দিয়ে যাচ্ছিলো। ফলে মুসলমানদের অগ্রযাত্রা

www.bjilibrary.com

খুবই কঠিন হয়ে পড়েছিলো। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু ফলপ্রসূভাবে অগ্রগমনের উদ্দেশ্যে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে অবিলম্বে সিরিয়ায় জিহাদরত মুসলমানদের সাহায্যে পৌছার নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ পেয়েই হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খলিফা রাদিয়াল্লাহ আনহুর নির্দেশ অনুযায়ী অর্ধেক সৈন্যসহ আরব ইরাক থেকে সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করলেন।

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু সিরিয়ার রণক্ষেত্রে পৌছার জন্যে এক ভয়ংকর ও বিপদসংকুল পথ বেছে নিলেন। তিনি পাঁচ ছ'দিনে অতিক্রম যোগ্য পরিচিত ও সহজ পথ ছেড়ে দারুজ (হাওরান) পর্বতের পূর্বে দিগন্ত প্রসারিত বিরাট মরুভূমির (বাদিয়াতুশ শাম অথবা হামাদ) দীর্ঘ পথ ধরে এগুলেন। ঐতিহাসিকরা হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর এ কর্মপদ্ধতির বিভিন্ন বিশ্লেষণ করেছেন। বিশ্লেষণের সার সংক্ষেপ এ দাঁড়ায় যে, হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু নিজস্ব রণনীতির ভিত্তিতেই এ পথ অবলম্বন করেছিলেন এবং ১৮ দিন ব্যাপী কঠিন পথ পরিক্রমার পর সাওয়া (বর্তমান নাম সিবা কূপ) নামক স্থানে পৌছে গেলেন। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর বাহিনীকে দেখে সাওয়াবাসী হতভম্ব হয়ে পড়লো। তারা চিন্তাই করতে পারেনি যে, এ ভয়াবহ মরুভূমি অতিক্রম করে কোনো বাহিনী তাদের ওপর হামলা করতে পারে। যখন তারা হঠাৎ করে ইসলামী বাহিনীকে নিজেদের মাথার ওপর দেখতে পেলো তখন তারা হতবাক হয়ে পড়লো এবং সাধারণ বাধাদানের পর অস্ত্র সমর্পণ করলো। সাওয়া থেকে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু ইরক, তাদমোর (পালমোরাহ), কারইয়াতাইন, হাওয়ারিন ও কাছামকে পদানত করে সোজা দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হলেন এবং দামেস্ককে এক পাশে রেখে মারজে রাহিত গিয়ে পৌছলেন। এখানে রোমীয়দের একটি বাহিনী হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে প্রচণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হলো কিন্তু পরাজিত হলো। মারজেরাহিত থেকে তিনি ইয়ারমুক উপত্যকার দাররে জারয়ায় প্রবেশ করলেন এবং হাওয়ান পর্বতের পাশ দিয়ে অগ্রসর হতে হতে সিরিয়ায় অবস্থানরত প্রথম ইসলামী বাহিনীর সাথে মিলিত হলেন। জারয়ার কাছে রোমীয়দের এক শক্তিশালী বাহিনী মওজুদ ছিলো। তাদের ধারণাতীত ব্যাপার ছিলো যে, কোনো শত্রু হামাদ মরুভূমি অতিক্রম করে তাদের পেছনে এসে পড়বে। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর আগমনের খবরে তারা হতভম্ব হয়ে পড়লো এবং তাঁকে মুকাবিলা প্রশ্নে হিম্মত হারিয়ে ফেললো। সুতরাং হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিনা বাধায় নিজের ভাইদের কাছে পৌছলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু সিরিয়ার ওপর অভিযানের জন্যে চার বাহিনীর

www.bjilibrary.com

প্রধান সেনাপতি হিসেবে হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল জাররাহ্কে নিয়োগ করেছিলেন। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু সেখানে পৌঁছতেই হযরত আবু ওবায়দাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু সমগ্র সৈন্যের নেতৃত্ব তার হাতে সোপর্দ করলেন। ইবনে আসির (র) এবং বালাজুরী (র) বর্ণনা করেছেন, এরপর হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বসরার শহরের ওপর হামলা করলেন। বসরার শাসক এক ঝাঁকুনিতেই হিম্মত হারিয়ে ফেললো এবং জিযিয়া প্রদান করে মুসলমানদের সাথে সন্ধি করে নিলো।

ওদিকে রোমের বাদশাহ হিরাক্লিয়াস সিরিয়ায় মুসলমানদের অগ্রযাত্রার খবর পেয়ে তাদের মুকাবিলার জন্যে পৃথক পৃথক বাহিনী প্রেরণ করলো। পৃথক পৃথক বাহিনী প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিলো যাতে করে ইসলামী বাহিনী পরস্পর মিলিত হতে না পারে। রোমীয় বাহিনীসমূহের নেতৃত্ব করছিলো দু' অভিজ্ঞ জেনারেল কাবকালা ও তাজারক। তারা উভয়ই ফিলিস্তিনের আজনাদাইন নামক স্থানে তাঁবু স্থাপন করলো। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু ফিলিস্তিন পদানত করার জন্য হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসকে নিয়োগ করেছিলেন। তিনি সে সময় উরবাতে অবস্থান করছিলেন। রোমীয় বাহিনীর আগমনের খবর পেয়ে তিনি আজনাদাইনের দিকে অগ্রসর হলেন। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহু ও বুসরার অভিযান শেষ করে তাঁর সাহায্যে পৌঁছে গেলেন।

১৩ হিজরীর জমাদিউল আখিরে আজনাদাইন নামক স্থানে রোমীয় এবং মুসলমানদের দু'দিন ধরে ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হলো। যুদ্ধে তাজারক ও কাবকালা নিহত হলো এবং রোমীদের শিক্ষণীয় পরাজয় ঘটলো।

আজনাদাইনে রোমীয়দের পরাজিত করার পর হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু রোমীয়দের সেই বাহিনীর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন, যে বাহিনী ওয়ারয়ার কাছে দারুজ পর্বতের পাদদেশে এবং ইয়ারমুক নদীর গভীর পাহাড়ী উপত্যকার মধ্যবর্তী ঘাঁটিতে মযবুতভাবে অবস্থান করছিলো। এ বাহিনীকে উপেক্ষা করে সিরিয়ার রাজধানী দামেস্ক অভিমুখে অগ্রসর হওয়াটা ছিলো খুবই কঠিন এবং বিপদসংকুল। সুতরাং হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসকে সিবাকুপে রেখে এবং অবশিষ্ট সৈন্য সমেত অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে ওয়ারয়া পৌঁছলেন। এখানে রোমীয় এবং মুসলমানদের মধ্যে প্রচণ্ড ও রক্তাক্ত যুদ্ধ হলো এবং রোমীয়রা পরাজয় বরণ করলো। তারা ওয়ারয়া থেকে পিছু হটে গেলো। এভাবে ইসলামী বাহিনীর জন্যে দামেস্কের রাস্তা পরিষ্কার হলো। সেখান থেকে দামেস্কের দূরত্ব ছিলো ৬৫ মাইল।

www.bjilibrary.com

এটা ছিলো ইয়ারমুকের প্রথম যুদ্ধ। এ যুদ্ধ অব্যাহত ছিলো। এমন সময় হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু ওফাত পেলেন। তাঁর স্থলে হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু খলিফা নির্বাচিত হলেন।

যুদ্ধের মধ্যেই মদীনা মুনাওয়ারাহ থেকে দূত পৌঁছলেন। তিনি মুসলমানদেরকে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর ওফাত এবং হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুর খলিফা নির্বাচিত হওয়ার খবর দিলেন। একই দূত হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফরমানও নিয়ে গিয়েছিলেন। সে ফরমানে তখন থেকে হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনুল জাররাহকে সিরিয়ার রণক্ষেত্রের ইসলামী বাহিনীর কমাণ্ডার ইনচীপ নিয়োগ এবং হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন ওয়ালিদকে তাঁর অধীন একজন সাধারণ সৈনিক হিসেবে কাজ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো। এ ফরমানের ঘোষণা বিজয়ের পর দেয়া হয়। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু আনন্দচিত্তে ইসলামী বাহিনীর কমাণ্ড হযরত আবু ওবায়দার হাতে ন্যস্ত করলেন।

এখানে এটা পরিষ্কার করা প্রয়োজন যে, সিরিয়ার মশহুর যুদ্ধসমূহ সংঘটিত হওয়ার কাল নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে ব্যাপক মতপার্থক্য রয়েছে। এমনিভাবে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর পদচ্যুতির সাল প্রশ্নেও ঐতিহাসিকদের মধ্যে ভিন্নমত পাওয়া যায়। কেউ কেউ লিখেছেন, হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু খলিফার দায়িত্ব পেয়েই (১৩ হিজরী) হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে পদচ্যুত করেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন, ১৭ হিজরীতে তিনি পদচ্যুত হন। এ প্রসঙ্গের যাবতীয় রাওয়ায়েত গভীর দৃষ্টি দিয়ে পর্যালোচনা করলে জানা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর পদচ্যুতি দু'বার ঘটেছিলো। প্রথমবার ১৩ হিজরীতে তাঁর মর্যাদা (RANK) খাটো করা হয়। এ সত্ত্বেও তিনি হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহুর নায়েব অথবা সেনাবাহিনীর একজন উচ্চপদস্থ অফিসার হিসেবে অব্যাহতভাবে দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। দ্বিতীয়বার ১৭ হিজরীতে তাঁকে সম্পূর্ণরূপে পদচ্যুত করা হয়। অন্য কথায় তাঁকে অফিসারের পদমর্যাদা থেকে হটিয়ে সাধারণ সৈনিক বানিয়ে দেয়া হয়।

প্রথমবার হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর মর্যাদা এজন্য খাটো করেছিলেন যে, তিনি আমিনুল উম্মাত হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনুল জাররাহকে প্রধান সেনাপতি পদে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর চেয়ে বেশী যোগ্য মনে করতেন। কেননা হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু কোনো সময়ে সীমাতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী বা বাহাদুরীর আবেগে এমন পদক্ষেপ নিয়ে ফেলতেন যা সতর্কতার পরিপন্থী হিসেবে বিবেচিত হতো।

www.bjilibrary.com

যেসব কারণে দ্বিতীয়বারের পদচ্যুতি ঘটে তার বর্ণনা যথাস্থানে আসবে। আমাদের বিচার-বিশ্লেষণ অনুযায়ী যুদ্ধসমূহের ধারাবাহিকতা বর্ণনা করা হয়েছে। আমাদের বিশ্লেষণ ও ধারাবাহিকতায় ভিন্ন মত পোষণ করা যেতে পারে কিন্তু এসব যুদ্ধ ১৩ থেকে ১৭ হিজরীর মধ্যবর্তী সময়ে সংঘটিত হওয়া সম্পর্কে নেতিবাচক কিছু বলার নেই। এ যুদ্ধে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু একজন উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারী হিসেবে পুরোপুরি অংশ নিয়েছিলেন। বরং সত্য কথা হলো, এসব যুদ্ধের বেশীর ভাগ (বিশেষ করে ইয়ারমুকের দ্বিতীয় যুদ্ধ) তাঁরই পরিকল্পনা এবং বাস্তব কৌশলের ভিত্তিতে সংঘটিত হয়েছিলো। হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহু তাকে নায়েব নয় বরং ভাই মনে করতেন এবং যুদ্ধ প্রশ্নে তাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছিলেন।

প্রথম ইয়ারমুকের যুদ্ধের পর মুসলমানরা দামেস্কের দিকে অগ্রসর হলেন এবং চারদিক থেকে তা অবরোধ করলেন। হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহু বাবুল যাবিয়ার সামনে তাঁবু স্থাপন করলেন। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস বাবেতুমা, হযরত শুরাহ বিল রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন হাসানা বাবুল ফারাদিস এবং হযরত ইয়াজিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবি সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহ আনহুকে বাবে কাইসানে মোতায়েন করা হলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু শহরের পূর্ব দরযার এক মাইল দূরে এক শূন্য খানকাতে ডেরা স্থাপন করলেন। এ ডেরা 'দিরে খালিদ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। যদিও দামেস্কের ঠাণ্ডা আরব মুজাহিদদের পক্ষে অসহনীয় ছিলো তবুও তারা অত্যন্ত দৃঢ়তার ও আস্থার সাথে অবরোধ অব্যাহত রাখলেন। এ অবরোধ বিভিন্ন মত অনুযায়ী দু' মাস দশ দিন, তিন মাস অথবা ছয় মাস অব্যাহত ছিলো। এ সময় দামেস্কবাসী শহর থেকে বের হয়ে যুদ্ধের হিম্মত দেখাতে পারেনি। অবশ্য তারা প্রাচীরের ওপর থেকে মুসলমানদের ওপর তীর ও পাথর নিক্ষেপ করতো। এক রাতে তাদের পক্ষ থেকে খুব কম তৎপরতা পরিলক্ষিত হলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বেশীর ভাগ সময়েই সারারাত জেগে থাকতেন এবং সামরিক ব্যবস্থাপনার সাথে সাথে শত্রুর তৎপরতার সন্ধানে মশগুল থাকতেন। সে রাতে তিনি শহরে কোনো হাঙ্গামা বা শোরগোল শুনতে না পেয়ে নিজের মাধ্যমসমূহ দিয়ে তার কারণ অবহিত হওয়ার চেষ্টা করলেন। জানা গেলো যে, দামেস্কের শাসক বুতরিকের গৃহে পুত্র সন্তান ভূমিষ্ট হয়েছে। এ আনন্দে সেদিন শহরবাসীকে দাওয়াত দেয়া হয়েছিলো। তারা দাওয়াতে খুব মদ পান করে এবং সন্ধ্যা থেকেই বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলো। এ খবর পেয়েই হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু নিজের বিশেষ বাহিনীসহ শহরের দিকে অগ্রসর হলেন এবং পানিতে পূর্ণ পরিখা পার হয়ে শহরের পাদদেশে পৌছে গেলেন। সেখান থেকে তিনি কতিপয় মুজাহিদসহ রশির সাহায্যে শহরের ভিতরের দিকে অবতরণপূর্বক

www.bjilibrary.com

পাহারাদারদের হত্যা করে দরযা খুলে দিলেন। সাথে সাথে তিনি তাকবির ধ্বনি উচ্চারণ করলেন। তাকবির শুনে বাইরে অবস্থানরত সৈন্যরা একযোগে শহরে প্রবেশ করলো। দামেস্কবাসীরা তখনও মদে চুর হয়েছিলো। হঠাৎ করে এ হামলায় তারা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলো এবং নিজেরাই শহরের দ্বিতীয় দরযা খুলে দিলো। দরযা খুলে তারা হযরত আবু ওবায়দার কাছে সন্ধির আবেদন জানালো। সন্ধির আবেদন তিনি মঞ্জুর করলেন। অবস্থা এ দাঁড়ালো যে, একদিকে হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহুর সন্ধি মঞ্জুর করে শহরের অভ্যন্তরে অগ্রসর হতে লাগলেন। অন্যদিকে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিজয়সূচক অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখলেন। শহরের মধ্যস্থলে উভয়ের সাক্ষাত হলো। বস্তুত হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহু সন্ধি মঞ্জুর করে ফেলেছিলেন। এজন্যে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুও তরবারি খাপে ঢুকিয়ে ফেললেন।

কতিপয় ঐতিহাসিক (তাদের মধ্যে "আরবের তামাদ্দুন" পুস্তকের লেখক ফরাসী দার্শনিক গুস্তাভলীবানও অন্তর্ভুক্ত) লিখেছেন, যেদিন হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু ওফাত পান সেদিনই দামেস্ক বিজয় হয়েছিলো। কিন্তু এ বর্ণনা বা মত গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহুর ওফাতের তারিখ হলো ১৩ হিজরীর ২২শে জমাদিউল আখির। পক্ষান্তরে ১৪ হিজরীর রজব মাসে দামেস্ক বিজয় হয়েছিলো।

দামেস্ক অবরোধকালে মুসলমানরা যে পরিস্থিতির মুকাবিলা করেছিলো তার কয়েকটি ঘটনার কথা বিভিন্ন ঐতিহাসিক ব্যাপকভাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাদের বর্ণনায় ব্যাপক মতপার্থক্য রয়েছে এবং প্রকৃত অবস্থা কি ছিলো তা উদ্ঘাটন করা কঠিন হয়ে পড়ে। এ ধরনের বর্ণনার বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

১-হিরাক্লিয়াস অবরুদ্ধ দামেস্কবাসীর সাহায্যার্থে একটি বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু সামনে অগ্রসর হয়ে রাস্তা অবরোধ করেন এবং বাহিনীটিকে দামেস্ক পৌছতে বাধাদান করেন।

২-হিরাক্লিয়াস প্রেরিত সাহায্যকারী বাহিনীকে বাধাদানের জন্যে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত জিরার রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আযুরকে পাঁচ শ' সৈন্যসহ প্রেরণ করেন। হযরত জিরার রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে পৌছে অবহিত হন যে, শত্রু বাহিনীর সংখ্যা (প্রায় ১০ হাজার) অনেক বেশী। হযরত জিরার রাদিয়াল্লাহ আনহু বাহাদুরীর আবেগে শত্রু বাহিনীর ওপর হামলা করে বসলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁর ঘোড়া আঘাত প্রাপ্ত হলো এবং তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। রোমীয়রা তাঁকে এবং অন্য কতিপয় মুসলমানকে গ্রেফতার করলো।

www.bjilibrary.com

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত জিরার রাদিয়াল্লাহু আনহুর আটকের খবর পেয়ে মাইছারাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন মাছরুককে এক হাজার সৈন্যসহ দামেস্কের পূর্ব দরযায় প্রেরণ করলেন এবং নিজের অবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে হযরত জিরার রাদিয়াল্লাহু আনহু ও অন্য মুসলমানদেরকে রোমীয়দের পাঞ্জা থেকে মুক্ত করার জন্যে রওয়ানা হয়ে গেলেন। তিনি বিদ্যুৎ বেগে অগ্রসর হয়ে রোমীয় সৈন্যদের মুখোমুখি হলেন। উভয় বাহিনী পরস্পরের সামনাসামনি তাঁবু ফেললো। ইত্যবসরে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু জানতে পারলেন যে, রোমীয় সেনাপতি মুসলমান কয়েদীদেরকে একশ' অশ্বারোহী হেফাজতে হিমসের দিকে রওয়ানা করে দিয়েছে। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু রাফে' বিন উমাইরাহ তায়ীকে একশ' অশ্বারোহীসহ হিমসের দিকে প্রেরণ করলেন। যাতে তাঁরা মুসলমান বন্দীদেরকে রোমীয়দের কাছ থেকে মুক্ত করে আনতে পারে। রাফে' রাদিয়াল্লাহু আনহু রোমীয়দের ধাওয়া করার জন্যে রওয়ানা দিলেন এবং খুব তাড়াতাড়ি তাদের মাথার ওপর গিয়ে উপস্থিত হলেন। রোমীয়রা প্রচণ্ড শক্তিতে বাধা দিলো। কিন্তু মুসলমানরা মুহূর্তের মধ্যে তাদেরকে খতম করে দিলো এবং হযরত জিরার রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তার সাথীদেরকে সাথে নিয়ে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাহিনীর সাথে মিলিত হলেন। পরের দিন হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু রোমীয় বাহিনীর ওপর হামলা করে বসলেন এবং তাদেরকে পরাজিত করে পালিয়ে যেতে বাধ্য করলেন।

৩-হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহু খবর পেলেন যে, রোমীয়দের বিরাট এক বাহিনী আজানাদাইনে একত্রিত হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত রয়েছে। তিনি সাময়িকভাবে দামেস্ক অবরোধ প্রত্যাহার করে নিলেন এবং আজনাদাইন পৌছে রোমীয়দের চরমভাবে পরাজিত করলেন। এ যুদ্ধে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুও অত্যন্ত বাহাদুরীর সাথে অংশ নিয়েছিলেন এবং প্রতিটি পর্যায়ে অন্যান্য অফিসারদেরকে যথাযথ হেদায়াত দিয়েছিলেন। যুদ্ধ শেষে দ্বিতীয়বারের মতো তাঁরা দামেস্ক অবরোধ করে নেন।

৪-হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহু জানতে পারলেন যে, হিরাক্লিয়াস দূররে নাজ্জার নামক একজনের রোমীয় জেনারেলের নেতৃত্বে বিরাট এক বাহিনী দামেস্কবাসীর সাহায্যে প্রেরণ করেছে এবং এ বাহিনী মারজুস সফর নামকস্থানে অবস্থান নিয়েছে। হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত ইয়াযিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন আবি সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সেখানে রেখে অবশিষ্ট সৈন্য সাথে নিয়ে শত্রুর দিকে অগ্রসর হলেন। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুও তার সাথে ছিলেন। মারজুস সফরে উভয় বাহিনীর মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ হলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু রোমীয় বাহিনীর বামদিক

www.bjilibrary.com

চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেললেন এবং হযরত মায়াজ রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন জাবাল ডানদিকের বাহিনীকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়লেন। এভাবে রোমীয়দের পরাজয় ঘটলো। মুসলমানরা বিজয়ীর বেশে ফিরে এসে পুনরায় দামেস্ক অবরোধ করলো।

এ ধরনের আরো কিছু ঘটনা বিভিন্ন কিতাবে পাওয়া যায়। এসব ঘটনা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু তা কখন ঘটেছিলো এবং তার ধারাবাহিকতাই বা কেমন ধরনের ছিলো তা বিশ্বস্ততার সাথে বলা কঠিন। প্রকৃতপক্ষে চার পাঁচ বছরে রোমীয় এবং মুসলমানদের মধ্যে এত যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো যে, এসব ঘটনাবলী একাকার হয়ে গেছে। যা হোক, হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এসব যুদ্ধের বেশীর ভাগ অভিযানেই চরম বাহাদুরী প্রদর্শন করেছিলেন এবং বিপক্ষকে যুদ্ধের সাধ মিটিয়ে দিয়েছিলেন।

দামেস্ক বিজয়ের কারণে রোমীয়দের মধ্যে প্রচণ্ড উত্তেজনা দেখা দেয়। তারা জর্দানের বিসান শহরে একত্রিত হয়ে অত্যন্ত জোরেশোরে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকে। ইতিপূর্বে হিরাক্লিয়াস অবরুদ্ধ দামেস্কবাসীর সাহায্যে একটি বাহিনী প্রেরণ করেছিলো। কিন্তু সে বাহিনী দামেস্ক পর্যন্ত পৌছতে পারেনি। এ বাহিনীও বিসান এসে উপস্থিত হলো। এভাবে ৪০-৫০ হাজার সৈন্য একত্রিত হলো। এ বাহিনীর সেনাপতি ছিলো সকলার নামক একজন রোমীয় অফিসার। হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহু এ সৈন্য সমাবেশের খবর পেলেন এবং তিনি ও হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজেদের বাহিনীসহ জর্দানের দিকে অগ্রসর হলেন। তাঁরা বিসানের সামনে ফাহল (PELLA) নামক স্থানে তাঁবু ফেললেন। রোমীয়রা মুসলমানদের সাহস, ধৈর্য ও স্থৈর্য দেখে সন্ধির ইচ্ছা প্রকাশ করলো। হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত মায়াজ রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন জাবালকে দূত হিসেবে প্রেরণ করলেন। রোমীয়রা নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র এবং সৈন্যের সংখ্যাধিক্যের কথা বলে হযরত মায়াজ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ভীতবিহ্বল করতে চাইলো। কিন্তু হযরত মায়াজ রাদিয়াল্লাহু আনহু নির্ভিক চিত্তে বললেন, যদি ইসলাম গ্রহণ করো, তাহলে তোমরা আমাদের ভাই। যদি এ শর্ত মঞ্জুর না হয়, তাহলে তোমাদেরকে জিযিয়া দিতে হবে। আমরা তোমাদের হেফাজতের দায়িত্ব নেবো। যদি এ শর্ত না মানো, তাহলে তরবারীই সিদ্ধান্ত দেবে। তোমরা আমাদেরকে সংখ্যাধিক্যের ভয় দেখাও। তোমাদের সংখ্যা যদি আকাশের তারার সমানও হয়, তাহলেও কোনো পরওয়া নেই। আমাদের আল্লাহ বলেন, "কখনও অল্প সংখ্যকও বহু সংখ্যকের ওপর বিজয়ী হয়ে থাকে।"

১৮—

www.bjilibrary.com

মোটকথা সন্ধির শর্তে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হলো না। হযরত মায়াজ রাদিয়াল্লাহ আনহু ফিরে এলেন। পরের দিন রোমীয়রা হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে দূত প্রেরণ করলো। দূত প্রস্তাব করলো যে, রোমীয়রা প্রতি মুসলমান সৈন্যকে দু' দিনার করে দেবে। এ দিনার পেয়ে তারা যেনো সে স্থান ছেড়ে চলে যায়।

হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহু এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন এবং সৈন্যদেরকে প্রস্তুতির নির্দেশ দিলেন। কিন্তু রোমীয়রা মুকাবিলায় অগ্রসর হলো না। দ্বিতীয় দিন হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু নিজের অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে ময়দানে বের হলেন। রোমীয়রা নিজেদের বাহিনীকে তিন ভাগে ভাগ করলো এবং তাদেরকে পালাক্রমে ময়দানে প্রেরণ করলো। তাদের প্রথম দল হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর দিকে অগ্রসর হলে তিনি কায়েস রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন হাবিবাকে সামনে এগিয়ে তার মুকাবিলার ইঙ্গিত দিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং যুদ্ধের দামামা বেজে উঠলো। এ সময় রোমীয়দের দ্বিতীয় দল ময়দানে সমুপস্থিত হলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর নির্দেশে মাইছারাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন মাছরুক তাদেরকে প্রতিরোধ করলেন। সাথে সাথে রোমীয় বাহিনীর বিরাট তৃতীয় অংশটি অগ্রসর হলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু তাদের হামলা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে ঠেকালেন। দীর্ঘক্ষণ ঘোরতর লড়াই হতে লাগলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু তাদের দুর্বলতা আঁচ করতে পারলেন এবং নিজের বাহিনীকে আহ্বান জানিয়ে বললেন, রোমীয়রা নিজেদের শক্তি প্রয়োগ করে ফেলেছে। এখন তোমাদের পালা। তাঁর আহ্বান শুনে মুসলমানরা এত প্রচণ্ড শক্তিতে হামলা করলো যে, রোমীয়রা ভেগে নিজেদের তাঁবুর দিকে চলে গেলো। ততক্ষণে রাত হয়ে গেছে। এজন্য মুসলমানরা ফিরে এলো। পরবর্তী দিন উভয় পক্ষের মধ্যে পুনরায় প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু শত্রুর ডান দিক উৎখাত করে ফেললেন এবং তাদের এগারজন বড় বড় অফিসার হত্যা করলেন। কায়েস বিন হাবিবাহ রোমীয়দের বাম বাহিনীকে পরাজিত করলেন এবং হাশেম রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন উতবাহ যুদ্ধ করতে করতে শত্রুর মধ্যখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। এখানে দীর্ঘক্ষণ ধরে প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো। এ যুদ্ধে সমগ্র ময়দানে খুনের নালা প্রবাহিত হতে লাগলো অবশেষে রোমীয়দের কদম থর থর করে কেঁপে উঠলো এবং মুসলমানরা লাভ করলেন বিরাট বিজয়। এ সংঘর্ষের পর জর্দানের অন্যান্য সব শহর খুব সহজেই বিজিত হলো।

এরপর ইসলামী বাহিনী হিমসের দিকে অগ্রসর হলো। হিমস ছিলো সিরিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর। হিরাক্লিয়াস এ খবর পেয়ে এক বিরাট বাহিনী

www.bjilibrary.com

দামেস্কের দিকে প্রেরণ করলো। মুসলমানদেরকে হিমস পর্যন্ত পৌছার সুযোগ না দেয়া এবং সম্ভব হলে দামেস্ক থেকে তাদেরকে বহিষ্কার করে পুনর্দখল করার জন্যে এ বাহিনী প্রেরিত হয়েছিলো। তুজার নামক এক ব্যক্তি বাহিনীটির সেনাপতি ছিলো। সে দামেস্কের পশ্চিমে মারজুররুম নামক স্থানে তাঁবু ফেললো। হিরাক্লিয়াস আরো একটি বাহিনী তুজারের সাহায্যার্থে তার পেছনে প্রেরণ করলো। এ বাহিনীর সেনাপতি ছিলো সানাছ নামক এক রোমক। হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে তুজারের সাথে লড়াইয়ের জন্যে প্রেরণ করলেন এবং নিজে সানাছের বিরুদ্ধে মুকাবিলার জন্যে বের হলেন।

তুজার মারজুররুম থেকে দামেস্কের দিকে অগ্রসর হলো। এ সময় হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু তার পেছনে অনুসরণ করলেন। দামেস্কের শাসক হযরত ইয়াযিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবি সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহ আনহু যেই তুজারের অগ্রসর হওয়ার খবর পেলেন, অমনি নিজের বাহিনী সাথে নিয়ে তাকে প্রতিরোধ করার জন্যে অগ্রসর হলেন। দামেস্কের কাছে উভয় পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো। ইত্যবসরে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু পশ্চাত দিক থেকে তুজারের ওপর হামলা করে বসলেন। এভাবে দু'দিক থেকে ইসলামী বাহিনী রোমীয়দের ধ্বংস করে ফেললো। আঙ্গুলে গোনা কয়েকজন ছাড়া সকল রোমীয়ই যুদ্ধের ময়দানে লাশ হয়ে পড়ে রইলো। তাদের মধ্যে তুজারও ছিলো।

হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহু মারজুররুমের কাছে সানাছকে বাধা দিলেন এবং তুমুল লড়াইয়ের পর তাকে পরাজিত করলেন। অসংখ্য রোমীয়দের সাথে সানাছ নিহত হলো। যারা বাঁচলো তারা পালিয়ে হিমসে গিয়ে আশ্রয় নিলো।

তুজার এবং সানাছকে পরাজিত করার পর হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহু হিমসের দিকে অগ্রসর হলেন। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু নিজের বাহিনীসহ আগে আগে ছিলেন। পথিমধ্যে বাকা' এবং বা'লাবাক শহর পড়লো। বাকা'বাসী কোনো বাধা ছাড়াই আনুগত্য কবুল করলো। অবশ্য বা'লাবাকের অধিবাসীরা মুকাবিলা করতে চাইলো। কিন্তু হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু তাদের ওপর এমন মরণ আঘাত হানলেন যে, তারা অবিলম্বে আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য হলো।

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু হিমস থেকে কয়েক মাইল দূরে ছিলেন। এ সময় রোমীয়দের বিরাট এক বাহিনী হিমস থেকে বের হয়ে তাদের মুখোমুখী হলো। কিন্তু হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর প্রথম আঘাতেই

www.bjilibrary.com

তাদের পদতল থেকে মাটি সরে গেলো এবং তারা পালিয়ে শহরে ঢুকে পড়লো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু মাইসারাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন মাছরুককের নেতৃত্বে একটি দলকে সামনের দিকে অগ্রসর করালেন। পথিমধ্যে রোমীয়দের ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত দলের সাথে সংঘর্ষ হলো। এসব সংঘর্ষে মুসলমানরা বিজয়ী হলো এবং হিমসের একদম কাছে পৌছে গেলেন। হযরত মাইসারাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন মাছরুককের পেছনে পেছনে হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুও হিমসের বাইরে এসে পৌছলেন। তাঁরা হিমসের বড় দরজা 'রাস্তান'-এর সামনে তাঁবু ফেললেন এবং শহরের চতুর্দিকে সৈন্য ছড়িয়ে দিলেন।

প্রথমে হিরাক্লিয়াস হিমসেই অবস্থান করছিলো। কিন্তু তুজার এবং সানাছ নিহত হওয়ার পর হিমস থেকে আরহা চলে গেলো। সেখান থেকে সে জাযিরাহবাসীকে হিমসবাসীদেরকে সাহায্যের নির্দেশ দিলেন। সুতরাং জাযিরাহ থেকে একটি বিরাট বাহিনী হিমসবাসীর সাহায্যে রওয়ানা হলো। কিন্তু ইরাকের অভিযানে নিযুক্ত হযরত সা'দ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবি ওয়াক্কাস কিছু সৈন্য পাঠালেন। এ বাহিনী তাদের অগ্রগমনে বাধা দিলেন।

মুসলমানরা যখন হিমস অবরোধ করে রেখেছিলো তখন প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়ছিলো। হিমসবাসীদের ধারণা ছিলো যে, আরবের লোক এ ঠাণ্ডা বরদাশত করতে পারবে না এবং খোলা ময়দানে তারা বেশীক্ষণ টিকতে পারবে না। কিন্তু তাদের ধারণা ভুল বলে প্রমাণিত হলো। মুসলমানরা অত্যন্ত দৃঢ়তার পরিচয় দিলেন এবং অত্যন্ত কঠোরতার সাথে অবরোধ অব্যাহত রাখলেন। অবশেষে রোমীয়রা হিম্মত হারিয়ে বসলো এবং সন্ধির আবেদন জানালো। একটি রাওয়ায়েতে এও বর্ণিত হয়েছে যে, মুসলমানরা আশ্রয়ের জন্য শহরের বিভিন্ন স্থান ধ্বংস করতে সফল হলেন। এতে রোমীয়রা ঘাবড়ে গিয়ে আনুগত্য স্বীকার করে নিলো এবং মুসলমানদের কাছে শহর ন্যস্ত করলো।

হিমস বিজয়ের পর হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহু সেখানেই মুকিম হয়ে গেলেন। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস জর্দানে অবস্থান নিলেন এবং হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু এক হাজার সৈন্যসহ দামেস্ক চলে গেলেন।

রোমীয়দের অব্যাহত পরাজয়ে হিরাক্লিয়াস অত্যন্ত বিচলিত হলো। সে সাম্রাজ্যের সকল শক্তি ব্যয় করে সিরিয়া থেকে আরবদেরকে বহিষ্কার করার সংকল্প নিলো। বস্তুত সে নিজের অধীনস্ত আরমেনীয়া, আলজাযিরাহ, কাসতান. তুনিয়া প্রভৃতি এলাকা থেকে সৈন্য তলব করলো। এসব সৈন্য ইন্তাকিয়াতে

www.bjilibrary.com

একত্রিত হলো। এ বাহিনীতে বড় বড় অভিজ্ঞ সিপাহী এবং জেনারেল ছিলো। এমনকি সন্যাসব্রতে নিয়োজিত রাহিব এবং পাদরীরাও স্ব স্ব খানকাহ ও গির্জা পরিত্যাগ করে এ বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলো। ধর্মের দোহাই দিয়ে রোমীয়দের মধ্যে আবেগ এবং উত্তেজনা সৃষ্টিই তাদের একমাত্র কাজ ছিলো। সেনাবাহিনীটি ইন্তাকিয়া থেকে যাত্রা করলো। এতে চারদিকে হৈ চৈ পড়ে গেলো। মুসলমানরা দু' লাখেরও বেশী যোদ্ধার এ বাহিনীর অগ্রযাত্রার খবর পেয়ে পরস্পর পরামর্শ বৈঠকে মিলিত হলেন। বৈঠকে সিরিয়ার বিজিত শহরগুলো থেকে সৈন্য হটিয়ে একস্থানে একত্রিত হয়ে রোমীয়দের মুকাবিলা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। সাথে সাথে খেলাফতের দরবার থেকে সাহায্য চাওয়ার সিদ্ধান্তও নেয়া হলো। এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মুসলমানরা হিমস, দামেস্ক প্রভৃতি শহর খালি করলো। এরপর তারা সেখানকার অধিবাসীদের কাছ থেকে আদায়কৃত জিযিয়ার সকল অর্থ এ বলে ফিরিয়ে দিলেন যে, এখন আর তারা তাদেরকে রক্ষা করতে পারছেন না। চুক্তি পালন এবং উদারতার এমন উদাহরণ বিশ্বের কোনো জাতির ইতিহাসে পাওয়া যায় না। মুসলমানদের এ চারিত্রিক গুণাবলীই চরম দুশমনের অন্তরও জয় করে রেখেছিলো। এ সুন্দর আচরণে সেসব শহরের খৃষ্টান এবং ইহুদীরা অত্যন্ত প্রভাবান্বিত হয়েছিলো। তারা কেঁদে কেঁদে এ দোয়া করছিলো যে, আল্লাহ যেনো মুসলমানদেরকে শীঘ্র ফিরিয়ে আনেন।

সমগ্র ইসলামী সৈন্য সিরিয়ার শহরসমূহ থেকে বের হয়ে ইয়ারমুক উপত্যকায় রোমীয় বাহিনীর সামনাসামনি হলো। ইয়ারমুক নদী এবং জর্দান নদীর মিলনস্থল থেকে ৩০ মাইল উজানে ইয়ারমুক নদীর অর্ধবৃত্তের ঘূর্ণনে সৃষ্ট ময়দানে রোমীয় বাহিনীর তাঁবু স্থাপন করা হয়েছিলো। তার পশ্চাতদেশে ওয়াকুসার সংকীর্ণ ঘাঁটি ছিলো। সামনে ছিলো ওয়াকুসা উপত্যকা। পাশে ছিলো ইয়ারমুক নদী। এভাবে বাহিনী তিন দিক থেকে সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত হয়ে গিয়েছিলো। ইসলামী বাহিনী সরাসরি তার সামনে এসে তাঁবু ফেলেছিলো। রোমীয়দের ধারণায় তারা নিজেদের তাঁবুর জন্যে উত্তম স্থান নির্বাচন করেছিলো। কিন্তু এ ধরনের স্থান বিজয়ের অবস্থায় উত্তম বলে বিবেচিত হতে পারে। পরাজয়ের অবস্থায় এ স্থান তাদের জন্যে ধ্বংসের কারণ হতে পারতো। কিন্তু তারা এটা চিন্তাও করতে পারেনি যে, সব ধরনের যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত এতবড় বাহিনী পরাজয়ের মুখও দেখতে পারে। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস রোমীয়দের অবস্থান স্থল দেখে চীৎকার দিয়ে উঠলেন ঃ "হে মানুষেরা ! সুসংবাদ। আল্লাহর কসম, রোমীয়রা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। আর অবরুদ্ধ বাহিনী কমই মুক্তি পায়।"

www.bjilibrary.com

রণনীতি অনুসারে মুসলমানদের স্থাপিত তাঁবুর স্থান ছিলো উত্তম স্থান। সেখান থেকে তারা কেন্দ্রীয় খেলাফতের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম ছিলো ও যুদ্ধ সরঞ্জাম এবং রসদও খুব সহজে পৌঁছতে পারতো। পরাজিত অবস্থায় তারা মরুভূমির দিকে পিছপাও হতে পারতো। পক্ষান্তরে পরাজিত অবস্থায় রোমীয়দের আর কোনো আশ্রয়স্থল ছিলো না। দুই আড়াই লাখ রোমীয়দের মুকাবিলায় মুসলমানদের সংখ্যা সব মিলিয়ে ৪৬ হাজারের মতো ছিলো। কিন্তু তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিলো তুঙ্গে।

ইতিপূর্বে সিরিয়ার সকল যুদ্ধে মুসলমানরা রোমীয়দের পরাজিত করেছিলো। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সংখ্যাধিক্য ও সাজ-সরঞ্জাম সত্ত্বেও রোমীয়রা যুদ্ধ যাতে না হয় তা অন্তর দিয়েই চেয়েছিলো। মুসলমানরা কিছু নিয়ে যদি ফিরে যায় তাতেও তারা সম্মত ছিলো। বস্তুত তাদের সেনাপতি বাহান অর্থকড়ি নিয়ে ফিরে যাওয়ার জন্যে মুসলমানদের কাছে প্রস্তাব পেশ করলো। কিন্তু মুসলমানরা এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন এবং যুদ্ধ অবধারিত হয়ে উঠলো। বিভিন্ন রাওয়ায়েত অনুযায়ী উভয় পক্ষ দু' তিন অথবা পাঁচ মাস পর্যন্ত মুখোমুখি হয়ে রইলো। এ সময় ছোটখাটো সংঘর্ষ হলো। কিন্তু বড় ধরনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। অবশেষে ১৫ হিজরীর জমাদিউল আখির অথবা রজব মাসে উভয় পক্ষ পূর্ণ শক্তিসহ একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু নিজের বাহিনীকে ৩৬ (অন্য রাওয়ায়েত অনুযায়ী ৩৮ অথবা ৪০) গ্রুপে বিভক্ত করলেন। এ বিভক্তির কারণ হলো যাতে শত্রুরা প্রকৃত সংখ্যা থেকে বেশী মনে করে। এসব গ্রুপের সরদার এমন ব্যক্তিবর্গ ছিলেন যারা বাহাদুরী এবং সাহসিকতায় প্রভুত খ্যাতি লাভ করেছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ হযরত কা'কা রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আমর তামিমি, হাশিম রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন উতবাহ, জিরার রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আযুর, ইকরামাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবি জেহেল, আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন খালিদ প্রমুখ। কেন্দ্রে ১৮টি গ্রুপ ছিলো এ সকল গ্রুপের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহু। ডান দিকের ১০ গ্রুপের নেতৃত্ব হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস এবং হযরত শুরাহবিল রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন হাসানাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু দিচ্ছিলেন। আর বাম দিকের ১০ গ্রুপের অফিসার ছিলেন হযরত ইয়াযিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবি সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহ আনহু। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর কমাণ্ডে ছিলো যোগাযোগ বিষয়ক বাহিনী। এর সাথে যুদ্ধের পরিকল্পনা এবং সাধারণ তত্ত্বাবধানের দায়িত্বও তাঁর হাতে ন্যস্ত ছিলো। হযরত মিকদাদ রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসওয়াদ সৈন্যদের অগ্রভাগে সূরা আনফাল তেলাওয়াত করেছিলেন। এবং হযরত আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহ আনহু মুজাহিদদের সামনে

www.bjilibrary.com

দাণ্ডায়মান হয়ে জিহাদের জোশ পুনরুজ্জীবিত করছিলেন। তিনি প্রতিটি গ্রুপের সম্মুখে যাচ্ছিলেন এবং বলছিলেন ঃ

"তোমরা হলে আরবের সাহসী পুরুষ এবং ইসলামের সাহায্যকারী— তারা হলো রোমীয়দের সাহসী পুরুষ এবং শিরকের মদদগার।

"হে আল্লাহ ! আজকের দিন হলো যুদ্ধের দিন। হে আল্লাহ ! তোমার সাহায্য তোমার নিজের বান্দাদের ওপর নাযিল করো।"

সৈন্যদেরকে বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত করার উদ্দেশ্য বিভিন্নস্থান থেকে লড়াই করা ছিলো না। বরং হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু তাদেরকে কেন্দ্র, ডান এবং বামের সরদারদের নির্দেশাবলী লাভ এবং সে মুতাবিক কাজ করাকে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছিলেন।

ইসলামী বাহিনীতে এক হাজার সাহাবী রাদিয়াল্লাহ আনহুও ছিলেন। তাঁদের মধ্যে এক শ' সম্মানিত বদরী সাহাবী অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু ব্যূহ রচনায় ব্যস্ত ছিলেন। এমনি সময়ে একজনের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো রোমীয়দের মুকাবিলায় আমাদের সংখ্যা অনেক কম। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন ঃ

"চুপ কর। জয়-পরাজয় সৈন্যের কম-বেশী হওয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। বরং আল্লাহর সাহায্যেই তা হয়। আল্লাহর কসম ! আমার ঘোড়ার ক্ষুর যদি ঠিক থাকতো তাহলে আমি রোমীয়দেরকে এ পরিমাণ সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করতে বলতাম।"

ব্যূহ রচনা শেষে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত কা'কা রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আমর তামিমী ও হযরত ইকরামাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবি জেহেলকে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে দুশমনের ওপর হামলার নির্দেশ দিলেন। তাঁরা দু'জন স্ব স্ব বাহিনীর সাথে যুদ্ধ গাথা পড়তে পড়তে শত্রুর ওপর ঝাপিয়ে পড়লেন এবং সেই সাথে ঘোরতর যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো। এ যুদ্ধ তিনদিন (অন্য রাওয়ায়েত অনুযায়ী কয়েকদিন) যাবত অব্যাহত রইলো। ঐতিহাসিকরা এ যুদ্ধের বর্ণনা বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ধারাবাহিকতায় মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ কোনো ঘটনা প্রথম দিনের যুদ্ধের প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। অন্যরা আবার সেই একই ঘটনা দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় দিনের ঘটনাবলীতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কয়েকটি বিশেষ ঘটনার বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

১। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু একদিন শুধুমাত্র ৬০জনের একটি অশ্বারোহী বাহিনী তৈরি করলেন এবং রোমীয় বাহিনীর ৬০ হাজার আরব

www.bjilibrary.com

খৃষ্টান সৈন্যের ওপর এমনভাবে হামলা করে বসলেন যে, একবার এক অংশে এবং অন্যবার অন্য অংশে হামলা করতে থাকলেন। এভাবে তিনি সন্ধ্যা পর্যন্ত শত্রুকে ব্যস্ত রাখলেন এবং নিজের বড় বাহিনীর দিকে অগ্রসর হওয়া থেকে তাদেরকে বিরত রাখলেন। এ অপূর্ব এবং আশ্চর্যজনক যুদ্ধে শত্রুর হাজার হাজার সৈন্য নিহত হলো। পক্ষান্তরে মুসলমানদের মাত্র ১০ ব্যক্তি শহীদ এবং পাঁচজন শত্রুর হাতে বন্দী হলেন। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু পরের দিন তাদেরকে মুক্ত করে আনলেন।

২। রোমীয়দের আবেগ এবং উদ্দীপনাও চরম পর্যায়ে এসে পৌছে ছিলো। তাদের ৩০ হাজার মানুষ পায়ে শৃংখল লাগিয়ে রেখেছিলো। যাতে তারা পেছনে হটা অথবা পালানোর ধারণাও করতে না পারে। হাজার হাজার পাদরী হাতে ক্রুশ নিয়ে অগ্রভাগে উপস্থিত থেকে স্ব বাহিনীকে উদ্বুদ্ধ করছিলো।

৩। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহু নির্দেশ জারী করলেন। নির্দেশে সকল অফিসারকে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন ওয়ালিদের নির্দেশ মেনে চলার কথা বলা হলো। অতপর হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু সকল সৈন্য পরিদর্শন করলেন। তিনি যে পতাকার কাছেই পৌছতেন সেই বাহিনীর জওয়ানদের উদ্দেশ্যে এ ভাষণ দিতেন ঃ

"হে মুসলমানগণ ! অটলতার মাধ্যমেই বিজয় লাভ সম্ভব। দুর্বলতার পরিণাম হলো চিরকালীন বরবাদী। ভালোভাবে বুঝে নাও, স্থির চিত্ততা এবং অটলতার সাথে যারা কাজ করবে তারাই বিজয়ী হবে। দুর্বলতা তাদেরই পেয়ে বসে যারা বাতিলের পূজারী। হকের ঝাণ্ডাবাহীরা কখনো দুর্বলতা প্রদর্শন করে না। কেননা তারা আল্লাহর ওপর ভরসা করে থাকে। তারা আল্লাহর সীমাসমূহ হেফাজত করে এবং তার রাস্তায়ই লড়াই করে। তাদের পূর্ণ আস্থা বা ইয়াকীন থাকে যে, শহীদ হয়ে তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করবে।"

৪। প্রথম দিন জনৈক রোমক নিজের ব্যূহ থেকে বের হয়ে মুসলমানদেরকে যুদ্ধের আহ্বান জানালো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু কায়েস রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন হাবিরাহকে তার মুকাবিলায় যাওয়ার ইঙ্গিত দিলেন। কায়েস রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন হাবিরাহ সম্মুখে অগ্রসর হয়ে এক আঘাতেই সেই রোমককে লাশ বানিয়ে ফেললেন। মুসলমানরা নারায়ে তাকবির ধ্বনি উচ্চারণ করলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, শুরুটা শুভ হয়েছে। এখন বিজয় বাকী।

৫। রোমক সেনাপতি বাহান জর্জাহ (জর্জ) নামক এক দূত হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে প্রেরণ করলো। এ দূত মুসলমানদের কোনো

www.bjilibrary.com

সম্মানিত অফিসারকে সন্ধির আলাপ-আলোচনার জন্যে তাদের কাছে প্রেরণের বাণী নিয়ে এসেছিলো। জর্জাহ যখন ইসলামী বাহিনীতে পৌছলো তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছিলো। কিছুক্ষণ পরই মাগরিবের নামায শুরু হলো। মুসলমানদের জামায়াতের সাথে নামাযের অন্তস্পর্শী দৃশ্য জর্জাহর অন্তর ঈমানের আলোয় অত্যুজ্জ্বল করে ফেলেছিলো। মুসলমানরা নামায থেকে ফারেগ হলে জর্জাহ হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিদমতে হাজির হয়ে কতিপয় প্রশ্ন করলো। এসব প্রশ্নের মধ্যে মুসলমানরা হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করে তাও ছিলো। হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আল্লাহর সে ইরশাদের প্রতিই আমরা আস্থা স্থাপন করেছি ঃ

"হে আহলে কিতাব ! নিজের দীন এবং আল্লাহর ব্যাপারে অতিরঞ্জন করো না। যা কিছু বলো, সত্য বলো। ঈসা আলাহিস সালাম বিন মরিয়ম আলাহিস সালাম শুধুমাত্র আল্লাহর রাসূল এবং তার বাণী যা তিনি মরিয়ম আলাইহিস সালামের ওপর অবতীর্ণ করেছেন ও তার তরফ থেকে এক আত্মা। সুতরাং আল্লাহ এবং তার রাসূলের ওপর ঈমান আন ও তিন খোদা বলো না। তিন খোদা বলা পরিত্যাগের মধ্যেই তোমাদের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আল্লাহ একক মা'বুদ। সন্তান হওয়ার কথা থেকে তিনি পবিত্র। আসমান এবং যমীনে যাকিছু আছে সবই তার। মসীহ খোদার বান্দাহ হওয়ার ব্যাপারে লজ্জা অনুভব করেন না এবং নিকটবর্তী ফেরেশতারাও নয়। যে ব্যক্তি আল্লাহর বন্দেগীতে লজ্জা অনুভব করে এবং অহমিকার সাথে কাজ করে তাহলে মানুষেরা যেনো শুনে নেয় যে, আল্লাহ তাদের সবাইকেই নিজের কাছে একত্রিত করবেন।"

জর্জাহ হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহুর জবাব শুনে নির্দ্বিধায় বলে উঠলো, নিসন্দেহে এসব গুণই হযরত ঈসা (আ)-এর এবং অবশ্যই তোমাদের পয়গাম্বর সত্যবাদী। একথা বলেই সে কালেমায়ে তাওহীদ পাঠ করলো এবং মুসলমান হয়ে গেলো। তিনি নিজের জাতির কাছে আর ফিরে যেতে চাইলেন না। রোমকরা যাতে চুক্তিভঙ্গের ধারণার বশবর্তী হতে না পারে সে জন্যে হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে ফিরে যেতে বাধ্য করলেন এবং বললেন, আগামীকাল যে দূত এখান থেকে যাবেন তার সাথে তুমি চলে এসো।-(আল ফারুক শিবলী নোমানী)

মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান খান শিরওয়ানী (র) (নওয়াব ছদর ইয়ার জঙ্গ) নিজের কিতাব "সিরাতুস সিদ্দিকে" এ ঘটনাকে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ

"যুদ্ধের সময় রোমক সরদার জর্জাহ বিন তুজার ময়দানে এসে উচ্চস্বরে আহ্বান জানিয়ে বললো, খালিদ আমার সামনে আসুন। হযরত খালিদ

www.bjilibrary.com

রাদিয়াল্লাহ আনহু অগ্রসর হয়ে উভয় বাহিনীর মধ্যে জর্জাহর সাথে মিলিত হলেন। প্রথমে উভয়েই একে অপরকে আশ্রয় দিলো। অতপর এমনভাবে দাঁড়ালেন যে, এক ঘোড়া অপর ঘোড়ার সাথে মিশে গেলো।

জর্জাহ ঃ খালিদ ! সত্য কথা বলবে। মিথ্যা বলবে না। স্বাধীন মানুষ মিথ্যা বলে না। ধোঁকা দেবে না। ধোঁকা শরীফদের রীতি নয়। আমি একথা জিজ্ঞেস করছি যে, আল্লাহ তোমাদের নবীর কাছে আসমান থেকে তলোয়ার প্রেরণ করেছিলেন। সে তলোয়ার তুমি পেয়েছো। তার প্রভাবেই তুমি সর্বত্র বিজয়ী হয়ে থাকো।

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু ঃ না।

জর্জাহ ঃ তাহলে, তোমার উপাধি সাইফুল্লাহ কেন ?

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু ঃ আল্লাহ পাক আমাদের কাছে নিজের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রেরণ করেছিলেন। তিনি আমাদের সামনে ইসলাম পেশ করেছিলেন। প্রথমতঃ আমরা সবাই ভেগে এক প্রান্তে উপনীত হয়েছিলাম। কতিপয় ব্যক্তি নবীর কথায় আস্থাস্থাপন করে আনুগত্য করেন। কেউ কেউ দূরে দূরে থেকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে থাকে। আমিও মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের মধ্যে ছিলাম। অতপর আল্লাহ পাক আমাদের অন্তর ফিরিয়ে দিলেন। মাথানত এবং হেদায়াত দান করলেন। আমিও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য কবুল করলাম। এ সময় এরশাদ হলো ঃ

"হে খালিদ ! তুমি আল্লাহর তরবারীসমূহের মধ্যে অন্যতম। আর সেই তরবারীকে মুশরিকদের মুকাবিলায় খাপ থেকে বের করা হয়েছে।" ফলতঃ সকল মুসলমান থেকে আমি মুশরিকদের বড় দুশমন।

জর্জাহ ঃ তুমি সত্য বলেছ। এখন বলো, ইসলামের দাওয়াত কি ?

হযরত খালিদ ঃ এ বস্তুর বিশ্বাস যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বান্দাহ ও রাসূল। আর সেই পয়গামের প্রতি বিশ্বাসস্থাপন, যা তিনি খোদার কাছ থেকে এনেছেন।

জর্জাহ ঃ যদি কেউ তা না মানে।

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু ঃ জিযিয়া দেবে।

জর্জাহ ঃ এও যদি গ্রহণ না করে।

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু ঃ আমরা যুদ্ধের ঘোষণা দেব।

জর্জাহ ঃ তোমাদের অন্তর্ভুক্তদের মর্যাদা কি ?

www.bjilibrary.com

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু ঃ আল্লাহর ফরমান হলো, সব মুসলমান মর্যাদার দিক দিয়ে সমান। ছোট হোক বা বড় হোক প্রথম হোক বা শেষ হোক।

জর্জাহ ঃ কেউ আজ ঈমান আনলেও কি মর্যাদায় সমান হবে?

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু ঃ সমান বরং আফজাল বা বেশী মর্যাদাবান হবে।

জর্জাহ ঃ এটা কেমন করে?

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু ঃ আমাদের ইসলাম গ্রহণকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবিত ছিলেন। অহী নাযিলের ধারা অব্যাহত ছিলো। তিনি আসমানী নির্দেশের খবর দিতেন। আমরা মুজিযাসমূহ প্রত্যক্ষ করতাম। সে অবস্থায় মুসলমান হওয়াটা আমাদের জরুরী ছিলো। এখন তোমরা সেসব বস্তু দেখতে পাও না। তারপরও তোমরা ঈমান এনে থাকো। এজন্যে তোমরা আমাদের চেয়ে বেশী মর্যাদাবান।

জর্জাহ ঃ তুমি কসম দিয়ে বলছো যে, যাকিছু বলেছো তা সম্পূর্ণ সত্য। ধোঁকা দাওনি। বা মনতুষ্টির জন্য একথা বলোনি।

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু ঃ আল্লাহর কসম ! আমি মিথ্যাও বলিনি। তোমার প্রতি অথবা তোমাদের কারও প্রতি আমার ঘৃণা বা বিদ্বেষও নেই। যা তুমি জিজ্ঞেস করেছো তার সত্য জবাব আমি দিয়েছি। আল্লাহ আমার সাহায্যকারী।

জর্জাহ ঃ অবশ্যই তুমি সত্য বলেছো।

একথা বলেই সে নিজের ঢাল পেছনে ফেলে দিলো এবং তাকে ইসলামের তালকীন দানের কথা বললো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু তাকে নিজের তাঁবুতে নিয়ে গেলেন। প্রথমতঃ গোসল করালেন। অতপর ইসলামের তালকীন বা শিক্ষাদানের পর জর্জাহকে মুক্তাদী বানিয়ে দু' রাকাআত নামায আদায় করলেন। জর্জার এ অবস্থা দেখে রোমকরা সাধারণ আক্রমণ শুরু করে দিলো। সে সময় হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু জর্জাহকে নিয়ে তাঁবু থেকে বের হলেন তখন রোমকরা মুসলমানদের ব্যূহে ঢুকে পড়েছিলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু উচ্চস্বরে আহ্বান জানালেন। ফলে মুসলমানরা বাহাদুরীর সাথে হামলা করে দুশমনকে পিছনে হটিয়ে দিলো।

অতপর সাইফুল্লাহ আক্রমণ করলেন এবং তরবারীর পরীক্ষা শুরু হলো। সূর্যদয় হতে দ্বিপ্রহরের সময় অর্থাৎ চাশ্‌ত থেকে সূর্য ঢলে পড়া পর্যন্ত যুদ্ধের

www.bjilibrary.com

ময়দান একাধারে উত্তপ্ত রইলো। এমনকি আসরের নামায ইশারায় আদায় করা হলো। এটা দর্শনীয় ব্যাপার ছিলো যে, যে জর্জাহ সকালে মুসলমানদের দুশমন ছিলো সে জর্জাহ এখন হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর পাশে দাঁড়িয়ে ঈমানের পূর্ণ দীপ্তিতে বলীয়ান হয়ে রোমকদের ওপর তরবারীর আঘাত হেনে চলেছিলেন। আর তিনি কত বড় ভাগ্যবান যে, সংঘর্ষে শাহাদাত বরণ করেছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর মাত্র দু' রাকাআত নামায পড়ে রক্তাক্ত অবস্থায় আল্লাহর সান্নিধ্যে হাজির হয়েছিলেন।

৬। জর্জাহর দূতগিরির জবাবে পরবর্তী দিন হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দূত বানিয়ে বাহানের কাছে প্রেরণ করলেন। বাহান নিজের শান-শাওকাত এবং সেনাধিক্য ও শক্তি প্রদর্শনের বিশেষ ব্যবস্থা নিলো। রাস্তার দু' ধারে পদাতিক বাহিনীর দশ দশটি ব্যূহ ছিলো। তাদের পিছনে অশ্বারোহীদের সুদীর্ঘ কাতার খাড়া করা হলো। স্বসৈন্য যিরাহসহ সম্পূর্ণ সশস্ত্র ছিলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর ওপর এ প্রদর্শনীর কোনো প্রভাব পড়লো না। তিনি রোমকদের মধ্য দিয়ে এমনভাবে অতিক্রম করলেন, যেমন ভেড়া ও বকরীর পালের মধ্য দিয়ে বাঘ অতিক্রম করে। বাহানের তাবুর কাছে পৌঁছলে সে উষ্ণ সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করলো এবং তাঁবুতে নিয়ে নিজের বরাবর বসালো। দোভাষীর মাধ্যমে প্রথমে কিছু আনুষ্ঠানিক কথাবার্তা হলো। অতপর বাহান হযরত ঈসা (আ)-এর প্রশংসা দিয়ে বক্তৃতা শুরু করলো এবং বললো ঃ

"আমাদের বাদশাহ সকল বাদশার শাহানশাহ এবং আমাদের জাতি বিশ্বের সকল জাতি থেকে উত্তম।"

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বাধা দিয়ে বললেন ঃ

"তোমাদের বাদশাহকে যা ইচ্ছে তাই মনে করো। কিন্তু আমরা যাকে নেতা বানিয়েছি সে যদি অন্তরে এক মুহূর্তের জন্যেও বাদশাহীর খেয়াল করে, তাহলে তৎক্ষণাৎ তাকে বরখাস্ত করে থাকি।"

বাহান পুনরায় বক্তৃতা শুরু করলো এবং স্বদেশের সচ্ছলতা ও অঢেল সম্পদের উল্লেখ করে বললো ঃ "আরববাসী স্বাধীনভাবে এ দেশে গমনাগমন করতো। তাদের মধ্য থেকে যারা এখানে বসতিস্থাপন করেছে তাদের সাথে আমরা সুন্দর ব্যবহার করেছি। কিন্তু তোমরা আমাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার পরিবর্তে এ দেশের ওপর চড়াও হয়ে বসেছো। তোমাদের জানা নেই যে, তোমাদের পূর্বেও আরো কয়েকটি জাতি এ দেশ জয় করতে চেয়েছিলো। কিন্তু সবাই উচিত শিক্ষা পেয়ে গেছে। এরপর তোমাদের মত জাহেল, বন্য

www.bjilibrary.com

এবং সরঞ্জামহীন দুর্ভিক্ষ পীড়িত জাতি কি করে আর এ দেশ জয় করবে। সম্ভবতঃ তোমরা দারিদ্রের কারণে বাধ্য হয়ে এ দেশে প্রবেশ করেছো। তোমাদের সাহসের বলিহারি। তবে, তোমাদেরকে আমরা ক্ষমা করে দিচ্ছি এবং প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, যদি তোমরা আমাদের দেশ ছেড়ে চলে যাও তাহলে আমরা তোমাদের সেনাপতিকে ১০ হাজার, প্রত্যেক অফিসারকে ১ হাজার এবং প্রতিটি সিপাহীকে একশ দিনার করে দেয়ার ব্যবস্থা করবো।"

বাহান বক্তৃতা শেষ করলে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু হামদ ও নাতের পর বললেন ঃ

"তুমি স্বজাতির অঢেল সম্পদ ও শান-শাওকাতের যে বর্ণনা দিয়েছো তা আমরা জানি। তোমরা নিজের প্রতিবেশী আরবদের সাথে যে ব্যবহার করেছো তাও আমরা অবহিত আছি। কিন্তু এটা তোমাদের কোনো ইহসান ছিলো না। বরং এটা তোমরা করেছো তোমাদের সাম্রাজ্য এবং ধর্ম বিস্তারের জন্যে। তারই ফলশ্রুতিতে তাদের বহু লোক খৃষ্টান হয়ে গেছে। আর আজ তারা তোমাদের সাথে একত্রিত হয়ে আমাদের বিরুদ্ধে লড়ছে।

এটা ঠিক যে, আমরা অত্যন্ত দরিদ্র, অক্ষম এবং বেদুঈন ছিলাম। আমাদের অজ্ঞতা এতদূর গড়িয়েছিলো যে, শক্তিশালী মাত্রই দুর্বলদেরকে চিবিয়ে খেত। গোত্রসমূহ পরস্পরের সাথে লড়াই করে ধ্বংস হয়ে যেতো। আমরা আল্লাহকে পরিত্যাগ করে অনেক মাবুদ বানিয়ে নিয়েছিলাম। স্বহস্তে মূর্তি তৈরি করতাম। আল্লাহ আমাদের ওপর রহম করেছেন এবং এক পয়গাম্বর প্রেরণ করেছেন। তিনি আমাদের জাতিরই মানুষ। তিনি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী শরীফ, সবচেয়ে বেশী উদার এবং সবচেয়ে বেশী পূতপবিত্র ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী। তিনি আমাদেরকে একক খোদার দিকে ডাকলেন এবং শুধুমাত্র এক আল্লাহর ইবাদাতের শিক্ষা দিলেন। কাউকে তার অংশীদার বানাতে নিষেধ করলেন এবং মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করতে বললেন। সে আল্লাহর স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততি নেই। তিনি আমাদেরকে এ নির্দেশও দিয়েছেন যে, আমরা তাঁর আনীত দ্বীনকে দুনিয়াতে প্রসারিত করবো। যে এ দীন মেনে নেবে সে আমাদের ভাই। যারা দীনে প্রবেশ করেনি তবে জিযিয়া প্রদান কবুল করেছে, আমরা তাদের হেফাজতের জিম্মাদার। যারা উভয়টিই অস্বীকার করবে, তারা যেনো এটা বুঝে নেয় যে, তারা এমন সব লোকের সম্মুখীন হয়েছে, যারা মৃত্যুকে জীবনের মত ভালোবাসে। সাম্রাজ্য আল্লাহর। যাকে ইচ্ছা দান করেন। কিন্তু এটা বুঝে নাও যে, যারা আল্লাহকে ভয় করে তারাই পরিণামে সফল হবে।"

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর বক্তৃতা শুনে বাহান বললো ঃ

www.bjilibrary.com

"আমাদের মধ্যে কেউই তোমাদের দীন কবুল করবে না এবং জিযিয়া দানেও অগ্রসর হবে না। আমরা জিযিয়া নেই, দেই না।

মোটকথা, সন্ধির আলোচনা ব্যর্থ হয়ে গেলো এবং হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু নিজের বাহিনীতে চলে এলেন।

৭। একবার রোমকরা মুসলমানদের দক্ষিণ দিকে এমন প্রচণ্ড আঘাত হানলো যে, তারা সৈন্য বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অত্যন্ত বিশৃংখল অবস্থায় পিছু হটতে লাগলো। এমনকি পিছুতে পিছুতে তারা মহিলাদের তাঁবুর কাছে পৌঁছলো। মহিলারা নিজেদের পুরুষদের পেছনে হটতে দেখে ক্রোধে ফেটে পড়লো। ইসলামের এসব মহিলারা তাঁবুর খুঁটি উপড়ে ফেললো এবং যারা পেছনে হটে আসছিলো তাদেরকে উচ্চস্বরে ডেকে বললো, তোমরা যদি এদিকে আসো, তাহলে এ খুঁটি দিয়ে তোমাদের মাথা ফাটিয়ে দেবো।

কিছু মহিলা সেই খুঁটিসহ রোমকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং অনেক রোমকের ভবলীলা সাঙ্গ করে ফেললো। মহিলাদের ঈমানী জোশ দেখে পিছনে হটনেওয়ালা মুজাহিদদের কদম স্থির হয়ে গেলো এবং তারা অত্যন্ত উদ্দীপনার সাথে যুদ্ধ করতে লাগলো। ঠিক সেই সময় হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু ব্যূহ ভেদ করে বেরিয়ে এসে এমন প্রচণ্ড হামলা করলেন যে, রোকমদের কয়েকটি কাতার খতম হয়ে গেলো। কিন্তু তাদের চাপ কোনোমতেই কম ছিলো না। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু ইসলামী বাহিনীর দক্ষিণ দিকে গিয়ে পৌঁছলেন এবং নতুন করে ঢেলে সাজালেন। অতপর মুসলমানদেরকে উচ্চস্বরে বললেন ঃ "হে মুসলমানরা ! শত্রুর উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং বাহাদুরী তোমরা দেখেছো। এখন পুরো শক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ো। আল্লাহ তোমাদেরকে কামিয়াব এবং সফল করবেন।"

হযরত খালিদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে মুসলমানরা অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করতে লাগলেন। হযরত ইকরামা রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবি জেহেল একা একা নিজের ঘোড়াকে অগ্রসর করলেন এবং রোমকদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ "হে রোকমরা ! কোনো এক সময় (ইসলাম গ্রহণের পূর্বে) আমি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি। আজ তোমাদের সামনে থেকে পিছু হটে যাবো ? আল্লাহর কসম ! কখনো তা হবে না।"—একথা বলে নিজের বাহিনীর দিকে তাকালেন এবং বললেন ঃ "এসো ! কে আমার হাতে মৃত্যুর বাইয়াত করবে।"

তাঁর আহ্বানে চারশ জানবাজ সামনে অগ্রসর হলেন এবং তার হাতে মৃত্যুর বাইয়াত করলেন। তারপর এসব জীবন উৎসর্গকারী হযরত খালিদ

www.bjilibrary.com

রাদিয়াল্লাহ আনহুর তাঁবুর সামনে অকুতোভয়ে লড়াই শুরু করলেন। এমন কি তাঁরা একে একে সবাই শহীদ হয়ে গেলেন। হযরত ইকরামার দেহ শহীদের স্তুপের মধ্যে পাওয়া গেলো। তখনো জীবনের স্পন্দন অবশিষ্ট ছিলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁর মাথা নিজের উরুর ওপর রাখলেন এবং হলকে পানি দিয়ে বললেন ঃ

"খোদার কসম ! ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর ধারণা ভুল ছিলো। তাঁর আরণা ছিলো যে, আমরা বনু মাখজুম শাহাদাত থেকে বঞ্চিত থাকবো।"

মোটকথা হযরত ইকরামা রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং তাঁর সাথী শহীদ হয়ে গেলেন। কিন্তু তিনি রোমকদের হাজার হাজার লোক হত্যাও করেছিলেন। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর প্রচণ্ড হামলায় তাদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিলো এবং পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু তাদের সেনাপতিকে ধাওয়া করতে করতে দূররে নাজ্জার পর্যন্ত পৌছে গিয়েছিলেন। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু যখন তার কাছে পৌছেন তখন সে বলছিলো ঃ

"আমার চক্ষু ও মাথার ওপর কাপড় মুড়িয়ে দাও। হায় ! আমি যেনো মুসলমানদেরকে অগ্রসর হতে না দেখি।" শেষ পর্যন্ত দূররে নাজ্জার মুসলমানদের অবরোধে নিপতিত হলো এবং সে মারা গেলো।

সংক্ষিপ্ত কথা হলো, উভয় পক্ষের মধ্যে তিন দিন অব্যাহতভাবে ঘোরতর লড়াই হতে লাগলো। তৃতীয় দিনে রোমকরা বার বার হামলা চালালো। কিন্তু মুসলমানরা অটলতার পরিচয় দিলেন। প্রতিটি হামলা তারা বাহাদুরীর সাথে মুকাবিলা করলেন। অবশেষে তারা তরবারীর খাপ দূরে নিক্ষেপ করলেন। নিযাহ সিধা করে আপাদমস্তক শত্রুর ব্যূহে ঢুকে পড়লেন এবং এমন প্রচণ্ড হামলা চালালেন যে, শত্রুর কদম টলটলায়মান হয়ে উঠলো। ঠিক এমনি সময় হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু কর্তৃক ময়দানের বাম পাশে নিয়োজিত হযরত হাবিরাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু পশ্চাত দিক থেকে রোমকদের ওপর বিদ্যুৎ বেগে হামলা করে বসলো। সাথে সাথে হযরত সাঈদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন যায়েদ সেনাবাহিনীর কেন্দ্রবিন্দু থেকে বের হয়ে রোমকদের ওপর আপতিত হলেন। এসব হামলায় রোমকরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লো। তাদের প্রায় অর্ধেক সৈন্য নিহত অথবা আহত হলো এবং অবশিষ্টরা পালিয়ে গেলো। এমনিভাবে মুসলমানদের বিরাট বিজয় ঘটলো। এটা ছিলো সিরিয়ায় সিদ্ধান্তমূলক যুদ্ধ। এরপর রোমকরা এ সংখ্যায় আর কোনোদিন একত্রিত হতে পারেনি। ইন্তাকিয়ায় অবস্থানরত হিরাক্লিয়াস পরাজয়ের সংবাদ পেলেন। পরাজয়ের খবরে তার মুখ দিয়ে অযাচিত বেরিয়ে এলো ঃ "বিদায় ! হে, সিরিয়া !"

www.bjilibrary.com

এরপর বাস্তবিকই সিরিয়া ছেড়ে সে কাসতানতুনিয়ার দিকে চলে গেলো।

ইয়ারমুক বিজয়ের পর হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে 'কানসারিন' বিজয়ের জন্য প্রেরণ করলেন। পথিমধ্যে 'হাজির' নামক স্থানে এক প্রখ্যাত রোমক জেনারেল মিনাস বিরাট বাহিনীসহ হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে বাধা দিলেন। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু তাকে পরাজিত করলেন এবং সেখান থেকে কানসারিনের দিকে অগ্রসর হলেন। কানসারিনবাসী কয়েকদিন দুর্গ বন্ধ করে বাধা দিতে থাকলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু তাদের কাছে পয়গাম পাঠালেন ঃ

"তোমরা যদি মেঘমালার মধ্যে গিয়েও লুকোও, তাহলে আল্লাহ পাক আমাদেরকে উঠিয়ে নিয়ে তোমাদের কাছে পৌছে দেবেন অথবা তোমাদেরকে আমাদের কাছে নিক্ষেপ করবেন।"

এ পয়গাম পেয়ে অবরুদ্ধরা হিম্মত হারিয়ে ফেললো এবং সন্ধির দরখাস্ত করলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু শহরের প্রাচীর ধ্বংস করার শর্তে সন্ধি মঞ্জুর করলেন।

কানসারিনের পর মুসলমানরা হালব, ইন্তাকিয়া, মামবাজ, মারয়াশ, হাছান, হারছ এবং অন্যান্য অনেক স্থান খুব সহজেই জয় করলেন। এসব স্থানের মধ্যে মারয়াশ হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর হাতে জয় হয়।

অতপর মুসলমানরা বায়তুল মুকাদ্দাসের (জেরুজালেম) দিকে রওয়ানা হলো এবং তা অবরোধ করলো। খৃষ্টানরা সাধারণভাবে বাধা দিলো এবং মুসলমানদের খলীফা স্বয়ং এসে সন্ধিনামায় স্বাক্ষর করবেন এ শর্তে সন্ধি করতে রাজি হলো। হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহু আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুকে চিঠি লিখলেন। বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয় তাঁর আগমনের ওপর নির্ভর করছে বলে তিনি চিঠিতে জানালেন। বাইতুল মুকাদ্দাস খৃষ্টানদের দীনি কা'বা ছিলো। আর মুসলমানদের কাছে কেবলমাত্র প্রথম কিবলা হওয়ার জন্যেই নয়, বরং বনি ইসরাঈলের নবীদের কিবলা এবং বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ স্থান থেকেই মিরাজের সফরের দ্বিতীয় মনযিলের যাত্রা শুরু করার কারণে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ স্থান ছিলো। বস্তুত হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু সেখানে তাশরীফ নিলেই খুন-খারাবী ছাড়াই এ পবিত্র শহর মুসলমানদের হস্তগত হওয়ার কথায় তিনি বাইতুল মুকাদ্দাস গমনে আগ্রহী হলেন। ১৬ হিজরীর রজব মাসে কতিপয় মুহাজির ও আনসারসহ তিনি মদীনা থেকে রওয়ানা হলেন। জাবিয়াহ পৌছলেই হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন

www.bjilibrary.com

ওয়ালিদ, হযরত ইয়াজিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং সেনাবাহিনীর অন্যান্য অফিসার তাঁকে স্বাগতঃ জানালেন। তাঁরা রেশমের অত্যন্ত মূল্যবান কুবা পরিধান করেছিলেন। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের এ বেশভূষা দেখে ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন এবং মাটি থেকে পাথর উঠিয়ে নিক্ষেপ করতে করতে বললেন ঃ

"তোমাদের কি হয়েছে ! তোমরা এ আড়ম্বরপূর্ণ পোশাক পরে আমাকে স্বাগত জানাতে এসেছ ? দু' বছরের মধ্যেই তোমরা সাদাসিধে জীবন পরিত্যাগ করে আজমী বেশভূষা অবলম্বন করে ফেলেছ ?

তাঁরা আরজ করলেন ঃ

"আমীরুল মু'মিনীন ! আমরা আমাদের সিপাহী সুলভ আচরণ পরিত্যাগ করিনি। এ কুবার নীচে আমাদের হাতিয়ারসমূহ মওজুদ রয়েছে।"

একথা শুনে হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন ঃ তাহলে ক্ষতির কোনো কারণ নেই। এরপর তিনি বাইতুল মুকাদ্দাসে তাশরীফ নিলেন এবং সন্ধিনামা লিখে খৃষ্টানদের হাওলা করে দিলেন। তারা হৃষ্টচিত্তে মুসলমানদের হাতে শহর অর্পণ করলো।

১৭ হিজরীর প্রথম দিকে রোমের কায়সার দ্বিতীয়বার হিমসের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালায়। যাজিরাবাসীই তাকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করেছিলো। তারা কায়সারকে লিখেছিলো, আপনি হিমসে সৈন্য প্রেরণ করুন। আমরা আপনাকে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত রয়েছি। তাদের কথায় কায়সার এক বিরাট বাহিনী হিমসের দিকে প্রেরণ করলেন। এদিকে যাজিরাবাসীও ৩০ হাজার সৈন্যসহ হিমসের দিকে অগ্রসর হলো। হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহুও এদিক ওদিক থেকে যত সৈন্য সংগ্রহ করতে পারলেন, তা নিয়ে হিমসের বাইরে অবস্থান নিলেন। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু সে সময় কানসারিন ছিলেন। তিনিও তাঁর কাছে পৌঁছে গেলেন। হযরত আবু ওবায়দাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু পরিস্থিতির চিত্র হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুকে অবহিত করলেন। খবর পেয়ে তিনি সর্বস্থানে দূত প্রেরণ করলেন এবং বলে পাঠালেন যেসব স্থান থেকে সৈন্যের একটি অংশ সাহায্যের জন্যে পৌঁছবে। হযরত সোহায়েল বিন আদি রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি নির্দেশ দেয়া হলো যে, সে যেনো যাজিরাহ পৌঁছে যাজিরাবাসীকে হিমসের দিকে অগ্রসর হওয়া থেকে বাধা প্রদান করে। সাথে সাথে ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন উকবাহকে যাজিরা পৌঁছে সেখানে বসবাসরত আরব গোত্রসমূহকে বিরত রাখার কাজে নিয়োগ করা হলো। হযরত সোহায়েল রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং ওয়ালিদ

www.bjilibrary.com

রাদিয়াল্লাহ আনহু যাজিরার দিকে অগ্রসর হলেন। এ সময় যাজিরাবাসী অবরোধের দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলো এবং হিমসের আশা পরিত্যাগ করে ফিরে গেলো। রোমকদের সাহায্যার্থে আগত আরব গোত্রসমূহও লজ্জিত হলো। তারা গোপনে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে পয়গাম প্রেরণ করে জানতে চাইলো যে, তারা এখনই রোমকদের থেকে পৃথক হয়ে যাবে, না যুদ্ধের সময় তাদের পরিত্যাগ করবে। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু জবাবে জানালেন যে, তিনি তাদের অবস্থান করা অথবা রোমকদের পরিত্যাগ করা কোনোটাই পরোয়া করেন না। তবে, যদি তারা সত্যবাদী হয়, তাহলে যথাসময়ে যেনো রোমক বাহিনী হতে পৃথক হয়ে কোনো দিকে চলে যায়।

যাজিরাবাসীর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার কারণে রোমকদের শক্তি দুর্বল হয়ে পড়লো। ওদিকে মুসলমানরা হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে রোমকদের ওপর হামলার দাবী জানালো। তিনি হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে পরামর্শ করলেন। তিনিও হামলার পক্ষেই অভিমত প্রকাশ করলেন এবং বললেন, রোমকরা সবসময়ই সংখ্যাধিক্যের ওপর ভরসা করে যুদ্ধ করে। কিন্তু এখন তাও তাদের নেই। এজন্যে হামলায় বিলম্ব করা ঠিক হবে না। বস্তুত হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহু সৈন্যদের সামনে এক জ্বালাময়ী ভাষণ দিলেন। অতপর রোমকদের ওপর হামলা করে বসলেন। রোমকরা এ হামলা সামলে নিলো। কিন্তু কয়েকবার আরব গোত্রসমূহ [হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে কৃত ওয়াদার কারণে] রোমক বাহিনী থেকে পৃথক হয়ে পিছু হটে গেলো। এভাবে রোমকরা কঠিন ধাক্কা খেলো এবং অসহায় হয়ে পলায়ন করলো।

আল্লামা শিবলী (র) "আল ফারুকে" লিখেছেন ঃ "এটিই ছিলো শেষ সংঘর্ষ। খৃষ্টানদের পক্ষ থেকে এ সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটানো হয়েছিলো এবং এরপর আর কখনো তাদের সামনে অগ্রসর হওয়ার সাহস হয়নি।"

আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে, হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পরই (১৩ হিজরীতে) হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদকে সিরিয়ার কমাণ্ডার ইন চীফ পদ থেকে পদচ্যুত করে হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল জাররাহর অধীনস্ত করে দিয়েছিলেন। বিভিন্নজন ধারণা করে থাকেন যে, হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেই হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে সম্পূর্ণরূপে পদচ্যুত করেন। কিন্তু এটা ভুল ধারণা। বাস্তব ঘটনা হলো, প্রথমবার (১৩ হিজরীতে) হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে সেনাপতির পদ থেকে পদচ্যুত করেন।

www.bjilibrary.com

কিন্তু সেনাবাহিনীর একজন পদস্থ অফিসার হিসেবে বহাল রাখেন। অবশ্য ১৭ হিজরীতে তাকে সম্পূর্ণরূপে পদচ্যুত করে একজন সাধারণ সিপাহী বানিয়ে দেন। ইসলামের এ মহান জেনারেলের পদচ্যুতির কি কারণ ছিলো। ঐতিহাসিকরা এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন ধরনের ধারণা পেশ করেছেন। কেউ কেউতো এ পর্যন্তও লিখেছেন যে, ব্যক্তিগতভাবে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে পসন্দ করতেন না এবং শৈশবকাল থেকেই তাঁর অন্তর হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে পরিষ্কার ছিলো না। কিন্তু এটা নিরেট ভুল ধারণা। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু দিয়ানত এবং তাকওয়ার ক্ষেত্রে এত উঁচু মর্যাদায় সমাসীন ছিলেন যে, রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যক্তিগত পসন্দ বা অপসন্দের ভিত্তিতে কোনো সিদ্ধান্ত নিতেন না। বরং সবসময়ই ইসলামী রাষ্ট্র এবং উম্মাহর ব্যাপক কল্যাণের প্রশ্নটিই সামনে রাখতেন।

বিভিন্ন রাওয়ায়েতে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর পদচ্যুতির বেশ কিছু কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। এসব কারণের মধ্যে যেসব কারণ বিবেক সম্মত তা নিম্নরূপ ঃ

১. হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু সৈনিক মেজায পেয়েছিলেন। তিনি প্রায় সবসময়ই যেখানে নরম ও ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে কাজ নেয়া যেতো সেখানেও কঠোরতার সাথে কাজ নিতেন। পক্ষান্তরে হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ ছিলেন এবং কৌশল ও বাহাদুরীর গুণেও পূর্ণভাবে গুণান্বিত ছিলেন।

২. কোনো কোনো সময় হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বাহাদুরীর ভাবাবেগে এমন সব পদক্ষেপ নিয়ে বসতেন যা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে অসতর্কতার সংজ্ঞায় পড়তো।

৩. হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু মালিক বিন নুওয়াইরাহকে হত্যা করেন এবং পরে তার স্ত্রীকে বিয়ে করেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সহ কতিপয় সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ কাজ পসন্দ করেননি। তাঁরা হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে পদচ্যুতির জন্য হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু এ পরামর্শ গ্রহণ করেননি এবং হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর ওজর গ্রহণ করে বলেছিলেন ঃ "আমি আল্লাহর তরবারীকে খাপে ঢুকাতে পারি না।" অনেকের মতে হযরত সিদ্দিকে আকবার রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ কাজকে ইজতিহাদী ভুল হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন এবং তাঁকে দায়মুক্ত বলে

www.bjilibrary.com

ঘোষণা দিয়েছিলেন। কিন্তু হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু এ ব্যাপারে মুতমায়েন ছিলেন না।

৪. হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু কোনো কোনো সময় হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহুর অনুমতি ছাড়া কোনো কাজ করে বসতেন। ১২ হিজরীতে যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে গোপনভাবে হজ্জ করা তাঁর এ ধরনের একটি কাজ ছিলো। যদিও হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু এটাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখেছিলেন, তবুও তিনি তাঁকে ভবিষ্যতে এ ধরনের কাজ করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু এ ধরনের কাজ বরদাশত করতে পারতেন না।

৫. হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু জিযিয়া ও বিভিন্ন ধরনের করের যথাযথ হিসেব খেলাফতের দরবারে প্রেরণ করতেন না। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে এ কাজ অবশ্যই জবাবদিহির যোগ্য ছিলো।

৬. হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু রণনীতি সম্পর্কে খেলাফত থেকে পদে পদে নির্দেশ ও অনুমতি লাভ আবশ্যক মনে করতেন না। তাঁর ধারণা ছিলো রণনীতি প্রশ্নে অকুস্থলে উপস্থিত অফিসারবর্গই ভালো বুঝতে সক্ষম। এজন্যে যে কোনো ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যাপক ক্ষমতা তাদের থাকা উচিত। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর এ মতের সাথে একমত ছিলেন না। তিনি নিজেকে সেনাবাহিনীর প্রতিটি সদস্যের সালামতি এবং নিরাপত্তার জিম্মাদার মনে করতেন। সুতরাং বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্বে তাঁর সাথে পরামর্শ করার জন্য তিনি নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন।

৭. মুসলমানদের মধ্যে এ ধারণা বদ্ধমূল হতে যাচ্ছিলো যে, হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর রণনৈপুন্যতা এবং বাহুবলের ওপর ইসলামী বিজয়সমূহ নির্ভরশীল। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু এ ধারণাকে মুসলিম উম্মার জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকারক মনে করতেন। নশ্বর মানুষের ওপর সীমাতিরিক্ত ভরসা করাকে তিনি শুধুমাত্র ঈমানী শক্তিকে দুর্বল করার কারণই মনে করতেন না, বরং তাতে মুসলমানরা আল্লাহর সাহায্য-সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হতে পারে বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন। বস্তুত মুসলমানদের অন্তর থেকে সে বদ্ধমূল ধারণাকে নির্মূল করার জন্যে তিনি নিজের যুগের সবচেয়ে বড় বিজয়ী জেনারেলকে পদচ্যুত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

বর্ণিত কারণসমূহ স্ব স্ব স্থানে যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন, হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু ১৩ হিজরীতে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর পদমর্যাদা (RANK) শুধুমাত্র খাট করেছিলেন। অতপর চার বছর থেকে কিছু

www.bjilibrary.com

বেশী সময় পর্যন্ত আর কোনো কথা বলেননি। ১৭ হিজরীতে তিনি তাঁকে পুরোপুরি পদচ্যুত করেন। এ পদচ্যুতির কারণ কি ছিলো সে ঘটনা এখানে উল্লেখযোগ্য। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু এক কবিকে (আশায়াছ বিন কায়েস) এক হাজার দিনার (অথবা দশ হাজার দিরহাম) ইনয়াম দিয়েছিলেন। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু নিজের কর্মচারী এবং কর্মকর্তাদের প্রতিটি কথার ওপর কড়া নজর রাখতেন এবং ইসলামী চেতনার সাথে সংঘর্ষশীল কোনো বস্তুকেই তিনি বরদাশত করতে পারতেন না। তিনি হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর এ "বাদশাহী দরাজ দিলের" খবর পেয়ে হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহুকে চিঠি লিখলেন যে, যদি খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু এ অর্থ সরকারী তহবিল থেকে দিয়ে থাকে তাহলে সে আমানতের খেয়ানত করেছে। আর যদি নিজের তহবিল থেকেও দিয়ে থাকে, তাহলে অপচয় করেছে। উভয় অবস্থাতেই সে পদচ্যুত হওয়ার যোগ্য। যে দূত এ পত্র নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁকে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, সাধারণ্যে খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে জিজ্ঞেস করবে এত বিপুল পরিমাণ অর্থ পুরস্কার আপনি কোথা থেকে দিয়েছেন? যদি সে ভুল স্বীকার করে নেয়, তাহলে তাকে ক্ষমা করে দেবে। নচেৎ দস্তুর অনুযায়ী সর্বাসাধারণ্যে তাকে পদচ্যুত করবে।

দূত মনযিলে মাকসুদে পৌঁছে হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুর ফরমান সর্বসাধারণ্যে পাঠ করে শুনালেন এবং হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এতবড় পুরস্কার কোথা থেকে দিয়েছেন? হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু জবাব দিলেন যে, এ পুরস্কার আমি আমার সম্পদ থেকে দিয়েছি এবং আমি কোনো ভুল করিনি। বস্তুত তিনি ভুল স্বীকার করলেন না। দূত বললেন, আপনি অপচয় করেছেন। এজন্যে আমীরুল মু'মিনীনের নির্দেশে আপনাকে পদচ্যুত করা হচ্ছে। সুতরাং তিনি পদচ্যুতির নিদর্শন স্বরূপ তার মাথা থেকে টুপি নামিয়ে নিলেন এবং ঘাড়ের ওপর পাগড়ী রাখলেন।

এক রাওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহু এ কাজ সম্পাদন করেছিলেন। সে সময় হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বলেছিলেন, আমি ফরমান শুনলাম এবং মেনে নিলাম। আমি এখনো অফিসারদের নির্দেশাবলী মানা এবং আনুগত্যের জন্য প্রস্তুত আছি।

অন্য এক রাওয়ায়েতে তাঁর সম্পর্কে এ বাক্যাবলী সংশ্লিষ্ট রয়েছে ঃ "আমি নিজের নফসকে আল্লাহর কাছে হিবা করে দিয়েছি।"

www.bjilibrary.com

আল্লামা শিবলী "আল ফারুকে" লিখেছেন ঃ

"এ ঘটনা কম আশ্চর্যের নয় যে, এমন একজন বড় সেনাপতি—যাঁর নজীর ইসলামী বিশ্বে দ্বিতীয় আর নেই—যাঁর তরবারী ইরাক ও সিরিয়ার ব্যাপার ফায়সালা করে দিয়েছেন—তাঁকে এভাবে অপমানিত করা হচ্ছে—অথচ সে নির্বাক। এ ঘটনায় একদিকে খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর পূন্য আত্মা এবং সত্য পূজার স্বাক্ষ্য পাওয়া যায়। অন্যদিকে হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুর প্রভাব এবং মর্যাদার আন্দাজ করা যায়।

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুর ফরমান বা নির্দেশের সামনে মাথানত করে দিলেন। কিন্তু তিনি নিজেকে নির্দোষ মনে করতেন। এজন্যে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর অন্তরে কিছুটা আঁচড় পড়লো। তিনি হিমস চলে গেলেন এবং সেখানে জনতার সামনে এক ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন ঃ

"আমীরুল মু'মিনীন আমাকে সিরিয়া বাহিনীর অফিসার বানিয়েছিলেন যখন আমি সমগ্র সিরিয়া জয় করলাম তখন তিনি আমাকে পদচ্যুত করলেন।"

তাঁর এ দুঃখ প্রকাশে একজন মুজাহিদ উঠে দাঁড়ালেন। এবং বললেন এ ধরনের কথা প্রকাশ না করাই ভালো। এতে ফেতনা সৃষ্টি হতে পারে।

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন, "আমার ভাই! ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু থাকতে কোনো ফেতনার আশংকা নেই।" [কিতাবুল খিরাজ ঃ কাজী আবু ইউসুফ রাদিয়াল্লাহ আনহু]।

ইবনে আসির (র) বর্ণনা করেছেন, পদচ্যুতির পর হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু হিমস হয়ে মদীনা মুনাওয়ারা গেলেন এবং হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুর খিদমতে হাজির হয়ে অভিযোগ করে বললেন, আপনি আমার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছেন।

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে এত সম্পদ কোথা থেকে এলো?

তিনি বললেন, গনিমাতের মালের অংশ থেকে আমার কাছে ৬০ হাজারের বেশী যাকিছু বেরুবে তা আপনি নিয়ে নিন।

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু তৎক্ষণাৎ হিসেব করালেন। বিশ হাজার পরিমাণ বেশী হলো। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু সন্তুষ্টচিত্তে তা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর হাওয়ালা করে দিলেন। তিনি তা বাইতুল মালে জমা দিলেন এবং হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

www.bjilibrary.com

"হে খালিদ ! তুমি আমার বুযর্গ ও শ্রদ্ধাস্পদ হওয়ার সাথে সাথে আমার প্রিয় এবং স্নেহাস্পদও।"

তাবারি (র) বর্ণনা করেছেন, এ সময় হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু এ কবিতাও আবৃত্তি করেন।

(তুমি অনেক কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছ। তোমার মতো কোনো ব্যক্তিই কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে পারেনি। কিন্তু বাস্তব হলো যে, জাতিসমূহ কিছুই করে না। যাকিছু করেন আল্লাহই করেন।)

এরপর আমীরুল মু'মিনীন রাদিয়াল্লাহ আনহু সমগ্র বিজিত দেশসমূহে এক ফরমান পাঠিয়ে বললেন ঃ

"খালিদকে আমি অসন্তুষ্টি অথবা খেয়ানতের কারণে পদচ্যুত করিনি। শুধুমাত্র এ কারণে পদচ্যুত করেছি যে, মুসলমানেরা জেনে নিক যে, খালিদের শক্তির ওপর ইসলামের বিজয়সমূহ নির্ভরশীল নয়। বরং ইসলামের বিজয় আল্লাহর মদদ ও সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল।"

'মুসতাদরাকে হাকিমে' বলা হয়েছে, পদচ্যুতির কিছুদিন পর হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে রাহা, হিরান, আমদ এবং মারতার এলাকাসমূহের গভর্নর নিয়োগ করেন। তিনি এক বছর পর্যন্ত এ দায়িত্ব পালনের পর পদত্যাগ করেন। পদত্যাগের সামান্য কিছুদিন পর তিনি অসুস্থ অবস্থায় ২১ হিজরীতে (অন্য রাওয়ায়েত মতে ২২ হিজরী ৬৪৩ খৃষ্টাব্দে) ইন্তেকাল করেন। এ সময় তার বয়স ছিলো ৬০ বছর।

হাফিজ ইবনে আবদুল বার (র) "আল ইসতিয়াব" গ্রন্থে লিখেছেন, ওফাতের কিছুদিন পূর্বে দুঃখ ও হতাশা ভারাক্রান্ত চিত্তে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বলেছিলেন ঃ

"আমি আমার জীবনে প্রায় তিনশ' (অন্য রাওয়ায়েত মতে একশ'র বেশী) যুদ্ধে অংশ নিয়েছি। আমার শরীরের প্রতিটি অংশ তীর, তরবারী এবং বর্শার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। কিন্তু শাহাদাত ভাগ্যে জোটেনি। আর আজ বিছানায় উটের মতো জীবন দিচ্ছি। আল্লাহ বুজ দীলদেরকে কখনো শান্তি দেন না।"

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর ওফাত ও দাফন স্থল নিয়ে চরিতকারদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ লিখেছেন যে, তিনি মদীনা মুনাওয়ারাতে ওফাত পান এবং হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁর জানাযাতে শরীক হন।

www.bjilibrary.com

সেদিন মদীনার মহিলা সমাজ বিশেষ করে বনি মুগিরা গোত্রে বিলাপের ধ্বনি অনুরনিত হচ্ছিলো।

এক রাওয়ায়েতে আছে যে, তাদেরকে শোকে শোকাভিভূত দেখে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন, বনু মুগিরার মহিলারা কাঁদতে বাধ্য। কিন্তু তারা যেন বুকের ছাতি পিটিয়ে না কাঁদে। কিন্তু বেশীর ভাগ চরিতকার বর্ণনা করেছেন, তিনি মদীনায় হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে সাক্ষাত করে হিমস চলে গিয়েছিলেন এবং সেখানেই ওফাত পান। এসব চরিতকারের মধ্যে রয়েছেন ওয়াকেদী (র), তাবারী (র), ইবনে আসাকির (র), ইবনে আসির (র), হাফেজ জাহাবী (র) এবং আল্লামা আইনী (র) প্রমূখ। ইবনে আসাকির (র) এ পর্যন্তও লিখেছেন যে, "হিমসে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর কবর রয়েছে। আমি এও জানি যে, তাঁর মৃতদেহ কে কে গোসল করিয়েছিলেন এবং কারা কারা তাঁর নামাযে জানাযায় উপস্থিত ছিলেন।"

হাফিজ জাহাবী (র) বলেছেন ঃ "এটিই ঠিক যে, হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু হিমসে ওফাত পেয়েছিলেন এবং তার কবর জিয়ারাত স্থল হিসেবে সর্বসাধারণ্যে পরিচিত।"-(সিয়রে আলামুন নুবলা)

হাফিজ ইবনে আবদুল বার (র) "আল ইসতিয়াবে" লিখেছেন, ওফাতের পূর্বে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু ওসিয়াত করেছিলেন যে, তাঁর হাতিয়ার এবং সওয়ারের ঘোড়া যেন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশ্যে ওয়াকফ্ করে দেয়া হয়।

হাফিজ জাহাবি (র)-এর মতে তাঁর সম্পদ বলতে ছিলো একটি গোলাম, একটি ঘোড়া এবং অস্ত্রশস্ত্র।

ইবনে আসাকির (র) বলেছেন, হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুকে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর মৃত্যু পরবর্তী ধন-সম্পদ সম্পর্কে অবহিত করা হলে তিনি বলেছিলেন, আল্লাহ আবু সুলায়মানের ওপর রহম করুন। আমরা আশা করিনি যে, তিনি এত দারিদ্রতার মধ্যে জীবনযাপন করতেন।

অন্য আর এক রাওয়ায়েতে ইবনে আসাকির (র) বলেছেন, হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর ওফাতে হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু অত্যন্ত দুঃখিত হলেন এবং বললেন ঃ

"খালিদের মৃত্যুতে ইসলামের প্রাচীরে এমন এক ফাটল দেখা দিয়েছে, যা আর কখনো পূরণ হবে না। হায় আল্লাহ! যদি তাকে আরো দীর্ঘদিন জীবিত রাখতেন।"

www.bjilibrary.com

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু কয়েকটি বিয়ে করেছিলেন। তাঁর সন্তানও বেশী ছিলো। কিন্তু তাদের সংখ্যা এবং নাম সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি। চরিতকাররা তাঁর চার পুত্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। এক পুত্রের নাম ছিলো সুলাইমান। এ নামানুসারে হযরত খালিদের কুনিয়াত ছিলো আবু সুলাইমান। আবদুল্লাহ নামক পুত্রটি ইরাকের কোনো যুদ্ধে শহীদ হন। সিফফিনের যুদ্ধে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর পক্ষ অবলম্বন করে যুদ্ধ করতে করতে মুহাজির নামক ছেলেটি শহীদ হন। আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহ আনহু তো বাপকা বেটা ছিলেন। বাহাদুরী, অশ্বারোহন এবং দানের ক্ষেত্রে তিনি মহান পিতার উত্তরাধিকারী ছিলেন। হযরত ওসমান জুন্নুরাইন রাদিয়াল্লাহ আনহুর খেলাফতকালে তিনি সিরিয়ার গভর্নর আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহুর অধীন হিমসের আমীর ছিলেন। হযরত আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহ আনহু সে প্রখ্যাত বাহিনীর একজন অফিসার হিসেবে ছিলেন, যে বাহিনী আমীরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহুর যুদ্ধে সর্বপ্রথম কাসতান তুনিয়ার ওপর অভিযান চালিয়েছিলো। আর এ বাহিনী সম্পর্কে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'মাগফুর' হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছিলেন। ইবনে কুতাইবা রাদিয়াল্লাহ আনহুর বর্ণনামতে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর কয়েকটি ছেলে এবং নাতি ১৮ হিজরীর প্লেগের প্রকোপে মারা গিয়েছিলো।

ইবনে আসির (র) এবং কতিপয় ঐতিহাসিক বর্ণনা করেছেন যে, দু' পুরুষের পর হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদের সকল সন্তান-সন্ততি শেষ হয়ে যায়। এরপর আল্লাহর নাম ছাড়া পূর্ব-পশ্চিমে তাঁর আর কোনো সন্তান-সন্ততি অথবা বংশধারা অবশিষ্ট ছিলো না। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর বংশ অবশিষ্ট না থাকলেও তিনি যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন তাই তাকে চিরস্মরণীয় করে রাখবে।

প্রখ্যাত চরিতকার এবং ইতিহাসবিদরা বলেছেন, হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদ আকৃতি, সুরত দেহের উচ্চতা এবং কণ্ঠস্বর হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুর গভীর সাজুয্য রাখতেন। এমনকি অনেকে ভুল করে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু মনে করে বসতেন। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর অবয়ব যেনো হযরত ওমর ফারুকের রাদিয়াল্লাহ আনহুর অবয়ব ছিলো। আল্লামা শিবলী 'আল ফারুক' গ্রন্থে হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুর অবয়ব এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

"গোধূম বর্ণ, লম্বা আকৃতি এমনকি হাজার হাজার মানুষের মধ্যে দাঁড়ালেও তাঁর মাথা সবার ওপরে থাকতো, গণ্ডদেশে অল্প গোশত, ঘন দাড়ি, মোচ বড় বড় এবং মাথার চুল সামনের দিক থেকে উড়ে যেতো।"

www.bjilibrary.com

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদ নীরেট সামরিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। কিন্তু ইলম ও ফযীলত থেকে তিনি একদম শূন্য ছিলেন না। তাঁর থেকে ১৮টি হাদীস বর্ণিত আছে। এর মধ্যে দু'টি হাদীসে হযরত ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম ঐকমত্য পোষণ করেন এবং একটি ইমাম বুখারী (র) ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। হাফিজ ইবনে হাজার (র) 'আল ইসাবাহ' এবং তাহজিবুত তাহজিব' গ্রন্থে লিখেছেন হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর হাদীসের সনদে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু, হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু, মিকদাম বিন মা'দিকারাব (র), কায়েস বিন আবিহাজম (র), আশতার নাখয়ী (র), আলকামা (র), বিন কায়েস (র), জুবায়ের (র) বিন নুফায়ের এবং আবুল আলিয়া (র) প্রমুখ ছিলেন।

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু ফিকাহতেও পারদর্শী ছিলেন। কিন্তু জিহাদে মশগুল থাকার কারণে ফতওয়ার মসনদে আসীন হননি। তাঁর ফতওয়ার সংখ্যা তিন চারের বেশী নয়।

দীনি হুকুম-আহকাম এবং মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কেও হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিজ্ঞ ছিলেন। এ কারণেই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে কয়েকবার তাবলীগ এবং দীনের প্রচার কাজে নিয়োগ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দায়িত্ব তাঁদেরকেই দিতেন, যাঁরা ইসলামী আকায়েদ, আমল এবং দীন সম্পর্কে পূর্ণরূপে ওয়াকিবহাল এবং সার্বিকভাবেই মুবাল্লিগ হওয়ার যোগ্য হতেন। বনু জাজিমা, বনু আবদিল মাদান, বনু হারিস বিন কায়াব প্রভৃতি গোত্র হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর তাবলীগেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলো। এমনিভাবেই ধর্মদ্রোহীতার ফেতনায় বনু হাওয়াযেন, বনু আমের, বনু সুলায়েম, বনু তাই প্রভৃতি গোত্র তাঁর প্রচেষ্টাতেই দ্বিতীয়বার ইসলাম গ্রহণ করেন। ইয়ারমুকের যুদ্ধে রোমক দূত জর্জার কাছে তিনি এমন প্রভাবপূর্ণভাবে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন যে, সে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নেয়।

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদের চারিত্রিক বাগিচায় জিহাদের উদ্দীপনা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রেম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্তুষ্টি এবং তাঁর প্রতি আদব ও সম্মান প্রদর্শন, বাহাদুরী ও তারুণ্য, সত্য-নিষ্ঠা ও অপরিমিত দানশীলতা উল্লেখযোগ্য রঙীন ফুল সদৃশ। জিহাদের উদ্দীপনা তাঁর জীবনের সবচেয়ে বেশী প্রোজ্জ্বল দিক। এ প্রসঙ্গে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। তিনি অষ্টম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তারপর প্রায় ১৪ বছর জীবিত ছিলেন। এ সময়ের বেশীর ভাগ অংশই তিনি জিহাদের ময়দানে কাটিয়েছেন। প্রায় সোয়াশ' (অন্যান্য রাওয়ায়েত

www.bjilibrary.com

মতে তিনশ') যুদ্ধে অংশ নেন এবং প্রতিটি যুদ্ধেই সফল হন। শরীরের প্রতিটি অংশেই হাতিয়ারের আঘাত এবং যখম ছিলো। তিনি বলতেন, মধুচন্দ্রিমার রাতের চেয়েও তাঁর কাছে শত্রুর সাথে যুদ্ধের রাত বেশী প্রিয়। শাহাদাত লাভের প্রবল ইচ্ছা ছিলো। কিন্তু দুনিয়ায় এমন কোনো হাতিয়ার তৈরিই হয়নি যা যুদ্ধের ময়দানে 'আল্লাহর তরবারীকে ভাঙ্গতে পারে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি সীমাহীন ভালোবাসা ছিলো। কারো মুখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রসঙ্গে কোনো বেয়াদবী বরদাশত করতে পারতেন না। একবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কিছু সোনা এলো। সে সময় নাজদের কিছু লোক তাঁর খিদমতে উপস্থিত ছিলো। তিনি সব সোনা তাদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। কিন্তু এক ব্যক্তি নিজের অংশে খুশী না হয়ে বললো ঃ "মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহকে ভয় করো।"

রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে বললেন ঃ "আমি যদি আল্লাহর নাফরমানি করি তাহলে তার আনুগত্য করে কে ?"

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি নাজদীর এ বেয়াদবীতে পুরোপুরি অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। খাপ থেকে তলোয়ার বের করলেন এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তার গর্দান উড়িয়ে দেয়ার অনুমতি চাইলেন। কিন্তু তিনি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে বললেন, খালিদ ছেড়ে দাও।

একবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে এক অভিযানে আমীর বানিয়ে প্রেরণ করলেন। হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ইয়াসির রাদিয়াল্লাহ আনহুও এ অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে জিজ্ঞেস ছাড়াই এক ব্যক্তিকে ইসলাম গ্রহণের ভিত্তিতে আশ্রয় দিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে তাঁর কথা কাটাকাটি হয়ে গেলো এবং কটু বাক্য বিনিময়ও হলো। হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহু মদীনা পৌছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর ব্যাপারে অভিযোগ পেশ করলেন। ইত্যবসরে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুও সেখানে পৌছলেন এবং নিজের বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনে হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহুকে কটু কাটব্য করলেন। এতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, যে ব্যক্তি আম্মারের সাথে শত্রুতা পোষণ করে সে আমার সাথেও শত্রুতা রাখে। আর যে ব্যক্তি আমার সাথে শত্রুতা রাখে সে খোদার সাথেও শত্রুতা রাখে।

www.bjilibrary.com

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ ইরশাদ শুনে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু কেঁপে উঠলেন। সে সময়ই তিনি আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে বার বার ক্ষমা চাইতে লাগলেন। কিন্তু তিনি এত মনোকষ্ট পেয়েছিলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিশ থেকে উঠে চলে গেলেন। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুও তাঁর পেছনে পেছনে চললেন এবং অনুনয় বিনয় করলেন যে, তিনি অবশেষে রাজী হয়ে গেলেন। স্বয়ং তিনিই বলেছেন, যখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে উঠলাম তখন আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহুকে রাজী করার চেয়ে বেশী প্রিয় কাজ আর আমার কাছে ছিলো না।

ধর্মদ্রোহিতার ফেতনায় তিনি মালিক বিন নুওয়াইরাহকে যেসব কারণে হত্যা করেছিলেন তার অন্যতম কারণ হলো, সে আলাপ-আলোচনায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রসঙ্গে বার বার 'সাহিবুকা' বলেছিলো। এতে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু উত্তেজিত হয়ে বললেন ঃ

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের সাহিব ছিলেন না?"

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিলো। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এতো গভীরভাবে ভালোবাসতেন যে, তাঁর কয়েকটি পবিত্র চুল নিজের টুপিতে সেলাই করে নিয়েছিলেন এবং তা মাথায় দিয়ে যুদ্ধের ময়দানে যেতেন। ইয়ারমুকের যুদ্ধে একবার এ টুপি কোথায়ও পড়ে গিয়েছিলো। ফলে তিনি অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। দৌড়াদৌড়ি করে এদিক সেদিক খোঁজাখুঁজির পর সে টুপি পেয়ে তারপর স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়েন।

তাঁর বাহাদুরী, সাহসিকতা এবং সামরিক যোগ্যতা লৌহ সদৃশ শত্রুরাও স্বীকার করতো। সৈন্যদেরকে এমনভাবে সাজাতেন এবং যুদ্ধ করাতেন যে, বিজয় সুনিশ্চিত হয়ে যেতো। যুদ্ধ কৌশলেও অত্যাশ্চর্যজনক নিপুণতা রাখতেন। তাঁর সামরিক কৌশলে শত্রু কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়তো এবং অস্ত্র পরিত্যাগ করতে বাধ্য হতো। তাঁর সবচেয়ে বড় গুণ ছিলো যে, যুদ্ধের ময়দানে স্বয়ং সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিতেন এবং প্রথম ব্যূহে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতেন।

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু এক বড় ধনী পরিবারে লালিত-পালিত হয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহ পাক তাঁকে আরাম-আয়েশে বিভোর হওয়া থেকে রক্ষা করেছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বেই তিনি কঠোর পরিশ্রমী ছিলেন। আর ইসলাম গ্রহণের পর কঠোর পরিশ্রমকে তিনি অভ্যাসে পরিনত করেছিলেন। জিহাদের ময়দানে রাতের পর রাত জেগে জেগে কাটাতেন। নিজেও নিদ্রা

www.bjilibrary.com

যেতেন না এবং সাথীদেরকেও নিদ্রা যেতে দিতেন না। নিজেকে এবং তাদেরকেও সবসময় সতর্ক রাখতেন। শত্রুর সংখ্যা, শক্তি ও তৎপরতা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেয়ার বিশেষ ব্যবস্থা করতেন এবং তাদের কোনো কথা তাঁর কাছে গোপন থাকতে পারতো না।

অধীনস্তদের সাথে তিনি ছিলেন অত্যন্ত বন্ধু ভাবাপন্ন। তিনি তাদের মুরুব্বীও ছিলেন। এ কারণেই সৈন্যরা তার জন্য জীবন দিতেও কুণ্ঠবোধ করতো না। তাঁর ইঙ্গিতেই মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত থাকতো।

আল্লাহ পাক হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রকৃতিতে 'আল্লাহর পথে খরচ' এবং দানশীলতার আবেগ ও আমানত রেখেছিলেন। তাঁর কাছে প্রচুর যুদ্ধ সরঞ্জাম মওজুদ ছিলো। ইসলাম গ্রহণের পর তা আল্লাহর রাহে ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছিলেন। বস্তুত বেশীর ভাগ সময় যুদ্ধেই মশগুল থাকতেন। এজন্যে প্রচুর গনিমাতের মালও পেতেন। এর বেশীর ভাগই তিনি অভাবগ্রস্ত, গরীব এবং অধীনস্তদের মধ্যে বন্টন করে দিতেন ও নিজে সাধাসিধে জীবনযাপন করতেন। তাঁর এ দান-দক্ষিণা কবিরাও পেতেন। এক কবিকে বিরাট অংকের পুরস্কার দেন। আর এ ব্যাপারেই তাঁর পদচ্যুতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজের সামরিক মেজাজ সত্ত্বেও অত্যন্ত হকপ্রিয় ছিলেন এবং আল্লাহকে ভয় করতেন। কোনো ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসন্তোষ প্রকাশ করার সাথে সাথে তা দূর করার চেষ্টায় লেগে যেতেন এবং আর কখনো সেই কাজ করতেন না। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে সে সময় পদচ্যুত করেন যখন তাঁর জনপ্রিয়তা তুঙ্গে ছিলো। জনসাধারণ্যে তাঁর টুপি খুলে নেয়া হয় এবং পাগড়ী ঘাড়ের ওপর রেখে দেয়া হয়। কিন্তু তিনি আমীরুল মু'মিনীনের নির্দেশের সামনে টু শব্দটি করেননি।

ঈমানী শক্তি এত প্রবল ছিলো যে, এক যুদ্ধের সময় কোনো এক ব্যক্তি বললো, রোমকদের সংখ্যা কতবেশী। আর মুসলমানরা কত কম। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন ঃ

"রোমকরা কত কম এবং মুসলমানরা কত বেশী ? আল্লাহর সাহায্যের সাথে সৈন্যের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং আল্লাহ যখন লজ্জিত করেন, তখন তা কমে যায়। মানুষের সংখ্যার ওপর তা নির্ভরশীল নয়। আল্লাহর কসম! আমার এ ঘোড়া যদি দুলকি চাল ছেড়ে দিতো এবং মুসলমানদের সংখ্যা আরো কম হতো, তাহলে আমি খুশী হতাম।"-(তারিখে তাবারী)

www.bjilibrary.com

একবার (ইরাকের যুদ্ধসমূহের যুগে) হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ্ আনহু হিরাতে বনি মিরাজ বিহর আমীরের কাছে অবস্থান করছিলেন। মুসলমানরা তাঁকে বললো, বিষ থেকে সাবধান। আজমীরা আপনাকে বিষ না খাইয়ে দেয়। হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ্ আনহু লোকদের কাছে বিষ চাইলেন। বিষ আনা হলে তিনি তা হাতের ওপর রাখলেন অতপর বিস্‌মিল্লাহ্ বলে তা গিলে ফেললেন। আল্লাহ্ পাক ঈমানী শক্তির বদৌলতে তাঁকে বিষের ক্রিয়া থেকে মাহফুজ রাখলেন।

অন্য এক রাওয়ায়েতে আছে যে, বিষ খাওয়ার সময় হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ্ আনহু এও বলেছিলেন ঃ "মৃত্যু না আসা পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি অবশ্যই মরে না।"

হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ্ আনহুর মর্যাদার চেয়ে বড় দলীল আর কি হতে পারে যে, স্বয়ং রহমতে দোআলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বাহাদুরী এবং সাহসিকতার স্বীকৃতি ও প্রশংসা করেছেন। এ কারণেই তিনি তাঁকে 'সাইফুল্লাহর' মতো উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।

মক্কা বিজয়ের সময় হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ্ আনহু বিজয়ীর বেশে এক ঘাঁটি থেকে বের হয়ে এলেন। হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ্ আনহু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, সামনে খালিদ আসছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'এ আল্লাহর বান্দাহ্ কত ভালো মানুষ।"—(মুসনাদে আহমদ)

অন্য একবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন ঃ

"তোমরা খালিদ রাদিয়াল্লাহ্ আনহুকে কোনো ধরনের কষ্ট দিও না। কেননা সে আল্লাহর তরবারীসমূহের অন্যতম। এ তরবারী আল্লাহ্ কাফেরদের ওপর মেরেছেন।"

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়ে একবার হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ্ আনহু যাকাত আদায়ের ব্যাপারে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ্ আনহুর ওপর বাড়াবাড়ি করলেন। একথা শুনে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

"তোমরা খালিদের ওপর বাড়াবাড়ি করো। অথচ সে তার সকল যুদ্ধ সরঞ্জাম আল্লাহর রাস্তায় ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছে। এখন তাঁর ওপর আবার যাকাত কিসের ?"

www.bjilibrary.com

স্বয়ং হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বলতেন, যেদিন থেকে আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি সেদিন থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার এবং অন্যান্য সাহাবীর মধ্যে কোনো পার্থক্য করতেন না।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু' তিনবার হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে কয়েকজন জলিলুল কদর সাহাবীর ওপর অফিসার বানিয়েছেন। এমনিভাবে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুও ইরাক এবং সিরিয়ার যুদ্ধসমূহে তাঁকে অসংখ্য মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবীর ওপর আমীর নিয়োগ করেছিলেন।

সাইয়েদেনা হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদের চরিত্র, কাজ এবং মহান সাফল্যসমূহ বিস্তারিত আলোচনা করতে হলে হাজার হাজার পৃষ্ঠার প্রয়োজন। এখানে সংক্ষিপ্তাকারে যাকিছু বলার ছিলো তা বর্ণনা করা হয়েছে। আমরা এ আলোচনা 'খালিদ সাইফুল্লাহ'র লেখক আবু যায়েদ শালবীর সে বাক্য দিয়ে সমাপ্ত করছি ঃ

"আল্লাহ পাক হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদের ওপর নিজের রহমত এবং বরকত নাযিল করেছেন। তিনি ইসলামের জন্যে যে খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন তা এমন যা কখনো ভুলা যায় না। আমাদের প্রত্যেকের ফরয হলো, আমরা যেনো তার জীবনের ঘটনাবলী নিয়ে চিন্তা করি এবং নিজেদের মধ্যে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহুর গুণাবলীর সমাবেশ ঘটানোর চেষ্টা করি। কেননা ইসলাম এবং মুসলমানদের জীবনে তাঁর গুণাবলীর অবলম্বনের মধ্যেই যথার্থ সার্থকতা নিহিত রয়েছে।"

www.bjilibrary.com

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস

একবার হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো এক অভিযানে সৈন্য প্রেরণ করতে চাইলেন। কিন্তু চাইলেই তো আর সৈন্য প্রেরণ করা যায় না। সৈন্য প্রেরণের জন্যে প্রয়োজন এমন জীবন উৎসর্গকারী সাহাবীর নেতৃত্ব যিনি একদিকে যেমন হবেন সামরিক বিষয়াবলীতে নিপুণ, তেমনি নেতৃত্বের যোগ্যতায় হবেন পরিপূর্ণ। তিনি যাকে এ ব্যাপারে যোগ্য মনে করলেন তাঁকে এক বাণী পাঠালেন। বাণীতে বললেন, পোশাক পরিবর্তন করে অস্ত্র সজ্জিত হয়ে অবিলম্বে চলে এসো। ক্ষুদ্র আকৃতির এ সাহাবী অস্ত্র সজ্জিত হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাজির হলেন। এ সময় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অযু করছিলেন। তিনি চোখ তুলে দেখলেন। অতপর চোখ নামিয়ে বললেন ঃ

"আমি তোমাকে অমুক অভিযানে আমীর বানিয়ে প্রেরণ করতে চাই। ইনশাআল্লাহ তুমি মাহফুজ থাকবে এবং গনিমাতের মালও হস্তগত হবে। এ মালের একটি সঙ্গত অংশ তুমি পাবে।"

তিনি অত্যন্ত তা'জিমের সাথে বললেন ঃ

"ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক। ধন-সম্পদের লালসায় আমি ইসলাম গ্রহণ করিনি। বরং খালেস অন্তরে ইসলাম গ্রহণ করেছি।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ "ভালো সম্পদ ভালো মানুষের জন্যে উত্তম।"

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখনিসৃত এ বাণী শুনে সে ব্যক্তি হৃষ্টচিত্তে সে অভিযানে রওয়ানা হয়ে গেলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ সাহাবী রাদিয়াল্লাহ আনহু যাঁর ওপর সাইয়েদুল মুরসালিনের এতো গভীর আস্থা ছিলো যে, তাঁকে বিশেষ অভিযানের জন্যে নির্বাচিত এবং সালেহ মানুষের উপাধিতে ভূষিত হওয়ার যোগ্য মনে করতেন। তিনি ছিলেন হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস।

সাইয়েদেনা হযরত আবু আবদুল্লাহ আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস প্রথম যুগের সেসব মহান সেনাপতি এবং চিন্তানায়কের মধ্যে পরিগণিত যাঁরা নিজের নজিরবিহীন বাহাদুরী, সমর নিপুণতা এবং উত্তম কার্যপ্রণালী দিয়ে

www.bjilibrary.com

ইসলামী রাষ্ট্রকে অত্যন্ত শক্তিশালী ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়েছিলেন। কুরাইশের বনু সাহাম খান্দানের সাথে তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন। তাঁর বংশ তালিকা নিম্নরূপ ঃ

আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবুনল আস ইবনুল ওয়ায়েল বিন হাশিম বিন সাঈদ বিন সাহাম বিন আমর বিন হাছিছ বিন কায়াব বিন লুব্বী বিন গালিব।

মাতার নাম ছিলো নাবিগাহ বিনতে হারমালাহ বিন হারিছ। তিনিও আদনান পরিবারভুক্ত ছিলেন।

জাহেলী যুগে মামলা-মোকদ্দমা ফায়সালার দায়িত্ব বনু সাহামের ওপর ন্যস্ত ছিলো। এ দিক থেকে কুরাইশদের মধ্যে তাদের অত্যন্ত গুরুত্ব ছিলো।

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর পিতা আস বিন ওয়ায়েল নিজের খান্দানের সরদার ছিলো। প্রভূত বাণিজ্যিক কারবার এবং ধন-সম্পদের ভিত্তিতে সে নেতৃস্থানীয় কুরাইশের অন্যতম ব্যক্তিত্ব ছিলো। এতো ধন-সম্পদ ছিলো যে, সে রেশমের পোশাক পরতো। এ ব্যক্তি ইসলামের জঘন্যতম শত্রু ছিলো। কুরাইশের যেসব সরদার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্য দাওয়াতের প্রতি উপহাস করতো সে-ও তাদের একজন ছিলো। সে-ও আখিরাত অস্বীকার এবং মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হওয়াকে অসম্ভব মনে করতো। হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত আছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পুত্র হযরত কাসেম রাদিয়াল্লাহ আনহু অতপর হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু ওফাত পেলে আস বিন ওয়ায়েল মুশরিক কুরাইশদেরকে সম্বোধন করে এ ভাষায় উল্লাস করেছিলো ঃ

"মুহাম্মদ শিকড় কাটা (নাম নিশানাহীন) লোক। স্থলাভিষিক্ত হওয়ার মত তার কোনো পুত্র নেই। সে মারা গেলে তোমরা তার অনুসরণ পরিত্যাগ করবে।"

একথার পরিপ্রেক্ষিতে সূরা আল কাওসার অবতীর্ণ হয়েছিলো। এ সূরায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুশমনদেরকে শিকড় কাটা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

বুখারী, মুসলিম এবং তিবরানী বর্ণনা করেছেন যে, প্রখ্যাত সাহাবী হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহ আনহু কর্মকার ছিলেন। তাঁর কিছু অর্থ আস বিন ওয়ায়েলের জিম্মায় রাখা ছিলো। তিনি সে অর্থ দাবী করলে আস বললো, ইসলাম পরিত্যাগ এবং মুহাম্মদের প্রতি অসন্তুষ্টির প্রকাশ না করা পর্যন্ত তোমার অর্থ দিবো না।

www.bjilibrary.com

হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, সত্য দীন এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কখনই বিশ্বাঘাতকতা করতে পারবো না। আমার স্থির বিশ্বাস যে, কিয়ামতের দিনে এ দীন হকের ওপরই পুনরুত্থিত হবো।

আস হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে উপহাস করে বললো, সবাই যদি মৃত্যুর পর জীবিত হবে মনে করো, তাহলে তুমি এবং আমি যখন দ্বিতীয়বার জীবিত হবো তখন আমার কাছে তুমি তোমার অর্থ দাবী করো। সেদিন আমার কাছে অঢেল ধন-সম্পদ এবং অসংখ্য সন্তান থাকবে। তোমার অর্থ কালবিলম্ব না করে আদায় করে দিবো।

একথার ওপর সূরা মরিয়ামের ৭৮-৮১ আয়াত নাযিল হয়। এতে আল্লাহ পাক বলেন ঃ

"ভালো, আপনি কি সে ব্যক্তিকে (অবস্থা) দেখেছেন, যে আমার আয়াতের সাথে কুফুরী করে এবং (উপহাস করে) বলে আমি (আখেরাতের দিন) অফুরন্ত সম্পদ ও অসংখ্য সন্তানের মালিক হবো। সে ব্যক্তির কি অদৃশ্য বা গায়েব সম্পর্কে জ্ঞান আছে অথবা সে কি আল্লাহর সাথে এ ব্যাপারে কোনো ওয়াদা করেছে ? কখনই নয়। আমরা কার্যতঃ তার কথা লিখে নিয়ে থাকি এবং সময় আসলে এমন শাস্তি দিবো যে, তার সে শাস্তি বাড়িয়েই যাবো এবং তার বর্ণিত বস্তুর মালিক আমরাই থেকে যাবো। সে আমাদের কাছে নীরেট একাকীই উত্থিত হবে।"

হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজের অর্থের দাবী নিয়ে অতপর আরেকবার আসের কাছে গমন করলেন। এ সময় আস বললো ঃ

"তোমরা মুসলমানরা ধারণা করেছ যে, মানুষ মাটির সাথে মিশে যাওয়ার পর পুনরায় জীবিত হবে। আমি কসম খেয়ে বলছি, মৃত্যুর পর জীবিত হওয়া সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব ব্যাপার।"

হযরত খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তার কথার যুক্তিপূর্ণ জবাব দিলেন এবং ফিরে এলেন।

মৃত্যু পর্যন্ত আস বিন ওয়ায়েলের সত্য দীন গ্রহণের ভাগ্য হয়নি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়াতের কয়েক বছর পরই সে কাফের অবস্থায়ই মারা যায়। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনুল আস এ ইসলামের দুশমনের সন্তান ছিলেন। ফিল বা হস্তী বিষয়ক ঘটনার ৬ বছর পর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। এমনিভাবে তিনি বয়সে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.bjilibrary.com

ওয়া সাল্লামের ছ' বছরের ছোট ছিলেন। তাঁর ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর পিতা খুব উৎসব করেছিলো। দশটি উট যবেহ করে সকল কুরাইশ সরদারকে দাওয়াত দিয়ে খাইয়েছিলো। সে হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রশিক্ষণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়। এরই ফলশ্রুতিতে তিনি বড় হয়ে সফল ব্যবসায়ী, উত্তম সিপাহী এবং উঁচুস্তরের চিন্তানায়ক হতে পেরেছিলেন। সারওয়ারে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হক দীনের দাওয়াত প্রদান শুরু করলেন। এ সময় আস বিন ওয়ায়েল এ হক দীনের জোরেশোরে বিরোধিতা করলো। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুও পিতার অনুসরণ করে বছরের পর বছর ধরে কুফর এবং শিরকের অন্ধকারে বিপথগামী হয়ে রইলেন। অবশ্য তাঁর ছোট ভাই হযরত হিশাম রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন আসের ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিলো। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়াত প্রাপ্তির প্রাথমিক যুগেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আর ইসলাম গ্রহণের কারণে তাঁর ওপর মুসিবতের পাহাড় আপতিত হয়েছিলো। হকপন্থীদের ওপর যখন কুরাইশ মুশরিকদের নির্যাতন সীমা ছাড়িয়ে গেলো তখন নবুয়াত প্রাপ্তির ৫ অথবা ৬ বছর পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইঙ্গিতে অনেক মুসলমান হিজরত করে হাবশা চলে গেলেন। কুরাইশরা তাদেরকে বহিষ্কারের জন্য হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশীর কাছে এক প্রতিনিধি দল প্রেরণ করলো। এ প্রতিনিধি দলের সবচেয়ে তৎপর সদস্য ছিলেন হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনুল আস। তিনি হাবশা পৌঁছে সেখান থেকে মুসলমানদের বহিষ্কারের জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালালেন। কিন্তু নাজ্জাশী তাদের কোনো কথাই শুনলেন না এবং প্রতিনিধি দলটি ব্যর্থ হয়ে সেখান থেকে ফিরে এলো। সময় এভাবেই অতিবাহিত হতে লাগলো। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনা তাশরীফ নিলেন। এরপর বদর, ওহোদ এবং পরিখার যুদ্ধও শেষ হলো। তখনো হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনুল আস সম্পূর্ণরূপে-মুশরিকদের সাথে ছিলেন। পরিখার যুদ্ধে মুশরিকদের যখন নাস্তানাবুদ অবস্থা তখন তিনি হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন ওয়ালিদের সাথে একত্রিত হয়ে দু' শত অশ্বারোহীর একটি দল নিয়ে মুশরিক বাহিনীর পশ্চাতভাগ রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু পরিখার যুদ্ধে (৫ হিজরী) মুশরিকদের পরাজয়ে তাঁর মন ও মস্তিষ্ক ওলট-পালট হয়ে গেলো। তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে লাগলেন।

তিনি বলেছেন ঃ

"পরিখার যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে আমি ইসলাম সম্পর্কে চিন্তা শুরু করলাম। এ চিন্তার ফলশ্রুতিতে ইসলামের প্রকৃত তাৎপর্য আমার কাছে

www.bjilibrary.com

পরিষ্কার হতে লাগলো এবং চিন্তার জগতে প্রভাব বিস্তার শুরু হলো। এমনকি আমি মুসলমানদের বিরোধিতা থেকে নিজের হাত সরিয়ে নিলাম। আমার ভূমিকা দেখে কুরাইশরা প্রকৃত অবস্থা জানার জন্যে একজন লোক প্রেরণ করলো। সে এসে আমার সাথে তর্ক জুড়ে দিলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমরা সত্যের ওপর আছি না, পারস্য ও রোমকরা। সে বললো, আমরা। আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, ধন-সম্পদ এবং আরাম-আয়েশ তাদের আয়ত্বাধীনে না, আমাদের ? সে বললো, তাদের আয়ত্বে। আমি বললাম, আমাদের এ হকপন্থী (অর্থাৎ মূর্তিপূজা) হওয়া কবে কাজে আসবে। আমরাতো পরকালেই বিশ্বাস করি না। এ দুনিয়াতেও আমরা বাতিল পন্থীদের মুকাবিলায় দরিদ্র হিসেবে পরিগণিত থাকলাম। এজন্যেই আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা কতখানি সঠিক তা চিন্তা-ভাবনা করছি। তিনি বলেছেন, মৃত্যুর পর আর এক জগত হবে। যেখানে প্রতিটি মানুষ তার কাজ হিসেবে বদলা পাবে।-(আল ইসাবহ লি ইবনে হাজার)

এ বর্ণনা থেকে অনুমিত হয় যে, পরিখার যুদ্ধের পর হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু সঠিক খাতে চিন্তা-ভাবনা শুরু করে দিয়েছিলেন। তার চিন্তা জগতের এ পরিবর্তনই তাঁকে ইসলাম গ্রহণের মূল ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়।

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস ইসলাম গ্রহণের ঘটনা নিজেই বর্ণনা করেছেন। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে তাঁর নিজের ভাষ্য নিম্নরূপ ঃ

"আমরা পরিখার যুদ্ধ থেকে মক্কা ফিরে আমার অধীনস্থ লোকদের ডেকে পাঠালাম। যখন তারা এলো তখন বললাম, খোদার কসম ! তোমরা বিশ্বাস করো যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা সকল কথার ওপর মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। এ ব্যাপারে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। আমার একটি রায় আছে। জানি না তোমরা তা কেমনভাবে গ্রহণ করবে। তারা জিজ্ঞেস করলো, কি রায় ? আমি বললাম, আমার ধারণা আমরা হাবশা গিয়ে নাজ্জাশীর কাছে অবস্থান নিই। যদি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের জাতির ওপর বিজয়ী হন, তাহলে আমরা সেখানেই নাজ্জাশীর কাছে থেকে যাবো। কেননা নাজ্জাশীর কাছে অবস্থান করা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অধীনে থাকার চেয়ে উত্তম। আর যদি আমাদের জাতি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর বিজয়ী হয়, তাহলে আমাদের সাথে তার ব্যবহার ভালোই হবে। কেননা আমরা সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত মানুষ। আমার মতের সাথে সবাই ঐকমত্য পোষণ করলো। অতপর পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হলো যে, আমরা নিজেদের এখানকার সর্বোত্তম সওগাত চামড়া নিয়ে যাবো এবং তা নাজ্জাশীর খিদমতে পেশ করবো। এতে সে খুব

www.bjilibrary.com

খুশী হবে। বস্তুত আমরা অনেক চামড়াসহ হাবশা পৌঁছলাম এবং সেখানে অবস্থান করতে লাগলাম। আমরা সেখানে অবস্থানকালেই আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন উমাইয়া জুমরী এলো। কোনো প্রয়োজনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বাদশাহর কাছে প্রেরণ করেছিলেন। তার আগমনের কথা জ্ঞাত হয়ে আমরা নাজ্জাশীর খিদমতে হাজির হলাম। আমি নিয়ম মতো তাকে সেজদা করলাম। তিনি আমাকে স্বাগত জানালেন এবং বললেন, দেশ থেকে কোনো তোহফা এনেছো ? আমি বললাম, হুজুর অনেক চামড়া তোহফা হিসেবে এনেছি। একথা বলেই আনিতো সব চামড়া তার সামনে পেশ করলাম। সে খুব পসন্দ করলো। অতপর আমি আরজ করলাম, জাঁহাপনা ! আপনার কাছে আমাদের শত্রু প্রেরিত এক ব্যক্তি এসেছে। তাকে আমরা দরবার থেকে বের হতে দেখেছি। তাকে কতল করার জন্য আমাদের হাওলা করে দিন। সে আমাদের অনেক সম্মানিত ব্যক্তিকে দুঃখ-কষ্ট দিয়েছে। আমার কথা শুনে নাজ্জাশী অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হলো এবং এমন জোরে আমার নাকের ওপর ঘুষি লাগিয়ে দিলো যে, মনে হলো নাক বুঝি ভেঙ্গে গেছে। বাদশাহর এ ভূমিকা দেখে আমি এমন লজ্জিত হলাম যে, ধরণীতে সেঁধিয়ে যেতে চাইলাম। এরপর আমি আরজ করলাম, হে বাদশাহ ! যদি জানতাম যে, আমার কথা আপনার পসন্দ হবে না, তাহলে আমি অবশ্যই মুখ দিয়ে তা বের করতাম না।

বাদশাহ বললেন, তোমরা এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করার জন্য আমার কাছে চেয়েছো, যে সেই মহান ব্যক্তিত্বের দূত। যার কাছে হযরত জিবরাঈল আলাহিস সালাম আগমন করে থাকেন। আর এ ফেরেশতা হযরত মূসা আলাহিস সালামের কাছেও আগমন করতেন।

আমি আরজ করলাম, জাঁহাপনা ! সত্যিই কি এ ধরনের ঘটনা ?

বাদশাহ বললেন, আমর ! তোমার জন্যে দুঃখ হয়। আমার কথা যদি শুনতে চাও, তাহলে তাঁর আনুগত্য করো খোদার কসম ! তিনি হকের ওপর রয়েছেন। আর হযরত মূসা আলাহিস সালাম যেমন ফেরাউনের ও তার বাহিনীর ওপর বিজয়ী হয়েছিলেন, তেমনি তিনিও তাঁর বিরোধীদের ওপর বিজয়ী হবেন। আমি বললাম, তাহলে অতপর আপনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তরফ থেকে আমার ইসলামের বাইয়াত নিয়ে নিন। সুতরাং নাজ্জাশী হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং আমি ইসলামের বাইয়াত গ্রহণ করলাম। এখান থেকে যখন আমি আমার সাথীদের কাছে ফিরে গেলাম, তখন আমার চিন্তার রাজ্যে সম্পূর্ণরূপে বিপ্লব এসে গেছে। কিন্তু আমি তা প্রকাশ করলাম না। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাজির হয়ে

www.bjilibrary.com

যথারীতি ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে মদীনা রওয়ানা হয়ে গেলাম। পথিমধ্যে খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন ওয়ালিদের সাথে সাক্ষাত হলো। সে মক্কা থেকে আসছিলো। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আবু সুলাইমান ! কোথায় যাচ্ছো ? খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু জবাব দিলেন, আল্লাহর কসম ! ভালোই হলো। ওয়াল্লাহ এ ব্যক্তি [মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] অবশ্যই নবী। এজন্যে আমি ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে যাচ্ছি। আর কতদিন আমরা কুফরীর অন্ধকারে পথভ্রষ্ট হয়ে চলতে থাকবো। আমি বললাম, খোদার কসম! আমিও একই উদ্দেশ্যে যাচ্ছি। বস্তুত আমরা দু'জনই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাজির হলাম। প্রথম হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন ওয়ালিদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাইয়াত হলেন। অতপর আমি কাছে গিয়ে আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার হাতে বাইয়াত করার জন্যে হাজির হয়েছি। কিন্তু আগে আমার অতীতের গোণাহসমূহ ক্ষমা করে দিন। তিনি বললেন, আমর ! বাইয়াত করো। ইসলাম অতীতের গোনাহসমূহ মিটিয়ে দেয় এবং হিজরতও ভবিষ্যত গোনাহ থেকে বিচ্ছিন্ন রাখে।

তাঁর ইরশাদ শুনে আমি মুতমায়েন হয়ে গেলাম। আর বিলম্ব না করে আমি তাঁর হাতে বাইয়াত হলাম এবং মক্কা ফিরে এলাম।

ইমাম হাকিম (র) বর্ণনা করেছেন, হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইনবুল আসের সাথে হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন ওয়ালিদ ছাড়া হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন তালহা আবদারীও ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

–(মুসতাদরাকে হাকিম)

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস মক্কা ফিরে সেখানে বেশীদিন থাকলেন না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুহবত থেকে এমন দূরে থাকা তাঁর জন্যে অসম্ভব হয়ে পড়েছিলো। কিছুদিন পর হিজরত করে মদীনা এসে গেলেন। মক্কা বিজয়ের কিছুদিন পূর্বে এ ঘটনা ঘটেছিলো।

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস মদীনা আগমনের পর কতিপয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়। চরিতকাররা এসব যুদ্ধে হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর অংশগ্রহণ এবং কৃতিত্বের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেননি। কিন্তু ধারণা করা যায় যে, তিনি এসব যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। কেননা তাঁর অংশগ্রহণ না করার কোনো কারণ ছিলো না। তাঁর ওপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গভীর আস্থা ছিলো। এজন্যে তাঁর নেতৃত্বে কয়েকটি অভিযান প্রেরিত হয়। এসব অভিযানের মধ্যে জাতুস সালাসিল এবং ছুয়া অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য অভিযান।

www.bjilibrary.com

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খবর পেলেন যে, বনু কাজায়া গোত্রের একটি দল কুরা উপত্যকায় একত্রিত হয়ে মদীনার ওপর হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। স্থানটি মদীনা থেকে দশ দিনের দূরত্বের পথে অবস্থিত ছিলো। অষ্টম হিজরীর জমাদিউল আখিরে তিনি হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসকে মুহাজির ও আনসারের তিন শ' সদস্যের একটি বাহিনীসহ তাদেরকে উৎখাতের জন্যে প্রেরণ করলেন। এক রাওয়ায়েতে আছে যে, হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু কুরা উপত্যকার বাসিন্দা এবং এ এলাকা সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিবহাল ছিলেন। এজন্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ অভিযানের নেতৃত্বের জন্যে তাঁকেই বিশেষভাবে নির্বাচিত করেছিলেন। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু দুষ্কৃতকারীদের কাছে পৌঁছে জানতে পারলেন যে, সংখ্যায় তারা বিপুল। সুতরাং তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আরও সৈন্য চেয়ে পাঠালেন। তিনি হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনুল জাররাহকে দু'শ সৈন্যসহ তাঁকে সাহায্যের জন্যে প্রেরণ করলেন। কথিত আছে যে, দুষ্কৃতকারীরা পরস্পর জিঞ্জিরাবদ্ধ করে রেখেছিলো। যাতে তারা একত্রে লড়াই করতে পারে। এজন্যে এ অভিযান জাতুস সালাসিল (জিঞ্জির বা শিকলের) অভিযান বলে খ্যাত হয়। হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহু পৌঁছার পর অভিযানের নেতৃত্ব নিয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয়। কিন্তু অবশেষে হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর নেতৃত্বের ওপরই মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। মুজাহিদরা দুশমনের ওপর মরণ আঘাত হেনে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে ফেললো। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস সাফল্যের মুকুট পরে মদীনা ফিরে এলেন।–(ইবনে সায়াদ)

ইবনে আসির রাদিয়াল্লাহ আনহু বর্ণনা করেছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রকৃতপক্ষে হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসকে বাল্লী ও আজরাহ গোত্রের কাছে ইসলাম প্রচারের জন্য প্রেরণ করেছিলেন। তিনি সেখানে পৌঁছে জ্ঞাত হলেন যে, তাঁরা যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত। সুতরাং হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। এরই ফলশ্রুতিতে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

হাজিল গোত্রের মূর্তির নাম ছিলো ছুয়া। মক্কা থেকে তিন মাইল দূরে রুহাত নামক স্থানে মূর্তিটি স্থাপিত ছিলো। মক্কা বিজয়ের পর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসকে মূর্তিটি অপসারণের কাজে নিয়োগ করলেন। তিনি যখন সেখানে পৌঁছলেন, তখন মূর্তির রক্ষক বললো, তুমি কোন্ উদ্দেশ্যে এসেছো? তিনি বললেন, ছুয়াকে অপসারণের জন্যে এসেছি। রক্ষক অত্যন্ত খন খনে গলায় বললো, তুমি এটা

www.bjilibrary.com

করতে পারো না। ছুয়া নিজেই নিজেকে রক্ষা করবে। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন, তোমার ঘিলু বলতে কিছু আছে বলে মনে হয় না। একটা মূর্তি যে দেখতেও পায় না এবং শুনতেও পারে না সে নিজের হেফাযত কিভাবে করবে?

অতপর তিনি মুহূর্তের মধ্যে ছুয়াকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিলেন এবং রক্ষককে বললেন, তুমি কি তার অসহায়ত্ব দেখেছো। এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করে সে খুব প্রভাবিত হলো এবং তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করলো।

আল্লামা বালাজুরী (র) 'ফতহুল বুলদান' গ্রন্থে লিখেছেন, মক্কা বিজয়ের কিছু দিন পর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস এবং হযরত আবু যায়েদ রাদিয়াল্লাহ আনহু আনসারীকে ইসলামের পয়গাম সম্বলিত পত্র দিয়ে আম্মান প্রেরণ করেছিলেন। সেখানকার সরদার ওবায়েদ ও জিফারের নামে এ পত্র প্রেরণ করা হয়েছিলো। তারা দু'জন সহোদর এবং অগ্নি উপাসক ছিলো। ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত পত্র পেয়ে তারা দু'জন ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাদের উৎসাহ প্রদানের কারণে সেখানকার অন্যান্য লোকও ইসলামে দীক্ষিত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসকে আম্মানের গভর্নর নিয়োগ করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাত পর্যন্ত তিনি সেখানেই অবস্থান করেছিলেন।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহুর খেলাফতের শুরুতে ধর্মদ্রোহিতার ফেতনার আগুন প্রজ্জলিত হয়ে ওঠে। এ সময় হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকাল ও ধর্মদ্রোহিতার খবর জানালেন এবং তাঁকে মদীনা ডেকে পাঠালেন। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু বাহরাইনের পথে মদীনা রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে বনি আমের সরদার কুররাহ বিন হাবিরাহর কাছে যাত্রা বিরত করলেন। সে অত্যন্ত খাতির যত্ন ও মর্যাদার সাথে নিজের কাছে রাখলো। যখন তিনি রওয়ানা দেয়ার প্রস্তুতি নিলেন, তখন তাঁকে নির্জনে ডেকে নিয়ে বললেন, আপনি অত্যন্ত হুঁশিয়ার এবং বুদ্ধিমান মানুষ। বর্তমানে আরবের অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। আপনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খলিফাকে এ মর্মে পরামর্শ দিবেন যে, যদি আরবের কাছ থেকে যাকাত আদায় করা হয়, তাহলে তারা কারোর ইমারতই কবুল করবে না। হাঁ, যদি যাকাত মাফ করে দেয়া হয়, তাহলে তারা অনুগত থাকবে। এজন্যে যাকাতের আইন বাতিল করাই উত্তম হবে।

www.bjilibrary.com

কুররার কথা শুনে হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ক্রোধান্বিত হয়ে বললেনঃ "কুররাহ ! তুমি কি কাফের হয়ে গিয়েছো ? নচেৎ এ ধরনের কথা কেনো বলছো এবং আমাকে আরবদের ভয় দেখাচ্ছো। আল্লাহর কসম ! আমি যাকাত অস্বীকারকারীদেরকে ঘোড়ার খুরের নীচে পিষে ফেলবো।"

মুখের ওপর একথা বলে তিনি মদীনা রওয়ানা হয়ে গেলেন। ইবনে আসির (র) বর্ণনা করেছেন, পরে কুররাহ বিন হাবিরাহকে যাকাত অস্বীকারের অভিযোগে গ্রেফতার এবং হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহুর সামনে পেশ করা হয়। এ সময় সে জানায় যে, যাকাতের ব্যাপারে নেক নিয়তের ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এবং ইসলাম থেকে সে খারিজ হয়ে যায়নি। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস তার বিবৃতির সত্যতা স্বীকার করলেন। ফলে তাকে মুক্তি দেয়া হলো। অন্য এক রাওয়ায়েতে এও বর্ণনা করা হয়েছে যে, ধর্মদ্রোহিতায় লিপ্ত হওয়ার কারণে তাকে হত্যা করা হয়।

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস মদীনা পৌঁছলে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁকে বনু কাজয়ার মুরতাদদের উৎখাতের কাজে নিয়োগ করলেন। তিনি নিজের প্রচেষ্টায় তাদেরকে ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত করলেন এবং যাকাত উসুল করে মদীনা ফিরে এলেন। ইবনে জারীর (র) তাবারী বর্ণনা করেছেন, হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু স্বপদে পুনরায় তাঁকে আম্মান গমনের নির্দেশ এবং খোদাভীতির সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালনের পরামর্শ দিলেন। বস্তুত তিনি হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহুর শাসনামলে কমবেশী সোয়া বছর আম্মানের গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেন এবং সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে তা আঞ্জাম দেন।

১২ হিজরীতে ইরান ও রোকমদের সাথে সংঘর্ষ শুরু হলো। এ সময় হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসকে সিরিয়া প্রেরণের সিদ্ধান্ত নিলেন এবং তাকে এ বলে একটি পত্র প্রেরণ করলেন ঃ

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাকে জাতুস সালাসিল অভিযানের আমীর বানিয়ে বনু কাজায়ার প্রতি প্রেরণ করেছিলেন। এজন্যে আমিও ধর্মদ্রোহিতার ঘটনায় তাদের কাছেই তোমাকে প্রেরণ করেছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাকে আম্মানের গভর্নর বানিয়েছিলেন। এজন্যে আমি (ধর্মদ্রোহিতার ফেতনা নির্মূলের পর) তোমাকে দ্বিতীয়বার আম্মানের ইমারতের দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছিলাম। এখন আমি তোমার ওপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করতে চাই, যা তোমার ইহ ও পরকালের জন্য উত্তম হবে।"

www.bjilibrary.com

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুর জবাবে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে লিখেছিলেন ঃ

"আমি আল্লাহর একটি তীর। আর আপনি সেই তীরের তীরন্দাজ বা পরিচালক। এজন্যে যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে তা নিক্ষেপের অধিকার আপনার রয়েছে।"

সুতরাং হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে আম্মান থেকে ডেকে ফিলিস্তিনে (সে সময় সিরিয়ার অংশ ছিলো) প্রেরণ করলেন। তাঁর অধীন সৈন্য সংখ্যা ছিলো ৯ হাজার। এসব সৈন্যের মধ্যে হাওয়াজন, সাকিফা এবং বনি কিলাব গোত্রের লোকজন অন্তর্ভুক্ত ছিলো। তাঁর হাতে ঝাণ্ডা প্রদানের সময় হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু এ নসিহত করেছিলেন ঃ

"তুমি এখন ফিলিস্তিন রওয়ানা হয়ে যাও। তুমি তোমার বাহিনীর আমীর। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তুমি আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনুল জাররাহর সাথে চিঠি-পত্র আদান-প্রদান এবং পরামর্শ করবে এবং যখন তিনি তোমার সাহায্যের প্রয়োজন মনে করবেন তৎক্ষণাৎ তাঁকে সাহায্য করবে। আর প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য উভয় অবস্থাতেই আলিম ও খাবির খোদাকে ভয় করবে। আমি তোমাকে সে সকল লোকের ওপর প্রাধান্য দিয়েছি যারা তোমার আগে ইসলাম গ্রহণ করেছে। তোমার সকল তৎপরতা ইহকালের জন্যে নয় বরং পরকালের জন্যে ওয়াক্ফ থাকা চাই এবং জিহাদের উদ্দেশ্য শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই হওয়া দরকার। তোমার সাথীদের মধ্যে মুহাজির, আনসার এবং বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীরাও রয়েছেন। আর তুমি তাদের আমীর। তাদের মান-মর্যাদার প্রতি খেয়াল রাখবে। তুমি আমীর হওয়ার কারণে তাদের ওপর কর্তৃত্ব জাহির করো না। এ শয়তানী অহমিকা কখনো নিজের কাছে ঘেঁষতে দিও না। এটা শুধুমাত্র নফসের একটি ধোঁকা। মিলেমিশে থাকবে এবং সকল কাজ পরস্পর পরামর্শ করে করবে। জামায়াতের সাথে নামায আদায়ে গাফিলতি করো না। সৈন্যদের প্রতি কোনো হেদায়াতের প্রয়োজন হলে সংক্ষিপ্ত নসিহতের মাধ্যমেই তা করবে। যুদ্ধকালে ধৈর্য, স্থৈর্য এবং বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করবে এবং কোনো অবস্থাতেই পশ্চাদাপসরণ করবে না। বাজে কথা থেকে দূরে থাকবে। যাতে তুমি সালেহ এবং হেদায়াতদানকারী হিসেবে পরিগণিত হও। দুশমনের সকল তথ্য অব্যাহতভাবে যাতে পাও সে চেষ্টা করবে এবং পাহারাদাররা যাতে নিজেদের কাজে সজাগ থাকে সে ব্যবস্থা করবে।"–(ফতহুল বুলদান–বালাজুরী)

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনুল আস তাঁর এ হেদায়াতের ওপর আমল করার ওয়াদাহ করলেন এবং নিজের বাহিনীসহ ফিলিস্তিন রওয়ানা হয়ে গেলেন। এ সময় আরো কিছু ইসলামী সৈন্যও বিভিন্ন অফিসারের নেতৃত্বে

www.bjilibrary.com

সিরিয়া প্রবেশ করেছিলো। হিরাক্লিয়াস মুসলমানদের অগ্রযাত্রার খবর পেয়ে তাদের মুকাবিলার জন্যে পৃথক পৃথক বাহিনী প্রেরণ করলো। এসব বাহিনীর মধ্যে একটি শক্তিশালী দলের নেতৃত্ব করছিলো তার দু'জন অভিজ্ঞ জেনারেল। তাদের নাম ছিলো তাযারক ও কাবকালার। তারা ফিলিস্তিনের আজনাদাইন নামক স্থানে এসে তাঁবু ফেললো। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস সেখানে পৌঁছে নিজের বাহিনীর চেয়ে কয়েক গুণ বেশী সৈন্যের প্রতিপক্ষ পেলো। এ পরিস্থিতি মুকাবিলার জন্যে সিরিয়ায় অবস্থানরত অন্যান্য ইসলামী বাহিনীও হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল জাররাহ, হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল ওয়ালিদ, হযরত শুরাহবিল রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন হাসানাহ এবং হযরত ইয়াযিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আবি সুফিয়ানের নেতৃত্বে আজনাদাইন পৌঁছে গেলেন। এ সময় রোমক সেনাপতি এক আরবকে গোয়েন্দাগিরির কাজে নিয়োগ করলো। সে দেখে শুনে ফিরে গেলে রোমক সেনাপতি জিজ্ঞেস করলো, ইসলামী বাহিনী সম্পর্কে কি খবর এনেছো ? সে বললো ঃ

"তারা রাতে ইবাদাতকারী এবং দিনে যুদ্ধের ময়দানে অশ্বারোহী। তাদের কোনো যুবরাজও যদি অপরাধ করে, তাহলে তাঁকেও নিজের শরীয়াত অনুযায়ী দণ্ড দেয়।"

একথা শুনে রোমক সেনাপতি বললো, "যদি তারা সত্যিই এ ধরনের হয়, যেমন তুমি বর্ণনা করেছো, তাহলে তাদের মুকাবিলার পরিবর্তে মাটিতে দাফন হয়ে যাওয়াই উত্তম।" কিন্তু তখন যুদ্ধ থেকে বিরত থাকা রোমক সেনাপতির সাধ্যের বাইরে ছিলো। উভয় বাহিনীর মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হলো এবং রোমকদের শিক্ষণীয় পরাজয় ঘটলো। তাযারক এবং কাবকালা সমেত তাদের হাজার হাজার মানুষ লাশ হয়ে মাটিতে পড়ে রইলো।

এ যুদ্ধে হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর ছোট ভাই হযরত হিশাম রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আস বীরত্বের সাথে লড়াই করতে করতে শাহাদাত বরণ করেন। তিনি এক অপরিসর ঘাঁটিতে শহীদ হয়ে পড়ে গেলেন। ফলে মুসলমানদের অগ্রগামী কদম থমকে দাঁড়ালো। কেননা তাঁর লাশের ওপর দিয়ে ঘোড়া অতিক্রম করা ছাড়া ঘাঁটির বিপরীত দিকে যুদ্ধরত মুসলমানদের সাহায্য করা সম্ভব ছিলো না। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু এ পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করে মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

"হে মুসলমানরা ! হিশামের রূহ আল্লাহর কাছে পৌঁছে গেছে। এখানে শুধু তার মাটির দেহ অবশিষ্ট রয়েছে। এ দেহের জন্য অন্যান্য মুসলমানের জীবনকে আশংকায় নিক্ষেপ করো না।"

www.bjilibrary.com

একথা বলেই তিনি স্বয়ং ঘোড়া অগ্রসর করলেন এবং হিশাম রাদিয়াল্লাহ আনহুর লাশের ওপর দিয়ে অতিক্রম করে চলে গেলেন। অন্যান্য মুজাহিদরাও তাঁর অনুসরণ করলো। এভাবে হক পথের শহীদ হযরত হিশাম রাদিয়াল্লাহ আনহুর লাশ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলো। যুদ্ধ শেষে হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু খণ্ড-বিখণ্ড দেহকে বস্তায় ভরে দাফন করলেন। সহোদরের শাহাদাতের ঘটনা হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর স্মৃতিপটে সবসময় জাগরুক ছিলো। তিনি বলতেন, আমরা উভয়েই সারারাত ধরে শাহাদাতের জন্যে দোয়া করেছিলাম। ভোর হলে হিশাম রাদিয়াল্লাহ আনহুর দোয়া কবুল হয়ে গেলো এবং আমার দোয়া কবুল হলো না। এভাবেই হিশাম রাদিয়াল্লাহ আনহু আমার ওপর অগ্রাধিকার পেলো।

আজনাদাইন যুদ্ধের পর হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস ও হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল জাররাহ হযরত খালিদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ওয়ালিদের বড় বাহিনীতে যোগদান করেন। এ বাহিনীতে তাঁর একজন অফিসারের মর্যাদা ছিলো। বাহিনীর সামনে অগ্রসর হয়ে সিরিয়ার রাজধানী দামেস্ক অবরোধ করলো। শহরের বড় বড় দরযায় পৃথক পৃথক অফিসার মোতায়েন করা হলো।

আল্লামা বালাজুরী (র) বলেছেন, হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস, 'বাবে তুমাতে' মোতায়েন ছিলেন। তিনি রোমকদের ওপর অব্যাহতভাবে চাপ প্রয়োগ করতে থাকেন। এ অবরোধ কয়েক মাস চলেছিলো। এ সময় হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহ আনহু ইন্তেকাল করেন এবং হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু খেলাফতের দায়িত্ব পান। তিনিও এ অভিযান অব্যাহত রাখার নির্দেশ দিলেন। অবশেষে মুসলমানদের বিজয় ঘটলো এবং তারা শহর দখল করে নিলো।

দামেস্ক বিজয়ের পর মুসলমানরা ফাহাল ও বিসানের অভিযানে রোমকদেরকে শিক্ষণীয়ভাবে পরাজিত করলো। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু এসব অভিযানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। উপর্যুপরি পরাজয়ে রোমকরা চমকে উঠলো। বস্তুত তারা ইন্তাকিয়াতে বিরাট বাহিনী একত্রিত করে মুসলমানদেরকে সিরিয়া থেকে বহিষ্কারের শপথ নিলো। এ বাহিনীতে প্রায় দু' লাখ অভিজ্ঞ সিপাহী এবং অফিসার অন্তর্ভুক্ত ছিলো। মুসলমানদের নির্মূল করার লক্ষ্যে তারা ইন্তাকিয়া থেকে রওয়ানা হলো। মুসলমানরাও এ সময় সিদ্ধান্ত নিলো যে, দখলকৃত শহরগুলো থেকে সৈন্য অপসারণ করে সম্মিলিতভাবে রোমকদের মুকাবিলা করতে হবে। সুতরাং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করা হলো। এ সময় তাঁরা অত্যাশ্চর্যজনক পন্থা অবলম্বন করলেন। দামেস্ক

www.bjilibrary.com

এবং হিমস প্রভৃতি শহর ছেড়ে দেয়ার সময় তাঁরা জিযিয়ার অর্থ ফিরিয়ে দিলেন। তাঁরা সেখানকার বাসিন্দাদেরকে বললেন যে, এখন আর তাদের নিরাপত্তা দান সম্ভব নয়।

বর্ণিত আছে যে, মুসলমানদের এ পদক্ষেপ শহরবাসীদের ওপর হৃদয়গ্রাহী প্রভাব ফেলেছিলো। মুসলমানদের প্রস্থানে তারা কেঁদে কেঁদে দোয়া করেছিলো যে, খোদা, তুমি তাদেরকে পুনরায় ফিরিয়ে এনো।

মুসলমান মুজাহিদরা সিরিয়ার শহরসমূহ থেকে বের হয়ে ইয়ারমুক পৌছলেন। সেখানে পৌছে ইয়ারমুক নদীর তীরে খোলা ময়দানে তাঁবু ফেললেন। দু' লাখ রোমকদের মুকাবিলায় তাদের সংখ্যা ছিলো সব মিলিয়ে ৪০ থেকে ৫০ হাজার। কিন্তু তাদের উদ্দীপনা ছিলো তুঙ্গে। প্রথমে দু' পক্ষের দূতদের গমনাগমন চললো। রোমকদের ধারণা ছিলো যে, মুসলমানরা অর্থ কড়ি নিয়ে ফিরে যাবে। মুসলমানরা এ প্রস্তাবে কোনোক্রমেই রাজী হলো না। সর্বশেষ উভয় পক্ষের সৈন্যরা পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়লো। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনুল আস এ যুদ্ধে ইসলামী বাহিনীর দক্ষিণ দিকের কমাণ্ডার ছিলেন। উভয় পক্ষের মধ্যে কয়েক দফা রক্তাক্ত সংঘর্ষ সংঘটিত হলো। উভয় পক্ষই প্রচণ্ডভাবে হামলা পরিচালনা করলো। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনুল আস প্রতিটি সংঘর্ষে বাহাদুরীর চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করলেন। তিনি জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে সৈন্যদের মধ্যে আগুন লাগিয়ে দিতেন। দু' একবার রোমকরা মুসলমানদের পেছনে ঠেলতে ঠেলতে মহিলাদের তাঁবু পর্যন্ত পৌছে গেলো। কিন্তু ইসলামের মর্যাদাশীল কন্যারা তাঁবুর খুঁটি উঠিয়ে প্রত্যাঘাত হেনে রোমকদের ফিরিয়ে দিয়েছিলেন এবং পশ্চাদ পদ মুসলমানদেরকে লজ্জা দিয়ে যুদ্ধের ময়দানে ফিরে যেতে বাধ্য করেছিলেন।

মুসলমানরাও কয়েকবার জীবন বাজী রেখে হামলা চালালেন। কিন্তু রোকমরা তাদেরকে হটিয়ে দিলো। শেষে মুসলমানদের অটলতা এবং জীবন বাজী কাজে লাগলো। মুসলমানদের বাহিনীর এক অংশ যুদ্ধের শেষ দিকে বিদ্যুৎ বেগে রোমকদের পেছন দিক থেকে হামলা করে বসলো। ফলে তাদের ব্যূহ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলো। তাদের অর্ধেক সৈন্য যুদ্ধের ময়দানে পড়ে থাকলেও বাকী অর্ধেক জীবিত অবস্থায় পলায়ন করলো।

দামেস্ক বিজয়ের পূর্বে হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনুল আস ফিলিস্তিনের কিছু অংশ পরাভূত করেছিলেন। অতপর তাঁকে দামেস্ক, ফাহাল এবং ইয়ারমুক প্রভৃতি যুদ্ধে অংশ নিতে হয়। এজন্যে যে বিশেষ অভিযানে তাঁকে নিয়োগ করা হয়েছিলো তা অসমাপ্ত রয়ে যায়। ইয়ারমুক যুদ্ধের পর তিনি

www.bjilibrary.com

আবার সেদিকে খেয়াল দিলেন এবং গাজাহ, নাবলুস, লুদ, বাইতে হাবারাইন ও আমওয়াছ প্রভৃতি একের পর এক জয় করে বায়তুল মুকাদ্দাস ছাড়া সমগ্র ফিলিস্তিনকে ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করলেন। এখন তিনি রোমক সেনাপতি আরতাবুনকে পত্র লিখে জানালেন যে, বাইতুল মুকাদ্দাস আমাদের হাওয়ালা করে দাও এবং এ পবিত্র শহরে রক্ত বইতে দিও না। কিন্তু আরতাবুন এর অত্যন্ত অপমানজনক জবাব দিলেন এবং বললেন যে, আমর ইবনুল আসকে এ যমীনের ক্ষুদ্রতম অংশও আর দখল করতে দেয়া হবে না। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস অগ্রসর হয়ে বায়তুল মুকাদ্দাস অবরোধ করলেন। ইসলামী বাহিনীর সেনাপতি হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল জাররাহও কানসারীনের অভিযান শেষ করে বাইতুল মুকাদ্দাস পৌছে গেলেন। কথিত আছে যে, রোমক সেনাপতি আরতাবুন নিজের বাহিনী নিয়ে মিসর চলে গিয়েছিলো। এজন্যে বাইতুল মুকাদ্দাসে বেশী সৈন্য ছিলো না। বস্তুত বাইতুল মুকাদ্দাসবাসীরা খুব তাড়াতাড়ি হিম্মত হারিয়ে ফেললো এবং শর্ত সাপেক্ষে বিনা বাধায় মুসলমানদের হাতে শহর পত্যার্পণের ইচ্ছা ব্যক্ত করলো। শর্তে মুসলমানদের খলিফা সেখানে গিয়ে তাদের সাথে লিখিত সন্ধিনামায় স্বাক্ষর দানের কথা বলা হয়েছিলো। আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুকে বিষয়টি অবহিত করা হলো। তিনি এ শর্ত কবুল করে নিলেন এবং কতিপয় আনসার ও মুহাজিরসহ বাইতুল মুকাদ্দাস গমন করলেন। সেখানে খৃষ্টানদের ইচ্ছানুযায়ী সন্ধিপত্র লিখে তাদের হাওয়ালা করা হলো। এভাবে এ পবিত্র শহর কোনো রক্তারক্তি ছাড়াই মুসলমানদের দখলে এলো এবং ফিলিস্তিন সহ সমগ্র সিরিয়া মুসলমানদের করতলগত হলো।

কিছুদিন পর সিরিয়ায় মহামারী আকারে প্লেগ রোগ ছড়িয়ে পড়লো। এ প্লেগ 'তাউনে আমওয়াছ' নামে খ্যাত। সিরিয়ার গভর্নর হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল জাররাহ এবং হাজার হাজার মুসলমান এ মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করলেন। ওফাতের পূর্বে হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল জাররাহ হযরত মায়াজ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন জাবাল আনসারীকে নিজের স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করলেন। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস তাঁকে সেখান থেকে সৈন্য অপসারণের পরামর্শ দিলেন। কিন্তু তিনি এ পরামর্শ মানলেন না এবং নিজেও প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন। তাঁর ওফাতের পর হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস প্লেগ আক্রান্ত স্থানসমূহ থেকে সৈন্য অপসারণ করে পাহাড়ী এলাকায় নিয়ে গেলেন। এভাবে তারা মহামারী থেকে রক্ষা পেলো।

সিরিয়ার জিহাদের পর হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসের জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু হয়। আর এ অধ্যায়েই তিনি বিশ্বের প্রখ্যাত

www.bjilibrary.com

বিজেতার কাতারে আবির্ভূত হন। এ সময় তিনি শুধুমাত্র বিস্তীর্ণ সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা মিসরের ওপরই ইসলামের পতাকা উড্ডীন করেননি বরং ইসলামী বিজয়কে পশ্চিমে ত্রিপোলী পর্যন্ত পৌঁছে দেন। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস মিসরে কেন হামলা চালিয়ে ছিলেন ? এ প্রসঙ্গে তিন ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রথম বর্ণনা হলো, মিসর রোমের কাইসারের কর দিতো। সিরিয়া মুসলমানদের করতলগত হওয়ার পর কাইসারের মিসরের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হওয়ার আশংকা ছিলো। অনেকেই বলেছেন সে হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। দ্বিতীয় বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, মিসরীয়রা সিরিয়ায় প্রবেশ করে মুসলমানদের ওপর গেরিলা হামলা চালাচ্ছিলো। তৃতীয় বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস জাহেলী যুগে বাণিজ্য প্রসঙ্গে মিসর গিয়েছিলেন। তিনি সে দেশের সম্পদ ও শ্যামলিমা সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত ছিলেন। দেশটি ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হোক এটা তাঁর বাসনা ছিলো। আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুর সিরিয়ায় শেষ সফরের সময় তিনি তার সাথে একাকীত্বে মিলিত হন এবং মিসরে সৈন্য প্রেরণের অনুমতি প্রার্থনা করেন। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু প্রথমে উল্লিখিত কারণের ভিত্তিতে অনুমতিদানের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করলেন। তিনি চিন্তা করে দেখলেন যে, সিরিয়া বিজয়ের পর ইসলামী বাহিনী সম্পূর্ণরূপে বিশ্রামও নিতে পারেনি। দ্বিতীয় প্লেগে ২৫ হাজার মুসলমান মারা গেছেন এবং মুসলমানদের সামরিক শক্তি সন্তোষজনক ছিলো না। তৃতীয়ত দূর-দূরান্তের সফর ছিলো এবং রাস্তায়ও কয়েকটি বাধা ছিলো। চতুর্থত মিসরের গভর্নর মাকুকাসের সামরিক শক্তির সঠিক ধারণা ছিলো না। কিন্তু হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস বড় বাহাদুর এবং সাহসী পুরুষ ছিলেন। তিনি এ ব্যাপারে এত একাগ্রতা প্রকাশ করলেন যে, অবশেষে হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁকে মিসরের দিকে অগ্রযাত্রার অনুমতি প্রদান করলেন। কিন্তু এজন্যে মাত্র ৪ হাজার সৈন্য পাওয়া গেলো।

১৮ হিজরীর শেষ দিকে হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস সে সৈন্যসহ মিসরের দিকে অগ্রসর হলেন। সর্বপ্রথম ব্যাবিলন নামক স্থানে একটি মিসরীয় সৈন্যদল তাঁকে বাধা দিলো। কিন্তু হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁদেরকে পরাজিত করলেন। এরপর সামনে অগ্রসর হয়ে তিনি আল-আরিশ পৌঁছলেন। সেখানেই অবস্থান করছিলেন এমন সময় তিনি হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুর পত্র পেলেন। পত্রে তিনি লিখেছিলেন যে, যদি মিসর সীমানায় প্রবেশ না করে থাকো, তাহলে ফিরে এসো। আর যদি প্রবেশ করে থাকো, তাহলে আল্লাহর ওপর ভরসা করে অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখো। বস্তুত আল-আরিশ মিসরের সীমানার মধ্যে অবস্থিত। এজন্যে হযরত আমর

www.bjilibrary.com

রাদিয়াল্লাহ আনহু পত্র পাঠ করে বললেন, আমরা তো মিসরের সীমানার মধ্যে এসে পড়েছি। মোটকথা আল-আরিশ থেকে সামনে এগিয়ে ফারমা পৌঁছলেন। ফারমা নীল নদের তীরে অবস্থিত একটি পুরাতন বড় শহর। শহরটি রক্ষার জন্যে একটি শক্তিশালী বাহিনী মোতায়েন ছিলো। তারা এক মাস পর্যন্ত মুসলমানদের মুকাবিলা করলো। কিন্তু অবশেষে পরাজিত হলো। এরপর হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু বিলবিস এবং উম্মে ওনিন প্রভৃতি স্থান জয় করতে করতে আইনে শামস পৌঁছে গেলেন। প্রাচীন যুগে এটি একটি বড় শহর ছিলো। কিন্তু সে সময় তা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো।

ঐতিহাসিক মাকরিজী বলেছেন, পরে এ স্থান দ্বিতীয়বার আবাদ হয়ে "ফুসতাত" নামে খ্যাত হয়। এ স্থানে দিগন্ত প্রসারিত ক্ষেত ও চারণভূমির মধ্যে একটি মযবুত দুর্গ ছিলো। এ দুর্গকে "কাসরে শামা' বলা হতো। এ দুর্গে সরকারী সৈন্য এবং মিসরের বড় বড় অফিসার বাস করতো। দুর্গটির নীচ দিয়ে প্রবাহিত হতো নীল নদ। জাহাজ এবং কিশতী এসে ভীড়তো দুর্গের দরজায়। এজন্যে স্থানটি ছিলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং তা দখল করা ছাড়া মিসরের দিকে অগ্রসর হওয়া ছিলো কঠিন ও ভয়ের ব্যাপার। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস দুর্গটি অবরোধ করলেন। মিসরীয় বাহিনী অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে মুকাবিলা করলো। এক রাওয়ায়েতে আছে যে, স্বয়ং মাকুকাস দুর্গে পৌঁছে তা রক্ষায় ব্যাপৃত হয়েছিলো। অবরোধ দীর্ঘতর হলে হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস খেলাফতের দরবারে সাহায্য চেয়ে পাঠালেন। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত যুবাইর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আওয়ামের নেতৃত্বে ১০ হাজার সৈন্য (অন্য রাওয়ায়েতে ১২ হাজার) প্রেরণ করলেন। এ বাহিনীর অন্যান্য কর্মকর্তা ছিলেন হযরত মিকদাদ রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসওয়াদ, হযরত উবাদা রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ছামেত আনসারী এবং হযরত মাসলামাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন মুখাল্লাদ আনসারী।

হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে লিখলেন, হযরত যুবাইর রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং এ তিন অফিসার এক এক হাজার অশ্বারোহীর সমান। হযরত যুবাইর রাদিয়াল্লাহ আনহুর উঁচুমর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু অবরোধ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব তাঁর ওপরই ন্যস্ত করলেন। তিনি পরিখার চারপাশে চক্কর দিলেন এবং বিশেষ বিশেষ স্থানে অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী মোতায়েন করলেন। সাথে সাথে কামানের সাহায্যে দুর্গের প্রাচীরের ওপর প্রচণ্ডভাবে পাথর বর্ষণ শুরু করলেন। কিন্তু এতসব ব্যবস্থা গ্রহণ সত্ত্বেও সাত মাসেও যখন দুর্গ জয় করা সম্ভব হলো না তখন একদিন মুসলমানদের ওপর কসম খেয়ে হযরত যুবাইর রাদিয়াল্লাহ

www.bjilibrary.com

আনহু নাঙ্গা তরবারী হাতে নিয়ে সিঁড়ির সাহায্যে দুর্গের প্রাচীরের ওপর চড়ে বসলেন। আরও কতিপয় মুজাহিদ তাঁর সাথী হলেন। তাঁরা প্রাচীরে চড়ে এতো উচ্চস্বরে নারায়ে তাকবির ধ্বনি উচ্চারণ করলেন যে, মিসরীয়রা হতচকিত হয়ে পড়লো। তারা মনে করলো মুসলমানরা বুঝি দুর্গের ভিতরে ঢুকে পড়েছে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তারা এদিক ওদিক পালাতে থাকলো। ওদিকে হযরত যুবাইর রাদিয়াল্লাহ আনহু প্রাচীরের ওপর থেকে নেমে দুর্গের দরজা খুলে দিলেন এবং সমগ্র ইসলামী বাহিনী ভেতরে প্রবেশ করলো। এ অবস্থা দেখে মিসরীয়রা অস্ত্র ফেলে দিয়ে সন্ধির আবেদন জানালো। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু সাধারণ শর্তেই সন্ধি করলেন এবং সমগ্র দুর্গবাসীকেই নিরাপত্তা দিয়ে দিলেন। বালাজুরী (র) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর ফরমান অনুযায়ী ঐ এলাকার ভূমি জমিদারদের হাতেই ছেড়ে দেয়া হয়েছিলো এবং ভূমির ওপর কর আরোপ করা হয়েছিলো।

কতিপয় ঐতিহাসিক এ ঘটনাবলী ব্যাবিলন পদানত করা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আমরা তাবারী, বালাজুরী এবং মাকরিজীর (র) বর্ণনাসমূহকে প্রাধান্য দিয়েছি।

শামা দুর্গে কিছুদিন অবস্থানের পর হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস আমীরুল মু'মিনীনের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে মিসরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শহর ইসকান্দারিয়ার দিকে অগ্রসর হলেন। পথিমধ্যে আশমুন, আলিয়া, কুম, মাক্কু, ক্রিউন এবং অন্যান্য স্থানে মিসরীয় সৈন্যের সাথে ইসলামী বাহিনীর সংঘর্ষ হলো। কিন্তু প্রত্যেক স্থানেই তারা পরাজিত হয়ে পিছু হটে গেলো এবং হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু তাদের পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে ইসকান্দারিয়ার প্রাচীরের কাছে পৌঁছে গেলেন। ইসকান্দারিয়াতে ৫০ হাজার রোমক সৈন্য মোতায়েন এবং একটি শক্তিশালী নৌবাহিনীও তাদের রক্ষায় নিয়োজিত ছিলো। শহরে অস্ত্র এবং রসদের বড় বড় ভাণ্ডার ছিলো। এজন্যে রোমকদের উদ্দীপনা ছিলো তুঙ্গে এবং তারা দুর্গ বন্ধ অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত মুকাবিলা করার সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছিলো। আল্লামা বালাজুরী (র) এবং মাকরিযী (র) বর্ণনা করেছেন, মাকুকাস মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করতে চাননি। কিন্তু প্রকাশ্যে যুদ্ধ থেকে সরেও পড়তে পারছিলো না। কেননা তাতে কাইসারের ক্রোধের শিকার হওয়ার আশংকা ছিলো। পক্ষান্তরে মাকুকাস একথাও বিশ্বাস করতো যে, যে মুসলমানরা সিরিয়া থেকে কাইসারকে বহিষ্কার করেছে অবশেষে তারা মিসরকেও পদানত করে ছাড়বে। সুতরাং সে হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসের সাথে গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। চুক্তিতে বলা হয় যে, এ যুদ্ধ তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হচ্ছে এবং তারা অনিচ্ছায়

www.bjilibrary.com

তাতে অংশ নিচ্ছে। এজন্যে মুসলমানদের হাতে তার কাওমের (কিবতী) যেনো কোনো ক্ষতি না হয়, সে খেয়াল রাখতে হবে। মুসলমানরা বিজয়ী হয়ে গেলে শিশু, মহিলা এবং প্রতিবন্ধী ছাড়া প্রত্যেক কিবতী বাৎসরিক দু' দিনার করে জিযিয়া আদায় করবে এবং যেখানে মুসলমান বাহিনী গমন করবে কিবতীরা তাদের জন্যে সড়ক ও পুল মেরামত এবং খাদ্যের ব্যবস্থা করে দেবে। সর্বোপরি কিবতীরা মুসলমানদেরকে সার্বিকভাবে সাহায্য করবে।

বালাজুরী (র) বর্ণনা করেছেন, যুদ্ধের পূর্বে মাকুকাস শহরের সকল নারী-পুরুষকে সামরিক পোশাক পরিয়ে ইসকান্দারিয়ার প্রাচীরের ওপর দাঁড় করিয়ে দিলেন। যাতে তাদের সংখ্যাধিক্য দেখে মুসলমানরা ভীত হয়ে পড়ে। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু এ দৃশ্য দেখলেন এবং মাকুকাসকে বলে পাঠালেন যে, আমরা এতোদিন যত দেশ জয় করেছি তা সৈন্যের সংখ্যাধিক্যের শক্তিতে জয় করিনি। তোমাদের বাদশাহ হিরাক্লিয়াস কি ধরনের বিপুল সাজ-সরঞ্জামসহ আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলো তা তোমার জ্ঞাত থাকার কথা। আর সেই যুদ্ধের কি ফলাফল হয়েছিলো তাও তোমার জানা আছে। মাকুকাস এ পয়গাম পেয়ে ইস্কান্দারিয়াবাসীদেরকে তা অবহিত করালো এবং বললো সন্দেহাতীত-ভাবে এটা ঠিক যে, আরবরা আমাদের বাদশাহকে সিরিয়া থেকে বহিষ্কার করে কাসতানতুনিয়াতে ঢুকিয়ে দিয়েছিলো। আমরা এ মুসলমানদের সামনে তো নস্যি সমতুল্য। এ কথায় রোকমরা অত্যন্ত উষ্মা প্রকাশ করলো এবং মাকুকাসকে খুব করে শুনিয়ে দিলো। মাকুকাস আপাততঃ চুপ হয়ে গেলো। যুদ্ধে কিবতীরা কোনো তৎপরতা প্রদর্শন করলো না। বরং যুদ্ধ থেকে বিরতই রইলো। এক রাওয়ায়েত অনুযায়ী পর্দার অন্তরালে তারা মুসলমানদেরকে সাহায্যই করলো। (সড়ক পরিষ্কার এবং পুল মেরামতের কাজ)।

রোমকদের অহমিকা দেখে হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস অত্যন্ত কঠোরতার সাথে ইসকান্দারিয়া অবরোধ করলেন। রোমকদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা খুব মজবুত ছিলো। এজন্যে তারা মুকাবিলা অব্যাহত রাখলো। সাধারণত তারা শহরের অভ্যন্তরেই থাকতো। তবে, কখনো কখনো তাদের কোনো দল শহর থেকে বের হয়ে মুসলমানদের সাথে এক হাত নিয়ে আসতো। একদিন এমনি এক সংঘর্ষে ১২জন মুসলমান শহীদ হয়ে গেলো। অন্য আরো একদিন রোমকরা এক মুসলমানকে শহীদ করে তাঁর মাথা কেটে নিজেদের সাথে নিয়ে গেলো। এর জবাবে মুসলমানরাও এক খৃষ্টানের মাথা কেটে নিলো এবং তাকে সেই সময় রোমকদের হাওয়ালা করলো যখন তারা শহীদ মুসলমানের মাথা ফিরিয়ে দিলো।

www.bjilibrary.com

আরও এক ঘটনায় রোমকরা মুসলমানদের এক বিরাট সংখ্যককে শহীদ করে ফেললো। এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী এ সংখ্যা ছিলো ৪৩৬। তবে হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনুল আস তৎক্ষণাৎ তার বদলা নিলেন এবং হামলাকারীদেরকে তছনছ করে ফেললেন। অধিকাংশ ঐতিহাসিক লিখেছেন, রোমের কাইসার প্রচুর সাজ-সরঞ্জামসহ স্বয়ং ইসকান্দারিয়া গমনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। ঠিক এমনি সময়ে তার পরপারে যাত্রার ডাক এলো। তবুও ইসকান্দারিয়ায় মওজুদ রোমকরা অব্যাহতভাবে হামলা চালিয়ে যেতে লাগলো।

একদিন রোমকদের একটি দল শহর থেকে বেরিয়ে এলো। এ সময় তাদের মধ্যে থেকে জনৈক যুদ্ধবাজ সামনে অগ্রসর হয়ে মুসলমানদেরকে যুদ্ধের আহ্বান জানালো। হযরত মাসলামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন মুখাল্লাদ তার মুখোমুখি হলেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে তিনি ঘোড়ার ওপর থাকতে পারলেন না এবং রোমক ব্যক্তিটি তাকে মাটিতে ফেলে দিলেন। সে তাঁকে কতল করার জন্যে তলোয়ার উঠিয়েছিলো। এমন সময় একজন মুসলমান অশ্বারোহী বিদ্যুৎ বেগে সামনে অগ্রসর হয়ে তাঁকে রক্ষা করলেন।

এ ঘটনা দেখে হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনুল আস অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হলেন এবং অযাচিতভাবে বলে ফেললেন, "এ ধরনের নপুংসকদের যুদ্ধের ময়দানে আসার কি প্রয়োজন।" তাঁর কথা শুনে হযরত মাসলামা রাদিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। কিন্তু তিনি খুব ধৈর্য্যের সাথে কাজ করলেন। ততক্ষণে সাধারণ যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। মুসলমানরা বাঘের মত রোমকদের ওপর হামলা চালালো। হামলায় তিষ্টাতে না পেরে তারা পিছু হটতে হটতে দুর্গের ভেতরে গিয়ে আশ্রয় নিলো। মুসলমানরা তাদের পিছু নিলো। বহুক্ষণ ধরে দুর্গের অভ্যন্তরে যুদ্ধ চললো। অবশেষে রোমকরা সামলে নিয়ে এমন জবাবি হামলা পরিচালনা করলো যে, মুসলমানদেরকে দুর্গের বাইরে চলে আসতে হলো। অবশ্য চারজন মুজাহিদ দুর্গের অভ্যন্তরে রয়ে গেলেন। তাদের মধ্যে হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনুল আস এবং হযরত মাসলামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন মুখাল্লাদও ছিলেন। কিন্তু রোমকরা তাঁদেরকে চিনতো না। তারা এ চারজনকে জীবিত গ্রেফতার করতে চাইলো। কিন্তু যখন দেখলো যে, তারা মরতে এবং মারতে প্রস্তুত এবং কোনোক্রমেই জীবিত ধরা দিতে রাজী নয় তখন তারা দ্বন্দ্ব যুদ্ধের প্রস্তাব দিলো। তারা আরো বললো যে, তোমাদের কেউ বিজয়ী হলে ছেড়ে দেয়া হবে।

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনুল আস এ শর্ত মঞ্জুর করলেন এবং স্বয়ং একজন রোমক যুদ্ধবাজের সাথে মুকাবিলা করতে চাইলেন। কিন্তু হযরত মাসলামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আপনি সেনাবাহিনীর নেতা। খোদা

www.bjilibrary.com

না'খাস্তা আপনার যদি ক্ষতি হয় তাহলে সৈন্যদের কি হবে। আপনি থাকুন। আমিই রোমককে মুকাবিলার জন্য গমন করছি। একথা বলেই তিনি ঘোড়া ছুটালেন এবং রোমক যুদ্ধবাজের সামনে গিয়ে পৌছলেন। উভয়েই দীর্ঘক্ষণ ধরে পরস্পরের বিরুদ্ধে তরবারী চালালেন। অবশেষে হযরত মাসলামা রাদিয়াল্লাহ আনহু এমন আঘাত হানলেন যে, রোমক ব্যক্তিটি মাটিতে লাশ হয়ে পড়ে গেলো। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রোমকরা দুর্গের দরজা খুলে দিলো এবং চারজনই বাইরে বেরিয়ে এলেন। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস হযরত মাসলামা রাদিয়াল্লাহ আনহুর বাহাদুরীতে খুব প্রভাবিত হলেন এবং পূর্বেকার কথায় লজ্জা প্রকাশ করলেন ও ক্ষমা চাইলেন। তিনি সরল অন্তরে ক্ষমা করে দিলেন। এভাবেই বেশ কিছুদিন ধরে উভয় পক্ষের মধ্যে বিচ্ছিন্ন সংঘর্ষ চললো এবং অবরোধ দীর্ঘায়িত হতে থাকলো। এমনকি এ অবস্থায় দু' বছর কাটলো। এদিকে হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু এ বিলম্বে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। বস্তুত তিনি হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে কঠোর ভাষায় এক চিঠি লিখলেন। তিনি বললেন, সম্ভবতঃ তোমরা সেখান থেকে রোমকদের মতই বিলাসী হয়ে গেছো। নচেৎ বিজয়ে এত দেরী হতো না। যেদিন আমার চিঠি পৌছবে সেদিন সকল সৈন্য একত্রিত করে জিহাদের ফযীলাত সম্বলিত ভাষণ দেবে এবং যে চার ব্যক্তিকে অফিসার বানিয়ে প্রেরণ করেছিলাম তারা যেনো শুক্রবার সূর্যাস্তের পর নিজেদের বাহিনী নিয়ে সিদ্ধান্তমূলক হামলা চালায়।

আমীরুল মু'মিনীনের নির্দেশ মুতাবিক হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস সকল সৈন্যকে একত্রিত করে জিহাদের ফযীলাত সম্বলিত আগুন ঝরা বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতা শুনে মুজাহিদরা যুদ্ধের জন্য অস্থির হয়ে পড়লেন। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত উবাদা রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন সামেতকে ডেকে বললেন, আপনার বর্শা আমাকে দিন। অতপর নিজের মাথা থেকে পাগড়ী খুলে বর্শার সাথে বাধলেন এবং তা হযরত উবাদার হাতে সোপর্দ করে বললেন, এটা সেনাপতির ঝাণ্ডা। আজ আপনি সেনাপতি। এর সাথে হযরত যুবাইর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আওয়াম হযরত মিকদাদ রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং হযরত মাসলামা রাদিয়াল্লাহ আনহুকে স্ব স্ব বাহিনীর অফিসার নিয়োগ করলেন। এরপর মুজাহিদরা হযরত উবাদা রাদিয়াল্লাহ আনহুর নেতৃত্বে এমন প্রচণ্ড হামলা চালালেন যে, প্রথম হামলাতেই রোমকদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেলো এবং জলে ও স্থলে যে পথেই সুযোগ পেলো সে পথেই পলায়ন করলো। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস এক হাজার সৈন্য ইসকান্দারিয়াতে রেখে স্বয়ং মিসরের অভ্যন্তরে পলায়নরত রোমকদের পিছু নিলেন। এদিকে রোমকরা সুযোগ পেয়ে সমুদ্র পথে ইসকান্দারিয়াতে অবস্থানরত মুজাহিদদের ওপর হামলা করে বসলো। এ হামলায় বহু মুসলমান

www.bjilibrary.com

শাহাদাতের পেয়ালা পান করলেন। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ খবর পেয়ে পলায়ন পর রোমকদের পশ্চাদ্ধাবন পরিত্যাগ করে বিপরীত দিকে ছুটলেন এবং হামলাকারী রোমকদের পরাজিত করে ইসকান্দারিয়ার ওপর কব্জা মযবুত করলেন।

যদিও এ শহর তরবারীর মাধ্যমে বিজিত হয়েছিলো তবুও হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সাধারণ কোনো নাগরিককেই হত্যা অথবা গ্রেফতার করেননি। জিযিয়া এবং খিরাজ ধার্য করার পর তিনি সবাইকে নিরাপত্তা প্রদান করলেন।

অন্য এক রাওয়ায়েতে আছে যে, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পত্র ইসকান্দারিয়া অবরোধের চার মাস পর হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু পেয়েছিলেন। পত্র প্রাপ্তির পর তিনি রোমকদের এমন চাপ প্রয়োগ করলেন যে, তারা সন্ধি করতে বাধ্য হলো। তবে সন্ধি পত্রে ১১ মাস পর শহর মুসলমানদের হাতে হস্তান্তরের শর্ত আরোপ করা হয়েছিলো। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু রক্তারক্তির হাত থেকে বাঁচার জন্য এ শর্ত মেনে নিয়েছিলেন এবং ১১ মাস অতিবাহিত হওয়ার পর শহর দখল করেন।

পরিস্থিতি যাই হোক ইসকান্দারিয়া পতনের পর মিসরের অন্যান্য শহরে অবস্থানরত রোমকরা হিম্মতহারা হয়ে পড়লো। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনুল আস এসব শহর করতলগত করার জন্য হযরত উমায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন ওয়াহাব, হযরত উকবা রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন আমের জাহনী এবং হযরত খারেজা রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন হাজাফার নেতৃত্বে বিভিন্ন দিকে সৈন্য প্রেরণ করলেন। কোনো কোনো স্থানে রোমকরা বাধা দিলো। কিন্তু অবশেষে অস্ত্র সমর্পণ করলো। এভাবে সমগ্র মিসর মুসলমানদের করতলগত হলো। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনুল আস মুয়াবিয়া বিন খুদাইজের মাধ্যমে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মিসর বিজয়ের সুসংবাদ প্রেরণ করলেন। এ সুসংবাদ প্রাপ্তির সাথে সাথে তিনি রাব্বুল ইজ্জাতের দরবারে সিজদাবনত হলেন। অতপর সমগ্র মদীনাবাসীকে একত্রিত করে এ সুসংবাদ শুনালেন।

মিসর পদানত করার পর হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনুল আস বারকার দিকে অগ্রসর হলেন। বারকা ছিলো ইসকান্দারিয়া এবং পশ্চিম ত্রিপোলীর মধ্যে এক শ্যামলিমাময় পূর্ণ আবাসিক এলাকা। স্থানটি মিসরের সীমানার বাইরে ছিলো। কিন্তু এর বাসিন্দারা মিসরকে কর প্রদান করতো। বস্তুত এটাকে মিসরের করদরাজ্য বলা চলে। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনুল আস বারকা প্রবেশ করে সেখানকার গুরুত্বপূর্ণ এবং কেন্দ্রীয় শহর ইন্তাবলিস অবরোধ করলেন। শহরবাসীরা অবিলম্বে আনুগত্য কবুল করে নিলো। এবং বার্ষিক ১৩ হাজার দিনার জিযিয়া প্রদানের প্রতিশ্রুতি পত্র লিখে দিলো।

বারকা বিজয়ের পর হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু উকবাহ বিন নাফে রাদিয়াল্লাহ আনহুকে জাবিলা প্রেরণ করলেন। এটি ছিলো সুদানের সীমান্তবর্তী শহর। জাবিলাবাসীরা কোনো বাধা ছাড়াই জিযিয়া প্রদানে সম্মত হয়ে গেলো। এরপর হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু পশ্চিম ত্রিপোলীর দিকে অগ্রসর হলেন। রোম সাগরের তীরবর্তী আফ্রিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিলো এটি। মুসলমানদের আগমনের সংবাদ পেয়ে ত্রিপোলীবাসী দুর্গের দরযা বন্ধ করে বসে পড়লো। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু শহরের পূর্ব প্রান্তে তাঁবু ফেললেন এবং অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তা অবরোধ করলেন। দু' মাস পর্যন্ত অবরোধ অব্যাহত থাকলো। কিন্তু শহরে প্রবেশের কোনো পথ পাওয়া গেলো না। একদিন কতিপয় মুসলমান শিকারে গেলেন। ঘটনাক্রমে তারা একটি শুকনো রাস্তা দেখতে পেলেন। সমুদ্রের পানি নেমে যাওয়ার কারণে এ রাস্তা তৈরি ছিলো। তাঁরা এও দেখতে পেলেন যে, শহর এবং সমুদ্রের মধ্যে কোনো প্রাচীর বা অন্য কোনো বাধা নেই। ফিরে এসে তারা যা দেখেছিলেন তা হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে অবহিত করলেন। তাঁরা কালবিলম্ব না করে সে রাস্তা দিয়ে শহরের ওপর হামলা করে বসলেন। এ হঠাৎ আক্রমণে শহরবাসী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লো এবং নামমাত্র বাধাদানের পর অস্ত্র সমর্পণ করলো।

ত্রিপোলী করতলগত করার পর হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস সেখানেই রইলেন এবং একদল সৈন্য সাবরাহ রওয়ানা করলেন। ত্রিপোলীর অদূরে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর ছিলো। সাবরাবাসী ত্রিপোলীর ঘটনা সম্পর্কে পরিজ্ঞাত ছিলো না। এজন্যে শহরের ফটক খুলে নির্বিঘ্নে ও নিশ্চিন্তায় কাজ-কর্মে ব্যস্ত ছিলো। মুসলমানরা হঠাৎ করে আক্রমণ করে শহরে প্রবেশ করলো। সাবরাবাসী আর তাদের মুকাবিলা করার সাহস পেলো না। তারা তৎক্ষণাৎ আনুগত্য স্বীকার করে নিলো।

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস লাখ লাখ বর্গমাইলের ওপর ইসলামের ঝাণ্ডা উড্ডীন করেছিলেন। তিনি তখন ইসকান্দারিয়া থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে এমন এক স্থানে অবস্থান করছিলেন যেখানে সফর করা ছিলো খুব কঠিন ব্যাপার। কিন্তু তাঁর আশা ছিলো প্রচুর। তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিলো আফ্রিকার তিউনিসিয়া, আলজিরিয়া এবং মরক্কোর প্রতি। তিনি হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে পত্র লিখলেন। পত্রে তিনি জানালেন, আমরা ত্রিপোলী পর্যন্ত জয় করে নিয়েছি। এখান থেকে আফ্রিকার সীমান্ত ৯ দিনের পথ। অনুমতি প্রদান করলে আমরা উত্তর আফ্রিকার দিকে অগ্রসর হতে পারি। আমীরুল মু'মিনীন জবাবে লিখলেন ঃ

www.bjilibrary.com

"আফ্রিকায় পা রেখো না। সে দেশ বিবাদ-বিসম্বাদ এবং অরাজকতার কেন্দ্রবিন্দু। সেখানকার মানুষ কখনো ঐক্যবদ্ধ থাকে না। সেখানকার পানি কঠিন হৃদয় বানিয়ে দেয়। যে তা পান করবে তার অন্তরই কঠিন হয়ে যাবে।"

এ সাথেই হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসকে মিসরের গভর্নর নিয়োগ করলেন। মুসলমানদের ইসকান্দারিয়া দখলের পর বহুসংখ্যক রোমক নিজেদের ঘর-বাড়ী পরিত্যাগ করে সমুদ্র পথে কাইসারের সাম্রাজ্যে পাড়ি জমায়। মুসলমানরা সেখানে বহু-সংখ্যক বাড়ী, হাবেলী এবং মহল পরিত্যক্ত অবস্থায় পেলো। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুকে ইসকান্দারিয়াকে রাজধানী বানানোর অভিপ্রায় ব্যক্ত করে পত্র লিখলেন। কেননা সেখানে বসবাসের সুন্দর ব্যবস্থা ছিলো। কিন্তু তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন না। তিনি লিখলেন ঃ

"মুসলমান গাজীদেরকে এমন স্থানে বসতিস্থাপন আমি উপযুক্ত মনে করি না যেখানে শীত গ্রীষ্মে কোনো নদী বাধা হয়ে দাঁড়ায়।"

এরপর হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস "ফুসতাত" নামক এক নতুন শহরের পত্তন করলেন এবং সেখানেই রাজধানী বানালেন।

এ শহর পত্তনের বিস্তারিত বিবরণ আল্লামা শিবলী নোমানী "আল ফারুক" গ্রন্থে এভাবে দিয়েছেন ঃ

"আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস ইসকান্দারিয়া থেকে রওয়ানা হয়ে কাসরে শামাতে এলেন। এখানে তাঁর সে তাঁবু তেমনিভাবে দণ্ডায়মান ছিলো যা তিনি ইসকান্দারিয়া অভিযানের সময় শূন্য অবস্থায় পরিত্যাগ করে গিয়েছিলেন। বস্তুত তিনি সে তাঁবুতেই অবতরণ করলেন এবং সেখানেই নতুন জনবসতির গোড়াপত্তন করলেন। প্রত্যেক গোত্রের জন্য পৃথক পৃথক সীমানা নির্ধারণ করলেন। মুয়াবিয়া বিন খাদিজ, শুরাইক রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ছামী, আমর বিন মাখজুম এবং ইবনে নাশেরকে যথাযথ স্থানে প্রত্যেক গোত্রকে আবাদ করার দায়িত্ব দিলেন। যত মহল্লা সে সময় ছিলো এবং যেসব গোত্র তাঁতে বসতিস্থাপন করেছিলো তাঁর নাম আল্লামা মাকরিজী বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। বিশেষ ব্যবস্থাপনায় জামে মসজিদ তৈরি করা হয়। সাধারণভাবে বর্ণিত আছে যে, ৮০জন সাহাবী একত্রিত হয়ে মসজিদের কেবলা নির্ধারণ করেন। এসব সাহাবী রাদিয়াল্লাহ আনহুর মধ্যে যুবাইর রাদিয়াল্লাহ আনহু, মিকদাদ রাদিয়াল্লাহ আনহু, উবাদা রাদিয়াল্লাহ আনহু, আবু দারদা রাদিয়াল্লাহ আনহু প্রমুখ প্রখ্যাত ব্যক্তিরা ছিলেন। এ মসজিদ ৫০ গজ লম্বা এবং ৩০ গজ

চওড়া ছিলো। মসজিদটির তিন দিকে দরজা ছিলো। এর একটি ছিলো রাজধানীর দিকে। রাজধানী ও মসজিদের দূরত্ব ছিলো সাত গজ। আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর জন্য একটি বাড়ী বিশেষভাবে তৈরি করেছিলেন। কিন্তু হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু লিখে পাঠালেন যে, এ বাড়ী তাঁর জন্য কি প্রয়োজনে আসবে ? ফলে সে বাড়ী বাজারে রূপান্তর করা হলো। যেহেতু শহরটির বসতি তাঁবুর কাছ থেকে শুরু হয়েছিলো। এজন্য নামককরণ করা হয় ফুসতাত। আরবীতে ফুসতাত শব্দের অর্থ হলো তাঁবু। ২১ হিজরীতে শহরটির গোড়া পত্তন হয়। অবিলম্বে ফুসতাতের উন্নয়ন ঘটলো এবং ইসকান্দারিয়ার পরিবর্তে তা মিসরের রাজধানীতে পরিণত হলো।"

ফুসতাতের নির্মাণ কাজ শুরু হলো। এ সময় আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস নীল নদের পশ্চিমে তীর (ফুসতাতের সামনা সামনি) একটি সামরিক ছাউনি তৈরি করলেন। এ ছাউনীতে হামির, হামদান, আলে রাইন, ইযদ বিন হাজার গোত্র এবং হাবশার কতিপয় ব্যক্তিকে রাখা হলো। মুসলমানদেরকে ফুসতাত নগরী নির্মাণের কাজে ব্যাপৃতদের পশ্চিম দিক থেকে কোনো শত্রু নদীর দিক থেকে যাতে হামলা করে বসতে না পারে, সে জন্যই এ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিলো। নতুন শহরে বসতিস্থাপনের পর হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ঐসব গোত্রকে ফুসতাতে ডেকে আবাদ করতে চাইলেন। কিন্তু নদীর পশ্চিম তীর তাদের এত পসন্দ হয়েছিলো, যে তারা তা পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলো না। এ ছাউনীর নাম দেয়া হয়েছিলো জানিরাহ। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু একথা জানতে পেরে হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসকে এ চিঠি লিখলেন ঃ

"সৈন্য বাহিনী থেকে পৃথক থাকাটা তুমি কিভাবে মেনে নিলে। উপরন্তু তোমার এবং তাদের মধ্যে নদী বিদ্যমান। হঠাৎ করে যদি তাদের ওপর কোনো মুসিবত আপতিত হয়, তাহলে সম্ভবতঃ তুমি কোনো সাহায্য করতে পারবে না। ফলে তাদের ক্ষতি হবে। অতএব, তুমি তাদেরকে ফুসতাত ডেকে নাও। যদি তারা এতে সম্মত না হয়, তাহলে সরকারী অর্থে তাদের বস্তির চারপাশে একটি দুর্গ বানিয়ে দাও।"

সুতরাং হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু সেখানে একটি দুর্গ বানিয়ে দিলেন। কিন্তু হামদান এবং অন্যান্য গোত্রের কিছু লোক বললো যে, তারা কাপুরুষের মত দুর্গে থাকতে চায় না। তাদের দুর্গ হলো তাদের তরবারী। বস্তুত এসব লোক দুর্গের বাইরে খোলা ময়দানে বসতিস্থাপন করলো এবং স্থায়ীভাবে সেখানে রয়ে গেলো। শীঘ্রই সেখানে একটি নয়নাভিরাম শহর হয়ে গেলো। শহরটি বাগানে ঘিরে রেখেছিলো।

www.bjilibrary.com

ফুসতাতে বসতিস্থাপনের পর মিসরের সাবেক গভর্নর মাকুকাস হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে একটি আবেদন জানালো। আবেদনে মাকতাম পাহাড়ের সন্নিহিত অনাবাদযোগ্য জমি তার কাছে বিক্রি করার প্রস্তাব করা হলো। এজন্যে ৭০ হাজার দিনার দেয়ার প্রস্তুতির কথাও সে অবহিত করলো। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, মিসরের মাটি সকল মুসলমানের মালিকানাধীন। তার কোনো অংশই বিক্রয়যোগ্য নয়। তবুও আমি আমীরুল মু'মিনীনকে লিখছি। তিনি অনুমতি দিলে তোমার কাছে তা বিক্রি করে দেবো।

বিষয়টি হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে পৌছলে তিনি বললেন ঃ

"মাকুকাসকে জিজ্ঞেস করো যে, সে এ নাকাহরা জমির এতো মূল্য দিতে চায় কেনো। এ জমিতে না আছে পানি, না তা আবাদযোগ্য।"

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনুল আস মাকুকাসকে যখন একথা জিজ্ঞেস করলেন, তখন সে বললো, তাদের কিতাবে লেখা আছে যে, এখানে জান্নাতের চারা লাগানো হবে (অর্থাৎ খৃষ্টানদের সমাধিস্থল হবে)। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এ জবাব অবহিত করা হলো। তিনি লিখলেন ঃ

"মুসলমান ছাড়া জান্নাতের চারা আর কে হতে পারে তা আমার বোধগম্য নয়। অতএব যেসব মুসলমান ফুসতাতে মৃত্যুবরণ করবে তাদেরকে মাকতামের সন্নিহিত স্থানে দাফন করবে। কোনো মূল্যেই এ জমি বিক্রি করবে না। (হাসানুল মাহাজিরাহ লিস সুয়ূতী)।

হযরত ওমর ফারুক সকল গভর্নরকে প্রত্যেক বছর হজ্জের সময় হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি সকল গভর্নরের উপস্থিতিতে সাধারণ্যে ঘোষণা করতেন যে, কারোর কোনো গভর্নরের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে তা পেশ করো।

এ ধরনের এক সমাবেশে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার ভাষণ দিতে গিয়ে বললেন ঃ "মানুষেরা ! আমি তোমাদের ওপর যাদেরকে গভর্নর বানিয়ে প্রেরণ করি তাদের এ অধিকার দেইনি যে, তারা তোমাদের থাপ্পর মারবে অথবা তোমাদের সম্পদ ছিনিয়ে নেবে। বরং তারা তোমাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তরিকা শিক্ষা দেবে। যদি কোনো গভর্নর অথবা হাকিম এর বিপরীত কিছু করে থাকে তাহলে নির্দ্বিধায় উঠে দাঁড়িয়ে বর্ণনা করো। যাতে আমি তার তদারক করতে পারি।"

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনুল আসও সে সময় উপস্থিত ছিলেন। তিনি দাঁড়িয়ে বললেন, আমীরুল মুমিনীন ! কোনো গভর্নর যদি কাউকে আদব

www.bjilibrary.com

শিক্ষার্থে মারে তাহলেও কি আপনি তার মুহাসিবা করবেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আল্লাহর কসম ! আমি তাকেও শাস্তিদান করবো। কেননা আমি স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এমন করতে দেখেছি। সাবধান ! মুসলমানদের মেরো না। তাহলে তারা অপদস্থ হবে। তাদের অধিকার নষ্ট করো না। তাহলে তারা নিয়ামতের অস্বীকৃতি জানাবে।

একবার যথারীতি সকল গভর্নর উপস্থিত ছিলেন। এক মিসরী উঠে অভিযোগ করলো যে, গভর্নর বিনা অপরাধে আমাকে একশ' দোররা মেরেছেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মিসরীকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমিও কি কিসাস হিসেবে একশ' দোররা মারতে চাও ? সে বললো, অবশ্যই। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তুমি সাধারণ্যে গভর্নরকে একশ' দোররা মারতে পারো।

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনুল আস আরজ করলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন ! এ কাজ গভর্নররা খুব কঠিন বলে বিবেচনা করবে এবং ভবিষ্যতের জন্য এটা একটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। এভাবে দেশের আইন-শৃংখলা বিধান মুশকিল হয়ে পড়বে।

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "ফরিয়াদকারীর ফরিয়াদের বিহিত করবো না ; এটা হতে পারে না।"

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনুল আস ফরিয়াদকারীকে এ শর্তে রাজী করালেন যে, সে প্রতি দোররার পরিবর্তে একটি করে আশরাফী নেবে এবং অভিযোগ প্রত্যাহার করে কিসাসের দাবী ছেড়ে দেবে।

একবার হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এ মর্মে অভিযোগ গেলো যে, হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পুত্র মুহাম্মদ বিন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ঘোড়া দৌড়ের মাঠে এক মিসরীকে এ বলে প্রহার করেছে যে, সে শরীফদের পুত্রদের মুখে মুখে কথা বলে। অন্য এক রাওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, একজন সম্ভ্রান্ত পিতার পুত্র উপরিউক্ত কথা বলে দোররা মেরেছিলো।

হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু অভিযোগকারীকে নিজের কাছে রাখলেন এবং হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও মুহাম্মদ বিন আমরকে মিসর থেকে ডেকে পাঠালেন। তাঁরা হাজির হলে হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু মিসরীকে ডেকে হাতে দোররা দিলেন এবং বললেন, "এ দোররা দিয়ে সম্ভ্রান্ত পিতার পুত্রের খবর নাও।" মিসরী মুহাম্মদ বিন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ওপর দোররা বর্ষণ শুরু করলো। এ সময় হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু

www.bjilibrary.com

আনহু অব্যাহতভাবে বলতে লাগলেন, "হ্যাঁ ! সম্ভ্রান্ত পিতার পুত্রকে বেত্রাঘাত করো।"

মারা শেষ হলে যখন সে দোররা হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুকে ফিরিয়ে দিচ্ছিলো তখন তিনি হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন ঃ "দু' একটি বেত তার ওপরও বর্ষণ করো। কেননা তার ক্ষমতার কারণেই তার পুত্র তোমাকে বেত্রাঘাতের সাহস পেয়েছে।"

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস আরজ করলেন, আমীরুল মু'মিনীন ! ইনসাফের হক আদায় হয়ে গেছে।"

মিসরীও বললো, "আমীরুল মু'মিনীন ! আমার ওপর যে ব্যক্তি যুলুম করেছিলো তার প্রতিশোধ আমি নিয়ে নিয়েছি। এর চেয়ে বেশী আর আমার প্রয়োজন নেই।"

হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ্ আনহু বললেন ঃ তোমার ইচ্ছা। নচেৎ তুমি যদি তাকে মারতে চাইতে, তাহলে আমি তোমাকে বাধা দিতাম না।"

এরপর তিনি হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ্ আনহু ইবনুল আস এবং তাঁর পুত্র উভয়কেই সম্বোধন করে বললেন ঃ

"তোমরা তাদেরকে কবে থেকে গোলাম বানিয়ে নিয়েছো। প্রকৃতপক্ষে তাদের মায়েরা তাদেরকে স্বাধীন হিসেবে জন্ম দিয়েছিলো।"

মিসরে অবস্থানরত হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ্ আনহুর পুত্র হযরত আবদুর রহমান একবার মদ পান করার মতো পদস্খলন করে বসলেন। সম্বিত ফিরে পেয়ে খুব লজ্জিত হলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর খিদমতে উপস্থিত হয়ে নিজের গোনার কথা স্বীকার করলেন এবং তাঁর ওপর হদ জারীর আবেদন জানালেন। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ্ আনহু ইবনুল আস তাঁকে খুব করে তিরস্কার করলেন এবং প্রসঙ্গটি এড়িয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু তিনি তাঁর শাস্তি বিধানের জন্য জিদ করতে লাগলেন। এমনকি তিনি এও বললেন যে, শাস্তি দেয়া না হলে তিনি আমীরুল মু'মিনীন রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে (নিজের পিতা) অভিযোগ করবেন। তাঁর কথা শুনে তিনি ভীত হয়ে পড়লেন। সত্যিই যদি তিনি অভিযোগ করেন, তাহলে আমীরুল মু'মিনীনের ক্রোধ তাঁর ওপর আপতিত হবে। সুতরাং তিনি নিজের বাড়ীর আঙ্গিনায় ডেকে নিয়ে তাঁর ওপর হদ জারী করলেন এবং বাড়ীর এক প্রকোষ্ঠে নিয়ে গিয়ে মস্তক মুণ্ডন করালেন। কোনো মাধ্যমে হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু এ ঘটনার খবর পেয়ে তাঁকে ক্রোধসম্বলিত এ পত্র প্রেরণ করলেন ঃ

www.bjilibrary.com

"আমীরুল মু'মিনীন আবদুল্লাহ্ ওমরের তরফ থেকে আস বিন আসির নামে—হে ইবনে আসেম ! তোমার সাহস এবং প্রতিশ্রুতি পালন না করার ব্যাপারে আমি আশ্চর্য হচ্ছি। আমি মনে করি তুমি বরখাস্ত বা অপাসরণের যোগ্য শাস্তি প্রাপ্তির কাজ করেছো। তুমি আবদুর রহমানের ওপর নিজের বাড়ীর অভ্যন্তরে হত জারী এবং সেখানেই তার মস্তক মুণ্ডন করেছ। অথচ তুমি ভালোভাবেই জানো যে, এ ধরনের সুবিধা প্রদান আমার নীতি বিরোধী। আবদুর রহমান তোমার অধীনস্ত এক ব্যক্তি ছিলো। এজন্য অন্যের সাথে যে ব্যবহার কর সেই ব্যবহারেই তার সাথে করাও তোমার জন্য প্রয়োজন ছিলো। কিন্তু আমীরুল মু'মিনীনের পুত্র হওয়ার কারণে তাকে তুমি সুবিধা দিয়েছো। তুমি অবহিত আছ যে, হকের প্রশ্নে আমি কাউকে কোনো খাতির করি না। এখন আমি তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছি যে, আমার পত্র প্রাপ্তির পরই কষ্টকর ছোট হাওদাজে চড়িয়ে তাকে মদীনা পাঠিয়ে দেবে। যাতে আমি তাকে যথাযথ শাস্তি দিতে পারি।"

আমি এ পত্রের জবাবে একটি পত্র লিখলাম। তাতে আমি আমার ভুল স্বীকার করলাম এবং আমীরুল মু'মিনীনের কাছে ক্ষমা চাইলাম। এ পত্র আমি হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর রাদিয়াল্লাহ্ আনহুর হাতে প্রেরণ করলাম এবং তার সাথেই আবদুর রহমানকে রাদিয়াল্লাহ্ আন রওয়ানা করলাম।

বস্তুত আমিরুল মু'মিনীন রাদিয়াল্লাহ্ আনহুর নির্দেশ মুতাবিক আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহ্ আনহুকে শুধু মাত্র কাঠির ওপর বসিয়ে পাঠানো হয়েছিলো। এজন্যে মদীনা পৌছতে পৌছতে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। হযরত আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহ্ আন বিন আওফ সুপারিশ করে বললেন যে, আমীরুল মু'মিনীন ! অর ওপর হদ জারী হয়ে গেছে। এখন তাকে অতিরিক্ত শাস্তি দিবেন না। কিন্তু হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ্ আনহু তাঁর সুপারিশ মানলেন না এবং আদব শিক্ষার্থে তাকে শাস্তি দিলেন এবং কিছুদিনের জন্য তাকে জেলখানাতেও রাখলেন। মুহাম্মদ হুসাইন হাইকাল "আল ফারুকে ওমর" গ্রন্থে লিখেছেন যে, এ শাস্তির কারণে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ইন্তেকাল করেন। কিন্তু অন্য এক মতে জানা যায় যে, ৩ মাস গ্রেফতার থাকার পর আবদুর হরমান রাদিয়াল্লাহ্ আনহু সুস্থ হয়ে উঠেন। এরপর পুনরায় অসুস্থ হন এবং মারা যান।

মিসরের গভর্নর থাকাকালে হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ্ আনহু ইবনুল আসের বড় কৃতিত্ব হলো "নহরে আমীরুল মু'মিনীন" নির্মাণ। এ নহরের মাধ্যমে নীল নদকে লোহিত সাগরের সাথে সংযুক্ত করা হয়। এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস হলো, ২১ হিজরীতে মদীনা মুনাওয়ারা এবং তার উপকণ্ঠে প্রচণ্ড খরায় কিয়ামতের মত অবস্থা সৃষ্টি হয়। যেসব নদী-নালা মদীনার ক্ষেত-খামার শস্য-শ্যামল

www.bjilibrary.com

মাঠে রূপান্তর করতো তা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। ব্যবসায়ীরা মদীনা আগমন বন্ধ করে দেয়। মানুষ এবং গবাদি পশু শুকিয়ে জরাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। বাজারে খাদ্য দ্রব্য পাওয়া যেতো না। পাওয়া গেলেও ছিলো অগ্নিমূল্য। ক্ষুধা কাতর ৬০ হাজার বেদুঈন মরুভূমি থেকে বের হয়ে মদীনা ঘেরাও করে। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু এ দুর্ভিক্ষ আয়ত্বে আনার জন্য ইরাক, সিরিয়া এবং মিসরের গভর্নরদের কাছে সাহায্য চাইলেন। সিরিয়ার গভর্নর আমীর মুয়াবিয়া খাদ্য বোঝাই তিন হাজার উট প্রেরণ করলেন। এতে প্রচুর কাপড়ও ছিলো। কুফার গভর্নর দু' হাজার উট পাঠালেন। এমনিভাবে হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস উটের এক বিরাট কাফেলা খাদ্য ও কাপড় বোঝাই করে পাঠিয়ে ছিলেন। বস্তুত মিসর থেকে স্থল পথের রাস্তা ছিলো অনেক দূর। এজন্য খাদ্য পৌঁছতে বিলম্ব ঘটলো। ফলে হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসকে এ পত্র লিখলেন ঃ

"আবদুল্লাহ ওমর আমীরুল মু'মিনীনের কাছ থেকে আমর ইবনুল আসের প্রতি সালামুন আলাইকা—আমার জীবনের শপথ আমর। যদি তোমার এবং তোমার সাথীদের উদর পূর্ণ থাকে এবং আমি ও আমার সাথীরা ভূখা থাকি তাহলেও কি পরওয়া করবে না—আল মদদ আল মদদ।"

অন্য এক রাওয়ায়েত অনুযায়ী এ চিঠির বাক্য এমন ছিলো ঃ "মদদ, মদদ। আরবদের মদদ। উটের কাফেলার অগ্রভাগ থাকবে আমার কাছে। আর পশ্চাদভাগ থাকবে তোমার কাছে। উট বা কাপড়ে আটা ভরে আমার কাছে পাঠাও।"

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস পত্রের জবাব এভাবে দিলেন ঃ

"লাব্বাইকা ইয়া আমীরুল মু'মিনীন। শীঘ্রই আপনার কাছে খাদ্য বোঝাই উটের এতবড় কাফেলা পৌঁছাব যার অগ্রভাগ থাকবে আপনার কাছে এবং পশ্চাৎভাগ আমার কাছে—আমি আশা করি, এমন পথ বেড়িয়ে আসবে, যে আপনার কাছে সমুদ্র পথে খাদ্য প্রেরণ করতে পারবো।"

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর সমুদ্র পথের কথা জানতে পেরে হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু খুব খুশী হলেন। কিন্তু কিছুদিন পর তিনি হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসের আরেকটি পত্র পেলেন। এতে তিনি জানালেন যে, সমুদ্র পথ চালু করা একদিকে যেমন কঠিন তেমনি ব্যয়বহুলও। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অসম্ভব। এ পত্র পাঠে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ক্রোধান্বিত হলেন এবং হযরত আমরকে রাদিয়াল্লাহ আনহু লিখলেন ঃ

www.bjilibrary.com

"নীল নদ থেকে সমুদ্র পর্যন্ত খনন কাজ চালাও। এতে যদি মিসরের সকল রাজস্ব ব্যয় করতে হয় তাহলে তাই করো।"

আল্লামা সুয়ূতী (র) "হাসানুল মাহাজিরাহ" গ্রন্থে লিখেছেন, এ প্রসঙ্গে হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মদীনায় তলব করলেন। যখন তিনি এলেন তখন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "যদি একটি খাল খনন করে নীল নদকে সমুদ্রের সাথে যুক্ত করে দেয়া যায়, তাহলে মক্কা ও মদীনায় সহজে খাদ্য শস্য আনা সম্ভব হবে এবং আরবে দুর্ভিক্ষ ও দুর্মূল্যের আশংকা থাকবে না। এছাড়া স্থল পথে খাদ্য শস্য প্রেরণ খুব কঠিন ব্যাপার।" হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনুল আস মিসর ফিরে গিয়ে অবিলম্বে কাজ শুরু করে দিলেন এবং ফুসতাতের সন্নিকটে নীল নদ থেকে লোহিত সাগর পর্যন্ত প্রায় ৬৯ মাইল লম্বা নদী ৬ মাসের মধ্যে খনন করালেন। জাহাজ এ নহর দিয়ে নীল নদ হয়ে লোহিত সাগরে এসে পৌছতো এবং সেখান থেকে জেদ্দা নোঙ্গর করতো। এ নহর "নহরে আমীরুল মু'মিনীন" নামে খ্যাত হয় এবং বহুদিন তা প্রবাহিত ছিলো। এ নহরের কারণে মিসর এবং মদীনায় খাদ্য শস্যের মূল্য একই ধরনের থাকতো। তাছাড়া বাণিজ্যে মিসরের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। অনেক বছর পর শাসকদের গাফিলতির কারণে এ নহর বন্ধ হয়ে যায়।

আল্লামা শিবলী নোমানী (র) "আল ফারুক" গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

"এটা এক আশ্চর্য ব্যাপার যে, আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনুল আস রোম সাগর এবং লোহিত সাগরের মধ্যে সরাসরি সংযোগ স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। বস্তুত এজন্য তিনি স্থানেরও প্রস্তাব করেছিলেন। ফারমার কাছে রোম সাগর এবং লোহিত সাগরের মধ্যে দূরত্ব ছিলো মাত্র ৭০ মাইল। এ স্থানে তিনি খাল খনন করে দু' সাগরকে সংযুক্ত করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু একথা জানতে পেরে অনীহা প্রকাশ করেন এবং এ কাজ হলে গ্রীক জাহাজ এসে হাজীদের উঠিয়ে নিয়ে যাবে বলে লিখে পাঠালেন। আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনুল আস যদি অনুমতি পেতেন তাহলে সুয়েজ খাল আবিষ্কারের গৌরব প্রকৃতপক্ষে আরবদের ভাগ্যেই জুটতো।

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনুল আস মিসরের গভর্নরীর দায়িত্ব অত্যন্ত সুন্দরভাবে পালন করেন। তখন মিসর ছিলো সচ্ছল এবং সেখানকার জনগণও তাঁর প্রতি খুব খুশী ছিলো। অবশ্যই মিসরের উৎপাদিত ফসল, সম্পদ এবং সচ্ছলতার তুলনায় রাজস্ব কম আদায় হতো বলে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সন্দেহ পোষণ করতেন। সুতরাং এ প্রসঙ্গে তিনি হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে কয়েকটি কড়া পত্র প্রেরণ করেন। এসব পত্রের ভাষা তাঁর

www.bjilibrary.com

কাছে অসহ্য বলে মনে হলো এবং তিনিও তার জবাব কঠিন ভাষাতেই দিলেন। জবাবী পত্রে তিনি কম রাজস্ব প্রাপ্তির কারণসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করলেন এবং মিসরের ইমারত থেকে তাঁকে বরখাস্তের জন্য আমীরুল মু'মিনীনের কাছে দরখাস্ত করলেন। কিন্তু আমীরুল মু'মিনীন তার দরখাস্ত মঞ্জুর করেননি। অবশ্য খেলাফতের শেষ পর্যায়ে তিনি মিসরের একটি ক্ষুদ্র অংশ 'সাঈদে মিসরে' আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন সাদ বিন আবি সারাহকে গভর্নর নিয়োগ করেন। এ সত্ত্বেও মিসরের বৃহৎ অংশের ইমারতের দায়িত্ব হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর ওপরই অর্পিত ছিলো।

একবার হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসকে এ পত্র লিখলেন ঃ

"আমি জানতে পেরেছি যে, তোমার কাছে উট, বকরী, গরু, ঘোড়া এবং গোলাম রয়েছে। গভর্নরীর আগে এসব তোমার ছিলো না এবং এজন্যে তোমাকে অর্থও দেয়া হয়নি। এরপরও এ সম্পদ তোমার কাছে কোত্থেকে এলো। আমার কাছে তোমার চেয়ে উত্তম মুহাজির ছিলো, যাদেরকে আমি গভর্নর নিয়োগ করতে পারতাম। কিন্তু এ পদ যদি তোমার লাভ এবং আমাদের ক্ষতির জন্য হয়, তাহলে তোমাকে কেন অগ্রাধিকার দেয়া হবে ? এ সম্পদ তোমার কাছে কোত্থেকে এসেছে তা শীঘ্র লিখে জানাও।" হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আন ইবনুল আস সে পত্রের এ জবাব দিলেন ঃ

"আমীরুল মু'মিনীন ! আপনি আমার সম্পদ সম্পর্কে যা লিখেছেন তা ঠিক। এখানে জিনিসপত্র সস্তা এবং প্রায়ই লড়াই হয়ে থাকে (যা থেকে গনিমাতের মাল অব্যাহতভাবে প্রাপ্তি ঘটে)। বস্তুত অনুমিত অর্থ দিয়ে আমি এ সামান ক্রয় করেছি। যদি আপনার খেয়ানত বৈধও হতো, তাহলেও আমি খেয়ানত করতাম না। কেননা আপনি আমার ওপর আস্থা এনেছেন। রইলো আপনার সেই কথা। আপনি বলেছেন যে, আপনার কাছে আমার চেয়ে উত্তম মুহাজির ছিলো। তাহলে আপনি এ পদ তাদেরকে কেন দেননি। আমিতো এজন্য আপনার দরজা খট খটাইনি বা কখনো ধরণা দেইনি।"

হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু এ জবাবে সন্তুষ্ট হলেন না। হযরত মুহাম্মদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন মাসলামা আনসারীকে তিনি এক ফরমানসহ হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসের কাছে মিসর প্রেরণ করলেন। ফরমানে নির্দেশ ছিলো যে, তোমার সমগ্র সম্পদ তার সামনে রাখবে। সে তার অর্ধেক (অন্য রাওয়ায়েতে যতটুকু ঠিক মনে করবে) বাইতুল মালের জন্য নিয়ে নেবে।

www.bjilibrary.com

এ ব্যবস্থায় হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস খুব দুঃখিত হলেন ঠিকই কিন্তু আমীরুল মু'মিনীনের নির্দেশ পালন করলেন এবং সমগ্র সম্পদ হযরত মুহাম্মদ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন মাসলামার সামনে পেশ করে দিলেন। তিনি তা থেকে অর্ধেক নিয়ে নিলেন (অথবা কিছু) এবং বাকী অংশ ফেরত দিলেন।-[ইছাবাহ, কানযুল আ'মাল ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর সরকারী পত্রাবলী।]

অনেক সাহাবা কেরাম রাদিয়াল্লাহ আনহুম মিসরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছিলেন। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস তাদেরকে সীমাহীন সম্মান করতেন এবং তাদের কঠিন কঠিন কথাও অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে বরদাশত করতেন। কোনো সময় যদি কোনো সাহাবী আইন বিরোধী কাজ করে বসতেন তাহলে তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে আমীরুল মু'মিনীনের কাছ থেকে অবশ্যই অনুমতি নিতেন। একবার হযরত শুরাইক বিন ছুমাই রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁর কাছে এলেন এবং চাষাবাদ করার অনুমতি চাইলেন। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস বললেন, আপনি সরকারের কাছ থেকে বৃত্তি পেয়ে থাকেন প্রয়োজনের সময় কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করাই আপনার কাজ। আপনার চাষাবাদ করার অনুমতি নেই। হযরত শুরাইক রাদিয়াল্লাহ আনহু নিষেধ সত্ত্বেও চাষাবাদ শুরু করলেন। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস অভিযোগ লিখে আমীরুল মু'মিনীনের কাছে প্রেরণ করলেন। তিনি হযরত শুরাইক রাদিয়াল্লাহ আনহুকে মদীনা ডেকে পাঠালেন। তিনি এলে বললেন ঃ "আমি তোমাকে এমন শাস্তি দিবো যে, যাতে মিসরের মানুষ শিক্ষাগ্রহণ করে।"

হযরত শুরাইক রাদিয়াল্লাহ আনহু নিজের কাজের জন্য দুঃখ ও লজ্জা প্রকাশ করলেন এবং ক্ষমা চাইলেন। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে লিখলেন ঃ শুরাইক বিন ছুমাই আমার কাছে এসে কৃত কাজের জন্য লজ্জা প্রকাশ এবং ক্ষমা প্রার্থনা করেছে। আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি।

একবার সাহাবী হযরত গারফা রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন হারেস মিসরের এক রইস জিম্মীকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। সে দাওয়াত কবুল করার পরিবর্তে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শানে অবমাননাকর কথা বললো। হযরত গারফা রাদিয়াল্লাহ আনহু ক্রোধ সম্বরণ করতে না পেরে তাকে হত্যা করে বসলেন। বিষয়টি হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসের সামনে পেশ করা হলো। তিনি হযরত গারফা রাদিয়াল্লাহ আনহুকে বললেন, আইন আপনার নিজের হাতে নেয়া ঠিক হয়নি। আমরা

www.bjilibrary.com

জিম্মীদের জান-মালের নিরাপত্তার জামিন রয়েছি। হযরত গারফা রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন, এটা ঠিক কিন্তু কোনো জিম্মীর ইসলাম অথবা আমাদের নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অপমান করার অধিকার নেই। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু চুপ হয়ে গেলেন। এরপর হযরত গারফা রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁর বিরুদ্ধে হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে এক অভিযোগ লিখে পাঠালেন। অভিযোগে তিনি জানালেন, আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস মজলিশে আমাদের সামনে ঠেস দিয়ে বসে। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসকে লিখলেন যে, তুমি নাকি মজলিশে ঠেস দিয়ে বসো। এ অভিযোগ আমার কাছে করা হয়েছে। এটা করো না। অন্যান্য মানুষ যেভাবে বসে সেভাবে তুমিও বসবে।-(ইবনে আসাকির)

প্রখ্যাত চরিতকার ও ঐতিহাসিকরা হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসের মিসরের ইমারতকালের আরো অনেক ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এসব ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু সরকারী কর্মকর্তাদের ওপর কেমন তীক্ষ্ণ ও কঠোর দৃষ্টি রাখতেন। এসব ঘটনা থেকে এটাও প্রতীয়মান হয় যে, হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস সবসময়ই আমীরুল মু'মিনীনের নির্দেশাবলীকে বিনা শব্দে মেনে নিয়েছেন এবং তা অমান্য করার চিন্তা পর্যন্ত করেননি। কোনো ব্যাপারে সন্দেহ হলেই তিনি অবিলম্বে আমীরুল মু'মিনীনকে লিখে পাঠাতেন এবং সেখান থেকে যে নির্দেশ আসতো সে অনুযায়ী কাজ করতেন।

২৪ হিজরীতে হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুর শাহাদাতের পর হযরত ওসমান জুন্নুরাইন রাদিয়াল্লাহ আনহু খলিফা নির্বাচিত হলেন। এ সময় তিনি অবস্থা পর্যালোচনা করে হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে লিখলেন যে, মিসরে উৎপাদিত ফসল এবং সম্পদের তুলনায় খিরাজ বা রাজস্ব কম আদায় হয়। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস জবাবে লিখলেন ঃ

"গাভী এর চেয়ে বেশী দুধ দিতে পারে না।"

এ জবাব প্রাপ্তির পর হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহু রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব তার হাত থেকে নিয়ে হযরত আবদুল্লাহ বিন আবি সারার ওপর ন্যস্ত করলেন এবং কিছুদিন পর হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসকে বরখাস্ত করে আবদুল্লাহ বিন সা'দকে সমগ্র মিসরের স্থায়ী গভর্নর নিয়োগ করলেন। আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন সা'দ রাজস্বের যে পরিমাণ কেন্দ্রে প্রেরণ করলেন, তা হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু প্রেরিত পরিমাণ থেকে কিছু বেশী ছিলো। সুতরাং তিনি যখন মিসর থেকে মদীনা ফিরে এলেন এবং হযরত

www.bjilibrary.com

ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে সাক্ষাত করলেন, তখন আমীরুল মু'মিনীন বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ করলেন। এ সময় উভয় বুযর্গের মধ্যে যে কথোপকথন হয়েছিলো তা ঐতিহাসিক ইয়াকুবী বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেনঃ

হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহু ঃ আবদুল্লাহ বিন সা'দকে কি অবস্থায় রেখে এসেছ ?

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস ঃ আপনি যেভাবে চেয়েছেন।

হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহু ঃ তা কি রকম ?

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ঃ নিজের জন্য শক্তিশালী এবং আল্লাহর জন্য দুর্বল।

হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহু ঃ আমিতো তাকে তোমার কর্মপদ্ধতি অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছিলাম।

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ঃ আপনি তার ওপর তার শক্তির চেয়ে বেশী বোঝা সমর্পণ করেছেন।

হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহু ঃ দেখ, গাভী (অথবা উটনী) বেশী দুধ দিয়েছে (অর্থাৎ আবদুল্লাহ বিন সা'দ বেশী রাজস্ব প্রেরণ করেছে)।

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ঃ কিন্তু বাছুরতো অভুক্ত রয়েছে।

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস মিসর থেকে প্রত্যাবর্তনের পর ইসকান্দারীয়াবাসী রোমের কাইসারের ইঙ্গিতে বিদ্রোহ করে বসলো। হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে এ বিদ্রোহ দমনে নিয়োগ করলেন। কেননা সেখানকার অবস্থা তার চেয়ে বেশী কেউ ওয়াকিবহাল ছিলেন না। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস মিসর পৌঁছে ইসকান্দারিয়ার সাহায্যে আগত কাইসার বাহিনীকে পরাজিত করলেন। কিন্তু এ বাহিনীর এক অংশ ইসকান্দারিয়া দখল করে নিয়েছিলো। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস ইসকান্দারিয়া প্রবেশ করে তাদেরকে বের করে দিলেন। বস্তুত মাকুকাস এবং তার কওম (কিবতী) রোমকদের সহযোগিতা করেনি। এজন্যে রোমকরা পেছনে হটতে হটতে তাদের বসতি লুট করলো। যখন মিসরী বিদ্রোহী এবং হামলাকারী রোমকরা উৎখাত হলো তখন কিবতীরা বিদ্রোহে শরীক না হওয়ার জন্য রোমক ও তাদের সহযোগীরা ধন-সম্পদ লুট করে নিয়েছে বলে হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে ফরিয়াদ এবং তাদের সম্পদ ফিরিয়ে দেয়ার আবেদন জানালো। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস সনাক্ত করিয়ে যাদের সম্পদ ছিলো তাদের ফিরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করলেন।

www.bjilibrary.com

ইবনে আসির (র) বর্ণনা করেছেন, ভবিষ্যত বিদ্রোহের আশংকামুক্ত থাকার জন্য হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস ইসকান্দারিয়ার প্রাচীর ধ্বংস করে দিলেন। বিদ্রোহ দমনের পর আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁকে মিসরের সমর নেতা নিয়োগ করতে চাইলেন। কিন্তু তিনি এ পদ কবুল করার ব্যাপারে ক্ষমা চেয়ে নিলেন।

তাবারী এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক বর্ণনা করেছেন, হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসের বরখাস্তের ঘটনা ইসকান্দারিয়ার বিদ্রোহ দমনের পর ২৬ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিলো। কিন্তু ইমাম সুয়ূতী (র) আল কান্দী লিখেছেন, হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস ইসকান্দারিয়ার বিদ্রোহের আগে ২৫ হিজরীতে বরখাস্ত হয়েছিলেন। হযরত ওসমান গনি রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁকে বিদ্রোহ দমনের জন্য বিশেষভাবে দ্বিতীয়বার মদীনা থেকে মিসর প্রেরণ করেছিলেন। বিদ্রোহ অবসানের পর যখন তাঁকে সমর নেতার পদ পেশ করা হয়, তখন তিনি এই বলে তা প্রত্যাখ্যান করেন ঃ "আমি এটা পসন্দ করি না যে, আমি গাভীর শিং ধরবো আর দুধ অন্যে দোহন করবে।" অর্থাৎ আবদুল্লাহ বিন সা'দ মিসরের গভর্নর থাকবে আর আমি সেখানে দুশমনের মুকাবিলা করবো।

নিসন্দেহে বরখাস্তের ব্যাপারটি হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসের কাছে খুব কঠিন ব্যাপার ছিলো। এ সত্বেও তিনি একে কোনো সমস্যা করে তোলেননি এবং সবসময়ই হযরত ওসমান জুন্নুরাইন রাদিয়াল্লাহ আনহুর শুভ কামনা করেছেন। আমীরুল মু'মিনীনের বিরুদ্ধে বিশৃংখলা শুরু হলো এবং মিসর থেকে বিদ্রোহীরা রওয়ানা দিলো। এ সময় হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহুর ইচ্ছানুযায়ী হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস তাদের কাছে গেলেন এবং বুঝিয়ে শুঝিয়ে ফেরত পাঠালেন। অতপর শহরবাসীদেরকে একত্রিত করে আমীরুল মু'মিনীনের পক্ষ থেকে সাফাই পেশ করলেন।

সাইয়েদেনা হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শক্তিশালী হয়ে উঠলো। তখন তিনি এক পরামর্শ বৈঠক আহ্বান করলেন। এ বৈঠকে হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহুকেও ডাকা হলো। অন্যান্যদের মত প্রদানের পর আমীরুল মু'মিনীন হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে বিশেষভাবে তার মত জিজ্ঞেস করলেন। তিনি আরজ করলেন ঃ

"আমীরুল মু'মিনীন ! এসব ষড়যন্ত্র এবং ফেতনা-ফাসাদের মূল কারণ হলো প্রয়োজনের তুলনায় আপনি বেশী কোমলতা দেখিয়ে থাকেন এবং কঠোরতার সময় দৃষ্টি এড়িয়ে যান। আমার পরামর্শ হলো, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে

www.bjilibrary.com

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর অনুসরণ করুন এবং কঠোরতার সময় কঠোরতা এবং কোমলতার সময় কোমলতার সাথে কাজ করুন।"

বরখাস্তের পর হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস সাধারণত ফিলিস্তিনে থাকতেন। মাঝে মধ্যে মদীনা আসতেন। বিদ্রোহীরা যখন খলীফার বাড়ী অবরোধ করলো তখন তিনি মদীনায় ছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন নিরুপায় এবং আমীরুল মু'মিনীনকে কার্যকর সাহায্য করতে পারছিলেন না। অক্ষমতার তীব্র অনুভূতিসহ তিনি মদীনা থেকে সিরিয়া চলে গেলেন। যাওয়ার সময় বললেন ঃ "যে ব্যক্তি ওসমানের হত্যায় অংশ নেবে আল্লাহ তাকে অপদস্ত করবেন এবং যে ব্যক্তি তাকে সাহায্য করতে অক্ষম তার মদীনা ত্যাগ করা উচিত।"

সিরিয়া গমনের পরও তিনি হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহুর নিরাপত্তার ব্যাপারে খুবই উৎকণ্ঠিত ছিলেন। এজন্যে যারাই সেখান থেকে গমনাগমন করতো তাদের কাছে তাঁর অবস্থার খবর নিতেন। তাঁর শাহাদাতের খবরে তিনি অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন।

হযরত ওসমান গনি রাদিয়াল্লাহ আনহুর খেলাফতকালে তিনি যে একাকিত্ব অবলম্বন করেছিলেন। হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পরও কিছুদিন পর্যন্ত তা অব্যাহত রাখেন এবং উষ্ট্রের যুদ্ধে বলতে গেলে অংশই নেননি।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহুর মধ্যে বিরোধ তুঙ্গে উঠলো। এ সময় আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসকে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁর সহযোগিতা প্রার্থনা করলেন। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁর প্রতি সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে দিলেন। এমনিভাবে আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহু এক মহান সেনা এবং চিন্তানায়কের সমর্থন পেয়ে গেলেন। তিনি নিজেও একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। তবুও হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর পরামর্শ তাঁর সংকট মুকাবিলায় প্রভূত উপকারে এলো। সিফফিনের যুদ্ধ শুরু হলো। আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসকে সেনাপতি নিয়োগ করলেন। যুদ্ধকালে হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন ইয়াসির শাহাদাত বরণ করলেন। তিনি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। তাঁর শাহাদাতের পর দু' ব্যক্তি ঝগড়া করতে করতে আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহুর খেদমতে হাজির হলো। উভয়েই হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহ আনহুর শহীদ করার দাবীদার ছিলো এবং দু'জনই পুরস্কার

www.bjilibrary.com

দাবী করছিলো। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুও এ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন, তিনি হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের খবর শুনে অত্যন্ত দুঃখীত হলেন এবং বললেন ঃ "আল্লাহর কসম ! এ দু'জন জাহান্নামের জন্য ঝগড়া করছে।"

এ কথায় আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি বললেন ঃ "আমর ! তুমি তাদের ব্যাপারে এমন কথা বলছো ? যারা আমাদের জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করছে।"

এ সময় হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, "হায় ! বিশ বছর আগে যদি আমার মৃত্যু হতো।"

আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "আম্মার হত্যার জন্য আমরা দায়ী নই। বরং তারাই দায়ী যারা তাকে যুদ্ধের ময়দানে টেনে এনেছে।" এভাবেই কথা শেষ হলো।

৩৭ হিজরীর ১০ই সফর উভয় বাহিনীর মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হলো। তাবারী (র), ইবনে সায়াদ (র), ইবনে কাসির (র), ইবনে আসির (র) এবং ইবনে খালদুন (র) বর্ণনা করেছেন, সিরীয় বাহিনীর অবস্থা নাজুক পর্যায়ে পৌঁছলো। এ সময় হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরামর্শ মুতাবিক তারা বর্শাগ্রে কুরআন বেঁধে এ নারা লাগালো ঃ "আমাদের এবং তোমাদের মধ্যে এ কুরআনই ফায়সালা দেবে।"

এতে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাহিনী অস্ত্র সম্বরণ করে নিলেন এবং উভয় বাহিনীর মধ্যে সালিসীর ব্যাপারে একমত হলেন। আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষ থেকে হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনুল আস এবং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষ থেকে হযরত আবু মূসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু সালিস মনোনীত হলেন।

এ দু' বুযর্গ ব্যক্তি দাওমাতুল জান্দালে পরস্পর মিলিত হলেন এবং একাকীত্বে এ ব্যাপারে দীর্ঘক্ষণ ধরে আলোচনা করতে লাগলেন। আলোচনার বিষয়বস্তু কি ছিলো এবং দু'জন কি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তা আলিমুল খাবির আল্লাহ পাকই ভালো জানেন। কিন্তু অনেক নেতৃস্থানীয় চরিতকার এ আলোচনাকে কথোপকথনের আকারে এমনভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন যে, এ কথাবার্তা যেন তাদের সামনেই হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সবাই এ কথাও লিখেছেন যে, এ কথাবার্তা নির্জনে হয়েছিলো। কোনো তৃতীয় ব্যক্তি তাদের কাছে উপস্থিত ছিলেন না।

www.bjilibrary.com

যা হোক, যখন উভয় বুযর্গ নির্জনত্ব থেকে বাইরে এলেন তখন হযরত আবু মূসা আশআরী রাদিয়াল্লাহ আনহু মানুষের সামনে এ সিদ্ধান্ত শুনালেন ঃ

"আমি এবং আমার বন্ধু [আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস] চিন্তা-ভাবনা করে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু ও মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহু উভয়ই খেলাফত থেকে পৃথক হয়ে যাবে এবং জনগণ পরামর্শ করে যাকে ইচ্ছা খলীফা নির্বাচন করবেন। এজন্যে আমি আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহুকে বরখাস্ত করছি। এখন আপনারা যাঁকে যোগ্য মনে করেন তাঁকে খলিফা নির্বাচিত করুন।"

হযরত আবু মূসা আশয়ারী রাদিয়াল্লাহ আনহুর পর হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস উঠে দাঁড়িয়ে এ সিদ্ধান্ত শুনালেন ঃ

"আবু মূসা যা বললো, তা আপনারা শুনেছেন। তিনি নিজের মানুষকে [হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু] বরখাস্ত করেছেন আমিও তাকে বরখাস্ত করছি। কিন্তু আমার মানুষ [হযরত মুয়াবিয়া]-কে বহাল রাখছি। কেননা সে ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন আফ্‌ফানের মনোনীত গভর্নর, তাঁর খুনের দাবীদার এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার সবচেয়ে বেশী যোগ্য।"

যেন দু' সালিসের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ পৃথক ছিলো। এভাবে সালিসে কোনো ফল হলো না। যুদ্ধ মূলতবী হয়ে গেলো।

হাফিজ ইবনে কাসির (র) 'আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া' গ্রন্থে হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসের সিদ্ধান্তের এ ব্যাখ্যা দিয়েছেন ঃ

"হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস সেই সময় জনগণকে ইমাম বিহীন অবস্থায় রাখা ঠিক মনে করেননি। কেননা তখন জনগণের মধ্যে যে বিরোধ চলছিলো তাতে তিনি সংশয়ান্বিত ছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন যে, উম্মাতকে ইমাম বিহীন অবস্থায় রাখলে উদ্ভূত সংকটের সমাধান হবে না। এজন্যে মুসলিহাতের ভিত্তিতে তিনি আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহুকে বহাল রাখলেন এবং ইজতেহাদ সঠিকও হয়ে থাকে এবং ভুলও হয়।"

৩৮ হিজরীতে আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহু ৬ হাজার সৈন্যসহ হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসকে মিসর পদানত করার জন্য প্রেরণ করলেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর পক্ষ থেকে মুহাম্মদ বিন আবু বকর রাদিয়াল্লাহ আনহু তখন সেখানকার গভর্নর ছিলেন। মিসর রওয়ানা হওয়ার পূর্বে হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস মুহাম্মদ বিন আবি বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে এ চিঠি লিখলেন ঃ "মিসরবাসী তোমার বিরোধী।

www.bjilibrary.com

এজন্য তুমি আমার মুকাবিলায় সফল হতে পারবে না। আমার বন্ধুত্বপূর্ণ পরামর্শ হলো, তুমি স্বয়ং মিসর ত্যাগ করো। আমি তোমার রক্তে আমার হাত রঞ্জিত করতে চাই না।"

এ চিঠিতে হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস যা লিখেছেন তা বাস্তব ভিত্তিক ছিলো। কেননা মুহাম্মদ বিন আবি বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর বিরুদ্ধে মিসরে ব্যাপক গণঅসন্তোষ ছিলো। সরকার বিরোধী একটি শক্তিশালী দলও সেখানে ছিলো। মাসলামা রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন মুখাল্লাদ এবং মুয়াবিয়া বিন খুদাইজের মত প্রভাবশালী ব্যক্তি এ দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু মুহাম্মদ বিন আবি বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর ওপর এ পত্রের কোনো প্রভাব পড়লো না। তিনি তা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। সেখান থেকে মুকাবিলা করার নির্দেশ এলো। বস্তুত হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস যখন মিসর পৌঁছলেন তখন মুহাম্মদ বিন আবি বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে মুকাবিলার জন্য প্রস্তুত পেলেন। দু' পক্ষের মধ্যে রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হলো। মিসরের খ্যাতনামা বাহাদুর কিনানাহ বিন বাশার হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু বাহিনীর বিরুদ্ধে অকল্পনীয় বাহাদুরী প্রদর্শন করলেন। তিনি যেদিকেই অগ্রসর হলেন সেদিকেই ব্যুহ তছনছ হয়ে গেলো। অবশেষে মুয়াবিয়া বিন খুদাইজ তার সামনাসামনি হলো। বহু সিরীয়বাসী তাকে সহযোগিতা করলো এবং কিনানাকে ঘিরে ফেলে হত্যা করলো। এরপরই মুহাম্মদ বিন আবি বকর রাদিয়াল্লাহ আনহুর বাহিনীর পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেলো। মুহাম্মদ উধাও হয়ে গেলেন। কিন্তু সিরীয় এবং তাদের মিসরীয় সমর্থকরা খুঁজে বের করে তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যা করলো। এভাবে হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস মিসর করায়ত্ব করলেন। কয়েকটি শর্তের ভিত্তিতে আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁকে মিসরের গভর্নর নিযুক্ত করলেন। আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহুর প্রতি তিনি আজীবন অনুগত থাকবেন, এটি ছিলো অন্যতম শর্ত।

ওদিকে নাহরওয়ানে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু খারেজীদের পরাস্ত করলেন। পরাজিত খারেজীরা সিদ্ধান্ত নিলো যে, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু, হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস তিনজনকেই শহীদ করে ফেলতে হবে। যাতে সকল বিবাদের পরিসমাপ্তি ঘটে। পরিকল্পিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইবনে মালজাম হযরত আলী রাদিয়াল্লাহ আনহুর ওপর হামলা করলো এবং তিনি শহীদ হয়ে গেলেন। বারক বিন আবদুল্লাহ আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহুর ওপর হামলা করলো। কিন্তু তরবারীর কোপ ব্যর্থ হলো এবং তিনি বেঁচে গেলেন। আমর বিন বিকর

www.bjilibrary.com

তামিমী হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসকে হত্যা করতে গেলো। কিন্তু ঘটনাক্রমে সেদিন তাঁর শরীর অসুস্থ ছিলো। এজন্যে তিনি নিজের পরিবর্তে খারেজা রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন হুজাফাহকে নামায পড়ানোর জন্য প্রেরণ করলেন। আমর বিন বিকর হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস মনে করে খারেজাহ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে হত্যা করে বসলো।

আমীর মুয়াবিয়ার পক্ষ থেকে হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস যখন মিসরে গভর্নর নিযুক্ত হন তখন তাঁর বয়স ৮০ বছরের কিছু উর্ধে ছিলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি কয়েক বছর পর্যন্ত দায়িত্ব যথাযথভাবে আঞ্জাম দেন। ভিন্ন মতে ৪৩ অথবা ৪৭ হিজরীতে তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। এমনকি জীবনের আশা আর ছিলো না। সহীহ আল মুসলিমে আবদুর রহমান বিন সামাছাহ মাহরী থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসের মৃত্যু শয্যায় শুশ্রূষার জন্য গিয়েছিলাম। তিনি প্রাচীরের দিকে মুখ করে কাঁদতে লাগলেন। তাঁর পুত্র হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন, আব্বাজান ! আপনি কাঁদছেন কেন ? আপনাকে কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অমুক অমুক সুসংবাদ দেননি ? হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস বললেন ঃ

"আমার কাছে সর্বচেয়ে অমূল্য সম্পদ লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ—এর শাহাদাত রয়েছে। আমার জীবনের তিনটি অধ্যায় অতিক্রান্ত হয়েছে। এক অধ্যায়ে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মারাত্মক শত্রুতা পোষণ করতাম। আমার আন্তরিক আকাংখা ছিলো যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার হাতের কাছে এলেই হত্যা করবো। সে অবস্থায় যদি আমার মৃত্যু হতো তাহলে নিসন্দেহে আমি জাহান্নামী হতাম। অতপর আল্লাহ পাক আমার অন্তরকে ইসলামের দিক ফিরিয়ে দিলেন। আমি ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাজির হলাম এবং আরজ করলাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল ! পবিত্র হাত এগিয়ে দিন। আমি বাইয়াত হবো। তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন কিন্তু আমি আমার হাত পিছিয়ে নিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমর ইবনুল আস ! এটা তুমি কি করলে ? আমি আরজ করলাম, এক শর্তে ইসলাম গ্রহণ করতে পারি। তিনি বললেন, শর্তটি কি ? আমি আরজ করলাম, আমার গুনাহ মাফ হয়ে যাক। তিনি বললেন, হে আমর ! তুমি কি জানো না যে, ইসলাম পূর্বেকৃত সকল গুনাহ মিটিয়ে দেয়। হিজরত ও পূর্বেকৃত সকল গুনাহ অস্তিত্বহীন করে। এমনিভাবে হজ্জও পূর্বেকার সকল গোনাহ ধ্বংস করে দেয়। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

www.bjilibrary.com

আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় বলে পরিগণিত হলো এবং আমার দৃষ্টিতে তাঁর চেয়ে বেশী বুযর্গ বলে আর কেউ রইলো না। আজমত এবং হাইবাতের কারণে তাঁর প্রতি আমি দৃষ্টি তুলে দেখতে পারতাম না। যদি কেউ তাঁর অবয়ব সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করে, তাহলে আমি তা বলতে পারবো না। কেননা আমি কখনো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দৃষ্টি তুলে দেখিনি। যদি এ অবস্থায় মারা যেতাম তাহলে জান্নাতের আশা ছিলো। অতপর জীবনের তৃতীয় অধ্যায় এলো। এ সময় আমি বিভিন্ন ধরনের কাজ করেছি। আমি এখন জানি না যে, আমার কি হাশর হবে। আমার মৃত্যু হলে শোক জ্ঞাপনকারী মহিলারা যেন আমার জানাযার সাথে গমন না করে। জানাযার পেছনে আগুনও যেন না যায়। দাফনের সময় আস্তে আস্তে মাটি নিক্ষেপ করো। দাফনের পর তত সময় কবরের পাশে থাকবে যত সময় পশু যবেহ করে তার গোশত বণ্টন করা হয়। যাতে আমি তোমাদের কারণে সেখানে অন্তরঙ্গ হতে পারি এবং স্রষ্টার দূতদের কি জবাব দিব তা নিরূপণ করে নিতে পারি।"

ইবনে সায়াদ (র) বর্ণনা করেছেন, মৃত্যুর পূর্বে তিনি নিজের গার্ড বাহিনীকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি তোমাদের কেমন সাথী ছিলাম ? জবাব এলো আপনি আমাদের প্রতি স্নেহশীল ছিলেন। আমাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতেন। আমাদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করতেন এবং আমাদেরকে অন্তর খুলে পুরস্কার দিতেন।

বললেন, আমি এ ধরনের ব্যবহার এজন্যে করতাম যে, তোমরা আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবে। এখন মৃত্যু আমার সামনে সমুপস্থিত। তাঁকে এখান থেকে দূর করো। তারা ঘাবড়ে গিয়ে বললো, হে আবা আবদুল্লাহ ! আপনি এটা কি বলছেন ? মৃত্যুর ওপরেও কি কারো কোনো শক্তি চলে ? হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনুল আস বললেন, আমি জানি যে, মৃত্যুর বিরুদ্ধে তোমরা আমাকে কোনো সাহায্য করতে পারবে না। হায় ! আমার হেফাজতের জন্য যদি তোমাদেরকে না রাখতাম। আফসোস ! আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বিন আবি তালিব ঠিকই বলতেন। মানুষের মৃত্যু স্বয়ং তার রক্ষক। অতপর বিনয়াবনত হলেন এবং মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো ঃ "হে আল্লাহ ! আমি ক্ষমা চাইবার অধিকারী নই। শক্তিশালীও নই যে, বিজয়ী হবো। তুমি যদি তোমার রহমত বর্ষণ না করো, তাহলে আমার ধ্বংস অনিবার্য।"

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনুল আস জীবিতাবস্থায় আশ্চর্য প্রকাশ করে বলতেন যে, মৃত্যুর সময় কিছু লোকের সম্পূর্ণ হুঁশ থাকে। কিন্তু তারা মৃত্যুর তাৎপর্য বা হাকিকত বর্ণনা করতে পারে না। মুমূর্ষ অবস্থায় তাঁর পুত্র বললো, আব্বাজান ! জ্ঞান এবং হুঁশ তো আপনার পুরোপুরিই রয়েছে। মৃত্যুর

www.bjilibrary.com

অবস্থাটা একটু বর্ণনা করুন না। তিনি বললেন, পুত্র ! সে অবস্থা বর্ণনাতীত ব্যাপার। আমি শুধু এটুকুই অনুভব করছি যে, রিজভী পাহাড় যেন আমার গর্দানের ওপর ভেঙ্গে পড়ছে। আমার অন্ত্রগুলো যেন খেজুর বৃক্ষের কাটার ওপর ঘষা হচ্ছে এবং আমার জীবন সূচের ঘাত দিয়ে বের হচ্ছে।-(তাবকাতে ইবনে সায়াদ)

এরপর পুত্রকে ওসিয়ত করে বললেন, যখন আমার প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাবে, তখন প্রথম সাধারণ পানি দিয়ে গোসল করাবে এবং কাপড় দিয়ে দেহকে মুছে দেবে। অতপর তাজা এবং পরিষ্কার পানি দিয়ে গোসল করাবে। এরপর তৃতীয়বার কর্পূর মিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল দেবে। তারপর কাপড় দিয়ে মুছে দেহ শুকিয়ে নেবে। কাফনের সময় ইজার এঁটে বাঁধবে। জানাযা দ্রুত নেবে না এবং ধীরেও নয়। জানাযার পেছনে পেছনে মানুষ রাখবে। জানাযার সামনে ফেরেশতা গমন করে এবং মানুষ পেছনে যায়। লাশ করবে রাখার পর আস্তে আস্তে মাটি দেবে—অতপর তিনি এ দোয়ায় মশগুল হয়ে গেলেন, হে আল্লাহ ! তুমি হুকুম দিয়েছিলে—আমি তা মানতে পারিনি। তুমি নিষেধ করেছিলে, আমি তার নাফরমানী করেছি। সাহস নেই যে, ক্ষমা চাইবো—শক্তিশালী নই যে, বিজয়ী হয়ে যাবো। হ্যাঁ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ—লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ একথা বলতে বলতে শেষ হিচকী নিলেন এবং চিরকালের জন্য চুপ হয়ে গেলেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

ইবনে আসির (র) বর্ণনা করেছেন যে, ৪৩ হিজরীর প্রথম শাওয়াল ঈদুল ফিতরের নামাযের পর তাঁর পুত্র নামাযে জানাযা পড়ালেন এবং ইসলামের এ মহান ব্যক্তিত্বকে মুকাততাম পাহাড়ের পাশে দাফন করলেন।

মৃত্যুর সময় হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনুল আসের বয়স প্রায় ৯০ বছর ছিলো। মৃত্যুকালে তিনি আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং মুহাম্মদ (র) নামক দু' পুত্র রেখে যান। হযরত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ আনহু একজন অত্যন্ত উঁচু মর্যাদার সাহাবী হিসেবে পরিগণিত। তিনি নিজের পিতার অনেক আগেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং একজন বড় আবেদ ও জাহেদ ছিলেন।

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসের জীবনের বেশীর ভাগ সময় যুদ্ধের ময়দানে কেটেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। আম্মারের ইমারাতের দায়িত্ব পালন করেছেন। অতপর ধর্মদ্রোহীদের উৎখাতে পুরোপুরি অংশ নেন। ফিলিস্তিন ও সিরিয়ার যুদ্ধে জীবন বাজী রেখে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন। মিসর এবং ত্রিপোলী জয় করেন। এসব যুদ্ধ শেষে মিসরের গভর্নরের দায়িত্ব আঞ্জাম দেন। এতসব ব্যস্ততা সত্বেও

www.bjilibrary.com

তিনি দীনি ইলমে পূর্ণ ছিলেন। নবুয়াতের প্রস্রবণ থেকে যতটুকু সম্ভব অবগাহন করেছিলেন। প্রকৃতিগতভাবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধীর এবং মেধা সম্পন্ন। এজন্য ইলম ও ফযীলাতের দিক থেকেও তিনি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী ছিলেন।

হাফিজ ইবনে হাজার রাদিয়াল্লাহ আনহু "আল ইসাবাহ" গ্রন্থে লিখেছেন, কুরআন পাঠে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিলো। তিনি অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে কুরআন পাঠ করতেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইরশাদসমূহ অত্যন্ত আগ্রহের সাথে শ্রবণ করতেন। তাঁর থেকে ৩৯টি হাদীস বর্ণিত আছে। এর মধ্যে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম তিনটি হাদীসে ঐকমত্য পোষণ করেন। একটি হাদীস সম্পর্কে ইমাম বুখারী এবং তিনটিতে ইমাম মুসলিম ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁর হাদীস বর্ণনাকারী, শিষ্য এবং উপকৃতদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু (পুত্র), আবু কায়েস (গোলাম), উরওয়াহ বিন জুবায়ের রাদিয়াল্লাহ আনহু, আবু ওসমান নাহদী (র), আবদুর রহমান বিন সামাছা মাহরী (র), আম্মারা বিন শামাছা মাহরী (র), আম্মারা বিন খুজাইমা রাদিয়াল্লাহ আনহু, মুহাম্মাদ বিন কায়াব (র), আলী বিন রাবাহ (র) এবং কায়েস বিন আবি হাজেম রাদিয়াল্লাহ আনহুর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যাকিছু শুনেছেন এবং যাকিছু করতে দেখেছেন তা মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। তিনি উসওয়ায়ে হাসানা বা উত্তম আদর্শের ওপর চলা এবং বিদআত থেকে দূরে থাকার জন্য জনগণকে উপদেশ দিতেন।

জাতুস সালাসিল বা শিকলের যুদ্ধে বিজয় লাভের পর তিনি সেখানে কিছুদিন অবস্থান করেন ও মুসলিমদেরকে শিক্ষা দেন। আম্মানেও দু' বছর পর্যন্ত এ কাজ অব্যাহত রাখেন। জনগণের মধ্যে তিনি বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণার আধিক্য দেখে দুঃখিত হতেন। জনগণের মধ্যে তিনি প্রায়ই খুতবাহ দিতেন এবং তাদেরকে সুন্নাত অনুসরণের হেদায়াত করতেন। আলী বিন রাবাহ লাখমী একবার তাঁকে এ খুতবাহ দিতে শুনেছেন ঃ

"হে মানুষেরা ! তোমাদের এ অবস্থা কেন। তোমরা আখিরাত থেকে গাফিল হয়ে দুনিয়া তালাশে ব্যাপৃত হয়ে পড়েছো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেসব বস্তু পরহেয করতেন তোমরা সেদিকে আকৃষ্ট হচ্ছো। অথচ তোমরা অবগত আছো যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়া অর্জনে বা বস্তুগত ফায়দা লাভে কিভাবে দূরে থাকতেন।"

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতী "তারিখুল খুলাফা" গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুর শাসনকালে হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল

www.bjilibrary.com

আস মিসরের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। এ সময় একদিন বহুসংখ্যক মিসরী তাঁর খিদমতে হাজির হয়ে বললেন, আমাদের চাষাবাদ নীল নদের পানির ওপর নির্ভরশীল। নীল নদ শুকিয়ে গেলে তাতে পানি প্রবাহের জন্য আমরা একটি রসম পালন করে থাকি। আর এ রসম প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে।

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনুল আস জিজ্ঞেস করলেন, রসমটি কি ? তারা জবাব দিলেন ঃ "আমরা চাঁদের ১১ তারিখে (অন্য রাওয়ায়েত অনুযায়ী প্রতি বছর ১২ই জুন) একটি কুমারী কন্যা ঠিক করি এবং মাতা-পিতার সম্মতিতে তাকে মূল্যবান গহনা ও কাপড় পরিধান করাই। অতপর তাকে নীল নদীতে উৎসর্গ করি। এভাবে নদীতে পানি বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে নদীতে পানি খুব কমে গেছে। এজন্য আপনি আমাদেরকে এ পুরনো রসম পালনের অনুমতি দিন।"

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনুল আস বললেন ঃ "তোমরা যাকিছু বললে, তা কল্পনাপ্রসূত ব্যাপার। এসব কল্পনা এবং বাতিল কাজ নির্মূলের জন্যই ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছে। আমি তোমাদেরকে কোনো নিষ্পাপ বালিকার ওপর এ ধরনের যুলুম অবশ্যই করতে দিবো না।"

মিসরীরা নিরাশ হয়ে চলে গেলো। ঘটনাক্রমে নীল নদে পানি সম্পূর্ণরূপে কমে গেলো এবং অনেক মানুষ দুর্ভিক্ষের আশংকায় দেশ ত্যাগের প্রস্তুতি নিতে লাগলো।

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনুল আছ এ অবস্থার কথা আমীরুল মু'মিনিন হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জানালে তিনি লিখলেন ঃ

"আলহামদুলিল্লাহ ! তুমি মিসরীদেরকে সঠিক জবাব দিয়েছো। প্রকৃত-পক্ষে এ ধরনের বাতিল রসম রেওয়াজ নির্মূলের জন্যই ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছে। আমি এ পত্রের সাথে একটি চিরকুট প্রেরণ করছি। তা নীল নদে নিক্ষেপ করবে।"

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনুল আস এ পত্র পেলেন। চিরকুট নীল নদীতে নিক্ষেপের পূর্বে তা খুলে তার বিবরণ পাঠ করলেন। তাতে লেখা ছিলোঃ "আল্লাহর বান্দা আমীরুল মু'মিনীনের পক্ষ থেকে—নীল নদের জানা উচিত যে, সে যদি নিজের ইচ্ছায় প্রবাহিত হয়ে থাকে, তাহলে থেমে যাও। আর যদি আল্লাহর নির্দেশে প্রবাহিত হও, তাহলে আল্লাহর কাছে দোয়া করি যেন সে পূর্বের মতো পানিতে পূর্ণ করে দেয়।"

www.bjilibrary.com

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস এবং তাঁর সাথীরা এ চিরকুট নদীতে নিক্ষেপ করে ফিরে এলেন। পরবর্তী দিন সকালে যখন মিসরবাসী নিদ্রা থেকে জাগলো তখন তারা আল্লাহর কুদরাতের এক অত্যাশ্চর্য নিদর্শন দেখতে পেলো। এ সময় নীল নদীতে ১৬ হাত পানি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জমি পানি সিক্ত হচ্ছে। এ দৃশ্য দেখে অনেক মিসরী ইসলাম গ্রহণ করলো এবং সে নির্যাতনমূলক রসম চিরতরের জন্য নির্মূল হয়ে গেলো।

আল্লাহ পাক হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসকে ইজতিহাদ শক্তিও প্রদান করেছিলেন। জাতুস সালাসিল যুদ্ধে এক রাতে গোসল প্রয়োজন হয়ে পড়লো। সে সময় প্রচণ্ড শীত পড়ছিলো। ঠাণ্ডা পানি দিয়ে গোসল করায় অসুস্থ হয়ে পড়ার আশংকা ছিলো এবং গোসল করলে নামায কাজা হয়ে যেতে। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু অত্যন্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেলেন। অবশেষে জ্ঞান ও ইজতেহাদের মাধ্যমে এ সংকট থেকে মুক্তির পথ বের করলেন। তিনি গোসলের অবস্থাকে অযুর ওপর কিয়াস করলেন। ইজতেহাদের মাধ্যমে তাইয়াম্মুম করলেন এবং নামায পড়লেন। মদীনা ফিরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ ঘটনা বললেন। তিনি বললেন, আমর ইবনুল আস ! তুমি জানাবাত বা অপবিত্র অবস্থায় নামায পড়লে ? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! রাতে ভয়ানক ঠাণ্ডা ছিলো। এ অবস্থায় যদি গোসল করি তাহলে শেষ হয়ে যাওয়ার আশংকা ছিলো। আর যদি গোসল না করি তাহলে নামায যায়। এ দোদুল্যমান অবস্থায় কুরআনের এ আয়াত আমার স্মরণ হলো ঃ লা তাকতুলু আনফুসাকুম ইন্নাল্লাহা কানা বিকুম রাহিমা। বস্তুত তাইয়াম্মুম করে আমি নামায পড়ে নিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুচকি হেসে চুপ হয়ে গেলেন।–(মুসনাদে আহমদ)

আমওয়াসের প্লেগ মহামারীকালে বড় বড় জলিলুলকদর সাহাবী যেমন হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল জাররা এবং হযরত মায়াজ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন জাবাল অকুস্থল থেকে বাইরে চলে যাওয়াকে তাকদীর বিরোধী মনে করতেন। কিন্তু হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস বলতেন মানুষ ভীতি থেকে বাঁচার জন্য যেভাবে চেষ্টা করে বাঁচে তেমনি এ মুহূর্তে বাঁচার চেষ্টা না করা সঠিক হবে না। সুতরাং হযরত আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং হযরত মায়াজ রাদিয়াল্লাহ আনহু বিন জাবালের ইন্তেকালের পর তিনি ইমারতের দায়িত্ব হাতে নিয়েই সেনাবাহিনীকে মহামারীর স্থান থেকে সরিয়ে পাহাড়ের ওপর নিয়ে গেলেন। এভাবে তারা প্লেগে আক্রান্ত হওয়া থেকে রক্ষা পেলো। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুও হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসের এ কাজের প্রশংসা করলেন।

www.bjilibrary.com

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস সাহিত্য সৃষ্টিতে পারদর্শী এবং বাগ্মী ছিলেন। তাঁর রচনায় এবং ভাষণে সব ধরনের সাহিত্য গুণই সুলভ। ইতিহাসে তার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে।

একবার হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু তাকে এ পত্র লিখলেন ঃ

"হে আমর ! তোমার কাছে যা চাই তাহলো, এ পত্র পৌছার সাথে সাথেই তুমি মিসরের এমন সঠিক চিত্র তুলে ধরে চিঠি লিখবে যাতে আমি তা পাঠ করে সে দেশের বাস্তব অবস্থা স্বচক্ষে দেখার মতো মনে করতে পারি।"

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস এ চিঠির জবাবে লিখলেন ঃ

"হে আমীরুল মু'মিনীন ! মিসরকে বালুকাময় প্রান্তর ও শ্যামলীময় পূর্ণ দু'টি ভাগে বিভক্ত একটি পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত বলে মনে করতে পারেন। এক দিকে রয়েছে বালির টিলা আর অন্যদিকে রয়েছে জীর্ণ ঘোড়া অথবা উটের পেটের আকৃতির মত অবস্থা। এটা হলো মিসরের বাহ্যিক দৃশ্য। এ দেশের সামগ্রিক উৎপাদন ও সম্পদ আসওয়ান থেকে নিয়ে গাজা সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। আর এ সম্পদের মূল উৎস হলো একটি প্রবাহিত নদী। এ নদীর জোয়ার-ভাটা চন্দ্র ও সূর্যের উদয় এবং অস্তের সাথে সম্পৃক্ত।

একটি নির্দিষ্ট সময়ে বিশ্বের সকল প্রস্রবণ যেন একটি নদীকে রাজস্ব স্বরূপ পানি প্রদান করে। সে সময় নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে দু' কূল ছেপে যায় এবং শস্য শ্যামলীমায় পূর্ণকারী পলি রেখে যায়।

এ সময় বিভিন্ন স্থান থেকে অসংখ্য ছোট ছোট নৌকা এখানে আগমন করে। মোটকথা সে সময় যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায় নৌকা। খেজুরের পাতার সাথে এসব নৌকার সংখ্যার তুলনা করা যায়।

এরপর ভূমি সিঞ্চনের জন্য যখন আর পানির প্রয়োজন থাকে না, তখন ভাগ্যবান নদীটি নিজের সীমায় প্রত্যাবর্তন করে। এ সময় নদীর মধ্যে লুকায়িত সম্পদ অনায়াসেই আহরণ করা যায়।

খোদার আশির্বাদ পুষ্ট একটি জীব। মৌমাছির মত অন্যের জন্য শ্রম দানকারী এ জীবটি নিজের শ্রম ও গায়ের ঘামের জন্য কোনো লাভের ধার ধারে না। তারা এ মাটিতে সামান্য হাল কর্ষণ করে, বীজ বপন করে এবং সেই স্রষ্টার কাছেই সবুজের-সমারোহ প্রার্থনা করে যে স্রষ্টা শস্যের বৃদ্ধি এবং চরম রূপদানের দায়িত্ব পালন করেন। বীজ বর্ধিত হয়। বৃক্ষ বাড়তে থাকে এবং শিশির বিন্দুর মাধ্যমে মেঘের কাজ হয়ে ফলের খোসা তৈরি হয় এবং তা পোক্ত হয়।

www.bjilibrary.com

সুন্দর ফসল হওয়ার পরও কোনো কোনো সময় আবার খরার বছর আসে। আমীরুল মু'মিনীন! কোনো কোনো সময় এ শস্য শ্যামল মিসরে খরার কারণে নেমে আসে দুর্ভিক্ষ। মোটকথা বৈপরিত্যে ভরা এ দেশ।

শস্য শ্যামলীমাপূর্ণ মিসর এবং তার বাসিন্দাদের সুপ্রসন্ন ভাগ্য তিনটি জিনিসের ওপর নির্ভরশীল। প্রথমত এমন প্রস্তাব করা প্রয়োজন যাতে রাজস্ব বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয়ত রাজস্বের এক-তৃতীয়াংশ নদী ও পুলের রক্ষণাবেক্ষণ এবং নতুন নির্মাণে ব্যয় করা উচিত। তৃতীয়তঃ সবসময়ই জমির উৎপাদানের ভিত্তিতে রাজস্ব নির্ধারণ করা দরকার।—ওয়াসসালাম

আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহু হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহুর কাছে সাইপ্রাসের ওপর হামলার অনুমতি চাইলেন। আমীরুল মু'মিনীন হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসকে পত্রে সমুদ্রের অবস্থা জানতে চেয়ে পত্র লিখলেন। তিনি জবাবে জানালেন ঃ

"আমি একটি বড় সৃষ্টি দেখেছি। যার ওপর ছোট সৃষ্টি এমনভাবে বসে আছে যেমন কাঠের ওপর পোকা। কাঠ যদি সামান্য এদিক ওদিক হয়, তাহলে পোকা ডুবে যাবে। আর যদি সহীহ সালামতে থাকে তাহলেও ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় থাকে।"

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসের জীবনে রাসূল প্রেম, বাহাদুরী জিহাদের প্রেরণা ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ, শরাফত, নরম মন এবং তাদবির ও রাজনীতি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ভালোবাসার অবস্থা এমন ছিলো যে, একবার মদীনায় এক গুজবের ফলে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা সৃষ্টি হলো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সময় কতিপয় সাহাবী সমভিব্যাহারে মসজিদে নববীতে অবস্থান করছিলেন। বস্তুত প্রকৃত অবস্থা কেউই অবগত ছিলেন না। এজন্য চারিদিকে ভীতি ছড়িয়ে পড়লো। এ নাজুক অবস্থায় শুধুমাত্র হযরত আবু হুজাইফা রাদিয়াল্লাহ আনহু গোলাম সালেম রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর ইবনুল আস তরবারি হাতে মসজিদে দাঁড়িয়ে রইলেন। যাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর সামান্যতম আঘাতও না আসতে পারে এবং প্রয়োজনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য নিজের জীবন বিলিয়ে দিতেও সামান্যতমও কুণ্ঠাও ছিলো না। পরিস্থিতি একটু শান্ত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদের উদ্দেশ্য করে খুতবা দিলেন। খুতবায় তিনি বললেন, তোমরা আল্লাহ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের

www.bjilibrary.com

আশ্রয়ে কেন আগমন করোনি এবং আমর ইবনুল আস ও সালেমের অনুকরণ কেন করোনি ? কাণাঘুষার মধ্যে আল্লাহর রাসূলের কাছে তোমাদের দৌড়ে আসা উচিত ছিলো এবং ঐকবদ্ধভাবে ভীতির মুকাবিলা করার দরকার ছিলো।

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস স্বয়ং বলতেন, ইসলাম গ্রহণের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রিয় বস্তু দুনিয়ায় আমার কাছে আর কিছুই ছিলো না। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাঁকে সম্মান করতেন এবং তাঁর প্রতি ছিলেন স্নেহশীল। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বলে বর্ণিত আছে যে, একবার এক ব্যক্তি হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহুকে বললো, সেই ব্যক্তি কি চরিত্রবান নন, যাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত ভালোবাসতেন ?

তিনি বললেন, এমন এক ব্যক্তির সৌভাগ্যবান হওয়া সম্পর্কে কি কোনো সন্দেহ থাকতে পারে ?

সেই ব্যক্তি বললো, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওফাত পর্যন্ত আপনাকে ভালোবাসতেন।"

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন সময় হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসকে খোলাখুলিভাবে প্রশংসা করেছেন। একবার তাঁর ঈমানের প্রশংসা করে বললেন, "হিশাম রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু সাচ্চা মু'মিন।"-(মুসনাদে আহমদ)

একবার এরশাদ করলেন, আমর ইবনুল আস কুরাইশদের মধ্যে অন্যতম সালেহ ব্যক্তি।-(আল ইসাবা)

আরো একবার বলেছিলেন, "আবদুল্লাহ এবং আবু আবদুল্লাহ [আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস] উত্তম পরিবারের মানুষ।-(কানযুল আমাল)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কয়েকটি অভিযান তাঁকে জলিলুল কদর সাহাবীদের ওপর অফিসার বানিয়ে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি অত্যন্ত সাহসী পুরুষ ছিলেন। আমীর হওয়ার কারণে যুদ্ধে পিছনে থাকতেন না। বরং প্রথম কাতারে থেকে বাহাদুরী প্রদর্শন করতেন।

আল্লাহর পথে জিহাদে তিনি অকুতোভয় ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে এবং তার পরও ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে অসংখ্য লড়াইয়ে তিনি জান প্রাণ দিয়ে যুদ্ধ করেছেন। সবসময়ই শাহাদাতের তীব্র আকাংখা মনের বীণায় বাজতো। এজন্য প্রত্যেক যুদ্ধেই শত্রু ব্যূহে অবলীলাক্রমে ঢুকে পড়তেন এবং বেপরোয়া হয়ে যুদ্ধ করতেন। আজনাদাইনের

www.bjilibrary.com

যুদ্ধে তিনি এবং তাঁর ভাই হিশাম রাদিয়াল্লাহ আনহু সারারাত শাহাদাত প্রাপ্তির দোয়া করলেন। পরের দিন হযরত হিশাম রাদিয়াল্লাহ আনহু যুদ্ধে শহীদ হয়ে গেলেন। আর তিনি দোয়া করলেন। পরের দিন হযরত হিশাম রাদিয়াল্লাহ আনহু যুদ্ধে শহীদ হয়ে গেলেন। আর তিনি বেঁচে রইলেন। শাহাদাত থেকে মাহরুম থাকার কারণ আজীবন দুঃখ প্রকাশ করতেন। তিনি বলতেন, হিশাম আমার থেকে আফজাল ছিলেন। এজন্য শাহাদাত প্রশ্নে তার দোয়া কবুল হয়ে গেলো।

বিত্ত বৈভব এবং ধন-সম্পদের দিক থেকে হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস আরবের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন। তিনি যেমন ধনী ছিলেন তেমনি তাঁর অন্তরও ছিলো প্রশস্ত। আল্লাহর পথে নিজের সম্পদ দরাজ হাতে খরচ করতেন। তিনি বলতেন ঃ "সবচেয়ে বড় দানশীল সেই ব্যক্তি যিনি দুনিয়াকে দীনের উন্নয়নে ব্যয় করেন।"

স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার তাঁর ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহর আবেগের প্রশংসা করে প্রকাশ্যভাবে তিনবার বলেছিলেন ঃ

"হে আল্লাহ ! আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসের মাগফিরাত দান করো। আমি যখনই তাকে দান করার জন্য ডেকেছি তৎক্ষণাৎ সে দান করেছে।"–(কানযুল আমাল)

ইমাম হাকিম (র) নিজের গ্রন্থ "মুসতাদরাকে" হযরত আলকামা বিন রামছার বর্ণনা এভাবে নকল করেছেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসকে কোনো অভিযানে বাহরাইন প্রেরণ করলেন এবং নিজের অন্য এক অভিযানে তাশরীফ নিলেন। আমরাও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহযাত্রী ছিলাম। পথিমধ্যে তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। জেগে বললেন, "হে আল্লাহ ! আমরের ওপর রহম করো।"

একথা শুনে আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই "আমর" নামক ব্যক্তিটির উল্লেখ করতে লাগলাম। আবার দ্বিতীয়বার চোখ মুদিত করলেন এবং জেগে প্রথম কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। তৃতীয়বারও একই ঘটনা ঘটলো। আমরা নিজেদেরকে স্থির রাখতে না পেরে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! আপনি কোন্ আমরের দিকে ইঙ্গিত করছেন। ইরশাদ হলো আমর ইবনুল আস। আমরা এর কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আমার সেই কথা মনে পড়ছে। যখন আমি লোকদের কাছে সাদকাহ বা দান চাইতাম। তখন সে প্রচুর সাদকা আনতো। আমি জিজ্ঞেস করতাম কোত্থেকে এনেছ। তখন বলতো আল্লাহ দিয়েছেন।

www.bjilibrary.com

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস প্রকৃতিগতভাবেই দাতা ছিলেন। গরীব-দুঃখীদেরকে মুঠো ভরে ভরে দান করতেন। গরীব শরীফদের ওপর তাঁর বিশেষ দৃষ্টি ছিলো। না চাইতেই তাদেরকে দিতেন এবং এবং অন্তর খুলে দিতেন।

শরাফত এবং নরম দিলের দিক থেকে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। বিলবিসের যুদ্ধে মাকুকাসের কন্যা গ্রেফতার হয়ে তাঁর সামনে এলো। তিনি তার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করলেন এবং নিরাপত্তাসহ তার পিতার কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

ইসকান্দারিয়া বিদ্রোহে এক কিবতি সরদার তালমা গ্রেফতার হলো এবং তাঁর কাছে পেশ করা হলো। তিনি তার সাথে অত্যন্ত সুন্দর ব্যবহার করলেন এবং সাবধান করে মুক্ত করে দিলেন। কেননা সাধারণত কিবতীরা বিদ্রোহে অংশ নেয়নি। দু' একজন যারা অংশ নিয়েছিলো তাদেরকে রোমকরা পথভ্রষ্ট করেছিলো।

আর এক ঘটনাতেও তার নরম মনের পরিচয় পাওয়া যায়। আইনে শামস বা কাছরে শামা বিজয়ের পর হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু খেলাফতের দরবারে ইসকান্দারিয়ায় সৈন্য প্রেরণের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। সেখান থেকে অনুমোদন এলে হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু যাত্রার নির্দেশ দিলেন। ঘটনাক্রমে একটি কবুতর হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর তাঁবুতে বাসা বেধেঁছিলো। তাঁবু ভাঙ্গা হচ্ছিলো। এ সময় তাঁর দৃষ্টি গিয়ে পড়লো কবুতরের বাসার ওপর। কবুতরকে সেখানেই রাখার নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন, আমাদের মেহমান যেনো কষ্ট না পায়। বস্তুত আরবীতে তাঁবুকে ফুসতাত বলা হয়। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস ইসকান্দারিয়া থেকে ফিরে এসে সেই তাঁবুর কাছেই শহর পত্তন করেছিলেন। এজন্য ফুসতাত নামেই শহরের নাম বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিলো এবং আজ পর্যন্তও সে নামেই খ্যাত আছে।-(আল ফারুক)

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস নিজের ইমারাতকালে মিসরবাসী বিশেষ করে কিবতীদের সাথে অত্যন্ত স্নেহ বৎসল ব্যবহার করতেন। আর এ কারণেই তারা তার সত্যিকার শুভাকাংখী এবং অনুগত ছিলো। এ নরম ব্যবহারের কারণেই রাজস্ব কম আদায় হতো। এ ব্যাপারে হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহ আনহু এবং হযরত ওসমান জুন্নুরাইন রাদিয়াল্লাহ আনহু উভয়েই তাঁর কাছে জবাব চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর কর্মকৌশল পরিবর্তন করেননি। বরখাস্তের পর হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহুর সাথে এ ব্যাপারে তাঁর কথোপকথন হয়েছিলো। হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহ আনহু তাঁকে

www.bjilibrary.com

বলেছিলেন যে, তাঁর স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি অধিক রাজস্ব আদায় করে প্রেরণ করেছে (উটনী বেশী দুধ দিয়েছে) তখন তিনি এ অর্থপূর্ণ বাক্য বলেছিলেন—"কিন্তু শাবক বা বাছুর তো অভুক্ত রয়ে গেছে।"

একথার মাধ্যমে তিনি এ বুঝাতে চেয়েছিলে যে, মিসরবাসীর কাছ থেকে রাজস্ব তো বেশী আদায় করা হয়েছে। কিন্তু এটা দেখা হয়নি যে, রাজস্ব আদায়ের পর তারা অভুক্ত রয়েছে কিংবা দারিদ্রে নিমজ্জিত হয়েছে।

রাজনীতি ও কূটনীতি, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং বিচক্ষণতার দিক থেকে হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস আরবের হাতে গোনা কয়েকজনের অন্যতম ছিলেন। তাঁর চরিত্রের প্রতি তীক্ষ্ণভাবে দৃষ্টিনিক্ষেপ করলে এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, চিক্ষণতার ক্ষেত্রে সমকালীন সময়ে তিনি ছিলেন একক। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সঠিক মতের প্রশংসা করে একবার তাঁকে সম্বোধন করে বলেছিলেন ঃ

"ইসলামে তুমি সঠিক মতের মানুষ।-(কানযুল আমাল) হযরত ওমর ফারুকের রাদিয়াল্লাহ আন মত মানুষ বলতেন ঃ

"আমর ইবনুল আস হুকুমাতের জন্য যোগ্য মানুষ।" তিনি যখন কোনো অপোক্ত এবং দুর্বল মতের মানুষ দেখতেন তখন আশ্চর্য প্রকাশ করে বলতেন —"আল্লাহু আকবার—এ ব্যক্তি এবং আমর ইবনুল আসের সৃষ্টিকর্তাতো একই।"

শাইখাইন রাদিয়াল্লাহ আনহুর পর হযরত আমর ইবনুল আস যে কর্ম-পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন, তা অনেক চরিতকারই সমালোচনা করেছেন। কিন্তু এ ধরনের বাহাছ মুবাহিছা এ পুস্তকের আলোচ্য বিষয় নয়। প্রাচীন আলেমদের কাছে সাহাবাদের ঝগড়া-বিবাদের ব্যাপারে জবান বন্ধ রাখাই শ্রেয়। যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো সাহাবীর পক্ষ থেকে কোনো ত্রুটি হয়েও যায়, তাহলে ব্যাপারটি আল্লাহই দেখবেন। আমাদের এ ব্যাপারে কটু বাক্য করা এবং তাঁর অন্যান্য গুণাবলী উপেক্ষা করা ঠিক নয়।

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস অত্যন্ত মর্যাদাবান হওয়া সত্ত্বেও অত্যন্ত বিনয়ী ছিলেন। গর্ব এবং অহংকার তাঁকে কখনও স্পর্শ করেনি। অধীনস্তদের প্রতি পিতার মতো স্নেহশীল ছিলেন। এক যুদ্ধে তাঁর গোলাম এবং সন্তান দু'জনই আহত হয়। প্রথমে তিনি গোলামের কাছে যান। তার জখম দেখেন এবং সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, এখন কিছু দিন আরাম করো। তারপর পুত্রের দিকে অগ্রসর হন এবং তার অবস্থা জিজ্ঞেস করেন।

www.bjilibrary.com

হযরত কাবিছাছ রাদিয়াল্লাহ আনহু বর্ণনা করেছেন, "হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস নিজের বান্ধবদের মধ্যে অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় এবং প্রিয় ছিলেন। এ ধরনের আমি আর কাউকে দেখিনি।"

তিনি সুন্দর ব্যবহার দিয়ে মিসরীয়দের অন্তর জয় করে দিয়েছিলেন। মিসরীয়রা তাঁকে মুরুব্বী মনে করতো। কখনো কখনো তিনি ক্রোধান্বিত হতেন। কিন্তু সাধারণত তিনি মিষ্ট ভাষী ছিলেন। একবার এক বুড়ো খচ্চরে চড়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। এক ব্যক্তি দেখে বললো, আপনি মিসরের আমীর হয়ে এ ধরনের পশুর ওপর সওয়ার হয়েছেন। তিনি বললেন, পশু যতক্ষণ বোঝা বহন করতে পারে, স্ত্রী যতক্ষণ অনুগত থাকে এবং বন্ধু যতক্ষণ পর্যন্ত গোপনীয়তা রক্ষা করে ততক্ষণ আমি অসন্তুষ্ট হই না।

চরিতকাররা হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আসের অনেক বাণী উদ্বৃত করেছেন। তাঁর মধ্যে কতিপয় এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ

০ সবচেয়ে বড় বাহাদুর সেই ব্যক্তি যার ধৈর্য ক্রোধের ওপর বিজয়ী হয়।

০ সবচেয়ে বড় দাতা সেই ব্যক্তি যে নিজের দুনিয়াকে দীনের উন্নয়নে খরচ করে।

০ এক হাজার উপযুক্ত ব্যক্তির মৃত্যুতে ততখানি ক্ষতি সাধিত হয় না যতখানি ক্ষতি সাধিত হয় একজন অনুপযুক্ত ব্যক্তির ক্ষমতাসীন হওয়ার।

০ শরীফ অভুক্ত হলে মুকাবিলা করে এবং নীচদের উদর পূর্তি হলে সামনাসামনি দাঁড়িয়ে যাওয়ার হিম্মত দেখায়। সুতরাং অভুক্ত শরীফ এবং ভুখা নীচদেরকে ভয় করো। অভুক্ত শরীফদের খেতে দাও এবং নীচদের তাঁবুতে রাখো।

০ আমি যদি নিজের গোপন তথ্য কোনো বন্ধুকে বলি, আর সে তা প্রচার করে বেড়ায়, তাহলে সে জন্য গাল-মন্দ পাবার হকদার আমি, সে নয়।

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস হযরত আমীর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহ আনহুর ওফাদার বন্ধু ছিলেন। কিন্তু তাঁর সামনে সত্য বা হক কথা বলতে কখনই দ্বিধা করতেন না এবং অন্তরে যা থাকতো স্পষ্টভাবে মুখ দিয়ে তা প্রকাশ করতেন।

চরিতকাররা কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। যেসব ঘটনায় তাঁর হক কথা এবং স্পষ্টবাদিতার স্বাক্ষর মেলে। হযরত আমর রাদিয়াল্লাহ আনহু ইবনুল আস নিসন্দেহে আমাদের ইতিহাসের এক মর্যাদাবান ব্যক্তিত্ব। যাঁকে স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালেহ ব্যক্তির উপাধিতে ভূষিত এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ভালোবেসেছেন। তার সৌভাগ্যবান ও মর্যাদাবান হওয়ার প্রশ্নে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না।

www.bjilibrary.com

গ্রন্থপঞ্জী

১. পবিত্র কুরআন শরীফ
২. সহীহ্ আল বুখারী
৩. সহীহ্ আল মুসলিম
৪. মুসনাদে আবু দাউদ
৫. মুসনাদে আহম্মদ বিন হাম্বল
৬. জামে আত তিরমিযি
৭. মুসতাদরাকে হাকেম
৮. মিশকাত শরীফ
৯. তাবকাতে ইবনে সাআদ রাদিয়াল্লাহ আনহু
১০. তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক—ইবনে জারীর তাবারী (র)
১১. আল ইসাবাহ ফি তামাইয়িজুস সাহাবাহ—হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র)
১২. তাহযীবুত তাহযীব—হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র)
১৩. আর ইসতিয়াব মারিফাতুল আসহাব—হাফিজ ইবনে আবদুল বার (র) উন্দুলুসী
১৪. আস-সিরাতুন নুববিয়াত—ইবনে হিশাম (র)
১৫. যাদুল মাআদ—হাফিজ ইবনে কাইয়েম (র)
১৬. উসুদুল গাব্বাহ—ইবনে আসীর (র)
১৭. আল কামিল ফিত তারীখ—ইবনে আসীর (র)
১৮. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া—হাফিজ ইবনে কাসীর (র)
১৯. ফতহুল বুলদান—বালাজুরী (র)
২০. আল আনবারুত তাওয়াল—আবু হানিফা দিনাওয়ারী
২১. তরজুমানুল সুন্নাহ—মাওলানা বদরে আলম মিরাঠি (র)
২২. মাআরিফুল হাদীস—মাওলানা মুহাম্মদ মনজুর নুমানী
২৩. খালিদ সাইফুল্লাহ—আবু যায়েদ শালবী
২৪. আল ফারুক—শিবলী নুমানী (র)
২৫. তারীখে ইসলাম—শাহ মুঈনউদ্দীন আহমদ নদবী মরহুম

www.bjilibrary.com

২৬. তারীখে ইসলাম—আকবর শাহ খান নজিব আবাদী মরহুম
২৭. মিয়ারুস সাহাবাহ রাদিয়াল্লাহ আনহুম—শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নদবী মরহুম
২৮. সিয়ারে আনসার রাদিয়াল্লাহ আনহু—মৌলভী সাঈদ আনসারী মরহুম
২৯. সিয়ারুস সাহাবাহ রাদিয়াল্লাহ আনহুম—প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড—মৌলভী সাঈদ আনসারী মরহুম
৩০. আহলি কিতাব সাহাবাহ ওয়া তাবেয়ীন—হাফিজ মুজিবুল্লাহ নদবী
৩১. তারীখে মিল্লাত—কাজী যয়নুল আবেদীন মীরাঠি
৩২. হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহুর সরকারী পত্রাবলী—খুরশীদ আহমদ ফারুক
৩৩. আল মাশাহেদ—হাকিম রহমান আলী খান মরহুম
৩৪. দায়েরায়ে মাআরেফে ইসলামিয়া (ইনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম) পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়—বিভিন্ন খণ্ড
৩৫. হায়াতুস সাহাবা রাদিয়াল্লাহ আনহুম—মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ কানধুলুবী (র)

www.bjilibrary.com

আমাদের প্রকাশিত কিছু বই

* **তাফহীমুল কুরআন (১-১৯ খণ্ড)**
  —সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.
* **তরজমায়ে কুরআন মজীদ (এক খণ্ডে)**
  —সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.
* **তাদাব্বুরে কুরআন (১-২ খণ্ড)**
  —মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী
* **শব্দে শব্দে আল কুরআন (১-১ ৪খণ্ড)**
  —মাওলানা মুহাম্মাদ হাবিবুর রহমান
* **সহীহ আল বুখারী (১-৬ খণ্ড)**
  —আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী র.
* **সুনান ইবনে মাজা (১-৪ খণ্ড)**
  —আবু আবদুল্লাহ ইবনে মাজা র.
* **শারহু মাআনিল আছার (তাহাবী শরীফ) (১-২ খণ্ড)**
  —ইমাম আবু জাফর আহমাদ আত-তাহাবী র.
* **সীরাতে সরওয়ারে আলম (১-২ খণ্ড)**
  —সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.
* **মহানবীর সীরাত কোষ**
  —খান মোসলেহ উদ্দীন আহমদ
* **বিশ্বনবীর মোযেজা**
  —ওয়ালিদ আল আযমী
* **হযরত আবু বকর রা.**
  —মুহাম্মদ হুসাইন হাইকল
* **শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ দা'য়ী ইলাল্লাহ**
  —মুহাম্মদ নূরুজ্জমান
* **মাওলানা মওদূদীকে যেমন দেখেছি**
  —অধ্যাপক গোলাম আযম
* **মুন্সী মেহেরউল্লা ঃ জীবন ও কর্ম**
  —নাসির হেলাল

www.bjilibrary.com